আশাপূর্ণা দেবীর ছোটগল্প ঃ জীবনদৃষ্টি ও শিল্পরূপ

গবেষিকা

শুচিস্মিতা দেবনাথ

প্রভাষিকা, বাংলা বিভাগ

দিনহাটা মহাবিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়িকা

ডঃ মঞ্জুলা বেরা

রীডার, বাংলা বিভাগ

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পি. এইচ. ডি (বাংলা)

উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

২০০৮

STOCK TAKING - 2011

Th 80.33
শ্রীচ/গোস্বা

223080
31 MAR 2010

প্রাক্‌-কথন

'আশাপূর্ণা দেবীর ছোটগল্প ঃ জীবনদৃষ্টি ও শিল্পরূপ' শিরোনামে অভিসন্দর্ভটির প্রেক্ষিতে কিছু কথা বলা আবশ্যক। বিদ্যালয় শিক্ষার স্তর থেকেই আমার বিদ্যালয় ও স্থানীয় পাঠাগার থেকে সংগৃহীত পুস্তকগুলির মধ্যে আশাপূর্ণা দেবী রচিত বেশ কিছু গ্রন্থ পাঠের সুযোগ পাই। তাঁর রচনায় সংসার জীবনের বিশেষ করে মা-কাকিমা, পরিচিতদের মধ্যে কেমন যেন একটা সাজুয্য খুঁজে পেতাম। আর সেই থেকেই তাঁর লেখার প্রতি একটা অমোঘ আকর্ষণ বোধ করি। পরবর্তীকালে মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাগ্রহণের সময় তাঁর রচনা পাঠের আরো সুযোগ পাই এবং মুগ্ধচিত্তে তা গ্রহণ করি। এই মুগ্ধতাবোধ থেকেই আশাপূর্ণা দেবীর রচনারাজির ওপর গবেষণার জন্য আকর্ষণ তৈরি হয়। অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হবার পর সুপ্ত বাসনা বিকশিত হবার সুযোগ পায়।

উপন্যাসের তুলনায় ছোটগল্পের ছোট্ট পরিসরে তাঁর জীবনদৃষ্টিকে যেহেতু আরও বেশি গভীরভাবে উপলব্ধি ও বিশ্লেষণ করা যায়। তাই তাঁর ছোটগল্পের ওপর গবেষণা করার জন্য মনস্থির করি। এরপর আমি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন বাংলা বিভাগীয় প্রধান ডঃ মঞ্জুলা বেরা মহাশয়ার সান্নিধ্যে আসি এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে আরব্ধ কর্মে বৃত হই। প্রতিনিয়ত তাঁর মূল্যবান সুপরামর্শ এবং প্রচুর সহায়তা আমাকে সমৃদ্ধ করেছে।

অধ্যাপনা, সংসারজীবন ও একমাত্র ছোট্ট শিশুকন্যার লালন পালন করে গবেষণার কাজ আমার পক্ষে খুব কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছিল। কখনও মনে হত যে, আমার পক্ষে আর একাজ হয়ত সম্ভব নয়। তখন আমার পরিবারের সকলে বিশেষতঃ আমার মা-বাবা এবং আমার তত্ত্বাবধায়িকা যেভাবে সহযোগিতা করেছেন ও উৎসাহ জুগিয়েছেন তা বলার ভাষা আমার নেই। এজন্য তাঁদের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ।

এছাড়া অনেক জ্ঞানী, গুণীজনের সুপরামর্শও আমাকে উপকৃত করেছে। বিভিন্ন গ্রন্থাগার থেকেও নানাভাবে নানাসূত্রে সহযোগিতা পেয়েছি। যেমন —

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার (কোচবিহার), দিনহাটা মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, তুফানগঞ্জ রাজ রাজেন্দ্র নারায়ণ লাইব্রেরী, ইসলামপুর টাউন লাইব্রেরী, কোচবিহারের অন্তর্গত পেষ্টারঝাড় উচ্চবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, পেষ্টারঝাড় উদয়ন পাঠাগার এবং খাগড়াবাড়ি সিদ্ধেশ্বর পাঠাগার। এই সমস্ত গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও কর্মীদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

অভিসন্দর্ভটির মুদ্রণ কার্যে আমাকে সহায়তা করেছেন শ্রীমতী রাখী দাস, এস. ডি. ইম্প্রেশন, পুরাতন পোষ্ট অফিস পাড়া, কোচবিহার। তাঁকেও আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই।

কোচবিহার
১৫ অগস্ট, ২০০৮

শুচিস্মিতা দেবনাথ

আশাপূর্ণা দেবী

জন্ম
০৮ - ০১ - ১৯০৯
২৪ - ০৯ - ১৩১৫

মৃত্যু
১৩ - ০৭ - ১৯৯৫
২৭ - ০৩ - ১৪০২

হরেন্দ্র নাথ গুপ্ত

সরলাসুন্দরী দেবী

আশাপূর্ণা দেবীর 'বাবা' ও 'মা'

স্বামী, পুত্রবধূ ও দুই নাতনির সঙ্গে আশাপূর্ণা দেবী

ভাইফোঁটার দিন আশাপূর্ণা দেবীর পাঁচ ভাইবোন — বীরেন্দ্রনাথ, ধীরেন্দ্রনাথ, হীরেন্দ্রনাথ, সম্পূর্ণা ও আশাপূর্ণা দেবী

১৯৮৯ সালে বিশ্বভারতী কর্তৃক আশাপূর্ণা দেবীকে দেশিকোত্তম উপাধি

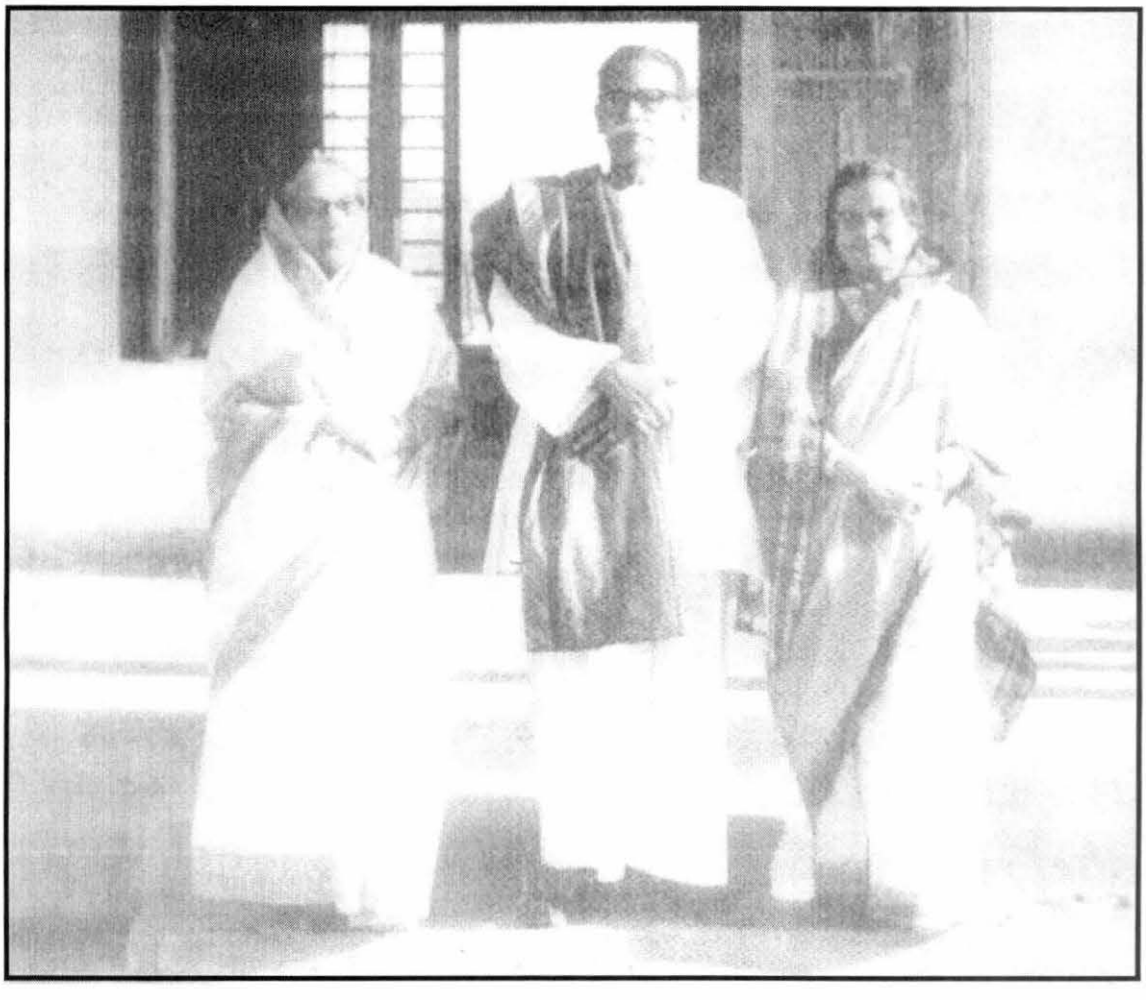

শান্তিনিকেতনে আশাপূর্ণা দেবীর বাড়িতে নরেন্দ্র দেব ও রাধারাণী দেবী
(শান্তিনিকেতন - ১৯৬২)

সূচিপত্র

ভূমিকা ১ - ৮

প্রথম অধ্যায় ঃ
আশাপূর্ণা দেবীর ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্য জীবন ১০ - ৩৭

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ
ছোটগল্পকার হিসেবে আশাপূর্ণা দেবীর আবির্ভাব ও ক্রমপরিণতি ৩৯ - ৪২

তৃতীয় অধ্যায় ঃ
আশাপূর্ণা দেবীর ছোটগল্পে জীবনদৃষ্টি ৪৪ - ২০৪

চতুর্থ অধ্যায় ঃ
আশাপূর্ণা দেবীর ছোটগল্পের শিল্পরূপ ২০২ - ২৩১

পঞ্চম অধ্যায় ঃ
সমকালীন ছোটগল্পকার ও আশাপূর্ণা দেবীর স্বাতন্ত্র্য ২৩৩ - ২৫৬

উপসংহার ২৫৭ - ২৭১

গ্রন্থপঞ্জি ২৭২ - ২৮১

সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা ২৮২

ভূমিকা

সৃষ্টির আদি লগ্ন থেকে, যখন মানুষ কথা বলতে এবং সংঘবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে শুরু করল, তখন থেকেই গল্প বলার শুরু। মানুষ গল্প শুনতে এবং গল্প সৃষ্টি করতে ভালোবাসে। সভ্যতার বিচিত্র অগ্রগমনের সঙ্গে সঙ্গে গল্পও নানাভাবে ভাষায় রসে বৈচিত্র্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। মানুষের গল্প শোনার এই চিরন্তন বৃত্তিটি শিল্পদৃষ্টির নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রতিনিয়ত নবরূপ লাভ করে চলেছে।

প্রতিটি দেশের প্রাচীন সাহিত্যেই গল্পের নানা উপাদান কোন না কোনভাবে বিরাজিত। লেখ্য পদ্ধতির সূচনা হয়নি বলে কথাকোবিদরা এবং দিদিমা-ঠাকুমারা মুখে মুখে গল্প বলে সেগুলোকে দীর্ঘস্থায়ী করে রেখেছেন। সর্বকালে মুখে মুখে অথবা লেখ্যরূপে কথারস পরিবেশনের নিপুণতাই মানুষের গল্প শোনার আকাঙ্ক্ষাকে পরিতৃপ্ত করেছে।

প্রকৃতি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রহস্যময়ী। আদিম যুগের মানুষের কাছে প্রকৃতির এই রহস্যময় সৌন্দর্য্য ছিল অপার মুগ্ধতার বিষয়। ভারতের প্রাচীনতম সাহিত্য ঋক্‌বেদেও তাই বিশ্বপ্রকৃতিকে কেন্দ্র করে মানুষের বিস্ময়াকুলতাই স্থান পেয়েছে। ঋক্‌বেদে কয়েকটি গল্প আভাসিত হয়ে উঠেছে। এখানে রয়েছে উর্বশী ও পুরূরবার কাহিনি।

বৈদিক সাহিত্যেও অনেক গল্পের কাঠামোর নিদর্শন মেলে। মনু ও যমের পিতা বিবস্বানকে নিয়ে গল্প রয়েছে। উপনিষদেও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী সমন্বিত ও উচ্চ ভাবাদর্শ বিশিষ্ট অনেক গল্প রয়েছে।

প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যেও যে পুরাণকাহিনি বর্ণিত হয়েছে সেখানে তাৎপর্যমণ্ডিত অনেক প্রথম শ্রেণির গল্প রয়েছে। এই কাহিনিগুলোতে মানবজীবনের বিবিধ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। জুপিটার-লেডা, নার্সিসাস-ইকো, ভেনাস-অ্যাডোনিস প্রভৃতি চরিত্রদের মানবিক ধর্মগুলো কবিরা অঙ্কিত করেছেন।

লোকসাহিত্যের মধ্যেও কাহিনি বর্ণনার একটি প্রয়াস দৃষ্টি আকর্ষণ করে। লোককথা (Folk tale), রূপকথা (Fairy tale), পশুপাখি সংক্রান্ত নীতিগল্প (Fable), লোকগীতিকা (Ballad), লৌকিক পুরাণ (Myth) ও জনশ্রুতিমূলক আখ্যায়িকা (Tale) — প্রভৃতি লোকসাহিত্যের বিভিন্ন ধারার প্রকাশে আমরা নানা ধরনের কাহিনির উল্লেখ পাই।

রূপকথার রূপকের আবরণে বাস্তবজীবনবোধকে পাওয়া যায়। যেমন — শঙ্খমালা, কাঞ্চনমালাতে

বাস্তবজীবনের প্রাত্যহিক সত্য প্রকাশিত হয়েছে। ইউরোপীয় রূপকথা সিন্ডারেলা (Cinderella), স্নো হোয়াইট (Snow-white) প্রভৃতি একইভাবে পাঠকমহলে প্রভাব বিস্তার করেছে। ছোটগল্পের উপাদানের সঙ্গে সঙ্গে উদার মুক্ত মনের পরিচয়ও রূপকথাতে পাওয়া যায় তার দিগন্ত বিস্তৃত কল্পজগতের মাধ্যমে।

রূপকথার চেয়েও বাস্তবতার কঠোর সত্যকে নিয়ে প্রকাশিত হয় গীতিকাগুলো যেখানে গল্পও রয়েছে। যেমন 'মৈমনসিংহ গীতিকা' তে কৃষক কবিদের রচিত আখ্যায়িকা রয়েছে। এই গীতিকার তীব্র সংহত একমুখী পরিণতি ও ঘটনাস্রোতের দ্রুততার মধ্যে ছোটগল্পের কিছু বৈশিষ্ট্য লুকায়িত রয়েছে বলে মনে হয়।

নীতিগল্প হিসেবে যে গল্পগুলো লিখিত হয়েছে তাতে পশুপাখীর স্থানই বেশি। যেমন বিষ্ণু শর্মা রচিত 'পঞ্চতন্ত্র' এবং 'ঈশপের ফেবলস্'। কাহিনিগুলোতে জীবন ঘনিষ্ঠতার প্রভাব রয়েছে বিস্তর।

প্রাচীন ভারতীয় কথা সাহিত্যের উৎস হিসেবে গুণাঢ্যের 'বৃহৎকথা' গ্রন্থটি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। এই 'বৃহৎকথা' কে অবলম্বন করেই ক্ষেমেন্দ্র 'বৃহৎকথামঞ্জরী' রচনা করেছেন এবং সোমদেব রচনা করেন 'কথাসরিৎসাগর'। সংস্কৃত কথাসাহিত্যের আরো নিদর্শন মেলে দণ্ডীর 'দশকুমারচরিত' ও বাণভট্টের 'কাদম্বরী' তে। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের গল্পের গ্রন্থাগার যেন 'কথাসরিৎসাগর'। পারস্য ভাষায় রচিত 'আরব্য উপন্যাস' এশিয়া এবং ইউরোপকে এক গদ্যরূপী মহাকাব্যের স্বাদ আস্বাদন করায়।

ইতালিতে নবজাগরণ ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই সাহিত্য জগতে এল বিরাট পরিবর্তন। পূর্বোক্ত রচনারাজির চাইতে ছোটগল্পের অনেক গুণাবলী সমৃদ্ধ রচনা প্রকাশিত হল গিওভানি বোকাচ্চিওর (১৩১৩-১৩৭৫) 'ডেকামেরণ'। বোকাচ্চিওকেই অনেকে আধুনিক ছোটগল্পের পথিকৃৎ বলে অভিহিত করে থাকেন। কারণ 'ডেকামেরণ' এর গল্প সমষ্টির অধিকাংশেরই সংক্ষিপ্ত পরিসর, গতির দ্রুততা এবং আকস্মিক পরিসমাপ্তি যেন ছোটগল্পের আগমন বার্তা ঘোষণা করে। বোকাচ্চিওর পরে কথাসাহিত্যে যাঁর অসামান্য অবদান রয়েছে তিনি হলেন জিওফ্রে চসার (১৩৪০ ? - ১৪০০ খ্রীঃ)। সাহিত্যে তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান হচ্ছে অসমাপ্ত 'ক্যান্টারবেরি টেল্স', 'ট্রয়লাস অ্যান্ড ক্রেসিডা' (১৩৮৫ খ্রীঃ) ও 'দি লিজেন্ড অব্ গুড্ উইমেন' (১৩৮৫ খ্রীঃ)।

উনিশ শতকে সমগ্র বিশ্বে ছোটগল্প রচনার জোয়ার আসে। মহাকালের ইতিহাসে যখন মহাসঙ্কট উপস্থিত হয় তখন সেখানে যে সামাজিক ঝড়-ঝঞ্ঝার সৃষ্টি হয় তাই ভাব ও বোধের জগতকে আলোড়িত করে তোলে। আর সাহিত্যিকরা তখন সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার জন্য প্রবল আর্তির সঙ্গে অভিমানাহত হয়ে জন্ম দেন ছোটগল্পের। ফরাসী বিপ্লব, রাশিয়ার জারের অপশাসন থেকে এই

ছোটগল্পের ঝড়ের সূত্রপাত ঘটে।

ফরাসী সাহিত্যে এলেন 'স্তাঁদাল' (১৭৮৬-১৮৪২), তাঁর বিখ্যাত গল্প 'The Philtre' ও 'The Jew'। এরপরে সর্বকালের সেরা কথাসাহিত্যিক 'ব্যালজাক্' (১৭৯৯-১৮০০) কে পাওয়া যায়। তাঁর রচিত 'A passion in the Desent' ও 'La Grande Breleche' হল বিখ্যাত গল্প। ছোটগল্পে টেকনিকের জন্ম দিলেন 'প্রস্পার মেরিমে' (১৮০৩-৭০)। 'Mateo Falcon' ও 'The Blue Room' গল্পগুলো উল্লেখযোগ্যতার দাবী রাখে। এরপরে 'এমিল জোলা' (১৮৪০-১৯০২) তাঁর রচনায় ন্যাচারিলিজমকে নিয়ে এলেন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গল্পকারদের মধ্যে একজন হলেন 'গী-দ্য-মোপাসাঁ'। তিনি কুড়ি বছর বয়সে লেখেন বিখ্যাত গল্প 'Buil de Suif' (চর্বির গোলা), এছাড়াও 'The Necklace' তাঁর অন্যতম গল্প। 'আলফঁস দোদে' (১৮৪৮-১৮৯৭) 'The Two Inns' গল্পের মাধ্যমে সাহিত্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন।

ছোটগল্পের সমৃদ্ধির জগতে এরপরেই স্থান হল রাশিয়ান সাহিত্যের। সাহিত্যে আধুনিকতাকে রাশিয়াতে নিয়ে এলেন আলেকজাণ্ডার পুশ্‌কিন (১৭৯৯-১৮৩৭)। 'Queen of Spades', 'The Shot', 'Snow storm' গল্পগুলো বহুখ্যাত। আধুনিকতায় বস্তুধর্মিতা ও তীক্ষ্মতা নিয়ে পুশ্‌কিনের পরে ছোটগল্পে এলেন নিকোলাই গোগোল (১৮০৯-১৯৫২)। 'ওভারকোট' তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্প। এরপর তুর্গেনিভ (১৮১৮-১৮৮৩) গদ্যরীতিকে সুষমামণ্ডিত করে তোলেন। সত্য ও সুন্দরের অনুভূতি নিয়ে সাহিত্য রচনা করে বিশ্ব সাহিত্যে অম্লান হয়ে আছেন কাউন্ট লিও টলস্টয় (১৮২৮-১৯১০)। মোঁপাসার সমগোত্রীয় রুশসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গল্পকার হলেন আন্তন চেকভ (১৮৬০-১৯০৪)। 'Ward No. 6', 'The Black Monk', 'The Grass Hopper' প্রভৃতি তাঁর শ্রেষ্ঠগল্প। গল্পের প্রথম খণ্ডের সংস্করণ প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই খ্যাতির শীর্ষে চলে যান অপর এক লেখক ম্যাক্সিল গোর্কি (১৮৬৮-১৯৩৬)।

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য ইংরেজি হলেও ছোটগল্পের দিক থেকে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। এখানে রয়েছেন রবার্ট লুই স্টিভেনসন (১৮৫০-১৮৯৪), যাকে বলা যায় ছোটগল্পের স্রষ্টা। 'ডক্টর জেকিল ও সিস্টার হাইড' তাঁর বিখ্যাত রচনা। অস্কার ওয়াইল্ড (১৮৫৬-১৯০০) 'দি পিকচার অব ডোরিয়ান গ্রে' নামে গ্রন্থ রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। এছাড়াও রয়েছে 'চার্লস ডিকেন্স', 'মাইকেল কলিন্স', 'টমাস হার্ডি', 'কোনান ডয়েল', 'সমার সেট মম', 'ই. এম. ফস্টার', ও ডি. এইচ. লরেন্স' এর নাম উল্লেখযোগ্য

ওয়াশিংটন আরভিঙ্ (১৭৮৩-১৮৫৯) এর সময় থেকেই আমেরিকান সাহিত্যের একটি স্বতন্ত্র ধারা দৃষ্টিগোচর হয়। এই ধারাকে পরিপূর্ণ রূপ দিয়েছেন এডগার অ্যালান পো (১৮০৯-৪৯)। 'The Black cat', 'The Pit and the Pendulum' প্রভৃতি তাঁর বিখ্যাত রচনা। 'পো' র সমকালীন

লেখক ন্যাথানিয়েল হথর্ন (১৮০৪ - ৬৪) ' দি স্কারলেট লেটার' লিখে খ্যাতির শীর্ষে উঠে যান। 'Twice-Told-Tales' তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্প সংকলন হিসেবে পরিগণিত। মার্ক টোয়েন (১৮৩৫-১৯১০), হেনরি জেমস (১৮৪৩ - ১৯১৬), ফ্রান্সিস ব্রেট হার্ট প্রমুখরা আমেরিকার সাহিত্যের ছোটগল্পের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেন।

ছোটগল্পে বিশ্বখ্যাত সাহিত্যিকদের ঠিক পরেই অর্থাৎ কনিষ্ঠ লেখক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)। তিনিই বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ছোটগল্পের রূপকার। কিন্তু তাঁরও আগে স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫ -১৯৩২) এবং ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৭ - ১৯১৯) কিছু গল্প রচনা করেন। ছোটগল্পগুলো আত্মপ্রকাশ করত প্রথমে কোন পত্রিকায়; 'ভারতী' র সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী দেবীর রচনা ভারতী পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়।

বাংলা কথা সাহিত্যের পূর্ণরূপ প্রকাশিত হয় বঙ্কিমচন্দ্রের (১৮৩৯-১৮৯৪) হাতে। তাঁর সাহিত্যের মতো 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২) পত্রিকাও এক অনন্য সৃষ্টি। এই পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়েছিল 'ইন্দিরা' (১৮৭২) ও 'যুগলাঙ্গুরীয়' (১৮৭৩) উপন্যাস। সেখানে প্রসঙ্গ ও প্রকরণের দিক থেকে ছোটগল্পের মৃদু পদধ্বনি পরিলক্ষিত হয়। এরপরেই ঐ পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয় বঙ্কিম সহোদর পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত ছোটগল্প 'মধুমতী' (১৮৭৩)।

বাংলা সাহিত্যে ১২৮৪ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ-ভাদ্র মাসের 'ভারতী' সংখ্যায় 'ভিখারিণী' গল্পের মাধ্যমে বীরের মতো বলিষ্ঠ পদক্ষেপে প্রবেশ করলেন রবীন্দ্রনাথ। 'সাপ্তাহিক হিতবাদী', 'সাধনা' 'সবুজ পত্র' তাঁর রচনার দ্বারা পরিপুষ্ট হতে শুরু করল এবং রবীন্দ্রনাথ ক্রমেই ছোটগল্পের জগতে স্বমহিমায় রাজকীয়, একমেবাদ্বিতীয়ম্ হয়ে উঠতে লাগলেন।

'রাজপথের কথা' (১২৯১) ছিল গল্পহীন কথা আর 'ঘাটের কথা' (১২৯১) তে রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্পের সূচনা ঘটান। এই সূচনা-বিন্দু পল্লবিত হয়ে ওঠে 'হিতবাদী' পত্রিকায় প্রথম পর্যায়ের ছয়খানি গল্প প্রকাশের মাধ্যমে। যেমন — 'দেনাপাওনা', 'পোস্টমাস্টার', 'গিন্নি', 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা', 'ব্যবধান' ও 'তারাপ্রসন্নের কীর্তি' গল্পের মাধ্যমে। প্রতিটি গল্পই ১২৯৮ সালে প্রকাশিত।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প রচনার দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয় 'সাধনা' পত্রিকাতে। গুরুগম্ভীর বিষয় নির্বাচনে 'হিতবাদী'র সম্পাদক 'সন্তুষ্ট নয়, তাই গ্রাম ছেড়ে নগর সভ্যতায় প্রবেশ করেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি লিখলেন 'দালিয়া' (১২৯৮), 'একরাত্রি' (১২৯৯), 'মধ্যবর্তিনী' (১৩০০), 'মানভঞ্জন' (১৩০২), 'দুরাশা' (১৩০৫), 'দৃষ্টিদান' (১৩০৫), 'নষ্টনীড়' (১৩০৮) ও 'মাল্যদান' (১৩০৯)। প্রকৃতি ও মানুষ একীভূত হয়ে গিয়ে সৃষ্টি হল 'সুভা' (১২৯৯), 'সমাপ্তি' (১৩০০) ও 'অতিথি' (১৩০২) র মতো গল্প।

সাময়িক পত্রিকাগুলোই সাধারণতঃ ছিল রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের বাহন। পত্রিকায় প্রকাশনার

ওপর ভিত্তি করেই তাঁর ছোটগল্পগুলোকে চারটি পর্বে ভাগ করা যায়। (১) **হিতবাদী পর্ব** (ছয়টি গল্প) ১২৯৮ বঙ্গাব্দ, (২) **সাধনা** (১২৯৮-১৩০২) ও **ভারতী** (১৩০৫-১৩১৮) **পর্ব**। 'সাধনা'য় পাঁচ বছরে ছত্রিশটি গল্প প্রকাশিত হয় এবং 'ভারতী'তে প্রায় পনেরোটি গল্প প্রকাশিত হয়।(৩) **সবুজপত্র** (১৩২১-১৩২৪) **পর্ব**। এই পত্রিকায় দশটি গল্প প্রকাশিত হয়। (৪) **তিনসঙ্গী পর্ব** (তিনটি গল্প)। আনন্দবাজার শারদীয়া সংখ্যায় ১৩৪৬ সালে প্রকাশিত হয় 'রবিবার'। 'শনিবারের চিঠি'তে ১৩৪৬ সালে 'শেষ কথা' এবং ১৩৪৭ সালের আনন্দবাজার শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশিত হয় 'ল্যাবরেটরি' গল্পটি।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে নানাদিকগুলি ধরা পড়ে। যেমন — প্রকৃতি, সমাজ ও মানুষ। ব্যক্তি ও সমাজ একত্রিত হয়ে রচিত হয় 'দেনাপাওনা' (১২৯৮), 'সদর ও অন্দর' (১৩০৭), 'যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ' (১৩০৮), 'হালদার গোষ্ঠী' (১৩২১)র মত গল্প। মানুষে মানুষে সম্পর্কের সূত্র ধরে আসে — 'দান প্রতিদান' (১২৯৯), 'দিদি' (১৩০১), 'মাস্টারমশাই' (১৩১৪), 'রাসমণির ছেলে' (১৩১৮), 'পণরক্ষা' (১৩১৮), 'শেষের রাত্রি' (১৩২১) র মতো গল্প। 'কঙ্কাল' (১২৯৮), 'নিশীথে' (১৩০১), 'মণিহারা' (১৩০৫) প্রভৃতি গল্পে অলৌকিকতার হাতছানি পাওয়া যায়।

রূপোপজীবনীদের কথা রবীন্দ্রনাথ 'বিচারক' (১৩০১) গল্পে প্রথম তুলে ধরেন। বিশ্বমানবতার প্রতিভূ রবীন্দ্রনাথ 'মেঘ ও রৌদ্র' (১৩০১) গল্পে রাজনীতি ও স্বদেশপ্রীতিকে তুলে ধরেছেন।

পরিণত বয়সের প্রগাঢ় প্রাজ্ঞতায় রবীন্দ্রনাথ মনস্তত্ত্বের সুনিপুণ ব্যবহার করেছেন তিনসঙ্গীর গল্পগুলোতে। ছোটগল্পের বিষয়কে খুঁজে নেবার প্রয়োজন হয় না, বিষয়ই অত্যুৎসাহী হয়ে ছোটগল্পের অঙ্গনে প্রবেশ করে। রবীন্দ্রনাথের রচনাগুলোই তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এককথায় ছোটগল্পের নিপুণ স্রষ্টা, উপযুক্ত ধারক ও বাহক হলেন রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথের পরেই আসে কল্লোলের কাল। রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালেই রবীন্দ্র বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয় 'কল্লোল' (১৯২৩), 'কালিকলম' (১৯২৬), ও 'প্রগতি' (১৯২৭) নামে পত্রিকাগুলি।

নগরপ্রাণ কিছু স্পর্শকাতর তরুণদের রচনার দ্বারা উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে শুরু করল পত্রিকাগুলোর মাধ্যমে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এঁরা রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে এসে অতি সাধারণ, অন্তেবাসীদের নিকট চলে এসেছিলেন।

প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮) নিম্নবিত্ত অসহায়দের বেদনার্তিকে গভীর মনন দিয়ে উপলব্ধি করে লেখেন — 'পুন্নাম', 'শুধু কেরাণী', 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে' প্রভৃতি গল্প। শৈলজানন্দ নেমে এলেন কয়লাকুঠিতে, বস্তিতে, ফুটপাতে। তিনি লেখেন 'কয়লাকুঠি' নামে বিখ্যাত গল্প। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৭৬) 'কাঠ খড় কেরোসিন', 'দুইবার রাজা', 'ধন্বন্তরি' ও বুদ্ধদেব বসু 'এমিলিয়ার প্রেম' প্রভৃতি গল্পের মাধ্যমে যৌনতা, অবক্ষয়, হতাশা, দুর্গন্ধময় স্খলন-পতনকে

অবলীলাক্রমে সাহিত্যে তুলে ধরেন।

'নিশিপত্র', 'মর্মকামনা', বনমানুষের হাড়' প্রভৃতি গল্পসম্ভার নিয়ে উপস্থিত হলেন প্রবোধকুমার সান্যাল (১৯০৫-১৯৩৮)। নারীদের অসহায় স্খলন-পতন ও পূতিগন্ধময় জীবনের কথা মরমী তুলিতে তুলে ধরেন তিনি। কল্লোলের লেখক হলেও স্বাতন্ত্র্যে ও গভীরতায় অনন্য হয়ে দেখা দেন জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭)। 'পয়োমুখম' এর মতো গল্পে তিনি সমাজের নিষ্ঠুর, প্রবঞ্চক, স্বার্থপর মানুষকে দেখিয়েছেন।

এবার ছোটগল্পের আসরে এলেন তিন বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁরা কেউ প্রত্যক্ষভাবে কল্লোলের লেখক নন, তথাপি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলেছেন 'কল্লোলের কুলবর্ধন'। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬) বৈজ্ঞানিকদের মতো তীক্ষ্ম বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে জীবন জগৎ ও মানুষকে দেখেছেন। তাঁর রচনায় আবেগের আতিশয্য ও বিদ্রোহের মুখোশে যৌবন শক্তির অপচয় নেই। তিনি জীবনের রুক্ষ, কঠোর, সংস্কারাচ্ছন্ন বাস্তববোধকে জীবনের বৈচিত্র্যে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন, আর এখানেই তাঁর বাস্তবতা ও স্বাতন্ত্র্য। 'প্রাগৈতিহাসিক', 'আত্মহত্যার অধিকার', 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী', 'হারানের নাতজামাই' প্রভৃতির মতো গল্প বাংলা সাহিত্যকে তিনি উপহার দিয়ে ছোটগল্পের গতিতে দৃঢ়তা এনে দিয়েছেন।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০) আমাদের 'মেঘ মল্লার' 'মৌরীফুল', 'যাত্রীদল', 'পুঁইমাচা'র মতো গল্প উপহার দিয়েছেন। কল্লোলের কালের হলেও বিভূতিভূষণ এই ধারার মানসিকতাসম্পন্ন ছিলেন না। প্রকৃতি প্রেমিক বিভূতিভূষণের প্রিয় বিষয় ছিল মাটির পৃথিবী ও নক্ষত্রখচিত আকাশের সৌন্দর্য।

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৮-১৯৭২) সাহিত্যিক জীবন শুরু হয় ছোটগল্প রচনার মধ্য দিয়ে। ছোটগল্পের বিষয় এবং স্বভাবকে তিনি অন্য মাত্রা দিয়েছিলেন। সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের প্রেম, ভালোলাগা, আদিমবৃত্তি, ঈর্ষা প্রভৃতি প্রবৃত্তিকে প্রস্ফুটিত করেছেন। 'নারী ও নাগিনী', 'তারিণী মাঝি', 'অগ্রদানী', 'জলসাঘর', 'কালাপাহাড়', 'রসকলি' প্রভৃতি গল্পের বিষয়-বৈচিত্র্য আমাদের বিস্ময়াবিষ্ট করে এবং রচনার ব্যঞ্জনা ও প্রকরণ ছোটগল্পের ভিত্তিকে সুদৃঢ়তা প্রদান করে।

যুবনাশ্ব, বনফুল, অন্নদাশংকর রায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ বসু প্রমুখ গল্পকাররা কল্লোলের শেষ পর্যায়ে ছোটগল্পকে আরো বেশি দীপ্তি প্রদান করে গেছেন।

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং শেষ হয় ১৯৪৫ এর সেপ্টেম্বরে। যুদ্ধ শুরুর আগে ও পরে যেসব সাহিত্যিকরা দেখা দেন তাঁরা হলেন আশাপূর্ণা দেবী (১৯০৯-১৯৯৫), সুবোধ ঘোষ (১৯০৯-১৯৮০), জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী (১৯১২-১৯৮২), নরেন্দ্রনাথ মিত্র (১৯১৬-১৯৭৫), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭০), সন্তোষ কুমার ঘোষ (১৯২০-১৯৮৫),

নবেন্দু ঘোষ (১৯১৭), বিমল কর (১৯২১), সমরেশ বসু (১৯২৪-১৯৮৮) এবং মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৬) প্রমুখ।

"কাব্যেণ হন্যতে শাস্ত্রং কাব্যং গীতেন হন্যতে। এই উক্তির অনুকরণ করে বলা যায় যে আধুনিক কথয়া (অর্থাৎ উপন্যাসেন) হন্যতে কাব্যং (অর্থাৎ মহাকাব্য) কথা গল্পেন (অর্থাৎ ক্ষুদ্র গল্পেন) হন্যতে। উপন্যাসের আবির্ভাবে মহাকাব্যের তিরোধান ঘটেছে আর ছোটগল্পের আবির্ভাবে উপন্যাসের তিরোধান ঘটতে শুরু করেছে।" (বনফুল — ডঃ সুকুমার সেন) — এই উক্তির নিরিখে অনায়াসেই বলা যায় বর্তমান সাহিত্য জগতকে ছোটগল্পই বেশি সংখ্যায় সমৃদ্ধ করে চলেছে। অথচ সাহিত্যে এটিই কনিষ্ঠতম শাখা কিন্তু সবচেয়ে সমৃদ্ধ।

সাহিত্যের এই শাখাটির আঙ্গিক প্রকরণ এবং বিষয়-বৈচিত্র্য পাঠকদের নিকট অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে ক্রমাগত। তেমনি আমাদের প্রিয় লেখিকা আশাপূর্ণা দেবীকেও ভীষণভাবে আকৃষ্ট করেছিল। আশাপূর্ণা দেবীর স্বমুখ নিঃসৃত উক্তিটিই এর প্রমাণ দেয় — "ছোটগল্পই আমার প্রথম প্রেম"। উপন্যাস আশাপূর্ণা দেবীকে পাঠক সমাজে জনপ্রিয় করে তুললেও ছোটগল্পের মধ্যেই নিজের ছোট ছোট অভিজ্ঞতাকে প্রস্ফুটিত করে আনন্দ পেতেন। তাই ছোটগল্পই তাঁর প্রিয় হাতিয়ার।

আমাদের প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় নারী ও পুরুষের মধ্যে যথেষ্ট অসাম্য রয়েছে। এখন তা অনেকটা কমে এলেও আশাপূর্ণা দেবীর সময়ে এই বৈষম্য ছিল ভয়ানক। আর এই বোধটাকে তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর সমস্ত চিন্তা-চেতনাকে নারী-পুরুষের এই ভেদাভেদই ব্যথিত, আলোড়িত করে তুলত। এ থেকেই তাঁর মনে জন্ম নেয় এক প্রতিবাদী সত্তা। যার মূর্ত প্রকাশ ঘটে 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসের 'সত্যবতী' চরিত্রের মধ্য দিয়ে।

জীবন ও সমাজের নানা বিচিত্রধর্মী বিষয় আশাপূর্ণা দেবীর গল্পে স্থান পেলেও মূলতঃ সমাজে নারীদের অবস্থান এবং তাদের অন্তরসত্তাকে নিয়ে নানা কথাই মুখ্য হয়ে উঠেছে। তাঁর রচনার বেশিরভাগ অংশই প্রতিবাদের আলোয় ঝলসে উঠেছে। বিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকে ঐ শতকেরই শেষ দশক পর্যন্ত লেখা গল্পগুলোর মধ্যে লেখিকার সমাজ ও জীবন সম্পর্কে যেমন গভীর জীবন দৃষ্টি প্রকাশ পেয়েছে তেমনি সেই জীবনের চিত্রাঙ্কনের সার্থক শিল্পরূপও তিনি দান করে গেছেন।

জীবনের একদিকে রক্ষণশীলতা ও অপরদিকে প্রগতিশীলতা — এই দ্বন্দ্বময় ভাবনার মধ্যে দাঁড়িয়েই তিনি বহুবর্ণরঞ্জিত বৈচিত্র্যময়তাকে বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আবার নারী পুরুষের সম্পর্কের প্রেম মনস্তত্ত্বকেও বিষয় হিসেবে প্রকাশ করেছেন। প্রচলিত ধ্যানধারণাকে দূরে সরিয়ে রেখে জীবনের নানা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ঘটনার সঙ্গে জীবনের মূল্যবোধগুলো কতটা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে, তা দেখবার মতো এক মননশীল সস্নেহ উপস্থিতি আশাপূর্ণা দেবীর ছোটগল্পে দেখা যায়।

আশাপূর্ণা দেবী ঔপন্যাসিক হিসেবেই অধিক পরিচিত এবং তাঁর উপন্যাস সম্পর্কে নানাবিধ

আলোচনাও হয়েছে সাহিত্য মহলে। তেমনি গবেষণার ক্ষেত্রেও দেখা গেছে উপন্যাসই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। তদনুযায়ী ছোটগল্পকার আশাপূর্ণা সম্পর্কে কিন্তু পূর্ণাঙ্গ আলোচনা বা গবেষণা ততটা দেখা যায় না। অথচ তাঁর বিষয় -বৈচিত্র্য, রচনার বাস্তবতা, প্রকরণ পাঠককুলকে যথেষ্ট আলোড়িত করে থাকে। তাই ছোটগল্পের আঙ্গিকে আশাপূর্ণা দেবীর জীবনদৃষ্টির প্রকাশ ও গল্পের রূপায়ণে শিল্প রূপের যে সার্থকতা তাই আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভে প্রকাশ করতে চেয়েছি।

গবেষণা পত্রে আলোচিত গল্পগুলোর মধ্যে কিছু সংখ্যক গল্পের সময়ক্ষণ দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে নি। প্রায় দেড় সহস্রাধিক গল্পের মধ্যে যতটা অধিক সম্ভব সংগ্রহ করার পরেও কিছু কিছু গল্পের কালসীমা সঠিকভাবে নিরূপণ করে ওঠা সাধ্যের বাইরে থেকে গিয়েছে। গ্রন্থাগার থেকে লব্ধ কিছু পুস্তকাদির প্রাচীনত্বের কারণে প্রকাশকের ঠিকানা ও প্রকাশকাল দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে নি।

আশাপূর্ণা দেবী ছোটগল্পের মাধ্যমে জীবনের নানা দৃষ্টিভঙ্গিকে রূপায়িত করতে গিয়ে নানাবিধ শিল্পরূপেরও আশ্রয় নিয়েছেন। তাই এই সমস্ত দিকগুলো সুপরিস্ফুটভাবে তুলে ধরার জন্য গবেষণা গ্রন্থটিকে কয়েকটি অধ্যায়ে বিভাজন করা হয়েছে। যেমন —

প্রথম অধ্যায়ে রয়েছে আশাপূর্ণা দেবীর ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্যজীবন। বহু পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিতা একজন লেখিকা যিনি সামান্যা নারী থেকে একজন দেশ-কালোত্তীর্ণা সাহিত্যিকে রূপান্তরিত হয়েছেন, স্বভাবতই তাঁর ব্যক্তি জীবন যথেষ্ট আকর্ষণীয় হবে। ব্যক্তি ছাড়া লেখিকা হওয়া কখনোই সম্ভব নয় বলেই এই অধ্যায়ে আমি আশাপূর্ণা দেবীর ব্যক্তিজীবনকে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে রয়েছে গল্প রচনার জীবনে প্রবেশের রূপরেখা। কিভাবে সাহিত্য প্রীতি ও সাহিত্য রচনা থেকে ছোটগল্প রচনার প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলেন তাই লিপিবদ্ধ হয়েছে এখানে।

তৃতীয় অধ্যায়ে নানা অভিজ্ঞতার আলোকে জীবনদৃষ্টিগত ভাবনাকে কিভাবে রূপায়িত করেছেন তা আলোচিত হয়েছে। নানা ভাবনাগত দিক থেকে গল্পগুলোর কিছু শ্রেণিকরণ করা হয়েছে। লেখিকার নিজের চোখে দেখা জগৎ, অন্দর মহলের জগৎ এবং চার দেওয়ালের মধ্যে বসবাসকারী যে নারীরা তাদের তিনি কিভাবে তাঁর গল্পে স্থান দিয়েছেন — সেই বিষয়টাকেই এই অধ্যায়ে আমি সামগ্রিকভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

আশাপূর্ণা দেবীর দীর্ঘদিনের গল্প রচনা এবং ভাবনাকে লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে শিল্প রূপের দিকটি কিভাবে তুলে ধরেছেন তা চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচনা করার প্রয়াস রইল।

সমকালীন লেখকদের সঙ্গে আশাপূর্ণা দেবীর বিষয় এবং রচনাশৈলীর মধ্যে যে স্বাতন্ত্র্য রয়েছে পঞ্চম অধ্যায়ে সেই বিষয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি।

উপসংহারে আলোচিত অধ্যায়গুলোর নিরিখে সামগ্রিকভাবে মূল্যায়নের একটা চেষ্টা করা হয়েছে। এই অধ্যায়গুলোর ধারাবাহিক বর্ণনার মধ্য দিয়ে গবেষণাগ্রন্থটি রচনা করার প্রয়াস রইল।

প্রথম অধ্যায়

আশাপূর্ণা দেবীর ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্য জীবন

প্রথম অধ্যায়

আশাপূর্ণা দেবীর ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্য জীবন

অনন্তকাল ধরে নিরন্তর গতিতে বয়ে চলেছে সময়। প্রতিনিয়ত যে সমস্ত ঘটনা আমাদের চারপাশে ঘটে চলেছে, তা কালের স্রোতে প্রবাহিত মহাকালের মোহনায় গিয়ে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। কালের এই বিচিত্র গতিতেই এগিয়ে চলে তারিখ, মাস, সাল ও শতাব্দী। এই স্রোতে ভেসে আসা সমস্ত মুহূর্তগুলো বুদ্‌বুদের মতো ঢেউয়ের বুকে মিলিয়ে গেলেও কিছু মুহূর্ত যেন মহামুহূর্ত হয়ে রয়ে যায় মুক্তো বহনকারী ঝিনুকের মতো। এমনই একটি তাৎপর্যমণ্ডিত মহামুহূর্ত হল ১৩১৫ বঙ্গাব্দের ২৪শে পৌষের শুক্রবারের একটি সকাল। কোন বিশেষ ঘটনা মুহূর্তকে স্মরণীয় করে তোলে, কিন্তু তা শুভ ও অশুভ দুইই হতে পারে। মহামুহূর্ত বা শুভক্ষণ কিন্তু মঙ্গলজনক দিকটিই সূচিত করে। তাই সেই শুক্রবারের শুভক্ষণের সকালটি ইংরাজি ১৯০৯ সালের ৮ই জানুয়ারি — বর্তমান যুগের অসাধারণ সাহিত্য প্রতিভাময়ী ক্ষণজন্মা আশাপূর্ণা দেবীর জন্মলগ্নটি চিহ্নিত করছে। আশাপূর্ণা দেবীর জন্মলগ্ন অত্যন্ত শুভযোগসূচক ছিল বলে অনেকেরই ধারণা। তিনি জন্মান উত্তর কোলকাতার পটলডাঙ্গাতে, তাঁর মাতুলালয়ে।

আশাপূর্ণা দেবীর আয়ুষ্কাল ৮৬ বছর ৬ মাস ৫ দিন। এই জীবন প্রবাহের দিকে ফিরে তাকালে তাঁর জীবনকে মোটামুটি তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায় —

আশাপূর্ণা দেবীর জীবন পর্যায়

জন্ম ঃ ০৮ / ০১ / ১৯০৯ মৃত্যু ঃ ১৩ / ০৭ / ১৯৯৫
২৪ / ০৯ / ১৩১৫ ২৭ / ০৩ / ১৪০২

প্রাক্ বিবাহ জীবন বা ছেলেবেলা	বিবাহিত ও একান্নবর্তী সংসার জীবন	আমৃত্যু একান্ত নিজস্ব সংসার জীবন
০৮/০১/১৯০৯ → ২২/০৭/১৯২৪	২২/০৭/১৯২৪ → ১৯৬০	১৯৬০ → ১৩/০৭/১৯৯৫
২৪/০৯/১৩১৫ → ০৬/০৪/১৩৩১	০৬/০৪/১৩৩১ → ১৩৬৭	১৩৬৭ → ২৭/০৩/১৪০২

সাহিত্যের অঙ্গনে সুপ্রতিষ্ঠিতা আশাপূর্ণা দেবীর ব্যক্তি জীবন আর সাহিত্য জীবন মিলেমিশে এক হলেও এখানে যতটা সম্ভব তাঁর ব্যক্তি জীবনকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হল।

আশাপূর্ণা দেবীর পিতা ছিলেন শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও মাতা ছিলেন শ্রীমতী সরলাসুন্দরী দেবী। তাঁরা ছিলেন উত্তর কোলকাতার বৃন্দাবন বসু লেনের বৃহৎ গুপ্ত পরিবারের মেজ ছেলে ও মেজ বৌ। হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত তখনকার বিখ্যাত সি. ল্যাজারাস কোম্পানীতে ডিজাইনার বা নকশা আঁকার কাজ করতেন, কারণ তিনি ছিলেন অঙ্কনবিদ্যায় পারদর্শী। গুপ্ত পরিবারের আদি পিতৃনিবাস ছিল হুগলী জেলার বেগমপুরে। বর্তমানে পৈতৃক ভিটার সঙ্গে বৎসরে একবার কালীপুজোয় যোগাযোগ রক্ষিত হয় মাত্র।

শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত ছিলেন সুদক্ষ শিল্পী। সেই সূত্রে কোম্পানীর কর্তা ব্যক্তিদের অত্যন্ত নিকটজন হয়ে ওঠেন এবং সকলের কাছে আস্থাভাজনও করে তোলেন নিজেকে। এই কর্ম ও চারিত্রিক গুণাবলীর জন্যই তিনি ধীরে ধীরে কর্মক্ষেত্রে যথেষ্ট যশ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন এবং সেই আনুকূল্যেই তিনি নিজস্ব সংসার রচনা করবার ক্ষমতা অর্জন করেন। কোম্পানীর সাহেবদের সহায়তায় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডে (খান্না সিনেমা হলের পাশে), তৎকালীন আপার সার্কুলার রোডের একটি বাড়িতে যৌথ পরিবার থেকে সরে গিয়ে একান্ত নিজস্ব — স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের নিয়ে সংসার পাতেন। এখানেই আশাপূর্ণা দেবীর জীবনের প্রথম পর্যায়ের প্রথম পর্বের পরিসমাপ্তি ঘটে দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়। হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও সরলাসুন্দরী দেবী আলাদা সংসার পাতলেও পারিবারিক ঐতিহ্যকে ও রীতিনীতিকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে চলতেন। কারণ যে বাড়িতে এ যাবৎ নিজেকে তৈরি করেছেন সেই বাড়ির ধারাকে সমীহ করে চলাতেই তিনি বা তাঁরা অভ্যস্ত ছিলেন। আশাপূর্ণা দেবীর পিতামহী সংসারকে একটি সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছিলেন।

আশাপূর্ণা দেবীর ছেলেবেলা বলতে যে চেহারার বর্ণনা তিনি দিয়েছেন তা হল — একমাথা ঝাঁকড়া চুল ধুলি-ধূসরিত অবস্থায়, পা দুটোও তথৈবচ। সারা গা ধুলো-ঘামে মাখামাখি, হাত দুটো অজস্র খেলার উপকরণে বোঝাই — তাই ঘাম মোছবারও সময় নেই। খালি দেশলাইয়ের বাক্স, সাবানের খোল, সিগারেটের খালি টিন, কাঠের টুকরো নিয়ে একতলায় ও ছাদে অসংখ্য বার যাতায়াত। একটু বড় হবার পরে সরঞ্জাম বদলে সেখানে ঠাঁই নিয়েছে হাতুড়ি, কাটারি, পেরেক, সরু-মোটা তার, বিস্কুটের টিনের পাতলা শিট। আর তার ফলে হাতে পায়ে নানাস্থানে সর্বদা ব্যাণ্ডেজ বাঁধাই থাকতো। সেই থেকে সেই মেয়ের নাম হয়ে গেল 'দস্যি', 'পাহাড়ে', 'ডাকাত'। এই ধরনের খেলার-ধারা বলে বিশাল 'তুতো' সাম্রাজ্যের মধ্যে বাস করেও কোন সাথী পেতেন না খেলতে গিয়ে। এই দস্যি মেয়েকে নিয়ে মা গঞ্জনা সহ্য করতে না পেরে তাকে বসিয়ে দিয়েছিলেন একটা উঁচু জানালার চওড়া ধাপে, আর হাতে ধরিয়ে দিয়েছিলেন একটা বই। এই শিশুর হাতে বই ধরিয়ে দেবার পেছনে তৎকালীন সময়েও মায়ের একটা প্রগতিশীল মানসিকতা ধরা পড়ে। এভাবেই আশাপূর্ণা দেবীর হাতে উঠে এল প্রথম বই।

বই পড়তে শেখাটাও তাঁর ক্ষেত্রে একটু অভিনব ছিল। তিনি নিজেই এ বিষয়ে সুন্দরভাবে বলে গেছেন। তাঁর দুই দাদা মেঝেতে মাদুর পেতে বসে বইয়ের ওপর ঝুঁকে একবার লেখাটা দেখে নিতেন একবার পড়ুয়াদের মুখটা। যেন উচ্চারিত শব্দগুলোকে লেখ্য শব্দের সঙ্গে মিলিয়ে নিচ্ছেন। শেষে দেখা গেল, তিনি যখন পড়ছেন বইয়ের উল্টো দিক দেখে। বই সোজা করে ধরলেই আর পড়তে পারছেন না। সম্পূর্ণ লেখাটা তার সামনে ছবির মতো অখণ্ডচিত্র হয়ে ধরা পড়ত, বর্ণ বা বর্ণমালা ছিল অচেনা জগত। এই উল্টো পড়া নিয়ে বাড়িতে সকলের মধ্যে হাসির ধুম পড়ে যেত। বাড়িতে কোন নতুন অতিথি বা আত্মীয়-স্বজন এলেই সেই মেয়েটির ডাক পড়ত, এবং উল্টো করে বই পড়ে শোনাতে হত। দস্যিপনা চরিত্রের সঙ্গে উল্টো করে বই পড়াটা মিলেমিশে একটা উদ্ভট চরিত্র হয়ে উঠেছিলেন তিনি।

আশাপূর্ণা দেবীর ছেলেবেলার জীবনে তাদের বাড়ির পাশের 'গুহ'দের কালীবাড়ির ঘণ্টাধ্বনি ভীষণভাবে তাঁকে নাড়া দেয়; এই ঘণ্টা ধ্বনির শব্দই তাঁকে স্মৃতির সমুদ্রে অবগাহন করিয়ে আনে যেন। তাঁদের বাড়ি যে কতটা শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে চলত তা বোঝা যায় — এই কালীবাড়িতে যখন সন্ধ্যাবেলায় ঘণ্টা বাজানো শুরু হত, তখন গুপ্ত বাড়ির ছেলে-মেয়েরা (ছোটরা) যে যেখানেই খেলাধুলা করুক না কেন সকলেই হাঁটু গেড়ে হাত জোড় করে চোখ বুজে বসে পড়বে, যতক্ষণ না ঘণ্টাধ্বনি ও সন্ধ্যা আরতি শেষ হয়। এ থেকেই বোঝা যায় তাঁদের বাড়ির একটা সুশৃঙ্খল নিয়ম ছিল। আশাপূর্ণা দেবীর জীবন পর্যায়ের প্রথম পর্ব চলছে এই অংশগুলোতে। পাঁচ বছর বয়সে তিনি মা ও ভাই-বোনেদের সঙ্গে রাঁচিতে ছোটমামার বাড়িতে যান। আশাপূর্ণা দেবীর ছোটমামা ছিলেন রাঁচির ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট চুনীলাল রায়। সেখানে থাকাকালীন তাঁর একটি ভাই জন্মাল। পরীক্ষা থাকায় তাঁদের সঙ্গে দুই দাদা আসতে পারেন নি, পরীক্ষা মিটলে তাঁর দুই দাদাও রাঁচিতে চলে আসেন। রাঁচিতে সর্বমোট কয়েক মাস কাটিয়ে সকলে মিলে কোলকাতায় ফিরে আসেন। এবারে পুরনো বাড়িতে আর ফিরে গেলেন না। ১৬৬ নং আপার সার্কুলার রোডের নতুন ভাড়া বাড়িতে উঠে আসেন। এই অংশ থেকে শুরু হয় প্রথম পর্যায়ের দ্বিতীয় পর্ব। এই পর্বই তাঁকে নানাভাবে পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল।

আশাপূর্ণা দেবীরা ছিলেন নয় ভাই-বোন। যথাক্রমে — স্নেহলতা, বীরেন্দ্রনাথ, ধীরেন্দ্রনাথ, রত্নমালা, আশাপূর্ণা, সম্পূর্ণা, হীরেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও লেখা। এই পাঁচ বোন ও চার ভাই বহুমুখী পারিপার্শ্বিক নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠছিলেন। আশাপূর্ণা দেবীর মা সরলাসুন্দরীও ছিলেন শিক্ষানুরাগী, ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ও সুরুচি সংস্কৃতি সম্পন্ন পরিবারের কন্যা। তাঁর সাত ভাইয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ যিনি তিনি ছিলেন লাহোরের 'ট্রিবিউন' পত্রিকার সম্পাদক অমৃতলাল রায় ও সর্ব কনিষ্ঠের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। আশাপূর্ণা দেবীর মেজমামার

ছেলে জ্যোতির্ময় রায় ছিলেন রাঁচির কাছে 'কাঁকে'র হাসপাতালের বড় ডাক্তার।

আশাপূর্ণা দেবী তাঁর মা-বাবা সম্পর্কেও নানা ধরনের কথা বলেছেন। তাঁর মতে, তাঁরা বড় হয়ে উঠেছেন এক ধরনের পরস্পর বিরোধী আবহাওয়ার মধ্যে, যেমন, তাঁর বাবা হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত ছিলেন ভীষণভাবে রাজভক্ত, অর্থাৎ ইংরেজীপ্রীতি আর মা সরলাসুন্দরী দেবী ছিলেন প্রচণ্ড রাজবিদ্বেষী, অর্থাৎ মনেপ্রাণে স্বদেশী। তাঁর নিজের কথাতেই কিছুটা পরিচয় দেওয়া যাক — "মার জীবনে একটি মাত্রই পরমার্থ, সেটি হচ্ছে সাহিত্য। আর বাবার ওই 'সাহিত্য' জিনিসটি বাদে, একশোরকম পরমার্থ! কতরকম হবিই যে ছিল বাবার! তাসখেলা, পাশাখেলা, মাছধরা, কালীপুজোয় বাজি বানানো, ফানুস তৈরি করে আকাশে ওড়ানো, গোবর গুহর জ্যাঠামশাই 'অম্বু গুহর কুস্তির আখড়ায়' কুস্তি শিখতে যাওয়া, ভোরবেলায় উঠে ডাম্বেল ভাঁজা, আবার তার সঙ্গে ঘর সাজানো এবং নিজেকে সাজানো।" *(পৃ. ৩৫ আর এক আশাপূর্ণা)*। তাঁর বাবার পোষাকের ব্যবহারেও যে শৌখিনতা প্রকাশ পেত, তাতেও যেন শিল্পী মনস্কতা ফুটে উঠতে দেখা যায়। তিনি পরতেন — ফুল কোঁচানো মিহি ধুতি, গিলে কোঁচানো মিহি আদ্দির পাঞ্জাবী, ছুরি কোঁচানো মিহি উড়ুনি, আর নিজের হাতে পালিশ করা জুতো। তিনি নিজের হাতে নিজের বাড়ির সমস্ত কাঠের আসবাবপত্র পালিশ করতেন। তাঁর নিজস্ব একটা কার্পেন্টারি বাক্সও ছিল, যেখানে থাকতো ছোটখাটো নানান যন্ত্রপাতি এবং যা দিয়ে অনেক সুন্দর সুন্দর অতি সূক্ষ্ম সব কাঠের জিনিস বানাতেন। আর ছবি আঁকা তো নেশা থেকে পেশায় পরিণত হয়ে গিয়েছিল। তখনকার দিনের বিখ্যাত সি. ল্যাজারাস কোম্পানীর ডিজাইনার হিসেবে তিনি বাইরেও কাজ করতে যেতেন। যেমন — বরোদা, ইন্দোর, পাতিয়ালা এবং সবচেয়ে বেশী যেতেন কুচবিহারে। কারণ কুচবিহারের রাজাদের শিল্পচর্চায় বিশেষ খ্যাতি ছিল। তিনি জীবিকার প্রয়োজনে কমার্শিয়াল আর্ট করলেও অন্যান্য ছবির দিকেও তাঁর ঝোঁক ছিল। যেমন — তিনি পোট্রেটও আঁকতেন, আবার সেগুলো বিক্রিও হয়ে যেত। এইরকম একজন বহুমুখী প্রতিভাধর, শিল্পী এবং শিল্পরসিক ব্যক্তি ছিলেন আশাপূর্ণা দেবীর পিতা।

তখনকার দিনে যৌথ পরিবারের একজন মহিলা বা গৃহবধূ, শুধুমাত্র বই পড়ার সুবিধার জন্য শ্বশুরবাড়ির নিন্দা-মন্দ সহ্য করে আলাদা একটা বাড়িতে চলে আসা — এ আশ্চর্য ব্যাপার নয় কি? অথচ, আশাপূর্ণা দেবীর মা সরলাসুন্দরী দেবী মনের সাধ মিটিয়ে সাহিত্যের আঙিনায় বিচরণ করতে পারবেন বলে তাই করেছিলেন। এই হলেন আশাপূর্ণা দেবীর মা। একান্নবর্তী পরিবারে সরলাসুন্দরীকে সকলেই ভালোবাসত, কিন্তু ঘরের বউ যদি সময়-সুযোগ পেলে সংসারের অন্য কাজে হাত না লাগিয়ে শুধু বইয়ে নিমজ্জিত হয়ে থাকতে চায়, তবে পরিবারের গুরুজনেরা সেটা সহ্য করবেন না, তাই স্বাভাবিক। বলতে গেলে ঝগড়াঝাঁটি নয়, শুধু এই কারণেই হরেন্দ্রনাথ ও সরলাসুন্দরীর আপার সার্কুলার রোডের একটি বাড়িতে তাঁদের নিজস্ব সংসার তৈরি হয়। সেই বাড়িতে রাম বলে একটি

ছেলে আশাপূর্ণা দেবীর ছোট্ট ভাইটিকে সামলাতো এবং একজন গিন্নিবান্নি বামুনদি রান্নাঘর সামলাতেন। কারণ, হাঁড়ি-কুড়ি সামলাতে গেলে শখ মিটিয়ে বই পড়তে পারতেন না — এই কথাটা হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। আশাপূর্ণা দেবীর বাবার সাহিত্য প্রীতি না থাকলেও স্ত্রীর সাহিত্য প্রীতিকে বাঁচিয়ে রাখতে তাঁর অবদান অপরিসীম। উনি নিজে তদারক করে বাড়িতে প্রচুর বই আনাতেন। হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত যখন গভর্ণমেন্ট আর্টস স্কুলের প্রথম বর্ষের ছাত্র ছিলেন, তখন থেকেই বাড়িতে অনেক পত্র-পত্রিকা আসত। যেমন — 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', 'মানসী ও মর্মবাণী', 'অর্চনা', 'মালঞ্চ', 'নারায়ণ', 'সবুজপত্র', 'সাধনা', 'বঙ্গদর্শন', 'ভারতী', বেশ বড় মাপের লাল মলাটের 'বালক' ও ছোট্ট মাপের 'শিশু' নামে একটি পত্রিকা। এর বেশ কিছু সময় পরে আসতে শুরু করে 'সন্দেশ', 'মাসিক বসুমতী', ও 'বিচিত্রা'। এছাড়া আসতো বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের যাবতীয় গ্রন্থরাজি, 'জ্ঞানবিকাশ লাইব্রেরী', 'চৈতন্য লাইব্রেরী' এবং 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' লাইব্রেরীর নানাবিধ গ্রন্থসমূহ। পুরানো পত্র-পত্রিকা বাঁধানো অবস্থায় একমাত্র 'সাহিত্য পরিষদ' এ পাওয়া যেত বলে ওখান থেকে 'প্রবাসী', 'ভারতী', 'প্রদীপ', 'সখা ও সাথী', 'মুকুল' এবং এমনই নানাধরনের পত্র-পত্রিকার প্রথম সংখ্যা থেকে প্রতিটি সংখ্যাই আসত। গল্প-উপন্যাস ছাড়াও ছাপার অক্ষরে যা প্রকাশিত হত, তার প্রায় প্রতিটি লেখাই এই বাড়িতে এসে পৌঁছাত। বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ — এদের তো কথাই নেই, এমনকি কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত পর্যন্ত সরলাসুন্দরী দেবীর সংগ্রহে ছিল। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যার মলাট আশাপূর্ণা দেবীর বাবা এঁকে দিয়েছিলেন বলে এই পত্রিকাটির প্রতিটি সংখ্যা সৌজন্য সংখ্যা হিসেবেই তাঁরা পেতেন, পয়সা দিয়ে গ্রাহক হতে হয়নি। সন্তানদের মানুষ করা, সংসার দেখার পাশাপাশি একজন গৃহিণীর পক্ষে এত বই পড়া অবশ্যই আশ্চর্যের বিষয়। এতেই বোঝা যায় সরলাসুন্দরী দেবীর সাহিত্য প্রীতি কতটা গভীর। তিনি একথাও মানতেন যে, বড়দের বই পড়লেও ছোটরা কখনো খারাপ হয় না। কারণ, জ্ঞান অবধি বই পড়তে থাকলে বই পড়ে খারাপ হবার বদলে নানাবিধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাই অর্জন করে থাকে। এইরকম একজন যথার্থ শিল্পী এবং শিল্পী মনের মানুষ ছিলেন আশাপূর্ণা দেবীর বাবা এবং প্রকৃত সাহিত্য রসপিপাসু ছিলেন তাঁর মা।

বাংলা সাহিত্য মানেই রবীন্দ্রনাথের বিপুল সৃষ্টি দ্বারা সমৃদ্ধ এবং বাঙালী মাত্রেই রবীন্দ্রানুরাগী, আশাপূর্ণা দেবীও এই পরিমণ্ডলের বাইরে নন। তিনিও মনেপ্রাণে রবীন্দ্রনাথকে অসীম শ্রদ্ধা করতেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর অনুরাগীদের স্বহস্তে চিঠির উত্তর দিতেন বলে আশাপূর্ণা দেবী শুনেছিলেন। সেই আশায় ভর করে অনেকদিনের সাধ পূরণ করতে তিনি ও তাঁর ছোটবোন সম্পূর্ণা একদিন অনেক কষ্টে খাম, কাগজ ও রবীন্দ্রনাথের ঠিকানা জোগাড় করে চিঠি লিখে ফেললেন। একে চিঠি না বলে আবেদনই বলা চলে। "নিজের হাতে আমাদের নাম লিখে একটি উত্তর দেবেন।" *(পৃ. ৩৭*

আর এক আশাপূর্ণা) — এই মর্মে গোপনে চিঠি পাঠিয়ে কম্পিত বক্ষে উভয়ে দিন গুণতে থাকেন। দিন কয়েক পরে এল সেই আকাঙ্ক্ষিত উত্তর। শক্তপোক্ত সাদা কাগজের বড় মাপের একখানি খামে করে চিঠি এল। আশাপূর্ণা দেবী তাঁর অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন এভাবে — "আমরা কি বেঁচে আছি? আমরা কি জেগে আছি?" *(পৃ. ৩৮ — ঐ)*। তাঁর মা সরলাসুন্দরী দেবীরও ছিল অসীম রবীন্দ্র প্রীতি। মেয়েদের এই কাজে আপ্লুত হয়ে বললেন — "তোরা পারলি? আমি শুধু স্বপ্নই দেখেছি।" *(পৃ. ৩৮ — ঐ)*। নিজের চেষ্টায় সংগৃহীত এই রাজ ঐশ্বর্য লাভ করেই আশাপূর্ণা দেবীর মন অর্ধেক দৃঢ় হয়ে উঠল। তাই তিনি বললেন — "জলেই জল বাড়ে। দুঃসাহসেই দুঃসাহস বাড়ে।" *(পৃ. ৩৮ — ঐ)*। এর পরপরই তিনি তাঁর প্রথম কবিতা 'বাইরের ডাক' ১৩২৯ বঙ্গাব্দে 'শিশুসাথী' পত্রিকায় পাঠিয়েছিলেন।

আশাপূর্ণা দেবী যে পরিবারে জন্মেছেন, খোদ কোলকাতা হলেও সে পরিবারে মেয়েদের পড়াশোনার কোন বালাই ছিল না। তাঁর পিতামহী ছিলেন কঠোর এবং দৃঢ় ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী, একান্নবর্তী পরিবারের রক্ষণশীলতাকে মেয়েদের ওপর কিভাবে আরোপ করতে হয়, তা তিনি খুব ভালো জানতেন। মেয়েরা স্কুলে বা পাঠশালায় গিয়ে তো পড়বেই না, এমনকি কোন গৃহশিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীও তাদের পড়াতে পারবেন না। লেখাপড়া শিখলেই মেয়েরা বাচাল হয়ে উঠবে — এই কথাটি অত্যন্ত যুক্তিহীন বুঝতে পেরেও আশাপূর্ণা দেবীর বাবা কাকাদের তাঁদের মায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার কোন ক্ষমতা ছিল না। এত নিষেধ থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র মায়ের উৎসাহে তাঁর পড়াশোনার কোন অসুবিধা হয়নি। আশাপূর্ণা দেবীর মায়ের বই পড়ার জন্য কি পরিমাণ বই তাঁদের বাড়িতে আসত, তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে; এই বিপুল সংখ্যক বইয়ের রাশির মধ্যে আশাপূর্ণা দেবী ও তাঁর দিদি-বোনেদের জীবন শুরু হয়। তিনি শুধু পাঠাভ্যাসের মধ্যেই নিজেকে নিমজ্জিত রাখেন নি, অন্যান্য অনুভূতির জগতও তাঁর মনকে জাগ্রত করে রাখত। যেমন, রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দের জগতের মধ্যে শব্দটাই আশাপূর্ণা দেবীকে বেশী আকর্ষণ করত। তাঁর মনে হত শব্দময়ী কোলকাতার নারী যেন নানা বিচিত্র শব্দের তরঙ্গে ও সংঘাতে সর্বদাই চঞ্চলা হয়ে থাকেন। ছেলেবেলার কথায় নানাবিধ শব্দের বৈচিত্র্য তাঁকে নাড়া দিত। প্রথমেই যে শব্দটি তাঁকে স্মৃতির মোহময় জগতে নিয়ে যেত, তা হচ্ছে কলের বাঁশীর শব্দ। ভোরবেলা থেকেই তাঁদের উত্তর কোলকাতার আশে পাশের ধানকল, তেলকল থেকে শব্দ নির্গত হতে শুরু করত। যেমন — 'সাড়ে পাঁচটার ভোঁ', 'সাড়ে আটটার ভোঁ', 'বারোটার ভোঁ', 'পাঁচটার ভোঁ'। তাঁর কাছে যেটা মহিমান্বিত শব্দ বলে মনে হত তা হচ্ছে কেল্লার তোপ দাগার শব্দ। আর এক শব্দময় জগত তাঁর কাছে অপার বিস্ময় আর ভালোলাগা নিয়ে। জঞ্জাল ফেলার রেলগাড়ির ঝিক্ ঝিক্ শব্দ আর তাঁর প্রাণ উদাস করা 'কুউ উ' ধ্বনি। এই রেলগাড়ি ময়লায় বোঝাই করা হত। সারা শহরের ময়লা আবার সংগৃহীত

হত আর এক শব্দে। রাত চারটে থেকে শুরু হত হাড় পাঁজরা বের হওয়া ঘোড়ায় টানা ময়লা গাড়ির 'ঝড়াং ঝড়াং' শব্দ। ঘোড়ায় টানা গাড়িগুলোর ময়লা একত্রিত হয়ে রেলগাড়ি বোঝাই হয়ে ভরদুপুরের নির্জন নিথর অনুভূতিকে উদাসী জগতের দিকে টেনে নিয়ে যেত 'কু' ধ্বনিতে। রেলগাড়ির বোঝার ক্ষমতাও ছিল না — একটি কচি প্রাণ উদাসী শব্দটার জন্য মনে মনে অপেক্ষা করে থাকত।

শব্দ স্মৃতির আরো একটা শব্দ হল পথচারীকে সচেতন বা সাবধান করে দেবার শব্দ। ঘোড়ার গাড়ির চালকরা যারা গাড়োয়ান বা কোচোয়ান নামে পরিচিত, তারা 'রোক্‌খে রোক্‌খে' বলে হাঁক পাড়ত। সেটা যেন 'রক্ষে রক্ষে' বলে আশাপূর্ণা দেবীর কানে বাজত। বড়লোকের শৌখিন জুড়ি গাড়ি চলত — 'রোক্‌খে' ধ্বনির সঙ্গে 'ঠুং-ঠুং' ঘণ্টা ধ্বনি করে। দুপুরের নির্জনতার প্রাচীর ভেদ করে বাসনওয়ালার 'ঠং-ঠং' বাসন বাজানোর আওয়াজ। পর পর এক এক করে ফেরিওয়ালারা হাঁক পাড়তে পাড়তে যেত — 'চীনের সিঁদুর, খেলনা ... কাঁচের চুড়ি', 'ট্যাপারি, টোপাকুল, নারকুলে কু—ল।' *(ঐ, পৃ. ৪৭)* 'পাংখা বরফ' হাঁক পৌঁছে যেত ছোটদের কানে। দুপুর রোদের তীব্রতা কিঞ্চিৎ কমে আসার মুখেই শোনা যেত রাস্তায় জল দেবার শব্দ। এই সমস্ত শব্দগুলো এতটাই সময় বেঁধে হত যে, গৃহস্থরা ঘরে বসেই আন্দাজ করতে পারতেন সময়ের পারদ কোথায় গিয়ে চড়েছে। সন্ধ্যের প্রাক্কালে শোনা যেত 'কুলপী — বরো — ফ!' *(ঐ, পৃ. ৪৭)* ঐ মধুর ধ্বনি যেন লেখিকা জীবনের প্রান্তে এসেও শুনতে পেতেন, কুলপীর হাঁক যেন শ্যামের বাঁশরীর মতো ঘর থেকে টেনে বের করে আনত বারান্দায়। একটা পয়সা কোনভাবে হাতে আসা মানেই কুলপী এসে যাওয়া, এই আনন্দটাই মাতিয়ে রাখত।

সন্ধ্যের আগে আগেই রাস্তার গ্যাস বাতি জ্বালানেওয়ালারা মই ঘাড়ে করে বেরত, আর রাস্তায় রাস্তায় আলো জ্বালিয়ে দিয়ে যেত। যখন আঁধার নেমে আসত ছোটদের কাছে একটা ভয়ের আবেশ নিয়ে, তখন প্রায়শঃই এসে হাজির হতো 'মুস্কিল-আসান'। যেই না 'মুস্কিল-আসান' এই শব্দটি আশাপূর্ণা দেবী এবং তাঁর ভাইবোনেদের কানে যেত, ভয়ে তাদের ভয়ানক হৃদ্‌কম্প হত এবং হৃৎপিণ্ড ঠাণ্ডা হবারও উপক্রম হত। ঐ শব্দ কানে যাওয়া মাত্রই চোখের সামনে ভেসে উঠতো টকটকে লাল আলখাল্লা ও স্ফটিকের মালাধারী দাড়ি ও বড় বড় চুলওয়ালা মশাল হাতে ভয়ানক সেই মূর্তি। 'ইঁয়াপি মুস্কিল-আসান, যাঁহাস মুস্কিল তাঁহাস আসান' — *(ঐ, পৃ. ৪৯)* এই ভয়ংকর চেহারা মশাল হাতে যখন সাঁঝের আলোয় জলদগম্ভীর সুরে হাঁক দিয়ে এসে দাঁড়াত তখন বাড়ির ছোটদের হৃৎপিণ্ড কাঁপবারও ক্ষমতা যেন হারিয়ে ফেলত। তবুও একটি করে পয়সা হাতে নিয়ে সকল ভাইবোনে মিলে 'মুস্কিল-আসান' এর কাছে দাঁড়াত ভুষোকালির টিপ পরার জন্য, যাতে পাপ না হয়।

সন্ধ্যের পরেও ফেরিওয়ালার হাঁকের বিরাম ছিল না। রাতের নিথর পথকে চিরে বেরত

সেইসব হাঁক। 'কুলপী বরোফ —' 'বেলফুল' ... 'তপসে মাছ'। এই শব্দগুলো যে একটি অনুভূতিপ্রবণ শিশুকে নাড়া দিয়ে যেত, তা কোন শব্দের উৎসস্থলের পক্ষে বোঝা সম্ভব ছিল না।

আশাপূর্ণা দেবী ছোটবেলার কথা বলতে গিয়ে নিজের জীবনের আরো অনেক দিকের কথা তুলে ধরেছেন। তাঁর মা-বাবা পরস্পরবিরোধী মতবাদের হলেও বাড়িতে নানা উৎসব অনুষ্ঠানে সকলে সুন্দরভাবে মেতে উঠতেন। যেমন — বড়দিন, কালীপূজা ও আরো নানা কিছু। ওঁরা ছোটবেলায় এই উৎসব অনুষ্ঠানগুলো বেশ উপভোগ করতেন, সঙ্গে ওঁদের বাবা-মাও যোগ দিতেন। বাবা-মা-ই তাঁদের এসব অনুষ্ঠান পালনের মধ্য দিয়ে সব ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা শেখাতেন। দেওয়ালী, কালীপুজো, বড়দিন, শ্রীপঞ্চমী, রথযাত্রা, অরন্ধন, নবান্ন, পৌষপার্বণ ইত্যাদি বেশ আনন্দমুখর হয়ে উঠত।

'রথযাত্রা' উৎসবে একটা তিনতলা কাঠের রথ এনে আশাপূর্ণা দেবীর বাবা-মা তাকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করে সাজিয়ে, মাঝে একটি জগন্নাথ বসিয়ে ষোড়শোপচারে সাজাতেন এবং রান্নাঘরের ছাদটুকুর মধ্যেই তাকে নিয়ে টানাটানি চলত। 'দীপাবলী'তে হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রায় চার / পাঁচশ মাটির প্রদীপ মুটের মাথায় চাপিয়ে নিয়ে হাজির হতেন, আর সরলাসুন্দরী দেবী তার জন্য তেল ও প্রায় হাজার খানেক সলতে পাকাতে মহোৎসাহে বসে যেতেন। ছাদের আলসে, ঘর-বারান্দা, জানালা-দরজা, বাড়ির বাইরের রক সবকিছুই আলোর মালায় আলোকিত করে তুলতেন। কালীপুজোর আগে আগে তাঁদের বাড়িতে এসে যেত সোরা, গন্ধক, কাঠকয়লা, লোহাচুর প্রভৃতি সব কাঁচামাল। এ সমস্ত দিয়ে তুবড়ি তৈরি হত। শিল-নোড়া, হামান দিস্তা দিয়ে সরলাসুন্দরী দেবী সমস্ত জিনিস সুন্দরভাবে গুঁড়ো করতেন, ন্যাকড়া দিয়ে গন্ধক, কাঠকয়লা ছাঁকতেন — এরপর বারুদ ও অন্যান্য চূর্ণ দিয়ে নানা মাপের সব তুবড়ি ঠাসা হত। পরিবারের সকলে মিলে এইভাবে এইসব ব্যাপারগুলো উপভোগ করতেন। এইসব তুবড়ি আবার দেশের বাড়ির যে কালীপুজো সেখানেও যেত। কালীপূজা উপলক্ষে বড় বড় ফানুস বানিয়ে আকাশে ওড়ানোও ছিল হরেন্দ্রনাথ গুপ্তের আর একটি শখ। ঘুড়ির কাগজের মতো গোছা গোছা নানা রঙের কাগজ আসত বাড়িতে। লম্বা-বৃহৎ সাইজের লম্বাটে লাউয়ের মতো একটা গড়ন তৈরি করা হত কাগজ কেটে আঠা দিয়ে জুড়ে জুড়ে। ফানুসটার সরু মুখের দিকে শক্ত করে তার দিয়ে বেঁধে কেরোসিনের ভেজানো ছেঁড়া কাপড়ের টাইট একটি বল-এ আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হত। তার আবার নির্দিষ্ট মাপ রয়েছে। আশাপূর্ণা দেবীর মা সেই কাজটি বেশ দক্ষতার সঙ্গে করতেন। সারা দুপুর ধরে বসে সরু সরু পরিষ্কার ছেঁড়া কাপড়ের ফালিগুলো নিয়ে আঁটোসাঁটো করে জড়িয়ে জড়িয়ে সেই ফানুসের বল তৈরি করে তুলতেন। তারপর তা কেরোসিনে ভেজানো হত। বলটি এমনভাবে ভিজত, যেন তেল চপচপেও নয় আবার ভেজাও হয়। কার্তিক মাসে বাড়িতে আকাশ প্রদীপ দেওয়াও একটা সুন্দর শিল্পের চর্চা বলে মনে করা হত। পাড়ার সমস্ত বাড়ির থেকে

223083 31 MAR 2010 LIBRARY

উঁচু একটা বাঁশে রঙীন কাগজে আঁটা চীনে লণ্ঠনে প্রদীপ বসিয়ে বাঁশে কপিকলের সাহায্যে উঁচুতে তুলে দেওয়া হত। প্রতি সন্ধ্যায় এই কাজটি করা সরলাসুন্দরী দেবীর খুব প্রিয় ছিল।

২৫শে ডিসেম্বর, 'বড়দিন'টাকে আশাপূর্ণা দেবীদের বাড়িতে খুব সুচারুভাবে উদ্‌যাপন করা হত। তাঁর মা-ও শিল্পীমনস্কা ছিলেন, তাই প্রতিটি জিনিসকে, উৎসবকে শিল্পসুষমায় প্রস্ফুটিত করে তুলতে তিনি ভালোবাসতেন। হরেন্দ্রনাথ ও সরলাসুন্দরী দেবী 'বড়দিন' কেও তাই স্বমহিমায় সাজিয়ে তুলতেন। যেমন — বড়দিনের দুদিন আগে থেকে পাতলা রঙীন কাগজ, কাঁচি, ময়দার আঠা দিয়ে সরলাসুন্দরী দেবী কাগজের শিকল বানাতে শুরু করে দিতেন। সারা বাড়িতে, ছাদের আলসেতে সেগুলো ঝোলানো হত। বিদ্যুৎ না থাকায় 'টুনি' বাল্ব দেবার সুযোগ ছিল না, তাই তাঁর মা সারা বছর ধরে সিগারেটের টিনগুলো জমাতেন ও তাঁর বাবা সেগুলো ফুটো করিয়ে আনতেন। এই টিনগুলোর ভেতরে প্রদীপ বসিয়ে সেগুলো ঝুলিয়ে দেওয়া হত। শুধু এই দিনটির জন্য সারা বছর ধরে সিগারেটের টিনগুলো জমানো হত।

বাড়িতে কোন আত্মীয়-স্বজন এলে বড়দিনের উৎসব দেখার জন্য আশাপূর্ণা দেবীরা সকলে ঘোড়ার গাড়ি করে সাহেব পাড়ার 'বড়দিন' দেখতে যেতেন। গাড়িতে 'গুড়ের-নাগরী' ঠাসবার মত ঠাসা হয়ে যেত সকলে, তথাপি উৎসব দেখতে হত খড়খড়ি দেওয়া জানালা দিয়ে। দরজা বা জানালা কিছুই খোলা যাবে না, কারণ সাহেবরা রয়েছেন বাইরে। এতটাই রক্ষণশীলতার মধ্য দিয়ে বাইরের জগতে চলতে হত তাঁদের।

'বড়দিন' মানেই বাড়িতে আসত ঝুড়ি ভর্তি কমলালেবু চ্যাঙারি ভর্তি নতুন গুড়ের সন্দেশ ও হৃষ্টপুষ্ট একখানি কেক। কেকখানি হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত অফিস পাড়া থেকে আগেরদিনই নিয়ে আসতেন, কিন্তু সকলেরই জানা সত্ত্বেও কেক আনবার ব্যাপারটাকে যেন অজানা রাখার ভান করা হত। এই উপলক্ষে আরও বিশেষ খাবার-দাবার আসত, যেমন — 'হান্টলী পামার' এর এক টিন বিস্কুট ও ঠোঙা ঠোঙা মেওয়া ফল। বড়দিনের বিস্কুটের এই ছিল আনন্দ উদ্রেককারী একটি বিষয়। কোন্ ভাই বা বোন বিস্কুটের টিনটি সেইবারের মতো পাবেন তা আগে থেকেই ঠিক করা থাকত। এই বিস্কুটের টিনের ফিনফিনে টিনের কভারটি টিনের ভেতরেরই পাতলা ছুরির মতনটি দিয়ে এমন সুন্দরভাবে ধীরে ধীরে কাটতেন যে, এই কাটার মধ্য দিয়েও হরেন্দ্রনাথের শিল্প সৌন্দর্য প্রস্ফুটিত হয়ে উঠত। এছাড়া আরো একটি মজার ব্যাপারও উল্লিখিত হল — খুব মিহি কাগজের প্যাকেট বানিয়ে তার মধ্যে নানা রকমারি লজেন্স-জেম বিস্কুট ভরে নিতেন আশাপূর্ণা দেবীর বাবা। লজেন্স-বিস্কুটগুলো নানা ধরনের জীব-জন্তুর মুখের আকৃতির মত হত। সেই ঠোঙা উঁচুতে তুলে আছাড় মারতেন আর সমস্ত বিস্কুট-লজেন্সগুলো যেন হরির লুঠের বাতাসার মত ছড়িয়ে পড়ত চারধারে। আশাপূর্ণা দেবীর সমস্ত ভাই-বোনেরা এমনকি বাড়ির কাজের লোকেরা পর্যন্ত এই আনন্দমেলায় সামিল হতেন। বাড়ির

ছোটদের প্রতি অবশ্য নির্দেশ ছিল গরুর মুখাবয়ব বিশিষ্ট লজেন্স-বিস্কুটগুলো যেন না খাওয়া হয়। বড়দিনের খাবারের ভাগ বাড়ির কাজের লোকেরা এবং ধোবা, গয়লা, জমাদার পর্যন্ত পেত। ঠাকুর-চাকর-ঝি সকলকে এইদিনে লেবু, সন্দেশ, মেওয়া, পাটালীসহ গায়ের চাদর বা কম্বল দেওয়া হত। আর, এইদিনে বাইরের কোন লোককে সবসময়ই খেতে বলা হত।

আশাপূর্ণা দেবী দুর্গাপূজা সম্পর্কেও বাড়ির এবং তাঁর ছোটবেলার অনেক অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। শরৎকাল আসতে না আসতেই ভিখারী বৈষ্ণবেরা আগমনী গানের সম্ভার নিয়ে এসে হাজির হতেন। সেই চিরকালীন গান — "যাও যাও গিরি, আনতে গৌরী — উমা কেমন করে রয়েছে!" আবার নবমীর সকালের সেই কাতর মিনতি — "নবমী নিশি গো, তুমি আর পোহায়ো না" — *(পৃ. ১০ আর এক আশাপূর্ণা)*। সেই কাঁধে কাঁথার সেলাই করা ঝুলি, গলায় কণ্ঠী, পরণে ফর্সা ধুতি, সারা শরীরে চন্দনের রেখা আর গায়ে হরেকৃষ্ণ ছাপ নামাবলী। বৈষ্ণবের মুখে আগমনী গান শুনেই যেন বিরাট বড় এক প্রাপ্তির আনন্দে মেতে উঠতেন। বাড়ির পরিবেশ সম্পর্কে যা বলেছেন তাতে জানা যায় — বাড়িতে অনেক জোড়া কোরা কাপড় আসত গাঁঠরি ভর্তি। দূর-দূরান্তে অনেক আত্মীয়-স্বজনের কাছে চলে যেত, দেশের বাড়িতে চলে যেত আশাপূর্ণা দেবীর ঠাকুমার জন্যে বেশ কিছু এবং বাকিগুলো চেনাজানা বাইরের কিছু লোক এসে ঠিক সময়মতো সেগুলো নিয়ে যেত। আর ধোবা, গয়লা, নাপিত, জমাদার, রাঁধুনি — এরা তো পাবেই। তাঁতিনীরা আসত পুঁটুলি বহন করে প্রচুর শাড়ীর সম্ভার নিয়ে। সেই গাটরির সকলের ওপরে থাকত — 'ফুল পাড়', 'কল্কা পাড়', 'মতি পাড়', 'ধাক্কা পাড়', 'চুড়ি পাড়' ও 'জরি পাড়', নানা ধরনের ছোট ছোট সব ধুতি। তারপর আসত বাড়ির মেয়েদের জন্য শাড়ী। সেগুলো হচ্ছে — 'লীলাম্বরী', 'কালাপানি', 'চাঁদের আলো', 'বউ পাগলা', 'সরু ডুরে', 'চ্যাটালো ডুরে', 'চৌখুপি ডুরে', 'গঙ্গা যমুনা ডুরে' — ইত্যাদি সব নাম। আর সকলের শেষে হাত পড়ত দশহাতি শাড়ীতে, বাড়ির গিন্নীদের জন্য। তাতেও থাকত নানা রকমারি — 'কাশী পাড়', 'রেললাইন পাড়', 'সিঁতেয়সিঁদুর পাড়', 'কল্কা পাড়', 'তাবিজ পাড়', 'আনারস পাড়', 'গঙ্গাযমুনা পাড়', 'এলোকেশী', 'বন্দেমাতরং পাড়' — ইত্যাদি। নানা রকমারি শাড়ীর বাহার মেলে ধরতেন সেই 'গিরি তাঁতিনী'।

পুজো উপলক্ষে আর একজন বাড়িতে আসতেন, তিনি হচ্ছেন দক্ষ নাপতিনী। পুজোর কদিন রোজ এসে তারা বৌদিদিদের, খুকিদের চরণ ধরে টানাটানি করত। খুকিরা নতুন জুতোয় ছাপ লাগবে বলে আলতা পরতে চাইত না, আর জবরদস্তি পায়ে ধরে টানতে থাকত। আশাপূর্ণা দেবীর বাবা হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত ছিলেন জুতোর ব্যাপারে ভীষণ শৌখিন, তাই সব ভাইবোনদের জন্য পুজোয় আসত নতুন জুতো। তিনি এ প্রসঙ্গে যা বলেছেন তা হল — "সে এক মহোৎসব। সেই বাক্সদের বুকে রাখি, না, মাথায় রাখি, না, মাথার বালিশের পাশে রেখে নিশিযাপন করি" — *(ঐ পৃ. ৫৫)*।

বাড়ির পুরুষরা ও মেয়েরা আলাদা আলাদা হয়ে দলবদ্ধভাবে অনেক দূরে দূরে পায়ে হেঁটে ঠাকুর দেখে ঘুরে ফিরে বাড়ি ফিরত সব। বিভিন্ন পুজো মণ্ডপের সামনে নানা খাবারের রকমারি দোকান আর নাগরদোলা সহ মেলা বসে যেত, এই মেলা ছিল পুজোর একটা বিশেষ অঙ্গ। অথচ পিতৃ আদেশ লঙ্ঘন করে রাস্তার তেলেভাজা-ফুলুরি খেতে বা নাগরদোলায় চড়তে কারো সাহস হত না। পুজোর পর ছিল বিজয়া দশমী। পুজোর এই শেষ পর্বটি ছিল তাঁদের কাছে বেশ হার্দিক। প্রতিটি বাড়িতে খাবার তৈরির ধুম পড়ে যেত, আর তার সঙ্গে ছিল আত্মীয়-বন্ধুদের বাড়ি ঘুরে ঘুরে বিজয়া করতে যাওয়া। সন্ধ্যা নেমে আসবার আগে থেকেই বাড়ি ভর্তি হতে শুরু করত লোকজনে আর তাদের মনে করা হত ভগবানতুল্য। ক্রমাগত খাবারের রেকাবী ভর্তি করা হচ্ছে নানা রসনা সুখকর খাদ্যদ্রব্যে আর সাথে সাথে সকলের হাতে দেওয়া হচ্ছে বিজয়া উপলক্ষে বানানো এক চামচ সিদ্ধির শরবত। প্রায় সারা বছর ধরেই এই যে নানা উৎসব অনুষ্ঠান চলত, আর চলত শিল্প মাধুর্য সহযোগে সেগুলোকে পালন করা। এই সমস্ত উৎসব মুখর দিনগুলো এবং তাদের জন্য আয়োজন পর্ব আশাপূর্ণা দেবীকে নানাভাবে প্রভাবিত করত। এই প্রভাব তাঁর মধ্যে ব্যক্তিত্বের উন্মেষ ঘটাতে এবং বিচিত্র অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ করে তুলতে সাহায্য করেছিল।

এই সমস্ত অভিজ্ঞতা আশাপূর্ণা দেবী সংগ্রহ করেছেন সারা ছেলেবেলাটি ধরে। তার পরবর্তী পর্যায়ে আশাপূর্ণা দেবীরা ১৬৬ নং আপার সার্কুলার রোডের ভাড়া বাড়িতে উঠে এসেছিলেন। তাঁর জীবনের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পর্যায় চলছে তখন, সে সময় তাঁর বয়স পাঁচ। এই বাড়িতে আসেন হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, সরলাসুন্দরী দেবী ও তাঁদের তিন ছেলে ও তিন মেয়ে। সবচেয়ে বড়দিদি স্নেহলতার তখন কার্শিয়াঙে বিয়ে হয়ে গেছে। তিনি বলেছেন — "যে বাড়িতে এসেই আমি আর দিদি সোজা ছাদে উঠে গিয়েই চেঁচিয়ে উঠেছিলাম, এ বাড়ির আকাশটা কি নীল।" *(ঐ - পৃ. ৬)*। এটা যেন তাঁদের কাছে ছিল একটা আবিষ্কার। তিন বোনে যেন মুক্তির আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠেছিলেন। আশাপূর্ণা দেবী নিজেই তিনবোনকে (রত্নমালা, আশাপূর্ণা, সম্পূর্ণা) ট্রিলজির অখণ্ড সংস্করণ বলে মনে করতেন। এ বাড়ি তাদের কাছে, বিশেষতঃ আশাপূর্ণা দেবীর কাছে আরও নানা কারণে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। যেমন — বাড়ির সামনের বড় রাস্তাকে তাঁর মনে হত — "চলমান জীবনের নিরন্তর প্রবাহ"। সেই পথ দিয়ে ঠেলায় করে জালা ভর্তি জল যেত, মহরমের তাজিয়া ভাসান যেত, আর ঘোড়ার গাড়ি চড়ে ব্যাণ্ড বাজিয়ে, গ্যাসের বাতি জ্বালিয়ে যেত নতুন বর; যা নাকি শিশুচিত্তকে অতি সহজেই মোহাবিষ্ট করে তুলতে পারত।

তিন বোনে একমন, একপ্রাণ হলেও খেলাধুলার ক্ষেত্রে ভিন্ন রুচি বহন করে চলতেন তাঁরা। তাঁর দিদি রত্নমালা মত্ত থাকতেন পুতুল খেলায়, তিনি নিজে বাইরের ঘরে দাদাদের সঙ্গে ক্যারাম খেলা ও দস্যিবৃত্তি করেই বেড়াতেন। আর ছোট বোন সম্পূর্ণা তাঁর বাবার দেওয়া রং, তুলি ও

কাগজ নিয়ে ছবি আঁকতে বসে যেতেন। আশাপূর্ণা দেবীর মা সরলাসুন্দরী দেবী মেয়েদের মধ্যে 'পদ্য' মুখস্থ করবারও একটা নেশা ধরিয়ে দিয়েছিলেন। তিন বোনের মধ্যে বিশেষ করে দুই বোনে, তিনি এবং সম্পূর্ণা কবিতা আওড়াতে আওড়াতে সারা বাড়ির লোকেদের কান একেবারে ঝালাপালা করে দিতেন। এর পর পরই আবার তাঁদের বাড়ি বদল ঘটল। এবার তাঁরা বছরখানেক অন্য পাড়ায় থেকে আবার পুরানো পাড়ায় আগের বাড়ির কাছেই উঠে এলেন। সেই বাড়ির ঠিকানা হল ১৫৭ / ১ - আপার সার্কুলার রোড, যা নাকি শেষ পর্যন্ত তাঁর বাবার বাড়ি ছিল।

এরপরই শুরু হয় আশাপূর্ণা দেবীর জীবনের দ্বিতীয় পর্ব। এবারে বাল্য ও কৈশোর কাল কাটিয়ে তিনি বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করলেন। ১৩৩১ বঙ্গাব্দ (ইং ১৯২৫) ৬ই শ্রাবণ, নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর মাঝের পাড়া নিবাসী নরেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও সরোজিনী দেবীর জ্যেষ্ঠ পুত্র কালিদাস গুপ্তের সঙ্গে আশাপূর্ণা দেবী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এর মধ্যেই চলতে থাকে তাঁর সাহিত্য চর্চা। তিনি যে কোলকাতাকে জানালায় বসে দেখতে ও ভালোবাসতে শিখেছিলেন, তাঁর সেই প্রিয় কোলকাতা ছেড়ে তাঁকে যেতে হল বেশ দূরে, তাঁর শ্বশুর বাড়িতে। কোলকাতা ছেড়ে যাবার ব্যথা তাঁকে বেশ বিরহী করে তুলেছিল। তাঁর স্বামী ছিলেন ব্যাংক কর্মী এবং তাঁর কর্মস্থল ছিল কোলকাতায়। তাই সারা সপ্তাহ কোলকাতায় কাটিয়ে কালিদাস গুপ্তকে সপ্তাহান্তে ছুটে আসতে হত বাড়িতে। এই টানাপোড়েন বেশিদিন চলতে পারে না, তাই কালিদাস গুপ্ত নিশ্চিন্তে কাজ করার জন্য সকলকে নিয়ে বিয়ের দু'বছরের মধ্যে কোলকাতায় বাড়ি ভাড়া করে চলে আসেন। আশাপূর্ণা দেবীর শাশুড়ি, শ্বশুর, স্বামী ও দুই দেবর — সকলে মিলে সংসার পাতেন ভবানীপুরে। তাঁর শ্বশুর বাড়িতে বছরে একবার তাঁদের ইষ্টদেবী 'অন্নপূর্ণা'র পূজা হত। কৃষ্ণনগর ছেড়ে চলে এলেও এই পূজা উপলক্ষে পরিবারের সকলে একত্রিত হতেন। কিন্তু সরোজিনী দেবীর কনিষ্ঠ পুত্রের অকাল মৃত্যুর পর একসময় সে যোগাযোগও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ধীরে ধীরে পুজোও বন্ধ হয়ে যায়।

এভাবেই এগিয়ে যেতে থাকে আশাপূর্ণা দেবীর সাংসারিক জীবন। ইতিমধ্যে আশাপূর্ণা দেবী ও কালিদাস গুপ্তের পর পর তিনটি সন্তান জন্ম নেয়। প্রথম সন্তান — কন্যা পুষ্পরেণু ও তারপর দুই পুত্র — প্রশান্ত ও সুশান্ত। তাঁদের সন্তানরাও ঠাকুরদা, ঠাকুরমা, কাকা — সকলের মধ্যে সুন্দর মনের মানুষ হয়ে বেড়ে উঠছিলেন। সরোজিনী দেবীর কনিষ্ঠ পুত্রের অকাল প্রয়াণের পর দেশের বাড়ির পুজো এবং যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায় ঠিকই কিন্তু কোলকাতার বাড়িতে দেবী অন্নপূর্ণার পটটি নিত্য পূজার জন্য বিরাজিত ছিল। এই ইষ্টদেবীর পটটি সরোজিনী দেবীকে দিয়েছিলেন তাঁর ভাই শ্রীশ্রী পূর্ণানন্দ স্বামী। তিনি ছিলেন সন্ন্যাসী। এই পূর্ণানন্দ স্বামীর কাছ থেকেই সরোজিনী দেবী দীক্ষা গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে দেখা যায় আশাপূর্ণা দেবী এবং কালিদাস গুপ্তও স্বামী পূর্ণানন্দর নিকটেই দীক্ষিত হন। তাঁদের ওপরে গুরুদেব অনেক অনুশাসন আরোপ করেছিলেন। তাঁরা সেই অনুশাসন

স্বরূপ নানা বিধিনিষেধগুলো পরম শ্রদ্ধায় সারা জীবনভর মান্য করে এসেছেন। সে কারণেই বেশ অল্প বয়স থেকেই প্রথমে কালিদাস গুপ্ত নিরামিষাশী হন এবং তার কিছুদিন পরে আশাপূর্ণা দেবীও সম্পূর্ণভাবে নিরামিষাশী হয়ে ওঠেন।

কর্তব্যকর্মেও তিনি ছিলেন পরম নিষ্ঠাবান। পরিবারের প্রত্যেক সদস্যদের প্রতি তিনি যথাযথ কর্তব্য পালন করে গিয়েছিলেন। তাঁর শাশুড়ি ছিলেন নিয়ম-কানুন ও আচার-বিচারে অত্যন্ত কঠোর মানসিকতার মহিলা, সেই শাশুড়ির সেবা ও মনোরঞ্জন তিনি বেশ নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে গেছেন। বাড়িতে পূজার্চনার ব্যবস্থা, আত্মীয়-অতিথিদের যত্ন-আত্তি ও সঙ্গে সঙ্গে সন্তান পালন — একা হাতে অসীম ধৈর্য্য ও মমতায় তিনি সামলেছেন। এভাবে যখন সংসার জীবন যাপন করছেন তখনই এক সময় আশাপূর্ণা দেবী এক শোকাহত পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ ও ১৩৫০ বঙ্গাব্দে তাঁর মাতা ও পিতার মৃত্যু ঘটে। তিনি তখন স্বামী-পুত্র-কন্যা-দেবর-জা ও তাদের সন্তান-সন্ততি নিয়ে ভরপুর সংসারের মধ্যমণিরূপে বিরাজমান।

এরপর সন্তানদের সংসার জীবনে প্রবেশ করানোর দায়িত্ব পালন শুরু করলেন। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে (বঙ্গাব্দ ১৩৪৯) আশাপূর্ণা দেবীর প্রথম সন্তান, কন্যা পুষ্পরেণুর বিবাহ সম্পন্ন হয়। বাঁকুড়া জেলার বিখ্যাত রায় পরিবারের ছেলে অতুলকৃষ্ণ রায়কে আশাপূর্ণা দেবী ও কালিদাস গুপ্ত একমাত্র জামাতা হিসেবে বরণ করেন। এরপর ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের (বঙ্গাব্দ ১৩৬০) মধ্যে পুষ্পরেণু ও অতুলকৃষ্ণের চারটি পুত্রকন্যার জন্ম হয়। আশাপূর্ণা দেবী তখন সমস্ত কর্ম, খ্যাতি সামলেও চিরাচরিত প্রথানুযায়ী ও অসীম স্নেহের সঙ্গে মাতামহীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। যথাযথ দায়িত্ব কর্তব্য নিজের হাতে পরম যত্নে ও আদরে সম্পাদিত করেন।

১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দ, বঙ্গাব্দ ১৩৫৫ — আশাপূর্ণা দেবীর জীবনে এই বছরটি চরম শোকের বার্তা বয়ে আনে। এসময়ই তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রশান্ত রোগ ভোগের পর মারা যান। পুত্রশোক তাঁকে নিদারুণভাবে ব্যথিত করে তুলেছিল। তা সত্ত্বেও সমস্ত শোক-আঘাত সামলে উঠে আবার সংসার ও কর্মজগতে ফিরে গেছেন। ১৯৫৬ সালে (বঙ্গাব্দ ১৩৬২) তিনি কনিষ্ঠ পুত্র সুশান্তর বিবাহ দেন, তিনি পুত্রবধূ হিসেবে মনোনীতা করলেন শ্রীমতী নূপুর গুপ্তকে। নূপুর গুপ্ত তখন লেডী ব্রেবোর্ণ কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়েছে। সেই সময় থেকে স্বামী, পুত্র ও পুত্রবধূকে নিয়ে শুরু হয় আশাপূর্ণা দেবীর পথচলা।

আশাপূর্ণা দেবীর সংসার আবার স্থানান্তরিত হয় ১৯৬০ সালে (১৩৬৬ বঙ্গাব্দে)। এবারে তাঁরা আসেন গোলপার্কের গভর্ণমেন্ট হাউসিং এর ফ্ল্যাটে। তাঁর সংসারে তখন আর একজন নতুন সদস্যা যুক্ত হয়েছেন। স্বামী-পুত্র-পুত্রবধূর মাঝে তাঁর জ্যেষ্ঠা পৌত্রী শতরূপা। এর সাত বৎসর পরে ১৯৬৭ সালে তাঁর কনিষ্ঠা পৌত্রী শতদীপা জন্মায়। এবার আসে আশাপূর্ণা দেবীর জীবনের শেষ পর্যায়।

১৯৭০ সালে (১৩৭৭ বঙ্গাব্দ) গড়িয়ায় (১৭ কানুনগো পার্ক) নিজস্ব নতুন বাড়ি করে সপরিবারে বসবাস করতে শুরু করেন। অনেক জাঁকজমক করে নতুন বাড়িতে গৃহপ্রবেশ হয়। এখানেই আমৃত্যু জীবনের বাকী বছরগুলো কাটান তিনি।

আশাপূর্ণা দেবী ব্যক্তিজীবনে নানাবিধ গুণের অধিকারী ছিলেন, তার মধ্যে একটি বিশেষ গুণ ছিল আনন্দের আতিশয্যে আত্মবিস্মৃত না হওয়া ও শোকে দুঃখে বিহ্বল হয়ে না পড়া। অর্থাৎ ভালো-মন্দ কোন আবেগেই বিচলিত না হয়ে ঋজু থাকার ক্ষমতা। যেমন তিনি অনেক পুরস্কার ও সম্মানে পুরস্কৃত ও সম্মানিত হয়েছেন — অথচ আনন্দ প্রকাশের মাত্রা ছিল তাঁর বশীভূত। এমনকি ১৯৭৬ সালে লব্ধ 'জ্ঞানপীঠ' পুরস্কার লাভের আনন্দকে আত্মীয়-বন্ধু সকলের সঙ্গে বন্টন করে নিলেও উচ্ছ্বাসের পারদ ছিল সংযত। ঠিক তেমনি ব্যাপার দেখা যেত শোক দুঃখের বেলাতেও। তিনি যখন বেশি বয়সের সীমানায় উপনীত হয়েছেন তখন খুবই সামান্য সময়ের ব্যবধানে তাঁর দুই দাদা, সর্বসময়ের সঙ্গী দিদি রত্নমালা ও কনিষ্ঠা ভগ্নী, যিনি বন্ধুর মত ছিলেন, সেই সম্পূর্ণা দেবীও মারা যান। তারও বেশ কিছুদিন পূর্বে সবচেয়ে কনিষ্ঠা যে ভগ্নী লেখা দেবী গত হন এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথও। আবার কিছুকালমাত্র অসুস্থ থেকে ইহলোক ত্যাগ করেন তাঁর একমাত্র জামাতা অতুলকৃষ্ণ রায়। সেটা ছিল ১৯৯৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাস। জামাতার আগেই অকালপ্রয়াণ ঘটেছিল জ্যেষ্ঠা দৌহিত্রীর।

বিষাদ এবং হর্ষ তাঁকে যেমন একটা সংযমের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখত তেমনি জনপ্রিয়তা, খ্যাতি, সুনামও তাকে কখনো খুশীর জোয়ারে ভাসিয়ে নিয়ে যেত না। কিন্তু পাঠকদের মুগ্ধতা তাঁকে বারংবার উদ্বুদ্ধ করেছে, অনুপ্রাণিত করেছে এবং তিনি নিজেও বারবার স্বীকার করেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে এই পাঠকদের জন্যই তাঁর এই লিখে চলা। আনন্দঘন ও বেদনাবিধুর পরিস্থিতি আশাপূর্ণা দেবীর জীবনে আর একবার আসে প্রায় হাত ধরাধরি করে। ১৯৭৬ সালে পাওয়া 'পদ্মশ্রী' উপাধি ও একই সালে পাওয়া 'জ্ঞানপীঠ' পুরস্কার তাঁকে আনন্দের শীর্ষদেশে উপনীত করে। আবার চরম দুঃখজনক ঘটনাটি ঘটে ১৯৭৮ সালের মার্চ মাসের ১২ তারিখে, তাঁর চিরসাথী, হৃদয়বান, তাঁর সমস্ত কর্মের হিতাকাঙ্খী, পরম বন্ধু, স্বামী কালিদাস গুপ্তের পরলোক গমনে। এই ঝড়কেও তিনি সামলে উঠে আবার সারস্বত সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। জীবন বিমুখ না হয়ে তিনি সমস্ত ধাক্কা সামলে আবার জীবনের কথাই বলতে লেগেছেন।

সাহিত্য আকাদেমীর ফেলো নির্বাচিত হয়েছিলেন ১৯৯৪ সালে। এরপর আর নিজেকে ধরে রাখতে পারেন নি। জরাগ্রস্ততার কোলে ঢলে পড়েছেন। শারীরিক অসুস্থতা তাঁকে কলম ছাড়তে বাধ্য করেছে। বয়সোচিত কারণে অসুস্থতা দেখা দিলেও যতটা সম্ভব লেখা চালিয়েই গিয়েছেন। যখন খুবই অসুস্থ হয়ে পড়লেন তখন আর পারলেন না, কলমের চলার গতি রুদ্ধ হল। এই পরিস্থিতির দু'তিন

মাস পরেই এল মহাপ্রস্থানের সময়। ১৪০২ বঙ্গাব্দের ২৭শে আষাঢ় (১৯৯৫-এর ১৩ই জুলাই) ঘন বর্ষার গভীর নিশীথে ঘটল তাঁর জীবনাবসান। জীবনে পরিণত বয়সে পৌঁছে, পরিপূর্ণতা এবং পরিতৃপ্তি লাভ করেছিলেন এই মহীয়সী নারী। সহজ, সরল জীবনের ভিতর দিয়ে নিঃশব্দে, নির্বিবাদে চালিয়ে গেছেন তাঁর প্রতিবাদী রচনা। একটি মহৎ প্রাণ মানুষ তাঁর উজ্জ্বল, অমলিন রচনা সাহিত্যের অঙ্গনে উপহার দিয়ে অমরলোকে চিরপ্রস্থান করলেন নিঃশব্দে গভীর রাতের নীরবতায়।

এই ব্যক্তিজীবন পরিক্রমাতেই জড়িয়ে রয়েছে আশাপূর্ণা দেবীর সাহিত্য জীবন; এটাই স্বাভাবিক। তাই ব্যক্তিজীবনের নানান তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাধারার উল্লেখের মধ্য দিয়ে লেখিকার মনন-দর্শনের পরিচয় তুলে ধরে এবার তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় উল্লেখযোগ্য দিকটি অর্থাৎ সাহিত্যিক আশাপূর্ণার সাহিত্য-সৃষ্টির সমগ্র দিকটির পরিচয় তাঁর জীবন প্রেক্ষাপটে প্রকাশ করার চেষ্টা করছি।

'ইচ্ছে হয়ে ছিলি মনের মাঝারে'' — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই কথাতেই বোঝা যায় ভবিষ্যতের কোন প্রতিমূর্তি মনের সংগোপনে লুক্কায়িত অবস্থায় থেকে যায় ইচ্ছের রূপ নিয়ে। আর সেই ইচ্ছেটাই ধীরে ধীরে সময়ের সঙ্গে পা ফেলে একটা পূর্ণাবয়ব ধারণ করে। আশাপূর্ণা দেবীর ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। শুরুটা ঝোঁকের বশে হয়ে গেলেও ধীরে ধীরে তাঁর মধ্যে জন্ম নিয়েছে ইচ্ছে। এই ইচ্ছেরই বহিঃপ্রকাশ তাঁর একটি পরিণত সাহিত্যিক হয়ে ওঠার চিত্র।

প্রতিটি মানুষই পিতা-মাতা — এই দুটি ধারার সম্মিলিত নির্যাসে বুদ্ধি, কৃষ্টি, মনন ও আদর্শকে পরিপুষ্ট করে নিজেকে সমৃদ্ধ করে। আশাপূর্ণা দেবী তাঁর শিল্পী পিতার কাছ থেকে পেয়েছিলেন সূক্ষ্ম অনুভূতি, বিশ্লেষণ শক্তি ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা আর মাতৃ সান্নিধ্যে লাভ করেছিলেন সাহিত্য ও জীবন সম্পর্কে অদম্য এক অনুসন্ধিৎসা। এসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর নিজস্ব মৌলিক প্রতিভা।

বাংলা ১৩২৯ সাল, আশাপূর্ণা দেবীর তখন তেরো বছর বয়স, সে সময় তাঁর প্রথম কবিতা ছাপা হয়। তিনি 'শিশুসাথী' পত্রিকায় 'বাইরের ডাক' নামে একটি কবিতা পাঠান, আর তাই প্রথম মুদ্রিত রচনা তাঁর জীবনে। 'শিশুসাথী' পত্রিকার একজন কর্তা ব্যক্তি রাজকুমার চক্রবর্তীর অনুরোধ বা নির্দেশ যাই হোক না কেন, তাই আশাপূর্ণা দেবীকে ধীরে ধীরে লেখিকা হবার দিকে এগিয়ে নিয়ে গেল। এই পত্রিকায় এরপর যত লেখাই পাঠালেন তার কোনটাই বাজে কাগজের ঝুড়িতে নিক্ষিপ্ত হয়নি, বরং পত্রিকায় বেশ সুন্দরভাবে তা ফুটে উঠেছে। এই 'শিশুসাথী' পত্রিকার পরিচিতির সূত্র ধরেই অন্যান্য পত্রিকায় প্রবেশ। এভাবেই ধীরে ধীরে চলে সাহিত্যের অঙ্গনে তাঁর বিচরণ। 'শিশুসাথী'-র পাশাপাশি অন্যান্য শিশু পত্রিকা থেকেও চিঠির মাধ্যমে অনুরোধ আসে তাঁর কাছে লেখা পাঠানোর জন্য। যেমন — 'মৌচাক', 'রংমশাল', 'খোকাখুকু' ইত্যাদি সব পত্রিকা। এ প্রসঙ্গে আরো এক সম্পাদকের কথা আশাপূর্ণা দেবী বলেছেন, তিনি হলেন 'খোকাখুকু' পত্রিকার সম্পাদক নিশিকান্ত সেন। এই পত্রিকাতে একসময় একটা কবিতা

প্রতিযোগিতার কথা ঘোষণা করা হল — বিষয় ছিল 'স্নেহ'। আশাপূর্ণা দেবী সেই বিষয়ের ওপর একটি কবিতা লিখে 'স্নেহ' নাম দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁর বয়স ছিল পনেরো বছরের মধ্যেই। দেখা গেল তিনিই প্রথম পুরস্কারটি পেলেন। পত্রিকায় লেখালেখির দৌলতে আশাপূর্ণা দেবীর মা সরলাসুন্দরী দেবী আহ্লাদে, গর্বে মিলেমিশে একাকার হয়ে যেতেন। আশাপূর্ণা দেবীর দাদা সত্যেন্দ্রনাথ তাঁকে নিজের জমানো পয়সায় একখানি বই কিনে পুরস্কার দিয়েছিলেন, সেটি হল — সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'অভ্র ও আবীর'। তিনি নিজে একথা ঠিকই হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন যে, প্রায় প্রতিটি সাহিত্যিকের জীবনই শুরু হয় কবিতা ও ছোটগল্প দিয়ে।

এরপর ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে তিনি প্রথম বড়দের জন্য লিখলেন। বৃহৎ আকারে লোভনীয় মূর্তিতে হলদে মলাটের যে বইটি প্রকাশ পেল, সেটি হল শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা যে গল্পটি আনন্দবাজার পত্রিকায় পাঠিয়েছিলেন — তাঁর প্রকাশনার ক্ষেত্রেও তিনি আর একজনের কাছে ঋণী বিশেষভাবে। তিনি হলেন মন্মথ সান্যাল। আনন্দবাজারের 'রবিবাসরীয়' তে গল্প লিখে পাঠাবার জন্য তিনি অনুরোধ জানান এবং সেই থেকেই শুরু হল নিয়মিত পথ চলা, যার কোন বিরাম নেই বললেই চলে। ছোটগল্প ও কবিতা অর্থাৎ ছোটখাটো রচনার নানা রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঘুরতে ঘুরতে কলম এরপর রওনা হয়েছে বড়সড় কোন উদ্দেশ্যে। আর তা হচ্ছে তাঁর উপন্যাস রচনার লক্ষ্য। শ্রীযুক্ত বিশু মুখোপাধ্যায় ছিলেন আশাপূর্ণা দেবীর এবং তাঁর পরিবারের পরিজনদের পরিচিত বন্ধু। তিনি একসময় 'কমলা পাবলিশিং' এর পক্ষ থেকে তাঁকে অনুরোধ জানান একটা উপন্যাস লেখার জন্য। আশাপূর্ণা দেবীর নিজের ওপর বিশ্বাস ছিল না যে, তিনি উপন্যাস লিখতে পারেন, তাই প্রথমে সাহস সঞ্চার না করতে পারলেও শেষ পর্যন্ত অনেক অনুরোধ ও উপরোধে পরে লিখতে রাজী হলেন। 'প্রেম ও প্রয়োজন' নামে একখানা উপন্যাসও লিখে ফেললেন। এই হল আশাপূর্ণা দেবীর প্রথম উপন্যাস, যা প্রকাশিত হয় 'কমলা পাবলিশিং' থেকে এবং সালটা ছিল ১৩৫১ বঙ্গাব্দ। পাঠক মহলে লেখাটি মোটামুটি কিছুটা সাড়াও ফেলে দিয়েছিল। এভাবেই শুরু হয় তাঁর সাহিত্যজগতে পথচলা। শুরুতে ধীর গতিতে চললেও পরে দ্রুত গতিতে তিনি একের পর এক উপন্যাস ও ছোটগল্প আরম্ভ ও শেষ করতে লাগলেন। আশাপূর্ণা দেবীর মনের ভেতরে একটা বোধ সর্বদা তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াত তাঁকে, আর তিনি সেটাকে চাইতেন সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে। যে চিন্তা তাঁকে সর্বদা অস্থির করে তুলত, ভাবাত — তা হচ্ছে নারী জাতির প্রতি অবহেলা। সমাজে সর্বদা সমস্ত ভালো দিকগুলোর শ্রেষ্ঠাংশ শুধু পুরুষ জাতিরা পাবে অথচ নারীরা কেন নয়? ১৩৩০ বঙ্গাব্দ, আশাপূর্ণা দেবী তখন অবিবাহিতা, তিনি তখন লিখলেন একটি কবিতা। এর বিষয় ছিল দেশকে স্বর্গ আর নারীকে দেবী বলে পুরুষের বন্দনা — অথচ একে আশাপূর্ণা দেবী আত্ম প্রবঞ্চনা ছাড়া যেন আর কিছু বলে ভাবতে পারেন নি। এই কবিতাটিও একসময় 'বেতার-জগৎ' এ ছাপা হয়েছিল।

একসময় বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠে কবিতাটি বেতারে প্রচারিতও হয়েছিল। কবিতাটির কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হল —

"— তৃপ্তি পেতেছ তুমিই কি শুধু শয্যাভাগিনী লভি?
মর্মে কর্মে সঙ্গী যে নয়, শুধু কামনার ছবি।
আসলে যে পেল দসীর আসন, 'দেবী' বলে বাড়াওনা
'সোনা' 'সোনা' বলে ফাটালে আকাশ, পিতল কি হবে সোনা?

* * *

তোমারও তো আজ ক্লান্তি এসেছে একাকী চলিতে পথ,
পশুর মতন চলিছ নীরবে, টানিয়া জীবন রথ।,
হাতে হাত রেখে চলো দুইজনে, ঘুচে যাক অবসাদ,
কর্মে আসুক নতুন প্রেরণা, নব আনন্দ স্বাদ।"

(পৃ. ১০ — আর এক আশাপূর্ণা)

মনের মধ্যে নানা ভাবের আনা গোনা চললেও তা সাহিত্য হয়ে ওঠার আগে নানা অলসতা যেন তাঁকে জড়িয়ে ছিল। একসময় আলস্যকে ছাপিয়ে ভেতরের তাগিদের সঙ্গে বাইরের তাগাদা এসে যোগ দিল। এই যোগাযোগের ফলেই জন্ম হল এক অমর সাহিত্যের। সাহিত্য মহলে যথেষ্ট প্রভাবশালী পত্রিকা 'কথাসাহিত্য' — এর পক্ষ থেকে আশাপূর্ণা দেবীর কাছে অনুরোধ আসে একটি ধারাবাহিক উপন্যাসের জন্য। এর পর পরই 'মিত্র ও ঘোষ' পাবলিশার্স থেকে শ্রীযুক্ত ভানু রায় মহাশয়েরও অনুরোধ আসে একখানি 'বড়' উপন্যাস রচনার জন্য। বাইরের জগতের এই তাগাদাগুলোই তাঁর অন্তরের ইচ্ছাটাকে প্রকট করে তুলল এবং সমস্ত আলস্য ভেদ করে বেরিয়ে এল যুগান্তকারী এক রচনা, যার নাম হল 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'। এটি হল আশাপূর্ণা দেবীর বিখ্যাত ট্রিলজির প্রথম গ্রন্থ। বইটি বাংলা ১৩৭১ সালে 'মিত্র ও ঘোষ' থেকে প্রকাশিত হয়। ১৩৭২ বঙ্গাব্দেই উপন্যাসটি 'রবীন্দ্র' পুরস্কারে ভূষিত হয়। এর কিছুদিন পরে তিনি আবার সাপ্তাহিক বসুমতী থেকে অনুরোধ পেলেন, তখন লিখতে শুরু করেন ট্রিলজির দ্বিতীয় খণ্ড 'সুবর্ণলতা' (১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দ)। এই ট্রিলজির প্রথম খণ্ডে অর্থাৎ 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' তে তিনি দেখিয়েছেন শতবর্ষ প্রাচীনকালের সমাজচিত্র। গ্রামীণ সমাজের এক বিত্তশালী ঘরের পটভূমিকায় লেখা এই গ্রন্থ। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র নায়িকা সত্যবতী এবং তারই কন্যা সুবর্ণলতাকে নিয়ে রচনা করেন ট্রিলজির দ্বিতীয় গ্রন্থ 'সুবর্ণলতা'। আজ থেকে এত বছর পূর্বে যখন নারীরা শুধুমাত্র নারীই ছিল, যাদের প্রধান কাজই ছিল নারী ধর্ম পালন করা, কিন্তু মানুষ হিসেবে কথা বলার, জানার কোনরকম অধিকার তাদের ছিল না, সেই সময়ের মেয়ে ছিল সত্যবতী। যে নাকি বাবার ছত্র ছায়ায় একজন 'মানবী' হয়ে উঠেছিল। স্বাধীনচেতা ও উদার মনোবৃত্তিসম্পন্ন সত্যবতীর কন্যা সুবর্ণও মাতৃ প্রদত্ত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে

৫। 'জ্ঞানপীঠ' পুরস্কার — ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দ, 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র জন্য।

৬। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক হরনাথ ঘোষ স্মৃতি পুরস্কার স্বরূপ স্বর্ণ পদক প্রাপ্তি ১৯৮৮।

৭। শরৎ পুরস্কার — ১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দ।

৮। জগত্তারিণী স্বর্ণ পদক — কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত, ১৯৯৩ খ্রীষ্টাব্দ।

এছাড়া ভারত সরকার ১৯৭৬ এ 'পদ্মশ্রী' উপাধি প্রদান করেন ও ১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'দেশিকোত্তম' উপাধিতে 'ফেলো' নির্বাচিত করেছিল। ১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দে জব্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'ডি. লিট' সম্মানে সম্মানিত করেছিল। ১৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'ডি. লিট' দেয় এবং ১৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় আশাপূর্ণা দেবীকে সম্মানসূচক 'ডক্টরেট' প্রদান করেন এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁকে একই সম্মান অর্থাৎ সম্মানসূচক 'ডক্টরেট' প্রদান করেন (১৯৯০)।

অন্যান্য পদ ঃ — বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্টের সদস্য ছিলেন তিনি। একসময় ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের সদস্যের পদও অলংকৃত করেন। অসংখ্য সাহিত্য সংস্থার সঙ্গে তাঁর ছিল নিয়মিত যোগাযোগ। বহু গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য সংস্থায় তিনি সভা নেতৃত্বের দায়িত্বও গ্রহণ করেছিলেন। বেতার ও দূরদর্শনের নানা অনুষ্ঠানেও তিনি বহু বছর অংশগ্রহণ করেছিলেন।

সাহিত্যিক আশাপূর্ণা দেবী আজীবন প্রচুর সাহিত্য রচনা করে গেছেন। তার মধ্যে উপন্যাস, ছোটগল্প, শিশুদের জন্য রচিত পুস্তক, কিশোরদের জন্য কিছু রচনা, এছাড়াও কিছু অগ্রন্থিত প্রবন্ধ, কিছু কবিতাও রয়েছে। তাঁর রচিত যে পুস্তক তালিকা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে সেখান থেকে উপন্যাসগুলো প্রায় সমস্তটাই নীচে দেওয়া হল। এরপরও হয়ত অপ্রকাশিত বা আমার সংগ্রহের বাইরে কিছু রয়ে যেতে পারে।

১।	প্রেম ও প্রয়োজন	(১৯৪৪)	১১।	উন্মোচন	(১৯৫৭)
২।	অনির্বাণ	(১৯৪৫)	১২।	নেপথ্য নায়িকা	(১৯৫৭)
৩।	মিত্তির বাড়ি	(১৯৪৭)	১৩।	জনম জনমকে সাথী	(১৯৫৭)
৪।	বলয়গ্রাস	(১৯৪৯)	১৪।	অতিক্রান্ত	(১৯৫৭)
৫।	অগ্নিপরীক্ষা	(১৯৫২)	১৫।	ছাড়পত্র	(১৯৫৯)
৬।	যোগবিয়োগ	(১৯৫৩)	১৬।	প্রথম লগ্ন	(১৯৫৯)
৭।	নবজন্ম	(১৯৫৪)	১৭।	সমুদ্র নীল আকাশ নীল	(১৯৬০)
৮।	কল্যাণী	(১৯৫৪)	১৮।	উত্তর লিপি	(১৯৬০)
৯।	নির্জন পৃথিবী	(১৯৫৫)	১৯।	মেঘ পাহাড়	(১৯৬০)
১০।	শশীবাবুর সংসার	(১৯৫৬)	২০।	তিন ছন্দ	(১৯৬১)

উঠতে শুরু করেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর থাকল না। মায়ের পথ থেকে একসময় সুবর্ণ বিচ্যুত হল, কারণ তার ঠাকুমা এলোকেশীর সিদ্ধান্তে এবং সত্যবতীর অজান্তে কলকাতা শহরের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে সুবর্ণকে জোর করে বিয়ে দেওয়া হয়। যে পরিবারে আভিজাত্য বলে কিছু নেই, রয়েছে শুধু অহংকার ও দম্ভ। এই 'সুবর্ণলতা' গ্রন্থে সেই যুগকে দেখানো হয়েছে, যেখানে নারীরা সুখের শয়নে শায়িত রয়েছেন কিন্তু সর্বাঙ্গ যেন জুড়ে রয়েছে অবমাননার মোড়কে। ট্রিলজির দ্বিতীয় গ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে যাবার বেশ কিছুদিন পর 'কথাসাহিত্যে'রই অনুরোধে এবং অনেকটা নিজেরও উৎসাহে আশাপূর্ণা দেবী লিখতে শুরু করেন তৃতীয় গ্রন্থ 'বকুল কথা' (১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দ)। যা নাকি কথাসাহিত্যেই ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। 'বকুল কথা'তে বকুল নায়িকা নয়, দর্শক। দর্শকের আসনে থেকে সমাজ ও জীবনকে যেমনভাবে দেখতে পাচ্ছে, তেমনভাবেই তুলে ধরছে গ্রন্থে। একটা গোটা সমাজ, প্রতিনিয়ত যার চেহারা ও রং বদলাচ্ছে, তাকে সামগ্রিকভাবে না হলেও মূল সুরকে আশাপূর্ণা দেবী 'ট্রিলজি'র মধ্য দিয়ে তুলে ধরতে চেয়েছেন। তিনটি যুগের চিত্র যেন তিনটি প্রজন্মের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। আশাপূর্ণা দেবী সারাজীবন ধরে যে সমস্ত ভাবনাগুলো ভেবে এসেছেন এবং যে প্রশ্নগুলো সারাজীবন ধরে তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে তাই যেন ট্রিলজিতে প্রতিফলিত হয়ে উঠেছে।

আশাপূর্ণা দেবীর প্রথম কবিতা ছিল 'বাইরের ডাক', প্রথম উপন্যাস 'প্রেম ও প্রয়োজন' (১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দ) আর প্রথম বই হল — 'ছোটঠাকুর্দার কাশীযাত্রা' (১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দ), যার প্রথম প্রকাশ কাল হল বাংলা ১৩৪৫ সালের শ্রাবণ মাসে। এই বইটি সংকলন করে প্রকাশ করেছিল 'বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স' অর্থাৎ যেখান থেকে 'শিশুসাথী' পত্রিকাটি প্রকাশিত হত। 'শিশুসাথী' পত্রিকার মাসিক ও বার্ষিক সংখ্যায় আশাপূর্ণা দেবীর যে সব গল্প প্রকাশিত হয়েছে, তা থেকে বাছাই করে সংকলিত হল এই 'ছোটঠাকুর্দার কাশীযাত্রা'। আরো একটি বইকে প্রথম হিসেবে ধরা যায়, তা হল — 'জল আর আগুন'। দাশগুপ্ত অ্যাণ্ড কোং থেকে প্রকাশিত, যা বড়দের জন্য গল্প সংকলন গ্রন্থ। অনেকদিন পর্যন্ত লোকজন ভাবত — আশাপূর্ণা দেবী ছদ্মনামে আসলে কোন পুরুষ লেখক লিখছেন। কারণ আশাপূর্ণা দেবী বলিষ্ঠ লেখিকা হলেও ছিলেন অন্তঃপুরচারিণী এবং অপরিচিতা।

আশাপূর্ণা দেবী অনেক পুরস্কার ও নানাবিধ সম্মান লাভ করেছেন এবং নানাবিধ প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। নিম্নে সেগুলি উল্লেখ করা হল ঃ—

১। লীলা পুরস্কার — কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দ।

২। মতিলাল পুরস্কার — যুগান্তর পত্রিকা প্রদত্ত, ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দ।

৩। ভুবনমোহিনী স্বর্ণপদক — কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত, ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দ।

৪। রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার — পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত, ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দ, 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসের জন্য।

২১। মুখর রাত্রি (১৯৬১)
২২। আলোর স্বাক্ষর (১৯৬১)
২৩। দিনান্তের রং (১৯৬২)
২৪। আর এক ঝড় (১৯৬২)
২৫। নদী দিকহারা (১৯৬২)
২৬। একটি সন্ধ্যা একটি সকাল (১৯৬২)
২৭। সোনার হরিণ (১৯৬২)
২৮। জহুরী (১৯৬২)
২৯। মায়াজাল (১৯৬২)
৩০। দোলনা (১৯৬৩)
৩১। উড়োপাখি (১৯৬৩)
৩২। বহিরঙ্গ (১৯৬৩)
৩৩। জীবন স্বাদ (১৯৬৩)
৩৪। বেগবতী (১৯৬৩)
৩৫। জলছবি (১৯৬৩)
৩৬। আবহসঙ্গীত (১৯৬৪)
৩৭। উত্তরণ (১৯৬৪)
৩৮। জনতার মুখ (১৯৬৪)
৩৯। লঘু ত্রিপদী (১৯৬৪)
৪০। দু'য়ে মিলে এক (১৯৬৪)
৪১। শুক্তি সাগর (১৯৬৪)
৪২। রাণা শহরের কাণাগলি (১৯৬৪)
৪৩। প্রথম প্রতিশ্রুতি (১৯৬৪)
৪৪। যুগে যুগে প্রেম (১৯৬৫)
৪৫। সুখের চাবি (১৯৬৫)
৪৬। সুয়োরাণীর সাধ (১৯৬৫)
৪৭। সুরভি স্বপ্ন (১৯৬৫)
৪৮। বৃত্ত পথ (১৯৬৫)
৪৯। রংয়ের তাস (১৯৬৬)
৫০। যুগলবন্দী (১৯৬৬)
৫১। মায়া দর্পণ (১৯৬৬)
৫২। শেষ রায় (১৯৬৬)
৫৩। নীল পর্দা (১৯৬৬)
৫৪। দুই মেরু (১৯৬৬)
৫৫। রাতের পাখী (১৯৬৬)
৫৬। সুবর্ণলতা (১৯৬৭)
৫৭। স্বর্গ কেনা (১৯৬৭)
৫৮। নীলাঞ্জনা (১৯৬৭)
৫৯। বিম্ববতী (১৯৬৭)
৬০। বালুচরী (১৯৬৭)
৬১। সেই রাত্রি এই দিন (১৯৬৭)
৬২। সমুদ্র কন্যা (১৯৬৭)
৬৩। অন্য মাটি অন্য রং (১৯৬৭)
৬৪। অনবগুণ্ঠিতা (১৯৬৭)
৬৫। অন্তর বাহির (১৯৬৭)
৬৬। যাহা চাই তাহা (১৯৬৮)
৬৭। দুই নায়িকা (১৯৬৮)
৬৮। বিজয়ী বসন্ত (১৯৬৮)
৬৯। সময়ের স্তর (১৯৬৮)
৭০। শুধু তারা দুজনে (১৯৬৮)
৭১। জালিকাটা রোদ (১৯৬৯)
৭২। মন মর্মর (১৯৬৯)
৭৩। দ্বিতীয় অধ্যায় (১৯৬৯)
৭৪। গাছের পাতা নীল (১৯৬৯)
৭৫। দর্শকের ভূমিকায় (১৯৬৯)
৭৬। নীল বন্দর (১৯৬৯)
৭৭। বিরহী বিহঙ্গ (১৯৬৯)
৭৮। নয় ছয় (১৯৭০)

৭৯। মনের মুখ (১৯৭০)
৮০। অনিন্দিতা (১৯৭১)
৮১। নিভৃত আকাশ (১৯৭১)
৮২। মধ্যে সমুদ্র (১৯৭১)
৮৩। দূরের জানলা (১৯৭১)
৮৪। কী পাইনি (১৯৭২)
৮৫। ঝিনুকে সেই তারা (১৯৭২)
৮৬। চাঁদের জানলা (১৯৭২)
৮৭। দর্পণে ছায়া (১৯৭২)
৮৮। রাত্তির পরে (১৯৭২)
৮৯। রেল লাইন (১৯৭২)
৯০। যার যা দাম (১৯৭২)
৯১। শিকলি কাটা পাখি (১৯৭৩)
৯২। নক্সা কাটা ঘর (১৯৭৩)
৯৩। তরঙ্গহীন (১৯৭৩)
৯৪। ওরা বড়ো হয়ে গেল (১৯৭৩)
৯৫। বকুল কথা (১৯৭৪)
৯৬। ভালোবাসার মুখ (১৯৭৪)
৯৭। হারানো খাতা (১৯৭৪)
৯৮। যে যায় দর্পণে (১৯৭৫)
৯৯। কখনো দিন কখনো রাত (১৯৭৫)
১০০। হয়তো সবাই ঠিক (১৯৭৫)
১০১। হে ঈশ্বর, তোমার যবনিকা (১৯৭৫)
১০২। পলাতক সৈনিক (১৯৭৬)
১০৩। লোহার গরাদের ছায়া (১৯৭৬)
১০৪। বংশধর (১৯৭৬)
১০৫। উত্তর পুরুষ (১৯৭৬)
১০৬। সময় অসময় (১৯৭৬)
১০৭। এই যুগ এই মন (১৯৭৬)
১০৮। আবৃতা অনাবৃতা (১৯৭৭)
১০৯। পাখির খাঁচা ও খাঁচার পাখি (১৯৭৭)
১১০। চার দেওয়ালের বাইরে (১৯৭৭)
১১১। ওরা ভাঙ্গেনা (১৯৭৭)
১১২। সোনার কৌটা (১৯৭৭)
১১৩। ত্রিনয়নী (১৯৭৭)
১১৪। শূন্যতার বাসা (১৯৭৮)
১১৫। যুগান্তরে যবনিকা পারে (১৯৭৮)
১১৬। পয়সা দিয়ে কেনা (১৯৭৮)
১১৭। সুখের ঠিকানা (১৯৭৯)
১১৮। সাপের ছোবল (১৯৭৯)
১১৯। মোম জ্বলে মোম গলে (১৯৭৯)
১২০। তিন ভুবনের কাহিনী (১৯৭৯)
১২১। অবিনশ্বর (১৯৭৯)
১২২। প্রতীক্ষার বাগান (১৯৮০)
১২৩। বালির নীচে ঢেউ (১৯৮০)
১২৪। সুখের নিলয় (১৯৮০)
১২৫। এই তো সেদিন (১৯৮০)
১২৬। উনিশশো উনআশিতেও (১৯৮০)
১২৭। পুঁথির লেখা (১৯৮০)
১২৮। অহল্যা উদ্ধার (১৯৮১)
১২৯। সূর্যোদয় (১৯৮১)
১৩০। স্বপ্নের ঝাঁপি (১৯৮১)
১৩১। জবর দখল (১৯৮১)
১৩২। অফুরন্ত (১৯৮১)
১৩৩। জরিপ (১৯৮২)
১৩৪। সন্ধিক্ষণ (১৯৮২)
১৩৫। তুলির টানে আঁকা (১৯৮২)

১৩৬। যে যেখানে ছিল (১৯৮৩)
১৩৭। সূর্য্যাস্তের রং (১৯৮৩)
১৩৮। ঘর (১৯৮৩)
১৩৯। চাবি (১৯৮৪)
১৪০। আমি ও আপনারা (১৯৮৪)
১৪১। নাটকের শেষ দৃশ্যে (১৯৮৫)
১৪২। নির্ণয় (১৯৮৫)
১৪৩। খবর বলছি (১৯৮৫)
১৪৪। অস্তিত্ব (১৯৮৫)
১৪৫। উৎসমূল (১৯৮৫)
১৪৬। অচল পয়সা (১৯৮৫)
১৪৭। নীট ফল (১৯৮৫)
১৪৮। অভয়ারণ্য (১৯৮৬)
১৪৯। নিজস্ব রমণী (১৯৮৬)
১৫০। রমণীর মন (১৯৮৬)
১৫১। মান সম্ভ্রম (১৯৮৬)
১৫২। হঠাৎ একদিন (১৯৮৭)
১৫৩। নিলয় নিবাস (১৯৮৭)
১৫৪। সাদায় কালোয় নক্সা (১৯৮৭)
১৫৫। সেকেণ্ড হ্যাণ্ড (১৯৮৭)
১৫৬। ছায়াতে আলোতে (১৯৮৭)
১৫৭। দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে (১৯৮৮)
১৫৮। চিত্রকল্প (১৯৮৮)
১৫৯। পরমেশ্বরী (১৯৮৮)
১৬০। যার বদলে যা (১৯৮৯)
১৬১। এখানে ওখানে সেখানে (১৯৯০)
১৬২। সৃষ্টিছাড়া (১৯৯০)
১৬৩। লীলা চিরন্তর (১৯৯১)
১৬৪। কখনো কাছে কখনো দূরে (১৯৯১)
১৬৫। চাবিবন্ধ সিন্দুক (১৯৯২)
১৬৬। পথ জনহীন (১৯৯২)
১৬৭। নিমিত্ত মাত্র (১৯৯২)
১৬৮। সিঁড়ি ভাঙ্গা অংশ (১৯৯২)
১৬৯। নষ্ট কোষ্ঠী (১৯৯৩)
১৭০। ছোট সে তরী (১৯৯৩)
১৭১। দিব্য হাসিনীর দিনলিপি (১৯৯৪)
১৭২। ভি. আই. পির বাড়ীর লোক (১৯৯৪)
১৭৩। ভুল ট্রেনে উঠে (১৯৯৪)
১৭৪। তনুশ্রীর জগত (১৯৯৪)
১৭৫। একটি মিথ্যা ভাষী নায়ক (১৯৯৪)
১৭৬। শূন্যে সেতু (১৯৯৪)
১৭৭। স্থান কাল পাত্র (১৯৯৫)
১৭৮। যাচাই (১৯৯৫)
১৭৯। এঘর ওঘর (১৯৯৫)

উপন্যাসগুলো ছাড়াও উপন্যাসের কিছু সংকলন গ্রন্থও রয়েছে। কোথাও তিনটি, কোথাও চারটি, পাঁচটি বা ছয়টি করে উপন্যাস নিয়েও উপন্যাসের সংকলিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। যেমন — 'বর্ষা বসন্ত শরৎ' এই উপন্যাসের সংকলন গ্রন্থে তিনটি উপন্যাস রয়েছে। নীচে সংকলিত উপন্যাসের গ্রন্থগুলোর নাম দেওয়া হল —

১। একাল সেকাল অন্যকাল
২। সপ্তসিন্ধু দশ দিগন্ত
৩। স্বপ্নমুখর রাত্রি
৪। নির্বাচিত উপন্যাস গুচ্ছ
৫। সকাল সন্ধ্যা রাত্রি
৬। তিনপ্রহর

৩৩। আশাপূর্ণা দেবীর ছোটগল্প সংকলন (১৯৯৩)
৩৪। নির্বাচিত ছোটগল্প (১৯৯৩)
৩৫। শ্রেষ্ঠ হাসির গল্প (১৯৯৫)

আশাপূর্ণা দেবী ছোটদের রচনা দিয়েই নিজের সাহিত্য জীবন শুরু করেছিলেন। এরপর সমস্ত ধরনের রচনার ফাঁকে তিনি ছোটদের জন্য আরো অনেক গল্প রচনা করেন। ছোটদের জন্য রচিত গল্পগ্রন্থগুলোর তালিকা —

১। ছোট ঠাকুর্দ্দার কাশীযাত্রা (১৯৩৮)
২। হাফ হলিডে (১৯৪১)
৩। রঙ্গিন মলাট (১৯৪১)
৪। ভাগ্যি যুদ্ধ বেঁধেছিল (১৯৪৬)
৫। বলবার মতন নয় (১৯৪৭)
৬। ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প (১৯৫৫)
৭। গল্প হলো শুরু (১৯৫৭)
৮। কনক দীপ (১৯৫৯)
৯। গল্প ভালো আবার বলো (১৯৫৮)
১০। রাজা নয় রাণী নয় (১৯৫৮)
১১। গল্পের মতো গল্প (১৯৫৮)
১২। কনক দীপ (১৯৫৯)
১৩। ছোটদের ভালো ভালো গল্প (১৯৬২)
১৪। এক সমুদ্র অনেক ঢেউ (১৯৬৩)
১৫। শোনো শোনো গল্প শোনো (১৯৬৫)
১৬। সেই সব গল্প (১৯৬৭)
১৭। হাসির গল্প (১৯৬৭)
১৮। কুমকুম (১৯৭০)
১৯। ডাকাতের কবলে আমি (১৯৭২)
২০। রাজকুমারের পোশাকে (১৯৭৫)
২১। রাজাই গল্প (১৯৭৬)
২২। দূরের বাঁশী (১৯৭৮)
২৩। দুজনে মিলে (১৯৭৯)
২৪। গজ উকিলের হত্যা রহস্য (১৯৭৯)
২৫। কিশোর সাহিত্য সম্ভার (১৯৮০)
২৬। ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প (১৯৮১)
২৭। রহস্যের সন্ধান (১৯৮১)
২৮। ওনারা আসবেনই (১৯৮২)
২৯। ভূতুরে কুকুর (১৯৮২)
৩০। ছুটিতে ছুটোছুটি (১৯৮২)
৩১। পাখি থেকে হাতি (১৯৮৩)
৩২। সেরা রহস্য সম্ভার (১৯৮৪)
৩৩। কত কাণ্ড রেলগাড়িতে (১৯৮৫)
৩৪। জীবন কালীর পাক্কা হিসেব (১৯৮৫)
৩৫। কিশোর অমনিবাস (১৯৮৬)
৩৬। আশাপূর্ণা দেবীর সেরা বারো (১৯৮৮)
৩৭। এক কুড়ি গল্প (১৯৮৮)
৩৮। নিখর চায় আমোদ (১৯৯০)
৩৯। পাঁচ ভূতের গপ্পো (১৯৯০)
৪০। একের মধ্যে তিন (১৯৯১)
৪১। কপাল খুলে গেল নাকি (১৯৯২)
৪২। মাণিকচাঁদ ও চোদ্দসখী (১৯৯২)
৪৩। পয়লা দোসরা (১৯৯২)
৪৪। যুগলরত্ন টিকটিকি অফিস (১৯৯২)
৪৫। ষড়যন্ত্রের নায়ক (১৯৯২)
৪৬। ম্যাজিক মামা (১৯৯২)

৭। আশাপূর্ণা বীথিকা
৮। বর্ষা বসন্ত শরৎ
৯। তিন তরঙ্গ
১০। শেষ রায়
১১। চতুর্দ্দোলা
১২। চতুস্পর্ণা
১৩। পর্বত সখী
১৪। দশ দিগন্ত
১৫। উপন্যাস এক উপন্যাস
১৬। আবার ফিরে দেখা

আশাপূর্ণা দেবী প্রায় দেড় হাজারের মতে ছোটগল্প লিখেছেন। উপন্যাসের মত এক একটা গল্প পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়নি। নানা পত্র-পত্রিকায় তার বেশিরভাগটাই প্রকাশিত হয়েছে আর পরবর্তীকালে গল্পগ্রন্থ আকারে সেগুলো প্রকাশ পেয়েছে। স্ব-নির্বাচিত গল্প, স্ব-নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্প যেমন লেখিকা নিজে নির্বাচন করেছেন। শ্রেষ্ঠ গল্পে যেমন বিখ্যাত গল্প, সরস গল্প ও শ্রেষ্ঠ হাসির গল্পে কৌতুক রসাশ্রিত গল্পগুলো সংকলিত হয়েছে। আবার যতটা সম্ভব কালানুক্রমিকভাবে 'মিত্র ও ঘোষ' থেকে 'গল্প সমগ্র' নামে ছয়টি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। ছোটগল্প গ্রন্থের নামগুলো যথাসম্ভব নীচে দেওয়া হল —

১।	জল আর আগুন	(১৯৪০)	১৭।	সাজ বদল	(১৯৬২)
২।	সাগর শুকায়ে যায়	(১৯৪৭)	১৮।	আকাশ মাটি	(১৯৬৫)
৩।	শ্রেষ্ঠ গল্প	(১৯৪৭)	১৯।	কাঁচ পুঁতি হীরে	(১৯৬৭)
৪।	স্ব-নির্বাচিত গল্প	(১৯৫৫)	২০।	ভোরের মল্লিকা	(১৯৭৮)
৫।	আর একদিন	(১৯৫৫)	২১।	এক আকাশ অনেক তারা	(১৯৭৮)
৬।	সরস গল্প	(১৯৫৬)	২২।	বাছাই গল্প	(১৯৭৯)
৭।	পূর্ণ পাত্র	(১৯৫৬)	২৩।	নক্ষত্রের আকাশ	(১৯৮১)
৮।	স্বপ্ন - শর্বরী	(১৯৫৬)	২৪।	গল্পগুচ্ছ	(১৯৮৬)
৯।	গল্প পঞ্চাশৎ	(১৯৫৬)	২৫।	ঢেউ গুনছি সাগরের	(১৯৮৬)
১০।	পশ্চীমহল	(১৯৫৯)	২৬।	স্ব-নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্প	(১৯৮৮)
১১।	নব নীড়	(১৯৬০)	২৭।	গল্প সমগ্র (১ম)	(১৯৯১)
১২।	কেশবতী কন্যা	(১৯৬১)	২৮।	গল্প সমগ্র (২য়)	(১৯৯২)
১৩।	মনোনয়ন	(১৯৬১)	২৯।	গল্প সমগ্র (৩য়)	(১৯৯৩)
১৪।	ছায়া সূর্য্য	(১৯৬১)	৩০।	গল্প সমগ্র (৪র্থ)	
১৫।	অতলান্তিক	(১৯৬২)	৩১।	গল্প সমগ্র (৫ম)	
১৬।	সোনালী সন্ধ্যা	(১৯৬২)	৩২।	গল্প সমগ্র (৬ষ্ঠ)	

৪৭। ব্যাপারটা কি হলো (১৯৯৩) ৪৯। অমরাবতীর অন্তরালে (১৯৯৪)

৪৮। রাণী মায়াবতীর অন্তর্ধান রহস্য (১৯৯৩) ৫০। সকাল (১৯৯৫)

আশাপূর্ণা দেবী শুধু যে বাংলা সাহিত্য জগতেই খ্যাতি অর্জন করেছেন তা নয়। তিনি ভারতীয় সাহিত্য ক্ষেত্রেও প্রভাব বিস্তার করেছেন। একজন সাহিত্যিকের রচনায় যখন মানুষ নিজের অনুভূতিকেও খুঁজে পায় তখনই তা দেশোত্তীর্ণ ও কালোত্তীর্ণ হয়। আশাপূর্ণা দেবীর অনেক রচনাই ভারতীয় সাহিত্যে স্থান করে নিয়েছে, তাই ভারতের নানা প্রাদেশিক ভাষায় তাঁর অনেক উপন্যাস, ছোটগল্প ও অন্যান্য রচনা অনুদিত হয়েছে। বিশেষত ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিন্দিতে অনুবাদের সংখ্যা বেশি। এছাড়া ওড়িয়া, মালয়ালম, অসমীয়া, মারাঠী ও ইংরেজিতেও অনুদিত হয়েছে। বিশেষতঃ ত্রয়ী উপন্যাসের প্রথম পর্ব 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র অনুবাদের সংখ্যাই বেশি। আশাপূর্ণা দেবীর লেখা যে কত মানুষের ভালোবাসা দ্বারা সমাদৃত হয়েছে এবং পাঠক সমাজে তা কতটা ছাপ ফেলেছে অনুদিত গ্রন্থগুলোতে তার নিদর্শন মেলে।

গ্রন্থের নাম	অনুদিত গ্রন্থের নাম	প্রকাশ কাল
১। অগ্নি পরীক্ষা	অগ্নি পরীক্ষা (হিন্দি)	১৯৬৪
২। রাতের পাখি	রাত কা পনছি (হিন্দি)	১৯৬৮
৩। দোলনা	দোলনা (হিন্দি)	১৯৭২
৪। প্রথম প্রতিশ্রুতি	প্রথম প্রতিশ্রুতি (হিন্দি)	১৯৭২
৫। লঘু ত্রিপদী	টুটে সপনে (হিন্দি)	১৯৭৪
৬। সমুদ্র নীল আকাশ নীল	শ্রাবণী (হিন্দি)	১৯৭৬
৭। বালুচরী	তপস্যা (হিন্দি)	১৯৭৭
৮। সুবর্ণলতা	সুবর্ণলতা (হিন্দি)	১৯৭৮
৯। বকুলকথা	বকুলকথা (হিন্দি)	১৯৭৮
১০। বেতকা বৃন্দা	বনগুণ্ঠনবতী (হিন্দি)	১৯৮০
১১। তিনছন্দ	তিনছন্দ (হিন্দি)	১৯৮০
১২। দিনান্তের রং	জীবন সন্ধ্যা (হিন্দি)	১৯৮০
১৩। ভাঙা আয়না	টুটা শিশা (হিন্দি)	১৯৮১
১৪। আবহ সঙ্গীত	নেপথ্য সঙ্গীত (হিন্দি)	১৯৮২
১৫। সোনার কৌটা	মণিমঞ্জুষা (হিন্দি)	১৯৮২
১৬। মুখর রাত্রি	মুখর রাত্রি (হিন্দি)	১৯৮২

গ্রন্থের নাম	অনুদিত গ্রন্থের নাম	প্রকাশ কাল
১৭। প্রতীক্ষার বাগান	প্রতীক্ষার কানন (হিন্দি)	১৯৮২
১৮। সাগর কন্যা	সাগর তনয়া (হিন্দি)	১৯৮২
১৯। যখন আলোক নাহিরে	যব প্রকাশ হি না হো (হিন্দি)	১৯৮৩
২০। মিনুকে সেই তারা	ভোর কা না রে (হিন্দি)	১৯৮৩
২১। উড়ো পাখি	পন্‌ছি উড়া আকাশ (হিন্দি)	১৯৮৩
২২। সাপের ছোবল	সর্প দংশ (হিন্দি)	১৯৮৩
২৩। মনের সুখ	মন কা চেহেরা (হিন্দি)	১৯৮৪
২৪। বালির নীচে ঢেউ	অন্তঃ তরঙ্গ (হিন্দি)	১৯৮৪
২৫। অন্য মাটির অন্য রং	মাটিকা রং ঔর (হিন্দি)	১৯৮৫
২৬। সময়ের স্তর	সময় কা স্তর (হিন্দি)	১৯৮৫
২৭। নীটফল	অবশেষে (হিন্দি)	১৯৮৫
২৮। অতিক্রান্ত	অতিক্রান্ত (হিন্দি)	১৯৮৫
২৯। বলয়গ্রাস	বলয়গ্রাস (হিন্দি)	১৯৮৬
৩০। সন্ধিক্ষণ	সন্ধিক্ষণ (হিন্দি)	১৯৮৬
৩১। প্রেম ও প্রয়োজন	প্রেম ও প্রয়োজন (হিন্দি)	১৯৮৭
৩২। নিজস্ব রমনী	তশনী নারী (হিন্দি)	১৯৮৭
৩৩। খাঁচার পাখি ও পাখির খাঁচা	পিঞ্জরে কি চিড়িয়া (হিন্দি)	১৯৮৮
৩৪। প্রথম প্রতিশ্রুতি	প্রথম প্রতিশ্রুতি (অসমীয়া)	১৯৭৮
৩৫। প্রথম প্রতিশ্রুতি	প্রথম প্রতিশ্রুতি (ওড়িয়া)	
৩৬। প্রথম প্রতিশ্রুতি	প্রথম প্রতিশ্রুতি (মারাঠি)	
৩৭। প্রথম প্রতিশ্রুতি	প্রথম প্রতিশ্রুতি (মালয়ালম)	১৯৮৫
৩৮। যখন আলোক নাহিরে	প্রকাশম ইল্লাগযাপ্পল (মালয়ালম)	১৯৮৫
৩৯। সুবর্ণলতা	সুবর্ণলতা (মালয়ালম)	১৯৮৬
৪০। বিলম্বিত	বিলম্বিত (ওড়িয়া)	১৯৮২
৪১। সাপের ছোবল ও দূরের জানালা	Snake dite (ইংরেজি) The Distainet Window	১৯৮৩
৪২। সমুদ্র নীল আকাশ নীল	সমুদ্র নীল আকাশ নীল (ওড়িয়া)	১৯৮৮
৪৩। গুণ্ঠনবতী	মানালকাট্রিল ভ্রুন্ডাভাণম (মালয়ালম)	১৯৮৮

গ্রন্থের নাম	অনুদিত গ্রন্থের নাম	প্রকাশ কাল
৪৪। এই তো সেদিন	অভি তো উসদিন (হিন্দি)	১৯৮৯
৪৫। অস্তিত্ব	অস্তিত্ব (হিন্দি)	১৯৮৯
৪৬। নিলয় নিবাস	নিলয় নিবাস (হিন্দি)	১৯৮৯
৪৭। হঠাৎ একদিন	অচানক একদিন (মালয়ালম)	১৯৮৯
৪৮। বকুল কথা	বকুলিন্তে কথা (মালয়ালম)	১৯৮৯
৪৯। ছোটগল্প সংকলন	কিচিয়া (হিন্দি)	১৯৯০
৫০। যার বদলে যা	প্রারব্ধ (হিন্দি)	১৯৯০
৫১। রমণীর মন	নারীমন (হিন্দি)	১৯৯১
৫২। রমণীর মন	দাসী পুত্র (হিন্দি)	১৯৯১
৫৩। রমণীর মন	নাগলতা (হিন্দি)	১৯৯১
৫৪। লেখা জোখা	জরিপ (হিন্দি)	১৯৯২
৫৫। আবহ সঙ্গীত	অনিয়ারা সঙ্গীতম (মালয়ালম)	১৯৯২
৫৬। দূরের জানালা	দূর কী খিড়কী (হিন্দি)	১৯৯৩
৫৭। দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তর	দৃশ্য সে দৃশ্যান্তর (হিন্দি)	১৯৯৩
৫৮। দিকচিহ্ন	দিক্‌চিহ্ন (দশদিগন্ত) (হিন্দি)	১৯৯৪
৫৯। কখনো দিন কখনো রাত	কভী দিন কভী রাত (হিন্দি)	১৯৯৪
৬০। ভুল ট্রেনে উঠে তনুশ্রীর জগৎ এমনও হতে পারে	অক্ষমৎ অপরাধ (হিন্দি)	১৯৯৪
৬১। শেষ রায়	অন্তিম ফয়সালা (হিন্দি)	১৯৯৪
৬২। কাঁচ পুতি হীরে (ছোট গল্প সংকলন)	কাঁচ পুতি হীরে (হিন্দি)	১৯৮৭
৬৩। ছোটগল্প সংকলন শ্রেষ্ঠগল্প ১ম খণ্ড, ২য় খণ্ড	(ওড়িয়া)	
৬৪। ছোটগল্প সংকলন	A Bonquet of Modern Short Stories (ইংরেজি)	১৯৭৮

তাঁর অনেক উপন্যাস ও কিছু ছোট গল্প বাংলা ও হিন্দি ভাষায় চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে। শুধু

পাঠক সমাজেই নয়, চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়ে তিনি আপামর জনসাধারণের অন্তরেও ঠাঁই করে নিয়েছেন।

১। যোগবিয়োগ	৬। শশীবাবুর সংসার	১১। চেনা অচেনা (সুয়োরাণীর সাধ)
২। অগ্নিপরীক্ষা	৭। ছায়াসূর্য	১২। অনিন্দিতা
৩। কল্যাণী	৮। দোলনা	১৩। নায়িকার ভূমিকায় (মায়াজাল)
৪। বলয়গ্রাস	৯। তাহলে	১৪। প্রথম প্রতিশ্রুতি
৫। নবজন্ম	১০। বালুচরী	১৫। সুবর্ণলতা
		১৬। উত্তরলিপি

হিন্দি ছায়াছবি হয়েছে যেগুলো ঃ-

১। মেহেরবান (যোগবিয়োগ)	৩। চৈতালী (উত্তরণ)
২। ছোটি সি মুলাকাৎ (অগ্নিপরীক্ষা)	৪। তপস্যা (বালুচরী)

এছাড়াও কিশোরদের জন্য রচিত গ্রন্থাবলী তিনটি খণ্ডরূপে প্রকাশ পেয়েছে। আশাপূর্ণা দেবীর সমগ্র রচিত উপন্যাস, অপ্রকাশিত প্রবন্ধ ও কবিতা নিয়ে দশখানি রচনাবলী প্রকাশিত হয়েছে। 'আর এক আশাপূর্ণা' নামে ১৯৯৫ সালে প্রবন্ধের বই প্রকাশিত হয়।

আশাপূর্ণা দেবীর রচিত প্রায় ১৭৯ খানি উপন্যাস, ৩২টি ছোটগল্প সংকলন, ছোটদের জন্য বই ৪৯টি ও ১৬টি উপন্যাসের সংকলিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তাঁর জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে ত্রয়ী উপন্যাস (প্রথম প্রতিশ্রুতি, সুবর্ণলতা ও বকুলকথা)। চিত্রায়িত ও মঞ্চে অভিনীত উপন্যাস ও গল্প হল — প্রায় ১৬টি উপন্যাস চিত্রায়িত, বাংলা ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় প্রায় তিরিশটির কাছাকাছি গল্প ও উপন্যাস চিত্রায়িত। উপন্যাস অবলম্বনে অন্ততঃ ৭টি নাটক রঙ্গমঞ্চে মঞ্চস্থ হয়েছে। রেডিওতে নানাগল্প ও উপন্যাসের অসংখ্য নাট্যরূপ অভিনীত হয়েছে। দূরদর্শনেও ধারাবাহিকভাবে অনেক গল্প উপন্যাস চিত্রায়িত হয়েছে।

অনুদিত হয়েছে হিন্দিতে ৪৯ খানা উপন্যাস, অসমীয়া ভাষায় ১ খানি, ওড়িয়া ভাষায় ৪খানি, মালয়ালম ভাষায় ৫টি, মারাঠিতে ১টি ও ইংরেজিতে এখনও পর্যন্ত ২ খানি গ্রন্থ।

আশাপূর্ণা দেবী শুধু মাতৃভাষাতেই পড়াশোনা করতেন, কারণ প্রথাগত শিক্ষা মেনে তিনি বিদ্যালয় শিক্ষালাভ করেননি। তাই বিদেশী সাহিত্যগুলোর অনুবাদ গ্রন্থই তিনি পাঠ করেছিলেন। পড়তে পড়তে তিনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন তাকেই তিনি তাঁর রচনায় মূল উপজীব্য করেছিলেন। তাঁর উপলব্ধিতে ধরা পড়েছিল যে, পরিবেশ-দেশ-কাল ও পাত্র-পাত্রী যাই হোক না কেন ভেতরে সমস্ত মানুষই এক।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ছোটগল্পকার হিসেবে আশাপূর্ণা দেবীর আবির্ভাব ও ক্রমপরিনতি

দ্বিতীয় অধ্যায়
ছোটগল্পকার হিসেবে আশাপূর্ণা দেবীর আবির্ভাব ও ক্রমপরিণতি

বিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত গল্পকারদের মধ্যে একজন হচ্ছেন আশাপূর্ণা দেবী। এমনকি স্ত্রী ঔপন্যাসিক হিসেবেও তিনি বিশেষরূপে খ্যাত। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে, যখন নারীদের শিক্ষার পথ সুপ্রশস্ত নয় এবং কর্মজগতেও তাদের তেমন গতিবিধি নেই, সেই সময়েই আশাপূর্ণা দেবীর আত্মপ্রকাশ ঘটে। ধীরে ধীরে শুরু হয় সাহিত্যাঙ্গনে তাঁর বলিষ্ঠ পদচারণা।

অন্যান্য অনেক লেখক-লেখিকার মতই আশাপূর্ণা দেবীও প্রথমদিকে শিশুদের জন্যই লিখতে শুরু করেন। প্রথম লেখার প্রকাশে যেমন আনন্দে পুলকিত হয়ে ওঠেন প্রত্যেকেই, তিনিও তেমনি প্রথমের প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন। আশাপূর্ণা দেবী নিজেই একথা বলে গিয়েছেন — "'প্রথম লেখা' যদি ছাদনাতলায় শুভদৃষ্টির স্বাদ তো প্রথম বইতে প্রথম প্রেমের স্বাদ। যার জন্যে থাকে উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষা, অধীর আগ্রহের ব্যাকুলতা। এ সুখ তো দ্বিতীয়বার আসে না। এই জন্যেই না 'প্রথম' শব্দটাকে নিয়ে এত টানাটানি।" *(পৃ. ২২ — আর এক আশাপূর্ণা)*।

'শিশুসাথী' পত্রিকায় আশাপূর্ণা দেবী প্রথম 'বাইরের ডাক' (১৩২৯) নামে একটি কবিতা পাঠান এবং সেটি প্রকাশিতও হয়। এটি হল তাঁর প্রথম লেখা। এরপর থেকে শুরু হল গল্প লেখার পালা। ১৩২৯-১৩৪৩ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত তিনি শুধুমাত্র শিশুদের জন্যই লিখে গেছেন। এই সময়টাতে প্রেম - ভালোবাসা - বিরহ - মিলন এবং দেশাত্মবোধ তাঁকে প্রবলভাবে আলোড়িত করলেও শুধুমাত্র শিশুসাহিত্যই রচনার মধ্যেই নিজেকে নিবদ্ধ করে রেখেছেন।

আশাপূর্ণা দেবী তেরো বছর বয়স থেকে লেখা শুরু করেন। 'শিশুসাথী' ও আরো অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রায় তিরিশ বছর বয়স পর্যন্ত প্রকাশিত হতে থাকে। বঙ্গদর্শনের সময় থেকে দেখা যাচ্ছে পত্রিকার সঙ্গে সাহিত্যের সংযোগ অত্যন্ত নিবিড়, এক্ষেত্রেও তার কোন অন্যথা ঘটে নি। তাঁর প্রথম বই প্রকাশিত হয় ১৩৪৫ সালের শ্রাবণ মাসে 'ছোট ঠাকুর্দার কাশীযাত্রা' নামে। 'শিশুসাথী'র প্রকাশক বৃন্দাবন ধর এন্ড সন্স থেকে উদ্যোগ নিয়েই মাসিক ও বার্ষিক পত্রিকা গল্প থেকে বাছাই করে এই গল্প সংকলনটি প্রকাশিত হয়। এভাবেই গল্প লেখার মাধ্যমে সাহিত্য জগতে তাঁর আবির্ভাব ঘটে থাকে।

১৩৪৩ সালে শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায় 'পত্নী ও প্রেয়সী' নামে প্রথম বড়দের জন্য লেখেন ছোটগল্প। পত্রিকা সম্পাদক মন্মথ সান্যালের অনুরোধে আনন্দবাজারের সদ্য প্রকাশিত বিভাগ 'রবিবাসরীয়'র জন্য পুনরায় গল্প লেখেন। এভাবেই শুরু হয়ে যায় বড়দের জন্য গল্প লেখা। দু'বছর ধরে লিখে চলা গল্পগুলো সংগ্রহ করে 'দাশগুপ্ত অ্যাণ্ড কোং' আর একটি গল্প সংকলন প্রকাশ করলেন 'জল আর আগুন' নামে। ছোটদের জন্য রচনাকে যদি কেউ ধর্তব্যের মধ্যে আনতে না চান তবে বলা চলে এই বইটিই তাঁর প্রথম বড়দের জন্য প্রকাশিত বই।

১৩৪৩ সাল থেকে গল্প লেখার পালা চলতে থাকে, তা উপন্যাসে গিয়ে রূপ পায় ১৩৫১ সালে। আশাপূর্ণা দেবীর প্রথম উপন্যাস হল 'প্রেম ও প্রয়োজন' যা প্রকাশিত হয় 'কমলা পাবলিশিং' থেকে ১৩৫১ সালে। এরপর থেকে বেশ কিছু উপন্যাস লিখলেও তা আয়তনে ছোটই রয়ে যায় বলে তিনি মনে করেন।

এভাবে আশাপূর্ণা দেবী ছোটগল্প ও উপন্যাসের জগতে স্বচ্ছন্দ পদচারণা শুরু করেন। তাঁর প্রথম দিকের রচনাগুলোতে পরিপক্কতার ছাপ সুস্পষ্ট না হলেও ক্রমশঃ তিনি অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। উপন্যাসের মত বড় ক্যানভাসকে গ্রহণ করে সেখানে জীবনের আলেখ্য অঙ্কনে সচেষ্ট হলেন। একে একে লিখলেন — 'মিত্তির বাড়ি', 'বলয় গ্রাস', 'অগ্নিপরীক্ষা', 'শশীবাবুর সংসার', 'অতিক্রান্ত' প্রভৃতির মতো উপন্যাস।

আশাপূর্ণা দেবীকে যা আবাল্য যন্ত্রণায় দগ্ধ করেছে তা হচ্ছে নারী পুরুষের বৈষম্য এবং নারীর অধিকারহীনতা। এই প্রশ্নকে, যন্ত্রণাকে তিনি সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার জন্য আরো বড় ক্যানভাসকে গ্রহণ করেন যা 'ট্রিলজি' বা 'ত্রয়ী' উপন্যাসের মধ্যে প্রকাশিত হয়। ১৯৬৪ সালে তেতাল্লিশতম উপন্যাস 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' তে ঘটে তাঁর সেই ইচ্ছার প্রথম প্রকাশ। ছাপ্পান্নতম উপন্যাস 'সুবর্ণলতা' ও পঁচানব্বইতম উপন্যাস 'বকুলকথা' তে ঘটে তার পরিণতি।

প্রায় দুইশত উপন্যাস তিনি লিখেছেন আর ছোটগল্প লিখেছেন দেড় সহস্রের মত। তিনি বলেছেন 'ছোটগল্পই আমার প্রথম প্রেম'। লিখে চলার মধ্যে যে ভাবটা তাঁর মনে সর্বদাই জেগে ওঠে তা হচ্ছে নিত্য নতুন কথার ঢেউ। যা নাকি সর্বদা বলে ওঠা হয় না। তৈরি হয় অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূক্ষ্ম অনুভূতি, যাকে উপন্যাসের মধ্যে সর্বদা ঠাঁই দেওয়া যায় না। লিখতে লিখতে তিনি অভ্যস্ত হয়ে গেলেও এই ক্ষুদ্র অনুভূতিগুলোকে সজীব করে তুলতেন ছোটগল্পের মধ্যে। অর্থাৎ জীবনকে যেমন বড় ক্যানভাসের মধ্যে রেখে তার সামগ্রিক রূপকে তুলে ধরা যায়, আবার জীবন যে অনেক নিজস্ব ছোটখাটো সুখ-দুঃখ-প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসা-ঈর্ষার দোলায় দোলে তার আলেখ্য অঙ্কনে ছোটগল্পের মতো ছোট ক্যানভাসেরও প্রয়োজন হয়।

১৩৪৩ সাল থেকে আজীবন ছোটগল্প রচনার মধ্যে তাঁর যে বিষয় বৈচিত্র ও পর্যবেক্ষণের

গভীরতা দেখা যায়, তা আমাদের মধ্যে বিস্ময়ের উদ্রেক করে। একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, শুধুমাত্র বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে নয়, শিল্প-সামর্থ্যের বাহাদুরিতেও তিনি ক্রমশঃ পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে চলেছিলেন। আশাপূর্ণা দেবীর রচিত গল্পগুলো বিশ্লেষণের ফলে দেখা যায় যে সেখানে নানাদিক রয়েছে। যদিও প্রতিবাদের ঝোঁকটাই সেখানে বেশি পরিলক্ষিত হয়। এছাড়াও রয়েছে — শিশুবিষয়ক রচনা, দাম্পত্য জীবনের নানা দিক, হাস্যরসের গল্প, ব্যঙ্গ রসাত্মক গল্প এবং প্রেমের গল্প।

রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে যেমন ছোটগল্প সার্থক রূপ পায় তেমনি প্রতিবাদী চেতনার গল্পও তাঁর লেখায় প্রথম প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে আশাপূর্ণা দেবীর রচনাতেও প্রতিবাদ মূর্ত হয়ে ওঠে। সত্য উন্মোচনে নির্মম ছিলেন বলেই হয়ত প্রতিবাদের আলোয় তাঁর চরিত্ররা ঝলসে উঠেছে। তাঁর ভিতরকার আপসহীন বিদ্রোহই ক্রমাগত তাঁকে উজ্জ্বল পরিণতির দিকে অগ্রসর হতে সাহায্য করেছিল। তাঁর অন্তরস্থিত যে তৃষ্ণা, তা হচ্ছে নারীমুক্তির তৃষ্ণা, এর ফলেই জন্ম নেয় চিরন্তনী সব নারীরা। যেমন 'সর্পশিশু'র ফেলী, 'ছিন্নমস্তা'র জয়াবতী, 'অঙ্গার'-এর নতুন বৌ, 'নিরুপমা'র নিরুপমা, 'অবিনশ্বর' গল্পে পদ্মা, 'তাসের ঘর' গল্পে মমতার মতো চরিত্র। আবার 'অভিনেত্রী' গল্পে অনুপমার মত চরিত্র সৃষ্টি করে দ্বিধাহীনভাবে সরবে বলেছেন — "নারীমাত্রেই কি অভিনেত্রী নয়?"

হাস্যরসাত্মক গল্পও তিনি যথেষ্ট নিপুণতার সঙ্গে রচনা করেছেন। যেমন — সিঁধকাঠি, নব কথামালা, বিস্ফোরণ, পূর্বরাগে রসনার স্থান, হাসির গল্প প্রভৃতি। গল্পগুলো হাস্যরসের সূক্ষ্ম কারুকার্য দ্বারা খচিত এবং মজার আবরণে আবৃত। আশাপূর্ণা দেবী হাস্যরসের গল্পেও এভাবে স্বকীয়তা নিয়ে আসেন। যেমন, 'হাসির গল্প' তে হাসির গল্প লেখার অছিলায় মধ্যবিত্ত সংসারের চালচিত্রটাকে হালকা চালে দেখিয়েছেন। কেমনভাবে লঘু চাপল্যের ভিতর দিয়েই সত্যরূপটা বিকশিত হয়ে ওঠে তাই তিনি তুলে ধরেছেন। **ব্যঙ্গধর্মী রচনাও** আশাপূর্ণা দেবীর রচনার একটি বিশেষ ধারা। কাহিনির উপরিতলে মনে হচ্ছে কোন চরিত্রের প্রতি মমতা প্রদর্শন করা হচ্ছে কিন্তু তা যেন কোথাও গিয়ে মর্মে আঘাত করছে বলেও মনে হয়। যেমন 'স্বজাতি' গল্পে শিবানীকে বৈধব্যের সাজে সজ্জিত করে তোলার মধ্য দিয়ে মমতার প্রস্রবণ বয়ে যাবার কোন সম্ভাবনা নেই, বরং অসহায় স্বামী পরিত্যক্তা একটি মেয়ের কাছ থেকে তার ন্যূনতম চাহিদাটুকুও কেড়ে নেবার যে আনন্দ — তাকেই ব্যঙ্গের মধ্য দিয়ে প্রস্ফুটিত করে তুলেছেন। 'লালাশাড়ী' তে বিবাহিতা স্ত্রীর মৃত্যুর চেয়ে নিষ্ঠুর, অপদার্থ স্বামীর একখানি লাল চেলির জন্য শোক অকূল প্লাবী হয়ে ওঠার মধ্য দিয়ে নারীদের মূল্যটা যে কত হীন পর্যায়ে চলে গিয়েছে তাই উপলব্ধি করাতে চেয়েছেন। 'সভ্যতার সংকট', 'কঙ্কণ', 'স্বপ্নভঙ্গ', 'জনসমুদ্র' প্রভৃতি গল্পে ব্যঙ্গধর্মীতার আরো নিদর্শন পাওয়া যায়। কি হতে পারত তা নয়, ব্যঙ্গের মধ্য দিয়েও সমাজে কি ঘটছে সেই চালচিত্রটাকেই তুলে ধরেছেন। তাই তাঁর গল্পের চরিত্রদের ভেতর থেকে মর্মোদ্‌ঘাটন নয়, বাইরে থেকে তীব্র কশাঘাত করে আক্রমণ চালিয়েছেন। ব্যঙ্গাত্মক লেখিকা

রূপেও সেখানে তিনি সার্থক হয়েছেন।

আশাপূর্ণা দেবীর গল্পে নেই অতিপ্রাকৃতের কোন স্পর্শ, নেই প্রকৃতির পদচারণা ও ধর্মীয় অনুশাসনের কোন ছুৎমার্গ। কিন্তু আমাদের সমাজে প্রচলিত হিন্দু ধর্মের মধ্যে যে অপশাসনের একটা হতশ্রী দিক রয়েছে, যার মধ্যে বৈষম্যমূলক আচরণটাই বেশি দেখা যায়, তিনি তাকেই প্রকাশ করেছেন।

আশাপূর্ণা দেবীর গল্পগুলোর বিভিন্ন ধারা থাকলেও আলোচনার মূলপর্বে রয়েছে গল্পের মধ্যে অন্তর্নিহিত অবস্থায় যে জীবন দেখা যায়, তারই বিশ্লেষণ। আমাদের চোখের সামনে প্রতিনিয়ত ঘটে চলা ঘটনার মাধ্যমে নারীদের প্রতি মানুষের মনোভাব এবং নারীদের নিজেদের কোন দিকটি সমস্যা কন্টকিত সেদিকেই তিনি আলোকপাত করেছেন। আশাপূর্ণা দেবী তাঁর গল্পরাজির মধ্যে কোন্ জীবনদৃষ্টিতে নারীদের দেখছেন, সেই বিষয়টাই আলোচনার মূল বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। আশাপূর্ণা দেবী কখনো বাংলাভাষা ছাড়া অন্যভাষায় কোন রচনা করেননি। এ সম্পর্কে নাট্যাভিনেতা জগন্নাথ বসুর একটি বিবৃতিতে পাওয়া যায় — জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পাবার পর আকাশবাণীতে তাঁর একটি সাক্ষাৎকার ছিল। ফেরার পথে রেডিও অধিকর্তা কয়সার কলন্দর সাহেবের একান্ত ইচ্ছাকে ফলপ্রসূ করতে আশাপূর্ণা দেবী তাঁর বাড়িতে যান। কিন্তু কয়সার সাহেবের হিন্দি প্রশ্নের উত্তর তিনি বাংলাতেই দিয়েছিলেন এবং এতদিন বাংলায় কাজ করেও বাংলাভাষা রপ্ত করতে না পারাটা যে অশোভন সেটা কয়সার কলন্দরকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

আশাপূর্ণা দেবীর প্রথম দিকের গল্পগুলোতে জীবন ভাবনার গভীরতা অল্প হলেও পরবর্তী রচনায় অতলান্তিক গভীরতা, প্রখর সংবেদনশীলতা, ও পরিপূর্ণতার ছাপ রয়েছে। তাঁর লেখনীর তীক্ষ্ম ক্ষুরধার অন্তর্বিশ্লেষণেই ক্রমপরিণতির দিকটি পরিলক্ষিত হয়। চোখের সামনে ঘটে যাওয়া ঘটনাই তাঁর রচনার বিষয় হওয়াতে তা কখনো বড় ক্যানভাস অর্থাৎ উপন্যাসের অন্তর্গত হয়েছে আবার কখনো তার খণ্ডচিত্র ছোটগল্পেরও বিষয় হয়ে উঠেছে। যেহেতু সংসার জীবনের বাইরে তিনি যাননি তাই অনেক সময় আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়েছে গল্পের বিষয়বস্তু এক কিন্তু আসলে কোথাও এর মূলসুরে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। গল্পের কালানুক্রম অনুযায়ী সবসময় আবার পরিণতির ক্রম নির্ধারণ করা বোধহয় ঠিক হবে না। কারণ, অনেক সময় দেখা যায় সাহিত্য রচনার মধ্যগগনে যখন বিরাজ করছেন তখন যে ধরনের গল্প লিখছেন তার চেয়ে আরো পূর্ববর্তীকালের রচনাটির উৎকর্ষতার গাম্ভীর্য অনেক বেশি। যেমন ১৩৫২ সালে রচিত 'না' গল্প আর ১৩৬৯-৭১ এর মধ্যে একসময় লেখা 'নারী প্রকৃতি' গল্পের মধ্যে জীবন ভাবনার গভীরতা 'না' গল্পেই বেশি পরিলক্ষিত হয়। তাই মূল আলোচনাতে এই কালানুক্রমের ধারা সর্বদা বজায় রাখা সম্ভব হয়নি। কিন্তু জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপারে যে স্বতন্ত্রতা তা তুলে ধরার প্রয়াস রয়েছে পরবর্তী অধ্যায়ে। গল্পগুলির বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের মাধ্যমে লেখিকার জীবনদৃষ্টির বিশেষ রূপকে অন্বেষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

আশাপূর্ণা দেবীর ছোটগল্পে জীবনদৃষ্টি

তৃতীয় অধ্যায়
আশাপূর্ণা দেবীর ছোটগল্পে জীবনদৃষ্টি

আশাপূর্ণা দেবী আজীবন যা রচনা করে গেছেন তা আমাদের বৈচিত্র্যপূর্ণ অভিজ্ঞতার জগত থেকে তুলে আনা দুর্লভময় কিছু অনুভূতি, যাকে অন্তরের দরদ দিয়ে উপলব্ধি করেছেন এবং সত্যের নিরিখে বিশ্লেষণ করে ছোটগল্পের আকারে আমাদের সামনে প্রস্ফুটিত করেছেন। তিনি অন্দরমহলের আটপৌরে জীবন থেকে গল্পের উপাদান সংগ্রহ করেছেন, এর জন্য তাঁকে কখনো বিদেশী সাহিত্যের প্রাঙ্গণ প্রান্তে যেতে হয়নি। অত্যাধুনিকতার প্রাবল্যও তাঁকে কখনো ভাবিত করেনি। অথচ তিনি সমস্ত পাঠককুলের অন্তরকে নাড়া দিয়ে গেছেন সুন্দরভাবে, কারণ তাঁর রচনায় আছে বিস্ময়ের স্পর্শ, আর পরিচিত জীবনের আন্তরিকতার ছবি।

আশাপূর্ণা দেবী তাঁর সাহিত্যে তুলে ধরেছেন বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নারী স্বাধীনতার চিত্রটিকে। কিভাবে নারীজাতি ধীরে ধীরে অর্গল ভেঙে বাইরের জগতে বেরিয়ে এল, একান্নবর্তী সংসারগুলো কিভাবে ভেঙে ছোট ছোট Unitary সংসারে পরিণত হল — তার চিত্র অঙ্কন করেছেন। নারী স্বাধীনতা তাঁর লেখনীতে নতুন মাত্রা পেয়েছে ভেবে অনেকে তাঁকেই নারী আন্দোলনের পুরোধা বলে ভাবেন। নারী স্বাধীনতা সম্পর্কে তাঁর ধারণা কিন্তু ছিল একটু আলাদারকম। স্বাধীনতা মানে কোন স্বেচ্ছাচার বা উচ্ছৃঙ্খলতা নয়, গার্হস্থ্যধর্ম, সংসারধর্ম, সন্তান প্রতিপালন — এগুলোকে তিনি নারীর অন্যতম কর্তব্য বলেই মনে করতেন। তার সঙ্গে যা চাইতেন তা হল — পুরুষের সঙ্গে নারীর মনুষ্যত্বের সমান অধিকার। ছোটবেলা থেকেই যে বোধটা আশাপূর্ণা দেবীকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে, সেটাই তাকে আজীবন লেখার অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে — নারীরা সমাজে অপাংক্তেয়, পুরুষেরাই সর্বস্বধন। জ্ঞানের সমস্ত রকমের আলোকিত পথ থেকে মেয়েদের দূরে সরিয়ে রাখা হোত, এমনকি তিনি নিজেও ছিলেন সেই বঞ্চনারই একজন শিকার। তাই হয়তো তিনি মনপ্রাণ দিয়ে নারীদের সেই অব্যক্ত যন্ত্রণাকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারতেন। আর এই বোধকে ভিত্তি করেই তাঁর গল্পে নারীরাই বারংবার নানা রূপে নানা সাজে ফিরে ফিরে এসেছে এবং তাদের অধিকাংশই ছিল নারীত্বের কোমলতায় ঘেরা কল্যাণী মূর্তি, অথচ প্রয়োজনে প্রতিবাদী, ব্যক্তিত্বময়ী এক একজন পূর্ণ মানবী। কিন্তু নারী ও পুরুষের পার্থক্যকে তিনি অস্বীকার করতে চাননি, কারণ নারী একাধারে স্ত্রী ও জননী। নারীর স্বভাবসিদ্ধ কোমলতা ও নারীত্ববোধ যদি বজায় না থাকে তবে সংসারের কেন্দ্রবিন্দু

সুস্থিরভাবে স্থিত হয় না। নারীই জননী হয়ে সন্তানকে পৃথিবীর আলো দেখায়, আর সেটা কখনোই নারীর পক্ষে পুরুষের সমান মর্যাদা পাবার পথে অন্তরায় হয়ে দেখা দিতে পারে না।

যে সমস্ত ক্ষেত্রে সুদীর্ঘকাল ধরে নারীকে অন্ধকার জগতে ফেলে রাখা হয়েছে, সে সব ক্ষেত্রেই আশাপূর্ণা দেবীর লেখনী সরব হয়ে উঠেছে। যে নারীকে ছাড়া জীবনচক্র আবর্তিত হওয়া এবং পূর্ণতা পাওয়া অসম্ভব, সেই নারীকেই অভিভাবক স্বামী এবং পরবর্তীকালে পুত্র তাদের জায়া ও জননীকে শুধুমাত্র নারী বলেই দূরে সরিয়ে রাখত। এই অবিচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সরব হওয়াই ছিল তাঁর লক্ষ্য। সমাজ সংসারের নানা ঘাত প্রতিঘাতে ধীরে ধীরে নারীরা নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে শুরু করল। আর তা থেকেই জন্ম নিল বিদ্রোহ ও প্রতিবাদ। নারীদের এই যে প্রতিবাদী হয়ে ওঠা, অন্যায়কে অন্যায় বলে চিহ্নিত করার যে প্রয়াস — তাই মূর্ত হয়ে ওঠে আশাপূর্ণা দেবীর রচনায়। আর তাই এই লেখিকার গল্প বিশ্লেষণে দেখা যায়, প্রায় সমস্ত গল্পই সামাজিক পটভূমিকায় লেখা। আমাদের এই সমাজের কথা অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন তাঁর রচনায়। আমাদের দৃশ্যমান জগতের অন্তরালে প্রায় প্রতিটি সংসারের অন্দরমহলের অলিন্দে অলিন্দে যে চিত্র ফুটে ওঠে, সেই অজানা-অদেখা কথাগুলোকেই সহৃদয়তার সঙ্গে গল্পরূপ দিয়ে পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপন করাই ছিল আশাপূর্ণা দেবীর প্রতিপাদ্য বিষয়।

তৎকালীন সময়ে নারীরা তেমনভাবে সমাজ সভ্যতার শরিক ছিলেন না, কিন্তু সংসারের অন্তঃপুরের দখল থাকত তাদেরই হাতে। অবলা এই নারীদের দ্বারাই সংসারের একট বিশেষ দিক নিয়ন্ত্রিত হোত। আবার তাদেরই কার্যকলাপে ঘটে যেত সংসারের নানা উত্থান-পতন। এই কার্যক্রমগুলো নিয়ন্ত্রিত নারীদের মনের চেতন-অচেতন স্তরের নানা অনুভূতির প্রভাবে। প্রায় প্রতিটি গল্পেরই অলক্ষে কাজ করে যাওয়া সত্য উন্মোচিত হয়েছে। আশাপূর্ণা দেবীর রচনায় পুরুষ চরিত্রের ভূমিকা বর্ণিত হয়েছে অত্যন্ত কম, বেশীরভাগটাই নারীদের কথাই বলা হয়েছে। আমাদের চির-পরিচিত জগতে চোখের সামনে অহরহ যা ঘটে চলেছে সেগুলোকেই তিনি তাঁর রচনায় তুলে ধরেছেন। আশাপূর্ণা দেবীর পূর্বে কোন লেখিকা অন্দরমহলের অন্তঃপুরিকায় অবস্থানকারী অবহেলিত নারীদের মনকে এভাবে ব্যবচ্ছেদ করেছেন বলে মনে হয় না। এই সমস্ত অন্তঃপুরিকাদের নানা ভাবনা, অনুভব ও অন্তঃস্থলের নানা কথা নিয়েই আশাপূর্ণা দেবীর ছোটগল্পে 'জীবনদৃষ্টি' অধ্যায়টি রচনা করবার প্রয়াস রইল।

আশাপূর্ণা দেবী চমকহীন, উত্তেজনা বর্জিত, সাধারণ মানুষের গল্প বলেই কথাসাহিত্যের প্রথম সারিতে পৌঁছে গেছেন। 'পত্নী ও প্রেয়সী' (১৩৪৩) তাঁর রচিত প্রথম ছোটগল্প। তখন থেকেই ধীরে ধীরে লেখা শুরু হয়, কিন্তু প্রথম দিকের গল্প সংখ্যা খুব একটা বেশী নয়। তবে তাঁর রচনায় প্রায় প্রথম দিক থেকেই একটা পরিণত সাহিত্যিকের সন্ধান পাওয়া যায়। ১৩৪৪ থেকে তিনি নিয়মিতভাবে

ছোটগল্প লেখার দিকে এগোতে থাকেন। ধীরে ধীরে লিখলেন — 'রাধার কি হইল অন্তরে ব্যথা', 'রাজুর মা', 'পূর্বরাগে রসনার স্থান', 'ক্ষণ গোধূলি', 'মেকী টাকা', 'বিস্ফোরণ', 'বিচিত্র', 'অঘটন', 'শিশু', 'জ্বালাতন', 'সমাধান', 'জল আর আগুন', 'ধাঁধার উত্তর', 'পূণ্যভূমি', 'তাসের ঘর', 'ব্যবধান', 'বিচারক', 'ফল্গুধারা', 'বেশ ছিলাম', 'ভাঙ্গন', 'অমর' প্রভৃতি। এভাবেই তিনি সহস্রাধিক গল্পের মধ্য দিয়ে আমৃত্যু সাহিত্যের আঙিনায় বলিষ্ঠ দৃপ্ত পদচারণা করে গেছেন। উন্মোচিত করে গেছেন স্বকীয় মানসিক দৃষ্টিভঙ্গীকে। আমরা এবার ছোটগল্পের মাধ্যমে জীবন সম্পর্কে কি বোধ এবং দৃষ্টিভঙ্গী আশাপূর্ণা দেবী তুলে ধরতে চেয়েছেন তার পরিচয় নেব গল্পগুলির ঘটনা ও চরিত্র বিশ্লেষণের মাধ্যমে।

সংসারের নানা জট-জটিলতা, ঘাত-প্রতিঘাত, সুবিধা-অসুবিধা সমস্ত কিছুর মধ্যে থেকে নারীরা কিভাবে নিজের অস্তিত্বকে, মর্যাদাকে উপলব্ধি করতে পেরেছে এবং জাগরণ ঘটাতে পেরেছে ব্যক্তিত্ববোধের এ বিষয়টাই তাঁর রচনায় মুখ্য হয়ে উঠেছে। আশাপূর্ণা দেবীর রচিত 'আত্মহত্যা' (১৩৫৪/১৯৪৮) গল্পে দেখা যায় সমাজের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ। সমাজের যে অন্যায়-অবিচার, তার বিরুদ্ধে তীব্র তীক্ষ্ম ব্যঙ্গের কশাঘাত হেনেছেন। নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজের নানারকম দুর্বলতা, আত্ম প্রবঞ্চনা ও মানবিকতাবোধের অবমাননার বিরুদ্ধে লেখিকার কলম সর্বদাই প্রতিবাদী। আর সেই প্রতিবাদে বেশিরভাগ ভূমিকা নারীর; 'আত্মহত্যা' গল্পেও দেখি নারীরই সোচ্চার প্রতিবাদ। 'বিছানাটা ময়লা, বালিশটা তেলচিটে, তোশক থেকে বিশ্রী একটা ভ্যাপসা গন্ধ উঠছে। সারা বর্ষা রোদে পড়েছে কিনা সন্দেহ।" — *(পৃ. ৩৮৬ আশাপূর্ণা দেবীর গল্প সমগ্র - ২য় খণ্ড)*। এই রকম গৃহগত পরিবেশে গল্পের পটভূমিকা। মুখরা জয়ন্তী পিতৃহীন; দাদা ভাই বোন আর বিধবা মাকে নিয়ে সংসার। বাতে অসুস্থ মায়ের সংসারে দাসীবৃত্তি করা যার একমাত্র কাজ। আর কাজের শেষে একটা মাত্র ঘরে সকলে মিলে রাত্রিযাপন। যে বয়সে স্বামী পুত্র নিয়ে রঙীন জগতে বাস করার কথা, সে বয়সে অসুস্থ রুগ্ন দরিদ্র-ক্লিষ্ট পরিবারের সদস্য হয়ে শুধুই একঘেয়ে কর্মক্লান্ত দিন অতিবাহিত করে জয়ন্তী এত মুখরা হয়ে উঠেছে। রাতে পাখার বাতাসকে কেন্দ্র করে যে তর্ক ঘনীভূত হয় তার ফলে, ও সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণায় নিজের বেঁচে থাকবার প্রতি একঘেয়েমিতে ক্লান্ত ও হতাশ জয়ন্তী আত্মঘাতী হয়। মোহন যখন ঘৃণায় মায়ের মুখে শুনতে পায় — "বাছা আমার মনের ঘেন্নায় আত্মঘাতী হল রে মোহন!" *(পৃ. ৩৯১, ঐ)* — সমাজের নোংরা, আবর্জনা ও জঞ্জালের পাশে বাস করে অভ্যস্ত জয়ন্তীরও যে আত্মসম্মানবোধ এতটা প্রবল থাকতে পারে তা যেন সকলকে অবাক করে দেয়। যে জয়ন্তীকে ঊষসীর মতো মেয়েদের সামনে বের করাই চলে না, যে মেয়ে জ্ঞানহীন, অশিক্ষিত, মুখরা — তার আত্মধিক্কার এতটাই কি প্রবল হতে পারে, যা নাকি আত্মহত্যায় পর্যবসিত হয়েছে? এই গল্পে বিদ্রোহ প্রকাশে কোন মেয়েলিয়ানা নেই, নেই কোন মেয়েলি ন্যাকামো, আছে

প্রতিবাদের বলিষ্ঠ প্রকাশ। এই প্রতিবাদ সমাজের বুকে আবর্জনার মতো বেঁচে থাকার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

আবার মোহনের কথায় একথাও শোনা যায় — "অশিক্ষিত অসভ্য বলেই বোধকরি ওর আবেগের বাহ্যিক প্রকাশ এত প্রচণ্ড।" — মনের ঘেন্নাকে পরিপাক করে বিশুদ্ধরূপে সভ্যরূপে প্রকাশ করতে পারলেই শিক্ষার সভ্যতার সুষ্ঠু নিদর্শন মেলে, কিন্তু জয়ন্তীর কাছ থেকে তো তা আশা করা বৃথা। তাই জয়ন্তীর এই প্রতিবাদ এত স্পষ্টরূপে ধরা পড়েছে এ গল্পে।

এই ধরনেরই অপর একটি গল্প হল **'তোমার মুখে আয়নায় ছায়া'**। এখানেও ভাই-বোনের বচসা এবং কলহের উৎপত্তিস্থল হল দারিদ্র্য-পীড়িত সংসার জীবন। দাদা তপন ও বোন ঝুন্টি এবং তাদের বাবা-মা, পঙ্গু হয়ে দুজনেই বিছানায় শয্যাশায়ী অবস্থায়। সমস্ত সংসারের কাজকর্মের দায়িত্ব ঝুন্টি একাই নিজে হাতে সামলায়। অসুস্থ মা-বাবার সেবা-শুশ্রূষা করে করে মুখরা ঝুন্টি সম্পূর্ণভাবে রূপ-রসের জগৎ থেকে নির্বাসিতা। দাদার ভাবী স্ত্রী ও তাঁর দাদার সঙ্গে বেড়াতে বের হওয়ায় প্রচণ্ড আক্রোশে তাকে বলে উঠতে শোনা যায় — "ভগবানের কাছে প্রার্থনা করব, ফিরে এসে যেন মা-বাপের মরামুখ দেখিস।" *(পৃ. ৮ নক্ষত্রের আকাশ / আশাপূর্ণা দেবী)* — কিন্তু আগের গল্পের চাইতে এখানের প্রতিবাদ একটু অন্যরকম। এখানে দাদার একটু ভালোলাগাটা সহ্য করতে না পেরে প্রতিবাদ করেছে যতটা, তার চেয়ে বেশী প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে বাবা মার বিরুদ্ধে। ছেলে ঘুরতে যাওয়ায় তাকে চক্ষুলজ্জাহীন নির্মম বলে যখন অভিযোগ করছে, তখনই মেয়ে ঝুন্টি ভয়ানক বাক্যবাণটি নিক্ষেপ করে বাবা-মায়ের দিকে — "স্বার্থপর, চক্ষুলজ্জাহীন? ও ছাড়া আর কি হবে মা? আমড়া গাছে কি ল্যাংড়া ফলবে?" *(পৃ. ১০ — ঐ)*। তার সমস্ত অভিযোগের তীর বাবা-মায়ের ভাবনাকে বিদ্ধ করে। নিজেরা অসুস্থ হয়ে আছে বলে সর্বক্ষণ চাইছে ছেলে মেয়ে দুটোও যেন ওদের ঘিরেই থাকে। কিন্তু ঝুন্টির অভিযোগ হল — তাদেরও জীবনে সাধ-আহ্লাদ আছে, কেন সর্বদা রুগীর সঙ্গে রুগী হয়েই থাকতে হবে? দাদার প্রতি তার রাগ থাকলেও বাবা মার চাওয়াটাকেই তার বেশী স্বার্থপর বলে মনে হচ্ছে। "তোমাদের একবারও মনে হয় না, আহা, ছেলেটা কেন আমাদের দশায় ভুগবে।" —

এই গল্প দুটোতে লেখিকা দেখাতে চেয়েছেন, যে বয়সে মেয়েরা নম্র, বিনয়ী, স্নেহপরিবৃতা হয়ে সংসারে বিরাজ করবে, সে বয়সে পরিবেশ তাদের কতটা উগ্র রুক্ষ করে দিচ্ছে। কোমলতা অন্তর্হিত হয়ে প্রকট হয়ে উঠছে হিংস্র আক্রোশে পরিপূর্ণ চাহনি। এই মেয়ে দুটো কোমল চিত্তবৃত্তির আদর্শ নমুনা হয়ে উঠতে পারেনি। দারিদ্র্য, অসহায়তা, দুর্বল অভিভাবকত্ব, রূপহীনতা এবং উপযুক্ত সময়ে নারীর কোমল রস সিঞ্চনের অভাব ঘটেছে তাদের মধ্যে। জীবনে শখ, সাধ, আহ্লাদ মেটাবার মত তারা কিছু পায়নি, পেয়েছে শুধু কঠোর বাস্তবের রুক্ষতা, তাই চাইলেও তারা নিজেদের ঠিক রাখতে

পারতো না, ভেতর থেকে প্রতিবাদ আর কর্কশভাব যেন ঠেলে বেরিয়ে এসে আগুনের মত ছড়িয়ে দিত।

'সর্পশিশু' (১৩৫৪) গল্পেও আশাপূর্ণা দেবী সমাজেরই অন্যায় অবিচারের কথা উল্লেখ করেছেন। জন্ম-পরিচয়হীন একটি কন্যা একজন পাগলের সাহায্যে আর অবস্থাপন্ন একটি বাড়ির গিন্নীর সহায়তায় বেড়ে ওঠে। 'ফেলী' নামে সে পরিচিত হয় সকলের কাছে। জন্মলগ্নে যে মাতৃপরিত্যক্ত, সমস্ত সংসারের কাজের ভার যে দিনকে দিন তার উপরই এসে বর্তাবে তাতে আর বিচিত্র কি? বিরিঞ্চি পাগল মারা যাবার পর একমুঠো ভাতের জন্য এ বাড়ি, ও বাড়ি করে শেষে ঠাঁই মেলে বামুনগিন্নীর বাড়িতে; তাও আবার বামুনগিন্নীর পুত্রবধূ নীহারের জন্য। পড়াশোনার শখ ফেলীর রয়েছে, কিন্তু নীহার সে সুযোগ ইচ্ছা থাকলেও করে দিতে পারেন নি। নীহারের কন্যা লীলার বিয়ের দিনে ঘটল সেই চূড়ান্ত ঘটনা। লাল পাড় কোরা একখানা নতুন শাড়ী পেয়ে খুশী ফেলী সমস্ত বিয়ে বাড়ির এঁটোপাত পরিষ্কার করে রাত দুপুরে একটু বাসর ঘরের শতরঞ্চ ছুঁয়ে দাঁড়িয়েছিল। আর তাতেই রে-রে করে উঠল সবাই। সবার ছিছিকারে ক্ষুব্ধ ফেলী সে রাত্রেই সে বাড়ি থেকে চলে যায়। পরদিন দেখা যায় লীলার একজোড়া কানপাশা ও রূপালী জরিদার ঢাকাই শাড়ীখানা বেমালুম হাওয়া।

আমাদের সমাজ ব্যবস্থা একটি অসহায় মেয়েকে সুস্থভাবে বাঁচতে দিতে নারাজ। অফুরন্ত কাজের বিনিময়ে সে পায় ভালোবাসাহীন ও স্নেহহীন দুমুঠো নিম্নমানের খাবার। অথচ সামান্য একটু স্নেহ, সামান্য একটু করুণা, ও একটু সুযোগ সুবিধা পেলে হয়তো এরা মনিবের জন্য প্রাণও প্রয়োজনে দিতে পারতো। এই তীব্র বঞ্চনা থেকেই ফেলীর মতো মেয়েরা সর্পিনীর মতো ক্রুর হয়ে ওঠে। তাই লেখিকা বলেছেন — "জন্মলগ্নের নিষ্ঠুরতার শোধ লইতে — একদিন হয়তো সর্পিনীর মতই ক্রুর হইয়া উঠিবে ফেলী ... বিষের থলি পুঁজি করিয়া — গৃহস্থের আনাচে কানাচে ঘুরিয়া নীতি আর ধর্ম, সমাজ আর শৃঙ্খলার গায়ে ছোবল হানিয়া বেড়াইবে।" — *(পৃ. ৩৮৬, আশাপূর্ণা দেবীর গল্প সমগ্র, ২য় খণ্ড)*। দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার আমাদের সমাজে চিরকালই বিদ্যমান রয়েছে। কোমল, স্নেহশীলা, কল্যাণী নারীমূর্তিরাও সর্বদা তাদের ধর্ম রক্ষা করেন না। তাদের মতো নারীদের হাতে পড়েই সমাজে ফেলীদের জন্ম হয়। কঠোর নারীর সংস্পর্শেই আর একটি কঠোর ও কুৎসিত চিত্তের নারী জন্মায়। হয়ত স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠলে ফেলী লীলার চেয়েও ভালো একটি মেয়ে হয়ে উঠতে পারত। জীবনকে দেখার বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই লেখিকার কলমে ফুটে উঠেছে এরকমই এক চরিত্র।

সামাজিক ব্যবস্থা, সমাজের চরিত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আশাপূর্ণা দেবী আরো কিছু গল্পে নিপুণভাবে অনেক দৃঢ় প্রত্যয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। এর মধ্যে অন্যতম হল **'অনাচার'** গল্পটি (১৩৫৯)।

প্রতিবাদী চেতনার জগতে এটি একটি প্রথম শ্রেণির ছোটগল্প। আমাদের হিন্দু সমাজের সংস্কার, প্রথা, আচার, বিধির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন গল্পের মুখ্য চরিত্র সুভাষকাকীমা। ব্যক্তিস্বার্থকে উপেক্ষা করে বৃহত্তর মানবিকতাবোধের স্বার্থে হিন্দুয়ানীর সংকীর্ণতাকে জয় করেছেন। তার ভেতরে কাজ করেছে যে বোধটা, তা হল — "ভেবেছিলাম বাবা বুড়োমানুষ, জীবনভোর অনেক শোকতাপ তো পেয়েছেন, মরণকালে না হয় আর নাই পেলেন!" *(পৃ. ১৪৮, আশাপূর্ণা দেবীর বাছাই গল্প)*। সুভাষকাকীমা বহু কষ্টে বৃদ্ধ শ্বশুরকে নিয়ে সংসারযাত্রা নির্বাহ করে গেছেন। অসুস্থ শ্বশুরকে বোম্বে থেকে আসা একমাত্র জীবিত সন্তান সুভাষের মৃত্যু সংবাদটা জানাননি। মৃত্যুপথযাত্রী শ্বশুর যাতে আর নতুন করে কোন কষ্ট না পান তাই তিনি নিজেই বিধবা হয়েও সধবার আচরণ করেন ও বেশ-বাস পরিধান করেন। শ্বশুরের মৃত্যুর দিনই তিনি সুভাষ কাকার মৃত্যু সংবাদ জানান। আর এখানেই দেখা যায় আমাদের সমাজ কিভাবে তার স্বরূপ নিয়ে জীবন্ত হয়ে ওঠে।

যে সুভাষকাকীমার সমালোচনায় আজ সারা পাড়া, গাঁ মুখরিত, সেই মহিলাটিকে অসহায় অবস্থায় ফেলে, সঙ্গে অসুস্থ বৃদ্ধ বাবা — কিভাবে তিনি সংসার চালাবেন তা একবারও না ভেবে সুভাষকাকা দেশান্তরী হন। আর সমাজের মানুষেরাও এতদিন খোঁজ নিতে আসেনি, কি করে অসহায় স্ত্রীলোকটি শ্বশুরকে খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখলেন, সেবা যত্ন করলেন। এই অবস্থাতেই মরণাপন্ন শ্বশুরকে বাঁচাতে নিঃস্বার্থভাবে স্বামীর মৃত্যুসংবাদকে চেপে রেখে নীলকণ্ঠ হয়ে থাকলেন সুভাষকাকীমা।

এই নোংরা, জঘন্য গ্রাম্য সমাজের বিরুদ্ধে লেখিকা ভয়ানক ক্ষুব্ধ হয়েছেন — তীব্র ব্যঙ্গ ও শ্লেষের ভাষায় তা ব্যক্ত করেছেন তিনি — "একটা অসহায় মেয়েমানুষ যে নিজের জোরে দাঁড়িয়ে থাকবে, স্বামী অনাসক্ত হয়ে গেছে বুঝেও ভেঙ্গে পড়বে না, সব সময় হেসে কথা কইবে লোকের সঙ্গে, এটা সত্যই বড় দৃষ্টিকটু! কিন্তু সে তো তবু সহ্যের সীমানায় ছিল! আর আজ যা জানা গেল! এ যে সহ্যের অতীত!" — গ্রাম্য পরিবেশে সুভাষকাকীমার মতো একটা গৃহবধূ চরিত্রের এতো মানবিকতাবোধ, শ্বশুরের দুঃখ ঘোচাতে, তাকে একটু সুখী রাখতে এত বড় কষ্টদায়ক একটা তপস্যা চালিয়ে যাওয়া সত্যিই মহীয়ান। এ হচ্ছে আমাদের ঘুণধরা সমাজের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ জেহাদ। "দেখি না ভগবানের ওপর কলম চালিয়ে!" *(পৃ. ১৪৯, ঐ)* — এই কথার মধ্য দিয়ে বোঝা যায় সুভাষকাকীমার মনের জোর কতটা।

গ্রামের বৃদ্ধ সুরেন সরকার ও আরো অনেকে এই সুভাষকাকীমার সমালোচনাতে সরবঃ 'বুড়ো মানুষটার মনে দাগা লাগবে বলে তাই। শ্বশুরের জন্য প্রাণ ফেটে মরে যাচ্ছিলেন।...তুই পারলি কি করে তাই বল? ...মাছ খাওয়া, শাড়ী পরা ঘুচে যেত?" *(পৃঃ ১৪৬)* ধিক্ আমাদের সমাজকে। মানবিকতার স্বার্থে সুভাষকাকীমার এতবড় একটা সাহসী পদক্ষেপ শুধুই অপবাদ সংগ্রহ করল, সাধুবাদ তাকে দেবার কথা কেউ ভাবতেই পারে না। সুভাষকাকীমাকে দেওয়া এই অপবাদটাইতো ভয়ানক অনাচার।

একটা গ্রাম্য মহিলার চেতনায় জাগ্রত হয়েছে যে, ঈশ্বর-ধর্ম-সমাজ — সবকিছুর থেকে শ্রেষ্ঠস্থানে আছে মনুষ্যত্ববোধ। আর এই বোধের স্বার্থেই সুভাষকাকীমার তীব্র প্রতিবাদ; অথচ এটাই আমাদের সমাজের কাছে ভয়ঙ্কর এক অনাচার। কিন্তু সকলের কাছে এটাই হওয়া উচিত। অনাচারের বিরুদ্ধে মনুষ্যত্ববোধের দৃঢ় প্রতিবাদ।

'ইজ্জত' গল্পটিও প্রথম সারির প্রতিবাদী চেতনার গল্প। আমাদের নিত্যকার জীবন সুখের হয় যাদের সেবায়, সেই কাজের লোকেদের সমাজের ভদ্রলোকেরা ছোটলোক বলে ভেবে থাকি। অথচ তারাও যে মানুষ, পরিশ্রমের বিনিময়ে অর্থ রোজগার করে, ন্যূনতম সম্মানটুকু নিয়ে বাঁচতে চায়, তা যেন ভদ্র সমাজ (বাবুসমাজ) মানতে সহজে নারাজ। তাই এরা বিপদে পড়ে সাহায্য চাইতে এলে ভদ্রলোকেরা ছোটলোক ঝি-চাকরদের সহজে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে না। এই গল্পে তাদেরই বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে যায় বাসনমাজা ঝি বাসন্তীবালার মেয়ে জয়ী। অর্থাৎ এখানে দেখি সমাজের তথাকথিত ভদ্রলোকদের বিরুদ্ধে ছোটলোকদের প্রতিবাদ।

সুমিত্রার বাড়ির কাজের ঝি ছিল বাসন্তীবালা। বাসন্তীর মেয়ে জয়ী বড় হয়ে ওঠায় সুন্দরী মেয়েকে ছেড়ে দিনরাতের কাজ সে নিতে পারে না। তাই সুমিত্রাকে অনেক অনুনয় বিনয় করে জয়ীকে একটু আশ্রয় দেবার জন্য। স্বামী মহীতোষের অনুপস্থিতিতে সুমিত্রা রাজি হয় এবং নিজের পুরানো পোষাক-আশাকে জয়ীকে সাজিয়ে রাখার ছবিও মনে মনে অঙ্কন করতে থাকে। কিন্তু মহীতোষ এতে বাদ সাধে। এত বিপদে পড়া একটা যুবতী মেয়ের ইজ্জত রক্ষার জন্য সমাজের বাবুরা এগিয়ে আসে না। বাসন্তীর কাতর অনুনয় যখন ব্যর্থ হচ্ছে তা দেখে জয়ী প্রচণ্ড ক্ষোভের সঙ্গে বলে ওঠে — "থাক থাক মা, চলে আয়। আর বউদি বউদি করে কাঁদতে হবে না। ... বাবুদের কাছে ছোটলোকের মেয়েদের ইজ্জতের কোন দাম নেই।" *(পৃ. ৭, আশাপূর্ণা দেবীর বাছাই গল্প)* মহীতোষের প্রত্যাখ্যানের সঙ্গে সঙ্গেই শান্ত নীরব আশ্রয় প্রার্থিনীর কণ্ঠে ওঠে ঝংকার। খোলস খুলে যখন তার ব্যক্তিসত্তার প্রকাশ ঘটে — তখনই ওঠে তীব্র প্রতিবাদ, আর সেই প্রতিবাদই গল্পটিকে দেয় সামাজিক তাৎপর্য। মধ্যবিত্ত সমাজের শ্রেণিবোধ সম্পর্কে সচেতনতা এবং কলঙ্কের ও সম্পদহানির ভয়টাই দরিদ্র ছোটলোকদের মনে অধঃপাতে যাবার নির্ভীক সংকল্প ফুটিয়ে তোলে। তাই জয়ী উচ্চ কণ্ঠে বলে ওঠে — 'মন্দ হতে হয়, মন্দই হব।' *(পৃ. ঐ. ঐ)* এখানে ইজ্জত নষ্ট হয়েছে আসলে সুমিত্রার — ঘরে তার ষোলআনা আধিপত্য আছে ভাবলেও, তা যে আসলে নেই, ঝি বাসন্তীর কাছে তার চিত্র পরিষ্কার হয়ে যাওয়াতেই সুমিত্রার ইজ্জত যায়। কিন্তু প্রতিবাদের ক্ষেত্রে জয়ীর ভূমিকাই প্রধান।

'অঙ্গার' (১৩৫৩) গল্পটিতে নতুন বৌদি সমাজ প্রচলিত নীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে। এই গল্পে দেখা যাচ্ছে জমিদারদের ভগ্নদশা। গল্পের নায়ক চরিত্র তার নিজের

আবাসভূমিতে ফিরে আসে বাড়িঘর সারানোর জন্য। এসেই তিনি খোঁজ করেন এই বাড়ির হাস্যময়ী, কৌতুকময়ী নতুন বৌদির। বাড়ীর জরাজীর্ণ অবস্থা, আর্থিক অসচ্ছলতা যে পরিবারের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে একেবারে কেড়ে নিয়েছে এবং নতুন বৌদিকেও যে সে অবস্থায় পাওয়া যাবে না এও বোঝা গেছে। কিন্তু মজা-মস্করা তিনি এর মধ্যেও কিছু বজায় রেখেছেন। সংসার রথচক্রের পরিচালনার প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটিত হল সেদিন রাত্রে।

নতুন বৌদি রাতে সুকান্তর ঘরে চুরি করতে এসে ধরা পড়ে। যার শ্বশুর পক্ষাঘাতগ্রস্ত, স্বামী লাম্পট্যের দায়ে পা খুইয়ে পঙ্গু — সংসারে শুধুই খাওয়ার মুখ, রোজগারের কোন সুযোগ রইলো না, তার সংসার কিভাবে চলে? আবার চিরকাল ভালো খেয়ে এসেছেন বলে খারাপ খাবারে অরুচি সকলেরই। কিভাবে সংগৃহীত হয় এত রসদ? চুরির কথায়, দুর্নামের কথায় নতুন বৌদির তীব্র-তীক্ষ্ম হাসির শব্দে খান খান হয়ে যায় অন্ধকার। দুর্নামকে আড়াল করেই এই সংসারটা চালিয়ে এসেছেন — এতে জাত গেলেও জেল হয় না বলে নতুন বৌদির অভিমত। দত্তবাড়ির বৌকে হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে যায় না। মেয়েদের আদি ও অকৃত্রিম রোজগারের বাঁধা পথে না যেতে চাওয়াতেই এই পথ বেছে নেওয়া। অপবাদের আড়ালে রোজগারের জন্যও শ্বশুরবাড়িতে কটুকথা শুনতে হয়, তথাপি সকলের অন্ন যোগাড় করতে এই পথে চলতেও হয়। সুকান্ত তার বৌদিকে পাগল হয়ে গেছে কিনা বললে তিনি বলেন — "পাগল! বলো কি, অসম্ভব ঠাণ্ডা মাথা, নিজেই অবাক হয়ে যাই মাঝে মাঝে। আর একটু কম ঠাণ্ডা হলে — সংসারের আর পাঁচজনের মতো হয়তো একটা খেলোমি করে বসতাম কোনোদিন — জল, আগুন, বিষ, দড়ি, এ তো আর কেড়ে নেয়নি কেউ?" *(পৃ. ১১৩ — গল্প সমগ্র ২য় খণ্ড)*। — এই কথা থেকে বোঝা যায় নতুন বৌদির কাছে অপমৃত্যু শ্রেয় নয়, একটা পরিবারকে বাঁচিয়ে রাখতে মানসিক দৃঢ়তা নিয়ে কেমন রুখে দাঁড়িয়েছেন। একজন নারী অপবাদকে মুকুট করে সমাজে বেঁচে থাকতে চাইছে, সকলকে বাঁচিয়ে রাখতে চাইছে। সামাজিক নিন্দা অপবাদের চাইতেও জীবনে বেঁচে থাকা এবং খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা যে কত বড় বাস্তব সত্য, লেখিকা সেটাই এখানে দেখাতে চেয়েছেন। বেঁচে থাকার পথ কত বিচিত্র ধরনের হতে পারে? যেখানে পুরুষের পঙ্গুত্ব এক উপার্জনহীন অথচ মানবিকতাপূর্ণ নারীকে সংসারের হাল ধরতে বাধ্য করে, সেখানে দেহ-ব্যবসায়ের পথে না গিয়ে চৌর্যবৃত্তিকে গ্রহণ করেছেন এবং অমলিন মুখে হালটি চালিয়ে চলেছেন দুর্নামের বিষয়টি মনের মধ্যে স্থিত থাকলেও। লেখিকার জীবনদৃষ্টি এই গল্পে নতুন মাত্রা সংযোজিত করেছে।

'শাস্তি' গল্পে আমরা দেখি এক অত্যাচারী সন্তানের বিরুদ্ধে মায়ের গর্জে ওঠার কাহিনি। পিতা নরনারায়ণের মৃত্যুর পর তার পুত্র ইন্দ্রনারায়ণের লাম্পট্য, অনাচার, অত্যাচার — সমস্ত কিছুই মাত্রা ছাড়িয়ে বিভীষিকা হয়ে দাঁড়ায়। বাগ্দী পাড়ার চাঁপা নামে একটি কিশোরী মেয়েকে আমবাগানে

একলা পেয়ে তার ওপর পাশবিক অত্যাচার করায় মেয়েটি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বাগ্দী পাড়ার প্রতিটি মানুষ খ্যাপা কুকুরের মতো এসে রায় বাড়ির উঁচু পাঁচিল টপকে ভেতরে ঢুকে পড়ে। সমস্ত কিছু বন্ধ দেখে উন্মত্ত জনতা ক্রোধে ইঁট পাটকেল ছুঁড়তে থাকে বাড়িটি লক্ষ্য করে। সমস্ত ব্যাপারটা অজানা থাকায় কৌতূহলী হয়ে নরনারায়ণের স্ত্রী মহালক্ষ্মীদেবী নির্ভীক চিত্তে বাইরে বেরিয়ে আসেন। চাঁপার বাবা কেষ্ট মেয়ের শোকে উন্মত্তপ্রায়; বীভৎস চিৎকারে ইন্দ্রনারায়ণের মা মহালক্ষ্মী দেবীকে বলে ওঠে — "বের করে দ্যান ওই কুকুরটারে; ওর মুণ্ডুটা নখে ছিঁড়ে ফেলাই।" আক্রোশ প্রকাশ করেই গভীর দুঃখে হাউ-হাউ করে কেঁদে ওঠে চাঁপার বাবা। "চাঁপার আমার এখনো চোদ্দো পুরোয়নি মা, সবে বে'র কথা উঠেছিলো, আমার সেই সোনার পুতুলডারে আমবাগানে একা পেয়ে ওই রাক্কোসডা তারে অ্যাকেবারে — ওগো মাগো, জলজ্যান্ত মেয়েডা আমার ঘরে কাঠ হয়ে পড়ে রয়েছে মা, ..."। একজন অত্যাচারিতা কন্যার পিতার এই কাতরোক্তি মহালক্ষ্মীকে বারুদের মতো দপ্ করে জ্বালিয়ে দিল।

প্রতিবাদে মুখর, উত্তেজিতা মা এক নিমেষে একটি বিদ্রোহিণী নারীতে পরিণত হলেন। দারোয়ান রামলগনকে তিনি স্থির অথচ দৃঢ়কণ্ঠে আদেশ দিলেন তার পুত্রকে এই জনতার হাতে এনে তুলে দিতে। দারোয়ান অছিলা দেখিয়ে এড়িয়ে গেলেও মহালক্ষ্মী দেবী আপন কর্তব্যে অটল। তিনি উন্মত্ত বাগ্দীদের উদ্দেশ্যে বলেন — "এই তোমরা উঠে এসো, চলে এসো আমার সঙ্গে। দরজা ভেঙ্গে তোমাদের আসামীকে বের করে নিয়ে যাও।" মহালক্ষ্মীর এই কথায়, অন্যায়কারী পুত্রের বিরুদ্ধে মাতার এই আচরণে অভিযোগকারীরা ও বাড়ীর অন্যান্য সকলে হতবাক্ হয়ে যান। সন্তানের প্রতি বিশেষত পুত্র সন্তানের প্রতি আমাদের বাঙালী মায়েদের যে অন্ধ অপত্য স্নেহ দেখতে সকলে অভ্যস্ত, এখানে তার উল্টো চিত্র সকলকে অবাক করে দিয়েছে। মহালক্ষ্মী সকলের এই চুপ হয়ে যাওয়া দেখে অসহিষ্ণু হয়ে তীব্র কণ্ঠে বলে ওঠেন — "নিয়ে যা তোদের আসামীকে। কুকুরে খাওয়া, আগুনে পোড়া, যা খুশী করগে যা। কেউ বাধা দেবে না।" — মদ্যপ, চরিত্রহীন, অসভ্য, বর্বর পুত্রের নীচু শ্রেণির মানুষদের প্রতি জঘন্য মনোভাব এবং নারীমাংস লোলুপতার বিরুদ্ধে মহালক্ষ্মী ক্রোধে যেন আগুনের ফুলকির মতো ঠিকরে পড়তে থাকেন। তিনি বলে ওঠেন — "তোমাদের কিসের কসুর? চিরটাকাল দুনিয়ার সব কসুর নিজেদের ঘাড়ে নিয়ে নিয়েই তোমরা বদমাইসদের আস্পর্দা বাড়িয়ে এসেছো। কিন্তু সাজা তো ওকে পেতেই হবে।... ওকে তোমাদের হাতে সঁপে না দেওয়া পর্যন্ত আমার ছুটি নেই।"

ইন্দ্রনারায়ণের মা মহালক্ষ্মী চরিত্রের যে বিদ্রোহিণী চরিত্র, যে কঠোরতা ও বলিষ্ঠ প্রতিবাদী চেতনার বিকাশ দেখি তা আমাদের দুর্যোধনের মাতা গান্ধারীর কথা মনে করিয়ে দেয়। তথাপি মনে হয় মহালক্ষ্মী যেন গান্ধারীর চাইতেও নির্মম ও দৃঢ়।

'জালিয়াত' গল্পটিতে পুরুষের মধ্যেকার প্রভুত্ববোধের প্রভাব দেখানো হয়েছে। সংসারে স্ত্রী-পুত্র সকলেই কর্তার কথা মেনে চলে, তাকে ভয় পায় — সেই ভয়ে স্ত্রী সংসারের সমস্ত অন্যায় তার কাছে লুকিয়ে রাখে, এতে একধরনের স্বার্থকেন্দ্রিক আত্মতৃপ্তি বোধ করে গল্পের প্রধান পুরুষ চরিত্র শক্তিনাথ। সমাজের ওপর পুরুষের প্রভাব থাকলে, সংসারের ওপর প্রভুত্ব বজায় থাকলে তবেই পুরুষের পুরুষ জন্ম সার্থক —এটাই প্রচলিত সামাজিক ধারণা। সংসারের যাবতীয় ভালোর ফলাফলটুকু তাদের আর সন্তানের জীবনের ব্যর্থতার দায় স্ত্রীর ওপরে চাপিয়ে দিয়ে তারা ভালো মানুষ হয়ে বাঁচে। এই সমস্ত কারণেই স্ত্রীরা স্বামীদের কাছে সন্তানের অন্যায় গোপন করে দিন অতিবাহিত করে, সংসারকে সুখী করতে চায়, শান্তি দিতে চায়। এই গল্পেও সেই ঘটনাটি ঘটে, কিন্তু প্রতিবাদ তার ভাষা পায় অন্যস্থানে।

শক্তিনাথের স্ত্রী সান্ত্বনা কন্যা বুলবুল ও পুত্র সীতুর অসদাচরণ গোপন করে স্বামীর কাছে। এই ব্যাপারটা স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক, পরিবারের প্রধান শক্তিনাথ বেশ ভালো করে বুঝতে পারত। উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে একদিন স্ত্রীকে বলে — " তোমার প্রতিটি মিথ্যে কথা আমি ধরতে পারতাম, ধরতে পেরেছি। মাকড়সার মতো মিথ্যে ঐ জালটা বুনে বুনে তুমি নিজেই জালিয়াত হয়ে গেছ।" *(পৃ. ২৫৯, আশাপূর্ণার বাছাই গল্প)* ভীতু সান্ত্বনা হয়ে ওঠে মুখরা। সে বলে ওঠে, "উঃ সব জেনেছো, সব বুঝেছো? তবু এতটুকু দয়া হয়নি তোমার? তবু কোনদিন বলে উঠতে পারোনি; 'সান্ত্বনা, আর কষ্ট কোরো না তুমি, তোমার ঐ জাল থেকে বেরিয়ে এসো। তোমার-আমার তো একই জ্বালা, এসো দুজনে একসঙ্গে সেই জ্বালা বহন করি। ... না, তা তুমি বলো নি, শুধু বসে বসে আমার যন্ত্রণা দেখেছো, আবার না দেখার ভান করেছো। তার মানে তুমিও একটা জালিয়াত, হ্যাঁ, হিংস্র নিষ্ঠুর পাকা একটা জালিয়াত।" *(পৃ. ঐ. ঐ.)*— স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীর এই প্রতিবাদ মুখরতা শুধু শক্তিনাথের বিরুদ্ধে স্ত্রী সান্ত্বনার নয়। এ যেন সমস্ত পুরুষ জাতির প্রভুত্ব আরোপের জন্য যে অমানবিক আচরণ তার বিরুদ্ধে শোষিত স্ত্রী জাতির প্রতিবাদ। নারীর সেন্টিমেন্টকে, মায়ের দুর্বলতাকে নিয়ে পুরুষের এই যে অবহেলা এর প্রতিবাদ হওয়া অবশ্য প্রয়োজন। এই গল্পে সান্ত্বনা নারীত্বের কোমলতা ও মাতৃত্বের স্নেহ পদদলিত বলে মুখরিত হয়ে উঠেছে প্রতিবাদের ভাষায়। সমাজ ও সংসার পরিমণ্ডলে নারীর অসহায়তা কোথায় তা লেখিকা আশাপূর্ণা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন।

'তাসের ঘর' (১৩৪৪-৪৭) গল্পটিও প্রথম শ্রেণির একটি প্রতিবাদী চেতনার গল্প। এই গল্পের নায়িকা মমতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের মৃণালের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। মৃণাল শিক্ষা-দীক্ষা প্রাপ্ত, শুরু থেকেই প্রতিবাদী ও স্বতন্ত্র চরিত্রের, কিন্তু মমতা তা ছিল না। মমতা ছিল একান্ত ঘরোয়া, একজন খাঁটি গৃহিণী, এবং সংসার অন্তপ্রাণ। মৃণাল নারীত্বের, মনুষ্যত্বের অবমাননা সইতে না পেরে একসময় বৃহত্তর জগতে নিজের স্থানটি খুঁজতে নিজেই বেরিয়ে পড়ে। তেমনি মমতাও এতবড়

পৃথিবীতে শুধু নিজের জন্য এক টুকরো আশ্রয়ের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে এতদিনের নিশ্চিন্ত আশ্রয় ও তার সাধের সংসারে জলাঞ্জলি দিয়ে।

মমতার মামাতো ভাই নিখিলেশ বোমার মামলার আসামী, — কয়েক ঘণ্টার জন্য দিদির ঘরে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। তারই ছেড়ে যাওয়া পোষাকের জন্য মমতার চরিত্রে কালি লেপন করা হয়। আর এই কাজটি করা হয় বোনের সন্তান প্রসবকালে মমতা কয়েক ঘণ্টার জন্য সেখানে গেলে, এই সময়টুকুর মধ্যে। আঠার বছর ঘর করার পরও একটিমাত্র কারণে এত কাছ থেকে দেখা মানুষটিকে দুশ্চরিত্রা বলতে যাদের বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা হয় না এবং সবচেয়ে বড় বিস্ময় বিশ্বাস করতে যাদের কোন যুক্তিবোধের প্রয়োজন হয় না, তাদেরকেই বিশ্বাস করতে আজ মমতা নিজেই নারাজ। পরিবারের সকলের সিদ্ধান্ত হয়ে যাওয়ার জন্য মমতা আজ সত্যি কথাটাও বলতে চায় না। প্রচণ্ড ক্ষোভের সঙ্গে মমতা বলে — "আঠার বছর ঘর করার পর মমতা সম্বন্ধে যাহাদের একথা বিশ্বাস করিতে বাধে নাই, ওটুকু তাদের কাছে খুব বেশী কি?" *(পৃ. ১২২, আশাপূর্ণা দেবীর গল্প সমগ্র, ১ম খণ্ড)* — সত্যি কথাটাও হয়তো গল্প বলে উড়িয়ে দেবে। নারী বলেই তার অন্যায় কি এবং কতটা, তার কোন যথাযোগ্য বিচার হল না; মমতার এতদিনের সংসারের কল্যাণে নিজের আত্ম বলিদান — সবকিছু সংসারে জা বিজলী ছাড়া প্রতিটি মানুষ এক লহমায় ভুলে গেল। সম্পূর্ণ জীবনের নির্ভরতা যার ওপরে — সেই স্বামী, বাড়ীর অন্যান্য সদস্যদের একটি কথারও প্রতিবাদ করেনি। যাকে আঠার বছর ধরে সবচেয়ে নিবিড় করে পেয়েছে, তাকে আজ সংসার স্বামী সব ছেড়ে অজানা পৃথিবীর উদ্দেশ্যে পা বাড়াতে হয়েছে।

স্বামীও যদি দীর্ঘদিনের সম্পর্কেও অবিশ্বাসের দেওয়াল দাঁড় করায় তবে কোনো আত্মসম্মান বোধসম্পন্ন নারীর পক্ষে যে আর সত্যিই সেই স্বামীর ঘর করা সম্ভব নয়, মমতাই তার প্রমাণ। তাই স্বামীর সামাজিক সম্মান, ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ, তাদের বিবাহাদি সম্পর্কে আর বিন্দুমাত্রও ভাবতে রাজী নয়। অবিশ্বাসের ধাক্কা একটা মানুষকে কঠোর বাস্তব সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে নিজের চেতনা ও ব্যক্তিসত্তাকে জাগ্রত করে দিল। সেই জোরেই হয়তো বলতে পেরেছে — "এতবড় পৃথিবীটায় একটা মেয়েমানুষের ঠাঁই হয় কিনা সেটাই একবার দেখবো ঠিক করেছি।" *(পৃ. ১২৩, গল্প সমগ্র, ১ম খণ্ড)* আশাপূর্ণা দেবীর লেখনীতে যে বিদ্রোহিণীরা মূর্ত হয়ে উঠেছিলেন মমতা তদের মধ্যে একজন। যে নাকি নারীর অসহায়ত্ব পরিত্যাগ করে বিশ্বসংসারে নিজেকে নিয়ে একাকী পথ চলার সাহস রাখে। এই মমতা চরিত্রের ছায়া আমরা পরবর্তীকালে 'প্রথম-প্রতিশ্রুতি'র সত্যবতী চরিত্রে দেখতে পাই। পারিবারিক সম্পর্কের ভিতরকার ঈর্ষা আর সন্দেহের কদর্যতা সেদিন মমতাকে তার অবস্থান সম্পর্কে সচেতন করে দিয়েছিল। সে তার নিজের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে, আত্ম-সচেতনতার জাগরণে ঘর এবং বর দুই-ই ছেড়েছিল।

এর পরের গল্প **'ব্যবধান'** (১৩৪৪-৪৭ বঙ্গাব্দ)। এখানে অন্য এক নারীর জাগরণ ঘটেছে। তারাশংকর ও স্বর্ণময়ীর পুত্র সুধীর, যে কিনা শহরে বিরাট বাড়ি বানিয়ে ছেলে-পুলে, স্ত্রী, ঠাকুর-চাকর সমেত অতি সুখে কালযাপন করছে। একসময় মা-বাবাকেও সেখানে নিয়ে যায় এবং যথেষ্ট যত্নের সঙ্গে তাদের রাখে। কিন্তু অকস্মাৎ স্বর্ণময়ীর এত সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে থেকেও গ্রামের পুরানো বাড়িতে ফিরে যাবার জন্যে এত তাড়া শুরু হল কেন? কারণ পুত্রবধূর সংসারে শাশুড়ি হয়ে থাকবার চাইতে নিজের সংসারে কষ্টে কালাতিপাত করাকে তার অনেক বেশি সঙ্গত মনে হয়েছে। তিনি জীবনে কোথাও এত আদর-যত্নে থাকেন নি, প্রত্যেকে যেন তাদের দুজনকে দেবতার মত ভক্তি শ্রদ্ধা করে রাখছিল। হঠাৎ একদিন তিনি বাড়ি যাবার কথা বলেন কোন এক ঝিয়ের কাছে। সেকথা সে যথারীতি মনিব গিন্নীর কানে গিয়ে তোলে। এখানেই ঘটে আসল কারণ; পুত্রবধূ শাশুড়ীর সংসারের মাটির হাঁড়ি-কুড়ি নিয়ে ব্যঙ্গ করে এবং তা শাশুড়ী অন্তরালবর্তী হয়ে নিজে কানে শোনে। এই যে অবমাননাকর উক্তি, যা স্বর্ণময়ীর ভেতরের চেতনাকে জাগ্রত করে, তার ব্যক্তিত্ববোধকে বাড়িয়ে তোলে — আর তার ফলেই এত আদর-যত্ন সত্ত্বেও ছেলের সংসার মায়ের কাছে অসহ্য বোধ হয়। পুত্রবধূর কাছে সুখে থাকবার চেয়ে নিজের সংসারে স্বস্তিতে থাকাটা অনেক বেশি শ্রেয় বলে মনে হয় তার। সামাজিক পরিকাঠামোর অগ্রগতির ফলে এবং নারীদের ধীরে ধীরে স্বাধীনতা লাভের ফলে হয়তো আর কোন নারীই বর্তমান সময়ে অন্য কারো অধীনে থাকতে চায় না। অর্থাৎ কি পুত্রবধূ, কি কন্যা, কি মা বা শাশুড়ী — প্রত্যেকেই ছোট হোক, বড়ো হোক, নিজের সংসারেই যেন বেশি স্বস্তিতে থাকতে চান। আশাপূর্ণা দেবী স্বর্ণময়ীর মধ্য দিয়ে এই বোধটাকেই ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন।

আশাপূর্ণা দেবী **'নিখাদ'** গল্পের মধ্য দিয়ে আর এক নারীকে তুলে ধরেছেন। যিনি প্রতিবাদে মুখর হয়ে স্বামী, সংসার, এমনকি শ্বশুরকুল পর্যন্ত ত্যাগ করেছেন। সমিতা হচ্ছে গল্পের মূল চরিত্র, শ্বশুরবাড়ি আসার পর থেকে যে সকলের থেকে আলাদা করে নিজেকে চিহ্নিত করতে পেরেছে। তার বড় জায়েরা স্বাভাবিকভাবেই অন্তঃপুরের চিরাচরিত নারীদের মত জীবনস্রোতেই চলতে অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু সমিতা শিক্ষাদীক্ষার জগতে একটা ভালো জায়গাতে গিয়েও উপযুক্ততা অনুযায়ী যথাস্থানে পৌঁছাতে পারে নি, কারণ দৃষ্টিশক্তি রহিত হবার সম্ভাবনা তার শিক্ষার পথকে অবরুদ্ধ করে দিয়েছে।

সমিতার ননদেরা বি. এস. সি. করে এম. এস. সি. তে ভর্তি হলেও সমিতার পক্ষে তা সম্ভব হয় নি শুধুমাত্র গৃহবধূ বলে। সমাজ তখনও ঘরের মেয়ে এবং বউয়ের ব্যাপারে আলাদা করে গণ্ডী টেনে রেখেছিল। সে শুধু পারত না অন্তঃপুরিকাদের সঙ্গে বসে পরচর্চা করতে। সে সময়টা বরং প্রাজ্ঞ মামাশ্বশুর নীলকণ্ঠমামার সঙ্গে নানা পুস্তকাদি ও অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা করত। কারণ,

শ্বশুরবাড়িতে একমাত্র নীলকণ্ঠমামাই সমিতাকে বুঝতে পারত, যা তার স্বামীও পারে নি।

বাড়ির ছোটদের গৃহশিক্ষককে প্রায় অকারণে অপমান করে এবং সমিতার স্বামী প্রেমরঞ্জন চাবুকের ঘা মেরে যেদিন তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয় সেদিন গল্পের মূল চিত্রটা প্রকাশ পায়। যা নাকি একজন শিক্ষিত অসহায় আশ্রয়প্রার্থী গৃহশিক্ষকের পক্ষে অত্যন্ত বেশি শাস্তি বলেই মনে হয়েছে সমিতার কাছে। একজন শিক্ষিত মানুষ নারী পুরুষ নির্বিশেষে আর একজন শিক্ষিত মানুষের সঙ্গে আলাপচারিতা চালাতেই পারে। কিন্তু গৃহশিক্ষকের সঙ্গে সমিতার কথোপকথন তার শ্বশুরবাড়ির অন্যান্য নারীদের নিকট এমনকি তার স্বামীর নিকটও কদর্য বলে পরিগণিত হয়। আর শিক্ষিতা, উদারমনের অধিকারী সমিতার এখানেই প্রচণ্ড আপত্তি। সেজন্য গৃহশিক্ষকের অপমানজনক বিতাড়ন সমিতার নিজেরই অপমান বলে তার মনে হয়েছে। স্বামীর অন্যায় কাজে ক্ষুব্ধা সমিতা তাই ছাত্ররূপী ভাসুরপোকে বলে ওঠে — "তোরা এতজন ছিলি, কেড়ে নিয়ে ফিরিয়ে মারতে পারলি না?" *(পৃ ১১৪, গল্প সমগ্র ৫ম খণ্ড)*। এরপরই নীলকণ্ঠমামার সাহায্যে ট্যাক্সি ডেকে সমিতা চিরতরে শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে চলে যায়। কদর্য মানসিকতার প্রতি প্রতিবাদ জানিয়ে সমিতা গৃহ ত্যাগ করার সময় নিজে আত্মসম্ভ্রমকেই সম্মান জানিয়েছে, জীবনের পরিণতির কথা সে চিন্তা করে নি।

'অনুপমার ঘর' (১৩৫৪) — ছোট্ট একটি নিজস্ব বাড়ি ও ছিমছাম পরিবেশের স্বপ্ন অনুপমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াত। 'ঘর বসত' (সংসার ধর্ম) করতে এসে স্বামীর কাছে তার প্রথম আবদারই ছিল 'ভেন্ন' হবার। সে আলাদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটি সংসার পাতবে। তিনতলা বাড়ি হলেও একগাদা লোক, জিনিসপত্রে ঠাসা ঘর-বাড়ি, চেঁচামেচি, নোংরা, সারাদিন ভর রান্নাবান্না — এসবের মধ্যেও অনুপমা নিজের স্বপ্নটি ভুলতো না। তাই গদাই লস্করের চালে চলা সংসারের প্রতি আক্রোশ যেন সর্বদাই তার কথাবার্তায় ফুটে উঠতো। তার স্বপ্নের সম্পূর্ণ প্রতিচ্ছবিটি সে দেখতে পেত সুধার সংসারে। স্বামী সুবোধের কাঁচা পয়সার গুণে সুন্দর বাড়িও সুধার আজীবনের সাধ। ছবির মত সুন্দর বাড়ি অনুপমাকেও অনুপ্রাণিত করে। সেই সাধের জোরেই অনুপমা নিজেই উদ্যোগী হয়ে, গয়না বিক্রি করে একফালি জমি ক্রয় করে ফেলে। ঘরে মেয়ে থাকা সত্ত্বেও গহনার বাঁধন তাকে বাঁধতে পারে নি, তাই স্বামীর প্রতি তার উক্তি — "কেন, মেয়ের বিয়ের সুবিধে আমি করতে যাব কেন? যে যার নিজের তালে আছে। তোমার মেয়ের বিয়ের ভাবনা তুমি ভাবোগে যাও। আমার বাড়ীর কথা তুমি একদিনের তরে ভেবেছ? না খেয়ে না পরে গয়না বেচে যেমন করে হোক বাড়ী আমি করবই, তুমি দেখো।" *(পৃ. ২৪১, আশাপূর্ণা দেবীর গল্প সমগ্র, ২য় খণ্ড)* — অনুপমার এই উক্তি একটি স্বতন্ত্র চেতনাসম্পন্ন মানবীর উক্তি। তার জন্য যে ভাবে না, সেও তার জন্য ভাবতে রাজী নয়। নিজের শখের, নিজের স্বপ্নের সংসারের উপযুক্ত মূল্য সে কারো কাছে পায় না, বদলে পায় শুধু অপমান ও অবহেলা।

যতই তার স্বপ্ন অবহেলিত হয়, ততই অনুপমা তীব্র হয়ে ওঠে। তৎকালীন সময়ে একজন অশিক্ষিতা নারী শুধু নিজের জেদের জোরে একা জমি ক্রয়, বাড়ি তৈরীর ঝুঁকি নেওয়া, তিল তিল করে ঘর গেরস্থালীর জিনিসপত্র (বটি, কাটারি, বালিশ-বিছানা) সংগ্রহ করা — এতসব কাজ করার যে মানসিকতা, দৃঢ়তা, সাহসিকতা তা সত্যই প্রশংসনীয়। একান্নবর্তী পরিবারের যুগে, মেয়েরা শুধুই মেয়ে হয়ে থাকবার যুগে নিজস্ব পছন্দ, রুচি ও ব্যক্তিত্ববোধের যে প্রকাশ দেখা যায় তা যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্যের দাবী রাখে। অজস্র প্রতিকূলতাও তাকে টলাতে পারে নি, নিজত্ববোধ প্রকাশের চেতনায় ছিল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। যদিও অনুপমার বাড়ির গৃহপ্রবেশের দিন ঠিক হওয়া সত্ত্বেও সে স্বর্গসুখ লাভ তার ভাগ্যে হয়ে ওঠে নি, তার আগেই তার স্বামী হীরালাল মৃত্যুবরণ করে। অসুন্দর, অশিক্ষার বিরুদ্ধে অনুপমা সারাটা জীবন ধরে প্রতিবাদ করে গেল নিজের স্বপ্ন ও সৌন্দর্য্য চেতনাকে বজায় রাখতে চেয়ে।

'নবাগতা' (১৩৫৪) নারীদের বিদ্বেষের বিরুদ্ধে এক নতুন ধরনের প্রতিবাদের গল্প। এই গল্পে দেখা যায় অশোকা ও তার স্বামী প্রদ্যোতের সুমধুর দাম্পত্য প্রেমের রূপ। কিন্তু জমিদার বংশে অন্যান্য পুরুষেরা সুরা-বাঈজীতে সান্ধ্যকালীন আসর মাতিয়ে রাখতেন, কদাপি তারা আসতেন পত্নী সন্দর্শনে। অথচ প্রদ্যোৎ স্ত্রীকে ভালোবাসে, তাকে সঙ্গ দান করে; বিদ্যাশিক্ষা, সঙ্গীত শিক্ষায় পারদর্শী করে তুলতে চায়। অশোকার এই স্বামী সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হয় জ্যেঠিশাশুড়ী নীলনয়না, যে ছিল ঐ জমিদার বংশের মত্ত-লম্পট এক পূর্বসূরীর স্ত্রী। যার অগ্নিসম রূপ-যৌবন অপেক্ষার হিমশীতল পাথরে মাথাকুটে মরত।

প্রতিহিংসার বলি হল প্রদ্যোৎ। তার জন্য নীলনয়নার নির্দেশে সাজল বাগান বাড়ি, জলসাঘর। বাঈজীরা এল, আবার জমিদারদের নীলরক্ত ফিরে এল সেই বাড়িতে। এর ফলে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়বে অশোকা, স্বামীসঙ্গ বিচ্যুত হয়ে, শুকনো মুখে পূর্বসুরীদের মতো হতাশার নিঃশ্বাস ফেলবে, আর নীলনয়না তার সঙ্গী সাথীদের নিয়ে সেই ছবি উপভোগ করবে, এটাই যেন শাস্তির ছবি, কাম্য ছবি। আন্তরিকভাবে এই দৃশ্য উপভোগ করার জন্য একদিন নীলনয়না তার সান্ধ্যকালীন আসরে অশোকাকে ডেকে পাঠায়, অশোকা এসে উপস্থিতও হয়, কিন্তু অন্য চেহারায়, যা নাকি নীলনয়নার ভাবনার জগতের আশেপাশেও আসেনি; এক প্রতিবাদের জীবন্ত প্রতিমূর্তি হিসেবে। "এসো বৌমা। কোথায় একলাটি বসে আছো, এখানে এসে বসো খানিক।" — নীলনয়নার এই আহ্বানের মধ্যে লুকিয়ে আছে করুণার সুর, আবার ফুটে উঠেছে দম্ভের ছবিও, নিজের দলভুক্ত করতে পারার ছবি। কিন্তু অশোকার সেই উত্তর, যা চমকে দেয় নীলনয়নাকে —

— "ফিরে এসে বসবো বড়মা।"

— "ফিরে এসে? যাচ্ছো কোথায়? ... "

— "বাগান বাড়ীতে।" —

— "তুমি বাগান বাড়ীতে যাবে!"

এবারে রয়েছে অশোকার সেই বিস্ফোরক উক্তি, যা নীলনয়নার সমস্ত চাতুরী, নিকৃষ্ট মানসিকতার সমস্ত কিছুকে টেনে হিঁচড়ে সকলের সামনে এনে ফেলে — "যাবো বৈকি বড়মা! এইবেলা সাবধান না হলে আবার ভবিষ্যতে কার সুখের ঘরে আগুন লাগাতে যাবো হয়তো।" *(পৃ. ২৪১/২৫২, গল্প সমগ্র ২য় খণ্ড)* স্বামী-প্রেম বঞ্চিতা অলঙ্কার বিভূষিতা যৌবনোচ্ছল এক নারীর বঞ্চনার প্রতিফলন স্বরূপ যে প্রতিহিংসা তা চরিতার্থ করতে চাইছেন স্বামী সোহাগিনী অশোকার ওপর — অশোকার এই উক্তি সেই মানসিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

'নিরুপমা' (১৩৫৩) আগে সমাজে যে রীতি প্রচলিত ছিল, তাতে মেয়েরা বড় হয়ে উঠতো শ্বশুরবাড়ির কৃষ্টি ও সংস্কৃতিতে। তার মধ্যে পরিবারের প্রতিটি সদস্যদের জন্যই সমান মমতা বিরাজ করতো। নিরুপমার স্বামী শক্তিনাথ একরাত্রে সুন্দরী, লাবণ্যময়ী স্ত্রীর শয্যাপার্শ্ব থেকে ধীরগতিতে অজানা ভাগ্যের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছিল। দীর্ঘ তিন বছর পরে আবার শক্তিনাথ ফিরে এসেছে বাড়ীতে। পুত্রের চেয়ে ধর্ম, সমাজ, সম্মান — অনেক বড় বলে ভক্তিনাথ ছেলেকে ঘরে তুললেন না। কিন্তু নিরুপমা, শক্তিনাথকে অবজ্ঞা করলেন কি সাহসে? তার ইহকাল-পরকাল, সংসার সাধ আহ্লাদ কোন কিছুই কি নেই? তবে কি নারীত্বের-ব্যক্তিত্বের জোরেই নিরুপমা এই সুদর্শন স্বামীকে অগ্রাহ্য করে ঘরে নীরব হয়ে পড়ে রইলেন। তার স্বামীর সমস্ত গুণাগুণ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও স্ত্রীর সমস্ত ভালোবাসা ফেলে দায়িত্ব এড়িয়ে চলে যাওয়াতে নিরুপমা নিজেকে যথেষ্ট অপমানিত মনে করেন। তাই তিনি অপমানের জ্বালায় স্বামীর সঙ্গে যাওয়ার চেয়ে শ্বশুরের ভিটেকেই সম্মানের বলে মনে করলেন। নিরুপমা যখন স্বামীর সান্নিধ্যে মধুর রোমাঞ্চের শিহরণ অনুভব করেছে গুরুজনদের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে, যখন আসন্ন মাতৃত্বের সম্ভাবনায় পেতে চলেছে গৌরবময় প্রতিষ্ঠা — তখনই শক্তিনাথ চলে যাওয়ায় — "সেই পলাতক স্বামীর বিরুদ্ধে যদি সমস্ত মন বিদ্রোহী হইয়া থাকে, সেকি নিরুপমার অন্যায় ঔদ্ধত্য?" *(পৃ. ১৩৫, আশাপূর্ণার গল্প সমগ্র ২য় খণ্ড)*। এই ঔদ্ধত্যই তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে সারাজীবন ধরে। সমস্ত উপহারই 'লইতে অনিচ্ছুক' বলে ডাকে ফেরত গেছে। পুত্র শিবনাথ এম. এ. পাশ করার পর মোটা অঙ্কের চেক্‌ও ফেরত গেছে। বত্রিশ বছর পরে শক্তিনাথ এ সংসারে ফিরতে চাইলে নিরুপমা ক্ষোভে ফেটে পড়লেন। সমস্ত রকমের আপত্তি জানালেও শেষ পর্যন্ত তিনি এলেন এবং থাকলেনও পুত্র ও পুত্রবধূর ভালোবাসায় আবিষ্ট হয়ে।

কিন্তু স্বামীর প্রতি বিদ্রোহিণী নিরুপমা হঠাৎ কি ভেবে মত পরিবর্তন করলেন এবং এমন কাণ্ডটা ঘটালেন? 'যাকে দেখতে নারি' — অথচ তারই শয্যাপার্শ্বে এসে বসে তাকেই অনুরোধ — "তোমার সঙ্গে আমাকে নিয়ে চলো" — আরও বলে ওঠেন — "পায়ে পড়ছি, নিয়ে চলো তোমার

সঙ্গে। চিরদিন তোমায় ফিরিয়ে দিয়ে এসেছি — তার শোধ নিতে তুমিও যেন আজ ফিরিয়ে দিও না আমায়।" *(পৃ. ১৪২ — ঐ)* তবে কি শেষ পর্যন্ত নিরুপমা নারীধর্মের কাছে — পতিপ্রেমের কাছে ধরা দিল? তার বিদ্রোহিণী সত্তা — প্রতিবাদীসত্তা অন্তর্হিত হয়ে সত্যিই কি স্বামীসঙ্গ লালসায় উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল? প্রতিবাদী সত্তার আড়ালে যে আজন্ম সংসার পিপাসু একটি নারীমন লুক্কায়িত ছিল তা যেন আর কোন বাধা মানতে চাইল না, চিরন্তনী শাশ্বত নারীমূর্তিতে তা প্রকাশিত হয়ে পড়ল।

'দৃষ্টি' (১৩৫৪ বঙ্গাব্দ)ঃ গল্পে অমল এবং হাসি স্বামী-স্ত্রী। শাশুড়ীকে নিয়ে হাসির তিনজনের সংসার। সুস্থ-সবল অমল অফিসে গিয়ে একদিন পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে বাড়ি ফিরে এল। সেই থেকে শয্যাশায়ী রোগীর সেবা করে আসছে হাসি। অমলের অফিস থেকে অকর্মণ্য কর্মীকে অর্ধেক টাকা বেতন দেয়। তাই দিয়েই সংসার চালায় এবং এই পদ্ধতিও যে আজীবন চলতে পারে না সেটা হাসি অনুধাবন করতে পারে। হাসি ম্যাট্রিক পাশ করার পর বিয়ে হয়ে গেলেও অমলই তাকে এম. এ. পাশ করায়। তাই পঙ্গু স্বামীর গলগ্রহ হয়ে না থেকে হাসি এখন নিজে রোজগার করে সংসারের আর্থিক সুরাহা করতে চায়, প্রয়োজনে অমলের সেবার জন্য নার্স রেখে দেবে। কিন্তু অমলের মা, হাসির দিদি-জামাইবাবুরা প্রত্যেকে এতে বিরক্তবোধ করে, কারণ স্বামীকে এভাবে অথর্ব অবস্থায় রেখে কোন সতী-সাধ্বী স্ত্রীর বিদেশে যাওয়া ঠিক নয়। যে স্বামী তাকে লেখাপড়া শিখিয়েছে, যাকে হাসি একবেলা না দেখতে পেলেই চোখে হারাত তাকে ছেড়ে শুধুমাত্র অর্থ রোজগারের জন্য বিদেশ যাওয়াটা যে গর্হিত কাজ এই সত্যটা সকলেই হাসিকে বোঝাতে চাইছে। হাসির মেজদি লীলা যখন তার লোকলজ্জার ভয় দিয়ে কথা বলছে হাসি তখন হাসতে হাসতে উত্তর দিচ্ছে — "আছে বলেই তো সময় থাকতে সাবধান হচ্ছি মেজদি। এরপর তোমাদের দরজায় হাত পেতে পেটের ভাত জোগাড় করতে হতো না কি? তাতে লজ্জা ছিল বৈকি!" *(পৃ. ৩৫৭, গল্প সমগ্র ২য় খণ্ড)*

একসময় হাসির বাইরে যাবার ক্ষণটি উপস্থিত হয় এবং যথা নিয়মে স্বামীর নিকট বিদায় নিতে আসে। স্বামী অমল স্বচ্ছন্দে তাকে বিদায় জানায় এবং গোছগাছ সম্পর্কেও খোঁজ নেয়। ঘর থেকে সহজভাবে বেরিয়ে হাসি পুনরায় স্বামীর মুখপানে তাকালে, দেখতে পেল সেই দৃষ্টি — যেখানে ঘৃণা, ভয়, ব্যঙ্গ, ধিক্কার কি যে রয়েছে বুঝতে পারল না। হয়ত অমলের দৃষ্টি ছ'মাস ধরেই এমন ছিল, আজ হাসি স্বামীকে ছেড়ে অজানার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যাচ্ছে বলে তার মনে এইরকম বোধ হচ্ছে। কিন্তু পরিণামে হাসির স্বার্থপরতাই বরং ধরা পড়ে, কারণ অমলের দৃষ্টিকে হাসির করুণার দৃষ্টি বলে মনে হয়েছে। অমল হয়ত তাকে করুণা করছে, ভাবছে, হাসি পঙ্গু স্বামীর নিকট থেকে পালিয়ে বাঁচতে চাইছে ভেবে। এই দৃষ্টির দ্বারা তাড়িত হয়ে হাসি চলন্ত ট্রেন থেকে লাফ দেয়। সে কর্মজগতে প্রবেশ করে সংসারকে সুখী করার স্বপ্ন নিয়ে গৃহত্যাগ করলেও সমাজ সংসার স্বামীর কাছে যে তার এই ভাবনার মূল্য নেই, বরং তাদের ঘৃণারই পাত্রী হবে, অথচ পেটের ভাত যোগাতে তাকে যে অতি

সত্বর অন্যের দ্বারস্থ হতে হবে, এর কোন অন্যথা নেই — নিজের শিক্ষিত মনে এই বোধ জাগ্রত হলে শেষ পর্যন্ত জীবনকে শেষ করে দেওয়ার পথই বেছে নেয় এবং ট্রেন থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে মৃত্যুকে বরণ করে। এই মৃত্যু হয়ত কাপুরুষতার দৃষ্টান্ত হল। তবুও সমাজ পরিমণ্ডলের পরিকাঠামো ও দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে যে মেয়েদের বেরতে দেওয়া হয় না তারই দৃষ্টান্ত গল্পটিতে পাওয়া যায়।

'আমায় ক্ষমা করো' (১৩৫২) নারীরাও যে নিজের ইচ্ছে অনিচ্ছের ওপর জোর দিয়ে জীবনের ভীষণ সব সিদ্ধান্ত নিতে পারে, এই গল্প হচ্ছে তার প্রমাণ। স্বামীর ভালোবাসা, পুরুষের আকর্ষণের চেয়েও যে তার নিজের তৈরি 'ইমেজ' অনেক শ্রদ্ধেয় — এই বোধকে প্রকাশ করার মতো মনের গভীর শক্তি দেখা যায় এই গল্পের নায়িকা হৈমন্তীর মধ্যে। যে তার একান্ত আশ্রয় ছিল, যার মধ্যে নিজের জীবনের সমস্ত সান্ত্বনা, সার্থকতা ও ভালোবাসাকে খুঁজে পেত, এক নিমেষের একটি ঘটনায় দুর্ভাগ্যের শিকার হয়ে সেই সমুদ্রনারায়ণ দেশছাড়া হয়।

অনেক বছর পরে যখন হৈমন্তী বৈধব্য জীবনের জন্য মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছিল তখন সহসা সমুদ্রনারায়ণের আবির্ভাব। মিষ্টার মুখার্জী নামে সেই জঙ্গল কাটা রাজত্বে তার রাজকীয় ঠিকানা। সুখের সমস্ত উপকরণই স্ত্রী হৈমন্তীর কথা ভেবে সংগ্রহ করেছে। কিন্তু যাবার মুহূর্তে হৈমর একি ভাবান্তর? তার মনে হচ্ছে এই জীবনটাই শুভ্র, নির্মল, শুচিস্মিত। ফটো আর মালা নিয়েই যেন জীবনখানা বেশ ভালো কাটছে। তার নির্জন, একক, পবিত্র শয্যাতে দীর্ঘদেহী সমুদ্র যেন বেমানান। স্বামীর সঙ্গে পালিয়ে গেলেও তার চরিত্রের যে কলঙ্ক লেপন হবে তা তাকে সারাজীবন তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াবে, তার এতদিনের সাধনা ও নিষ্ঠা হবে ভূ লুণ্ঠিত। তাই নিজের এই পবিত্র 'ইমেজ'টুকু ফেলে যেতে তিনি নারাজ, সেজন্যেই বোধহয় অতি সহজে বলতে পারল — "আমায় ক্ষমা করো।" পুরুষের দাবী নিয়ে যে সমুদ্র ডাকল স্ত্রীকে, সেই স্ত্রী সমাজের কারণে নয়, সমাজে তার সুনাম, প্রভাব, ব্যক্তিত্বের নির্মল উপস্থিতির লোভে এই চির আকাঙ্ক্ষিত পথ থেকে সরে দাঁড়াল। স্বামী সংসর্গের চেয়ে নিজের অর্জিত আত্মমর্যাদা তার কাছে শ্রেষ্ঠ বলে মনে হল।

'টেক্কা' গল্পে দেখা যায় সাধারণ আটপৌরে নারী থেকে উচ্চবিত্ত ঘরের নারীদের মনের গহনে যে বোধ লুকিয়ে আছে তার চিত্র। ভাইয়ের বিয়ে উপলক্ষে বড়, মেজ, সেজ, ছোট সকল মেয়েই বাপের বাড়ি এসে পৌঁছাবে, তারই প্রস্তুতি চলছে। প্রত্যেকে প্রত্যেকের সুবিধা অনুযায়ী ট্যাক্সি, রিক্সা, যা সহজলভ্য তাতে করেই এসে পৌঁছালেও সেজমেয়ে অণিমার আসা যেন 'আগমন'। রাজপুতনার মরুভূমি থেকে সাধারণ রীতি বদলে ঝকঝকে চেহারায় একেবারে আকাশ পথে মাটিতে অবতরণ। সুতরাং বাড়িতে ছোটবড় সকলের মধ্যে সাড়া ফেলবার মতো তো বটেই। অণিমা অর্থাৎ 'অনু' কে কি জল খাবার খেতে দেওয়া হবে, কেমন মাছ দেওয়া হবে — এ নিয়ে যেন প্রত্যেকেরই মাথা-ব্যথার অন্ত নেই। অথচ বেচারী অণু সকলের সঙ্গে সহজ হতে চাইছে পোষাক - পরিচ্ছদ,

আচার-ব্যবহার, গল্পগাছা ও সহজ-স্বাভাবিক খাদ্য গ্রহণের মধ্য দিয়ে, কিন্তু ততটা যেন স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারছে না। সমবয়সী বোনেরা ও পিসিরা সব খেতে বসে গল্প গুজবে বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যা করে দিচ্ছে, রাতে ঘুমোতে গিয়ে রাত ভোর করে দিচ্ছে। অর্থাৎ বিয়ে বাড়ির জাঁকজমককে সার্থকতায় প্রতিপন্ন করে তুলতে তৎপর হয়ে উঠছে।

এই গল্পের মধ্যেই উঠে আসে টেক্কা দেবার নেশা। বড় বোন, মেজ ছোট এবং তাদের বয়সী এক পিসির সংসার জীবনের গল্প, যার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে তাদের প্রত্যেকের পতিদেবতা। সুষমা, প্রতিমা, তণিমা এবং পিসি— তাদের স্বামীরা কেউ সংসারে অনভিজ্ঞ, বোকা, কেউবা স্ত্রীরত্নের চেয়ে অর্থকেই অনেক দামী বলে ভেবে সংসার পরিচালনা করেন। আর তণিমা রূপসী, তাই বিশ্বশুদ্ধ লোক তাকে দেখে হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরেন বলে তার স্বামীর ধারণা; অণিমা বুঝতে পারছে সকলেই যেন নিঃসন্তান অণিমাকে বোঝাতে চাইছে যে, হাজারো কষ্টের মধ্যেও, নানা জ্বালা যন্ত্রণার মধ্যেও সংসারের অনেক সুখ-আনন্দ লুকিয়ে থাকে, যা থেকে হয়তো অণিমা বঞ্চিত। অর্থ-বিত্ত সবসময় মানুষকে সুখী করতে পারে না, আর্থিক অ-স্বচ্ছলতাও একটা শান্তির হাওয়া বইয়ে দিয়ে যায়, যদি সঙ্গে স্বামীর সোহাগটুকু বজায় থাকে। কিন্তু অণিমা তো এদের দলে নয়, তার প্রাচুর্য্যও যেমন আবার স্বামী ভাগ্যও ভীষণ ভালো; কিন্তু এত ভালো নিয়ে তো এদের সঙ্গে মিশতে পারছে না, তাদের দলে ভিড়তে পারছে না। তাই সকলকে টেক্কা দিয়ে প্রথম হবার নেশা তাকে পেয়ে বসলো। মনে মনে ভাবতে লাগলো কোন্ মোক্ষম অস্ত্র ছুঁড়তে পারলে তাদের সবাইকে পিছনে ফেলে সে বেরিয়ে যেতে পারবে। সবাই কিভাবে চরম উৎকণ্ঠা নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকবে আর দুঃখ প্রকাশ করবে তার প্রতি। ওদের দলে ভিড়তে গেলে ওদের করুণা পেতে হবে প্রচুর, আর সেজন্যই অণিমা ছাড়ে সেই মোক্ষম অস্ত্র। "শ্যামলের স্বভাবের তো কোন দোষ দেখি না।.....রূপে গুণে আলো করা-" *(পৃ. ১৬, আশাপূর্ণার গল্প সমগ্র ৫ম খণ্ড)* প্রতিমার প্রশ্নের উত্তরে অণিমা জানায়— " তোমরা তাই ভেবে নিশ্চিন্তে আছো, আমিও বলি না কিছু।..... এতোদিন তো নীরবে সয়ে এসেছি, এখন-অনেক কিছুই শুরু হয়েছে।" *(পৃ., ঐ, ঐ)*। এই কথাতেই সমস্ত আলোচনা স্তব্ধ হয়ে যায়, এক নিমেষে সকলের করুণার পাত্রী হয়ে যায় সে। বুদ্ধিহীন, মমতাহীন, দায়িত্বহীন ও সন্দেহবাতিকগ্রস্ত স্বামী নিয়ে ঘর করা আর এক জিনিস এবং চরিত্রহীন স্বামী নিয়ে ঘর করা এক জিনিস। প্রকৃতপক্ষে চরিত্রহীন স্বামীর সংসার করা আরো দুর্বহ। এই কথাগুলো অণিমা সকলকে বুঝিয়ে প্রতিযোগিতায় প্রথমা হয়ে গিয়েছে।

সারা দেশজুড়ে যখন সাম্যাবস্থা ও সমানাধিকারের কথা চলছে, তখন এইসব দুঃখবিলাসী মেয়েরা কিভাবে দিনপাত করবে এটাই লেখিকার প্রশ্ন। অনেক কষ্টে, দুঃখে ও যন্ত্রণায় সংসারের হাল ধরে আছেন, স্ত্রীদের সম্পর্কে স্বামীদের মনে একটা অপরাধবোধ জাগিয়ে তুলে তাদের দিয়ে স্তবগান

করাচ্ছে এতেই যেন তাদের সার্থকতা। এই পরম আশ্রয় যেদিন সমানাধিকারের ঝড়ো হাওয়ায় ভেঙ্গে যাবে, সেদিন তো মেয়েরা অনাথ হয়ে যাবে। যে দুঃখবোধে মেয়েরা নিজের সংসারে নিজেদের বিকশিত করে তুলছে এবং অন্যের কাছে নিজেকে আর্কষণীয় এবং ঈর্ষণীয় করে তুলতে চাইছে তাই যেন তাদের আসল সম্পদ। নিজের আত্ম বিকাশে ও স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত থাকতে স্বামীর নামে মিথ্যা অপবাদ দিতেও তাদের মনে কোন দুঃখবোধ হয় না। নারীরা শুধু যে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করতে পারছেন তাই নয়। নিজের আত্মম্ভরিতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং অপরের চোখে নিজের মনোবেদনাকে উর্দ্ধোথিত করে তুলতে মিথ্যা ছলনাকেই সত্যভূমিতে প্রতিষ্ঠা করার জন্য কখনো কখনো বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠে।

'আগুন নিয়ে' গল্পে দেখা যায় মেয়েদের আত্ম-সম্মানবোধের আর এক অপূর্ব চিত্র। অমূল্যবাবু আর শেখরবাবুর পরিবার চেঞ্জে গিয়ে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হয়। দীর্ঘকাল পরে আবার দুই কর্তাতে দেখা হয় বাজারে। মধুপুরের শেখরবাবু উঠে এসেছেন অমূল্যবাবুদের পাড়ার নিকটে। আর তাতেই জানতে পারেন শেখরবাবুর স্ত্রী গত হয়েছেন, ছেলেটি বিয়ে করে আলাদা হয়ে গিয়েছে এবং বিবাহের যৎসামান্যকাল পরেই তার কন্যা বিধবা হয়েছেন। সদ্য বিবাহিতা কন্যা হিমানী, পুত্র ধ্রুব ও স্ত্রী সুকুমারীকে নিয়ে অমূল্যবাবুর সংসার বেশ ভালোই চলছে। পুত্র ধ্রুব ও হিমানীকে নিয়ে তাদের মা একদিন শেখরবাবুর বিধবা মেয়ে প্রতিমাকে দেখতে যান, তারা ঐ অসহায় মেয়েটিকে সান্ত্বনা দেবার মুখ্য উদ্দেশ্য নিয়ে যান। কিন্তু, গিয়ে দেখেন লালডুরে শাড়ী ও গয়নায় সেজে অতিথি অভ্যর্থনা করতে সে ছুটে আসে। তা দেখে এদের গাড়ী ভাড়া দিয়ে এখানে আসাটাই যেন ব্যর্থ বলে মনে হয়। এরপর ধীরে ধীরে প্রতিমা এই পরিবারের ধ্রুব বাদে সকলের সহানুভূতি হারায়। কিন্তু ধ্রুব মনে করে শেখরবাবুর কথাই ঠিক — "ও মেয়েদের আবার বিয়ে হওয়াই উচিত।" *(পৃ. ২২, গল্প সমগ্র ৫ম খন্ড)*

ধ্রুব নিজেই একদিন ঘোষণা করে বসে প্রতিমাকে সে বিয়ে করবে এবং প্রতিমার বাবার মতও আদায় করে। অথচ প্রতিমার নিজেরই হচ্ছে যেন আগুন নিয়ে খেলার শখ। ভাঙ্গা ভাগ্য ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে, তাকে যত্ন না করে আছড়ে ভেঙ্গে ফেলল? অনমনীয় মা-বাবার বিরুদ্ধে যখন ধ্রুব, তখনও প্রতিমা অদ্ভুত খেয়ালে পাগলামো করে যাচ্ছে। "শুনলাম তুমি নাকি আমাকে বিয়ে করবার জন্য একেবারে ক্ষেপে উঠেছো? বাবার কাছে ঝুলাঝুলি করে মত আদায় পর্যন্ত হয়ে গেছে?" *(পৃ. ২৬, গল্প সমগ্র ৫ম খন্ড)* প্রতিমার এসব কথা ধ্রুব মেনে নিতে না পেরে শেখরবাবুকে খারাপ লোক ভেবে বসল, কিন্তু প্রতিমা যে ধ্রুবর মনের আসল খবরটা এর মধ্যেই লাভ করে ফেলল তা কিন্তু ধ্রুব ধরতে পারল না। প্রতিমাকে ভালোবেসে নয়, ভাবী শ্বশুরমশাইয়ের প্রতি দয়াপরবশ হয়েই ধ্রুব এত বড় সিদ্ধান্ত নেয়। তাই তো ধ্রুব বলতে পারে- "তোমার বাবাকে বেশ ভালোমানুষ বলে

মনে করতাম।.....শুধু ওঁর মুখ চেয়েই আমি নিজের বাপ-মার কাছে অপ্রিয় হয়েছি তা' জানো?''- *(পৃ. ২৫, ঐ)*। আর প্রতিমা এতদিনে নিজেকে সত্যিকারের বিধবা বলে ভাবতে শুরু করল। কারণ শুধুমাত্র বিয়ে হয়েছে, মনে-শরীরে স্বামীর কোন প্রভাব না পড়াতেই যেখানে সব শেষ হয়ে গেছে, তাকে আকঁড়ে সারাজীবন সব কিছু থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে রাখবার কোন অর্থই তার কাছে নেই। কিন্তু আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় যে ঘরে এবং যার কাছে যাবে, তার কাছে সে নিজে কতটা প্রয়োজনীয় — সেটা দেখার একটু সাধ হয়েছিল বলেই ধ্রুবর সঙ্গে এ ধরনের কথোপকথন তার হয়। ভালোবাসা এবং মোহ কোন্‌টা তার প্রতি কাজ করেছে এটা জানা প্রয়োজন। সমাজে অপাংক্তেয় হলেও ভালোবাসা তাকে আজীবন বাঁচতে শেখাবে আর ভালোমানুষ হবার, উপকার করবার মোহের শিকার হলে কিছুদিন পরেই সমস্ত ভালোলাগা, ভালোবাসা ফুরিয়ে যাবে—এ বোধটাই প্রতিমাকে হিমানী, সুকুমারী ও আরো পাঁচটা মেয়ের থেকে আলাদা করেছে। আর অবহেলা যে আত্মমর্যাদার পক্ষে হানিকর বিষয় তা প্রতিমা বোঝে, আর তাই বিধবা হয়ে এবারে সে সম্মানের সঙ্গে বাঁচতে চায়। প্রতিমার উক্তিতে তার সুস্পষ্ট মনোভাবটি ধরা পড়ে — ''সাশ্রয় করতে তো এ যাবৎ 'কনে পেঁটরা' আর 'গায়ে হলুদের ডালার' রক্তচঙা শাড়িগুলো পরছি বসে বসে। এইবার শেষ হয়েছে। চলো দেখিগে, তরুণী বিধবার উপযুক্ত শৌখিন ধুতিটুতি কিছু মেলে কিনা।'' *(পৃ. ২৬, গল্প সমগ্র ৫ম খণ্ড)*। সমাজে নারীর অবস্থান কিরূপ তা লেখিকার দৃষ্টিভঙ্গিতে এরূপ নানাপ্রকারে ধরা পড়েছে।

'কসাই' গল্পে মেয়েদেরই আর এক ভিন্ন চিত্র প্রকাশ পেয়েছে। সমরেশ ও কমলার সন্তান রুগ্ন। শারীরিক কষ্টে সারাদিন শুধুই চিৎকার করে থাকে, চেহারাখানাও অত্যন্ত রোগা, অথচ তার রোগ কিছুতেই সুস্পষ্টভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হচ্ছে না। এই অসুস্থ ছেলেকে নিয়েও কমলাকে নিয়মমাফিক সংসারের নানাকাজে সর্বদাই হাত লাগাতে হয়। বিরাট একান্নবর্তী পরিবারে শত শত কাজ, সংসারে প্রয়োজনীয় চাকর বাকর নেই, তাই ছেলেকে মনোমত যত্নও করতে পারেন না কমলা। কারণ সংসারে যেমন প্রচুর কাজও রয়েছে তেমনি প্রচুর মুখও রয়েছে নানা কথা বলার জন্য। এই ঘ্যানঘ্যানে কান্না একদিন বাড়াবাড়ি পর্যায়ে পৌঁছালো, সমরেশ সেদিন কোনমতেই আর সহ্য করতে পারল না। কমলারও সেদিন রান্নার পালা ছিল তাই বাধ্য হয়ে কমলা রান্নায় এবং সমরেশ ছেলে সামলানোয় ব্যস্ত ছিল।

''কি ছেলেই জন্মেছে! অমন ছেলেকে নুন খাইয়ে মারতে হয়! মানুষের ছেলে চেঁচাচ্ছে, কি জানোয়ার চেঁচাচ্ছে বোঝবার উপায় নেই।'' *(পৃ. ৮২, গল্প সমগ্র ৫ম খণ্ড)* কমলার ননদের এই কথায় অসহায়া ব্যথাতুরা মা কমলার চোখে জল এসে যায়, প্রতিবাদ বেরিয়ে আসতে গিয়েও থেমে যায়; কারণ, সে সময়েই সমরেশ ছেলেকে রান্নাঘরে ঠক্ করে বসিয়ে রেখে চিৎকার করে বলে ওঠে, ''

পিন্ডির জোগাড় আর শেষ হচ্ছে না? ও কাজ আর কাউকে দিয়ে হতে পারে না?" *(পৃ. ৮২, ঐ)* সমরেশের এই কথার বিপরীত রূপ প্রকাশ পায় মহিলা মহলে। এখানে একান্নবর্তী পরিবারের যান্ত্রিক রূপটি ভয়ানক নগ্নভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়ে; সেখানে স্নেহ - মায়া - মমতার বদলে শুধু ঈর্ষা, বাক্যবাণই চোখে পড়ে। কমলার বড়-জা যেমন বলে উঠলেন — ".....স্পষ্ট করে বললেই হয় বৌ রাঁধতে পারবে না। ছেলেকে চিমটি কেটে কাঁদিয়ে, এমন ঠেস দিয়ে 'কথা' শুনিয়ে যাবার দরকারটা কি ছিল?" *(পৃ. ৮৩ ঐ)*। তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে বিদ্ধ হয়ে কমলা ছেলেকে ফেলে কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও। কিন্তু অন্যান্য পুরুষ সদস্যদের কথায় শেষপর্যন্ত ছেলের নিকট যাবার ছুটি পায় এবং তাকে কোলে করে ছাদে উঠে যায়। সমরেশ ডাক্তার ডেকে আনলেও শেষ চেষ্টা ব্যর্থ করে সেদিনই কমলার রুগ্ন ছেলের জীবনাবসান হয়। বাড়ির চিল চিৎকারের বাচ্চাটি চিরকালীন ছুটি নিয়েছে, পরিবারের সকলের চিৎকার থেমে গেছে এরপর। ধীরে ধীরে সংসার আবার স্বাভাবিক হতে শুরু করলেও অখণ্ড অবসর এখন শুধু কমলার। কমলা অভিযোগ করে স্বামীকে "শেষ দিন অবধি তাকে ফেলে রেখে হেঁসেল সামলেছি আমি! কেউ বলে নি, "আহা ওর ছেলে মরেছে। কসাই ! তোমরা সবাই কসাই!" *(পৃ. ৮৫, ঐ)* এরপরই প্রকাশিত হবে সেই চিত্র, যা নাকি আশাপূর্ণা দেবী সকলকে দেখাতে চেয়েছেন। সমরেশের বক্তব্যে ফুটে ওঠে সে কথা — "কসাই আমরা, না তুমি ?" কমলা অবাক হয়ে বলে, "আমি!" — "হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি! তোমরা মেয়েমানুষ জাতটাই তাই।... তোমরা পুত্রশোকের যন্ত্রণা সইতে পারো, তবু সইতে পারো না ... দুটো বাক্যযন্ত্রণা। ... মুমূর্ষু ছেলেটার মরণ যন্ত্রণার কান্নাকে অবহেলা করে, সংসারের কাজ না করলে কেউ ফাঁসি দিত তোমায়? না হয় দুটো কথা শোনাত। তার বেশি তো নয়? সেটুকু সহ্য করতে পারতে না তুমি? না, সে তোমরা পারো না, তাহলে যে ত্রুটিশূন্য কর্তব্য করতে পারার অহংকার খর্ব হবে। সে অহংকার কারও জন্য খর্ব করতে পারো না তোমরা, স্বামীর জন্য নয় সন্তানের জন্য নয়। ... আত্মসর্বস্ব স্বার্থপর তোমরা, কাউকে ভালোবাসতে পারে না, ভালোবাসো একমাত্র নিজেকে।" *(পৃ. ৮৫, ঐ)* নারীদের এই জ্বলন্ত ও জীবন্ত চিত্র আমাদের সামনে চিরন্তন সত্য রূপে প্রকাশিত হয়েছে, যার সত্যতা খুঁজলে আমরা প্রতি ঘরে ঘরেই নিদর্শন পাব। সকলকে ভালোবেসে, সকলকে সুখী করে জীবন কাটাতে চাইলেও নিজের কর্তব্য, সাধ আহ্লাদ স্বামী পুত্রকে ঘিরে যেন বেড়ে ওঠে। এসবের মধ্য দিয়ে খুঁজে নিতে চায় সকলের প্রশংসা। কারো নিন্দা, ভ্রূকুটি, বাক্যবাণ যেন কোনমতেই সহ্য করা চলবে না। প্রাণ স্নেহ মমতার গলা টিপে ধরতে পারে প্রয়োজনে, তা সে যতই কষ্ট হোক না কেন, কিন্তু ত্রুটিশূন্য কর্তব্যের অহংকারকে কোনমতেই খর্ব করা চলবে না। মেয়েদের এই রূপটিও কল্যাণী, স্নেহময়ীর মতো চিরন্তনী, একে বলা চলে আত্মসর্বস্ব ও আত্মকেন্দ্রিক। অথচ এই মনোভাবটি যদি আর একটু শিথিল ও কোমল হতো তবে হয়তো রুগ্ন শিশুটি মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করলেও মায়ের

হাতের কোমল স্পর্শ একটু বেশি সময় ধরে পেত, তার তৃষ্ণার্ত মনটা হয়ত একটু শান্তি পেত, পেত একটু নিরাপত্তার আনন্দ; যা নাকি অনেক কষ্টেও শান্তির ছোঁয়া এনে দেয়।

'অবিনশ্বর' গল্পে পদ্মা জঙ্গলে থেকে ও মানুষরূপী জংলীদের সঙ্গে মেলামেশা করে পুরোপুরি জানোয়ার বনে গিয়েছিল। কিন্তু অকস্মাৎ কিভাবে সে মানবতার সন্ধান পেল সে কথাই রয়েছে উক্ত গল্পে। সাব ওভারসীয়ার হরিপদ ও জরিপবাবু মুকুন্দ বিশ্বাস এরা এই গ্রামের ও এরাই অফিসের কর্মী। সাহেবের অনুপস্থিতিতে জঙ্গলের রাজকার্য ওরাই সামলাচ্ছিল। পদ্মার বাবা মা বন্যায় গত হওয়াতে অল্পবয়সী পদ্মাকে মুকুন্দ বিশ্বাস এনে কাজে লাগায়। জঙ্গলে আসা সাহেবদের আদিমতার প্রলোভনে ফেলে তাদের দুর্বল জায়গাগুলো আয়ত্ত করে এবং স্বার্থ সিদ্ধ করে নিজেরা রাজত্ব কায়েম করে চলে। এমনি এক সাহেব আসেন জঙ্গলে, কিন্তু তাতে ওদের কার্যকলাপের উদ্দীপনা স্তিমিত হয়ে যায়; কারণ এবারের সাহেব একটু অন্য রকমের, যদিও অল্পবয়সী। মুকুন্দ বিশ্বাসের কথায় তার নিজের স্বভাব অনেকটাই ধরা পড়ে এবং এও বোঝা যায় যে, জঙ্গলে ওরা কি জাল বিস্তার করে রেখেছে— "সংসার সমাজের বাইরে এই জঙ্গলে এসে অনেক উঁচু নাকই খ্যাঁদা হতে দেখলাম দাদা! ..... কলকাঠি তো আমাদের হাতে।" *(পৃ. ৬০, গল্প সমগ্র ৫ম খণ্ড)*

এই সাহেবের ঘরেই রাতের আঁধারে আদিমতার পসরা সাজিয়ে হাজির হয় পদ্মা; যেমন হোত অন্যান্য সাহেবদের বেলাতেও এবং অবশ্যই ওভারসীয়ার ও জরিপবাবুর কথামতো। কিন্তু অন্যান্যদের মতো এই সাহেবকে উপহার সাজিয়ে দিতে পারেনি, বিনিময়ে নিজেকে দেখবার একটা প্রতিবিম্ব পেয়েছে। এই সাহেব কাজ না করিয়ে টাকা দিয়েছে এবং সরাসরি প্রশ্ন করেছে — "তোমাকে পাঠিয়েছে কে ?" *(পৃ. ৬৩-৫ম খণ্ড)*; কাঁটাওয়ালা চাবুক সাহেবের হাতে দেখে পদ্মা ভয়ে কুঁকড়ে গিয়ে সব বলে দিয়েছে। "এভাবে খাটতে তোমার লজ্জা করে না?" *(পৃ. ৬৪)*— সাহেবের এই প্রশ্নের উত্তরে যেন চেতনা ফিরে পায় পদ্মা। সাহেবের সঙ্গে যখন সেই দুজনের তাঁবুর দরজা অবধি যায়, যেন সে নিজেকে চিনে নিতে নিতে এগোতে থাকে। এবার পদ্মা হেরে গেছে; আর যখন সে ফিরে যায় সেই দুজন সরীসৃপ স্বরূপ মানুষের কাছে, তখন সে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ মনের এক মানবী। তাই তো তারা একফোঁটা ছোড়াটার কাছে ফেল্ মেরে ফিরে যাবার কথা বলায় সে দপ্ করে জ্বলে ওঠে — "মানুষ তো কখনো দেখনি হরিপদদা, দেখেছো খালি জানোয়ার!" *(পৃ. ৬৫, ঐ)*। হাজার অভাবে থাকলেও একজন মানুষ যেমন তার আদর্শকে বলি দিতে পারে না, মনের সুদৃঢ় ভাব দৃঢ়ই থাকে, তেমনি তেজী ও সুদৃঢ় ভাব নিয়ে পদ্মা কথাগুলো বলে ঘর থেকে ছিট্‌কে বেরিয়ে যায়। এই রাতচরা মেয়ে আজ যেন আর কোন কিছুকেই ভয় পায় না, জগতের সব বাধা ঠেলে, সব অশুভকে দলিয়ে মাড়িয়ে একাই যেন যেতে পারে মানুষের বসতির মধ্যে। যে মেয়ে মুকুন্দের আশ্রিত, মুকুন্দ তাকে ইচ্ছে মতো নাচিয়ে নিচ্ছে, নিজেকে গুছিয়ে নিচ্ছে এবং যার ভয়ে সদাসর্বদা পদ্মা তটস্থ থাকে, সে

আজ মুকুন্দকে ভয় পায় না। সততা, নির্ভীকতা, আদর্শ এবং বিশুদ্ধ নারীত্ববোধের সমন্বয়ে পদ্মা আজ এক সচেতন, সজীব মানুষ। — লেখিকার প্রতিপাদ্য পদ্মার এই দিকটাই।

নারী চিত্তের বিচিত্র রূপের আর এক চিত্র পাই **'বৈরাগ্যের রং'** গল্পে রাণী চরিত্রের মধ্যে। বিবাহের দুদিন বাদেই যার স্বামী নিরুদ্দেশ, আট বছর গত হল, আজও কোন হদিশ নেই। বেনারসে সনাতন হিন্দুধর্মের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে, সেই উপলক্ষে স্বামীজী চলেছেন ট্রেনে চেপে, সম্মেলনে যোগ দিতে। তারই কামরায় এসে উঠলেন ঠাকুমা, নাতি চাঁদু ও নাতনী রাণী, যে হচ্ছে গল্পের নায়িকা।

কথায় কথায় ঠাকুমা পিতৃহীন, শ্বশুরবিহীন অর্থাৎ এককথায় অভিভাবকহীন নাতনীর চিন্তায় জর্জরিত হয়ে বাধ্য হয়ে বললেন স্বামীজীর কাছে নাতনীর কথা। রাণী এখন নিজেই গেরুয়াধারী, এককথায় লেখিকার ভাষায় — "সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব।" যৌবনে যোগিনী হয়ে সমস্ত সভা, সমাবেশ, সম্মেলনে (হিন্দুধর্মীয়) তার স্বামীকে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কারণ শোনা যায় 'নিরয়ানন্দ' নাম ধরে তার স্বামী বেলুড় মঠে সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে। রাণীর শুধু একটাই প্রশ্ন তার স্বামীকে, — কি দোষে তাকে পরিত্যাগ করে সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করে ও তার জীবনটাকে ছারখার করে দেয়।

আবার স্বামীকে খুঁজে পাবার জন্য বৈরাগ্যের রঙে রঞ্জিত হবার ইচ্ছা ও প্রেরণা ছিল এবং তা গ্রহণ করবার মতো ত্যাগের শক্তিও তার ছিল। সেই শক্তি রাণী পায় স্বামীর প্রতি ভালোবাসা ও অনুরাগ থেকেই।

নিরয়ানন্দের সন্ধান স্বামীজী সেই সম্মেলনের পর দিয়েছিলেন, কিন্তু বাদ সাধল সেখানেই। তিনি নাকি এখন আর সন্ন্যাসের ভার বইতে পারছেন না এবং সংসার ধর্মে অভিনিবিষ্ট হবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন স্বামীজীর নিকট। কাশীর বাড়ির ঠিকানায় স্বামীজী নিরয়ানন্দকে নিয়ে এলে ঠাকুমার যেন একেবারে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে; কিন্তু রাণী? সে তার ঠাকুমাকে আটকে দেয়। নীচে যেতে মানা করে। স্বামীর সঙ্গে দেখা করার পরিবর্তে সে চায় সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষিত হতে। এতদিন হয়তো সে সত্যিই বৈরাগ্যের রং ধারণ করেই ছিল, কিন্তু এখন সে তার সম্পূর্ণ স্বাধীন ইচ্ছা ও ব্যক্তিত্বের জোরেই চলতে চায়। অর্থাৎ তার নারীত্ববোধ যেন ধাক্কা খেয়েছে। যখন তাদের সম্পূর্ণ আনন্দের জোয়ারে ভেসে যাবার কথা তখনই তাকে নিঃস্ব, রিক্ত জীবন কাটাতে হল আর আট বছরের সাধ্য-সাধনার পর যখন খুঁজে পাওয়া গেল এবং যখন সে প্রস্তুত দীক্ষা গ্রহণ করে স্বামী সান্নিধ্যে যাবার জন্য, তখন তার স্বামী কিনা সংসার জীবনে ফিরতে উৎসাহী। তার সমস্ত জীবনের ইচ্ছা, আবেগ সবকিছু নিয়ে যখনই তার মনে হয়েছে তাকে নিয়ে খেলা চলছে, অবজ্ঞার ছোঁয়া দেখা যাচ্ছে, তখনই সমস্ত ইচ্ছা বিদ্রোহ করে বলে উঠল — 'না'। এত প্রতীক্ষা, সাধনা, ত্যাগ সব যেন এক ফুৎকারে নিভে গেল এবং মনে হল আর নয়, যেন নিজের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর, সমস্যার সমাধান পেয়ে গেছে।

যার ফলে একবারের জন্যও রাণী তার সঙ্গে দেখা করতে চায়নি, ঠাকুমার হাজার অনুরোধ সত্ত্বেও। যে 'বৈরাগ্যের রং' অঙ্গে লেপন করে রাণী ইষ্টদেবের সন্ধানে ফিরেছে, তাকে অন্যরূপে ফিরে পাবার লগ্নে সে রং যেন আর অঙ্গে নয়, মনকেও নতুন রঙে রঞ্জিত করে ফেলেছে। তার স্বামীর আধ্যাত্মিক জগতের রসাস্বাদনকে শুধুই আস্বাদন বলে মনে হয়েছে বলেই পুনরায় সংসার জীবনকেও আস্বাদন করতে চেয়েছে। কিন্তু পরিপূর্ণ চেতনাসম্পন্ন মানবী, প্রেমিকা রাণী প্রেমের মানুষকে খুঁজে ফিরেছে বলে তার নিকট আস্বাদনটা রসাস্বাদনের পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে।

নারী চরিত্রের অপরিসীম দৃঢ়তা ও গভীর বিশ্বাসের আর একটি চিত্র দেখতে পাওয়া যায় **'ঐশ্বর্য'** (১৩৫৯ বঙ্গাব্দ) গল্পের মূল চরিত্র অপর্ণার মধ্যে। শ্রীকুমার ও সুকুমার দুই ভাইয়ের সংসারে আর্থিক ও অন্যান্য সমস্ত দায় দায়িত্ব বড়জনই নিয়েছেন এবং তাদের স্ত্রী অপর্ণা ও আভা সংসারের যথাযথ কর্তব্য সামলে চলেছেন। এই স্বচ্ছল এবং সুন্দর সংসারে কদিনের জন্য এসে প্রবেশ করলেন তাদের পিসতুতো বোন নন্দা। নারীচিত্ত হল চির কৌতূহলী এবং চরম অনুসন্ধিৎসু, বিশেষত, অপর একজন নারীর চরিত্রে কোন ভ্রান্তির লক্ষন যদি পেয়ে থাকে। ছোট বৌ আভার সঙ্গে নন্দার বেশ আন্তরিক একটা সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায়। কিন্তু অপর্ণার ব্যক্তিত্বের প্রাখর্য্যের কাছে নন্দাও কেমন যেন হেরে যায়। তাই অধরা এই ভাজকে নিয়ে সমালোচনায় মুখরিত হয়ে ওঠে নন্দা ও আভা।

অপর্ণা নিজে সংসারের সমস্ত কাজকর্ম তদারক করে সন্ধ্যার আগে দোতলায় নিজের ঘরে গিয়ে স্বহস্তে স্বামীকে পরিপাটি করে সাজিয়ে দেন। পোষাক পরিচ্ছদ ব্যবহারেও এই দম্পতির শৈল্পিক চেতনা ফুটে ওঠে — গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবী, চুনট করা ধুতি, পায়ে দামী চামড়ার গ্রাসিয়ান, রূপো বাঁধানো ছড়ি প্রভৃতি। এই সাজসজ্জার শেষে তিনি সারাটি বছর — ঝড়, জল, শীত, গ্রীষ্ম সব উপেক্ষা করে নিয়মিত বেরিয়ে যান বাঈজী বাড়িতে গান শুনতে এবং তা স্ত্রী অপর্ণারই তাগিদে বলা চলে। স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নারীরা যেখানে তাদের স্বামীদের এ সমস্ত কাজকর্ম থেকে বিরত রাখবার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠেন, আর অপর্ণা কিনা সেখানে নিজের স্বামীকে যাবার জন্য নিজ হাতে সাজিয়ে দেন। মুখে কেউ না বললেও শ্রীকুমারের গন্তব্যস্থানটি সকলেরই জানা, তাই বাড়ির সকলেই অবাক হয়ে যান, একজন নারী হয়ে অপর্ণা এত মনোবল কোথায় পান? কি ঐশ্বর্য লুকিয়ে আছে তার ভেতরে, যার জন্য একজন গৃহবধূ হয়ে বাঈজীর গৃহে স্বামীকে পাঠাতে এতটুকুও দ্বিধা বা ভয় নেই তার?

অপর্ণা ও শ্রীকুমারের মধ্যে আছে সেই বহুমূল্য ঐশ্বর্য, যা নাকি সমস্ত বাধা-বিঘ্ন দূর করে সম্মানের সঙ্গে উন্নত মস্তকে লড়াই করতে শেখায় — তা হল ভালোবাসা। যা নাকি আভা ও সুকুমারের মধ্যে নেই। নববিবাহিতা অপর্ণার হাতে যেদিন 'বিরহিনী চাতকিনী চিরাশ্রয় প্রার্থিনী'র একখানা চিঠি পড়ল, সেদিন অবাক হলেও সমস্ত ব্যাপারটাকে বুদ্ধি ও ভালোবাসার দ্বারা

উন্নতমানের করে তুলেছিলেন। আর সেই জোরেই স্বামীকে এরকম জায়গায় পাঠাতে পারেন। আরো যে কারণটি এখানে নিহিত আছে তা হল — তার দয়ায় এবং তার স্বামীর দেওয়া পারিশ্রমিকেই এই অসহায়া নারীটির সম্মান বজায় থাকে এবং আহার জোটে। অকাল বিধবা নন্দার মত মুখরা মেয়েও অপর্ণাকে কোন কথায় ঘায়েল করতে পারে না। যেমন — "আচ্ছা পৃথিবী উল্টে গেলেও তো রদ হয় না, রোজ কোথায় যায় কুমারদা?" নন্দার এই প্রশ্নের উত্তরে অপর্ণা বলে ওঠে — "ও মা তাও জানো না? হায় কপাল! এসে পর্যন্ত এতদিন তাহলে করলে কি? অভিসারে যান যে গো!" *(পৃ. ৫, আশাপূর্ণা দেবীর স্বনির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্প)*

এই যে অবহেলা ভরে কথাবার্তা বলা, যা নিয়ে অন্দরমহল সমালোচনায় মুখর, তাকে হেয় প্রতিপন্ন করার স্পর্ধা অপর্ণা পান কোথা থেকে? তা পেয়ে থাকেন একমাত্র দাম্পত্য সম্পর্কের জোরে। যেখানে রয়েছে গভীর বিশ্বাস আর ভালোবাসা। সংসারের আর পাঁচটা কর্তব্যের মত স্বামীকে দিয়ে একজন অনাথিনীর প্রতি দয়া দেখান শুধু। "তোমার মনে সত্যিকার কষ্ট দিয়ে আমি কিছু করতে পারি এ তোমার বিশ্বাস হয় অপর্ণা? *(পৃ. ৭, ঐ)* — শ্রীকুমারের এই উক্তিতেই তাদের বিশ্বাস ও ভালোবাসার ভিত কতটা সুদৃঢ় তা বোঝা যায়। আবার অপর্ণার চিত্তের ঔদার্য্যের লক্ষণও ধরা পড়ে কয়েকটা উক্তিতে, যেমন — "আমার আচরণ তোমার পক্ষে অসম্মানকর, একথা কোন সময়ে যে না ভাবি তা নয় অপর্ণা, তবু তোমার প্রশ্রয়েই সে ভাবনা দাঁড়াতে পায় না।" *(পৃ. ৭, ঐ)* শ্রীকুমারের এই উক্তিই এই বৈশিষ্ট্যকে প্রমাণ করে।

এহেন সম্পর্ক যাদের মধ্যে রয়েছে তাদের নিয়ে বাইরে কত না আলোচনার স্রোত বহমান। অথচ নন্দাকে তার শ্বশুরবাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসার জন্য সুকুমারকে বলা হলে তার স্ত্রী আভার দুশ্চিন্তার অবধি নেই। কারণ তৃতীয় ব্যক্তিহীন গাড়ীর কামরা — শুধু বিধবা যুবতী নন্দা আর সুকুমার — পরিণতি কি দাঁড়াবে আভা যেন স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছে। যেহেতু হবিষ্যান্ন, সন্ধ্যাহ্নিকের আড়ালেও সুকুমারের রয়েছে কদর্য, নারীলোভী একটা মন। "তার স্বামীকে তার চাইতে বেশী আর কে জানে?" *(পৃঃ ৯, ঐ)* আভার প্রতি লেখিকার এই মন্তব্যেই সব স্বচ্ছ হয়ে যায়।

অপর্ণার এই যে পরিচয়, তা মধ্যবিত্ত সমাজে, গৃহে নারীদের ক্ষেত্রে এক বিশাল উত্তরণ ঘটিয়েছে। মানবিকতাবোধের জাগরণ ঘটেছে, গুরুত্ব পেয়েছে বিশ্বাস ও ভালোবাসার সম্পর্কের চিত্র।

'পঙ্খীমহল' গল্পে নারী-ব্যক্তিত্বের অপর একটি দিক অত্যন্ত সুচারুরূপে অঙ্কিত হয়েছে। দশ বছর বয়সে সরমা বিবাহিত হয়ে এসে 'পঙ্খীমহলে' প্রবেশ করেন, এখন চল্লিশের কোঠায় তার বয়স; অথচ একটি রাত্রিও এই ঘর ছেড়ে, স্বামী শোভনরামকে ছেড়ে থাকেননি। বংশের প্রথানুযায়ী পৌত্র জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে পঙ্খীমহলের অধিকারিণী হবেন নবজাতকের মা। শাশুড়ীহীনা সরমা নববধূ অবস্থায় সেখানে প্রবেশ করেছেন এবং তিনি গঙ্গাযাত্রা পর্যন্তই সেখানে থাকতে চান। বংশের প্রথা

হলেও এই স্বর্গতুল্য পশ্চীমহল ছেড়ে স্বামী-স্ত্রীর আলাদা-আলাদা মহলে থাকতে সরমা নারাজ। আর সে কারণেই পৌত্রের শুভাগমনের শুভ সংবাদ সরমাকে আনন্দে আপ্লুত না করে বরং বিষাদের সাগরে নিমজ্জিত করে রেখেছে। স্বামী-সংসর্গ থেকে বঞ্চিত হবার ভাবী বেদনায় তিনি অধীর। যে-কোন মূল্যেই এই স্বর্গটিকে তিনি হাতের মুঠোয় রাখতে চান। এজন্য তিনি সিন্দুকের সমস্ত সোনা উজাড় করে দান করতে পারেন, এমনকি মান-সম্ভ্রম পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। পৌত্র জন্মানোর পরে সরমা যতটা পারলেন সোনা-দানা-টাকা-পয়সা দান ধ্যান করলেন যাতে করে বংশের নিয়মানুযায়ী পশ্চীমহলের কথাটা অন্যরা ভুলে যায় বা মনে থাকলেও মুখে না তোলে।

'যেঠেরা-পুজো'র উৎসব চলছে। শোভনরামের বিধবা দিদি বরদামোহিনী এলেন নবজাতককে দেখতে। সরমা ও বরদামোহিনী নাতিকে আশীর্বাদ করার পর পশ্চীমহলের কথা ওঠে। কুমারের বৌ 'পশ্চীমহলের' সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করে এবং নতুন মহলই তার ভালো লাগে — একথা জানায়। পশ্চীমহল তার পছন্দ নয়, এর বিশালতা তার মনে ভয়ের উদ্রেক করে। অর্থাৎ সরমার স্বর্গতুল্য বস্তুটির প্রতি তারই পুত্রবধূর যখন অবজ্ঞা প্রকাশ পায় তখনই ঘটে বিরাট অঘটন। যে স্বর্গকে নিজের করে ধরে রাখবার জন্য এত এত ধন বিলোলেন, এতদিনকার নিয়মকানুনকে ভেঙ্গে নতুন নিয়ম গড়তে চাইলেন, সেই স্বর্গের প্রতি অবজ্ঞাতেই তার সমস্ত গায়ের রক্ত যেন টগবগিয়ে ফুটে উঠল। অপর ব্যক্তির হত শ্রদ্ধার ভাষায় নিজের পরম সুখস্থলকে কিছুতেই হীন হতে দিতে পারেন না। তাই পশ্চীমহল সম্পর্কে রানী বৌমার উক্তি — "বাবাঃ, দেখলেই দম বন্ধ হয়ে আসে, ঘর তো নয়, যেন শ্মশানপুরী, সরমা এর উত্তরে বলে ওঠেন "তোমার খেয়াল খুশীর তালে এ সংসারের নিয়মকানুন চলবে না রানী বউমা। একুশে ষষ্ঠীর পুজো মিটলেই তোমাকে পশ্চীমহলে গিয়ে ঢুকতে হবে।" *(পৃ. ১২৯, স্বনির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্প)* কথাগুলো বলার পর যেন সরমার বুক ফেটে যেতে চাইছে ; কিন্তু নিজের সর্বসুখ বিসর্জন দিয়েও আত্মসম্ভ্রমকে বজায় রাখবার মত একটা প্রতিবাদ যেন তার ভেতর থেকে আপনিই বেরিয়ে এল। সমস্ত সুখের কাছেও নারীত্বের, ব্যক্তিত্বের এই যে জাগরণ — যা নারীকে পূর্ণ মানবী হয়ে উঠতে সাহায্য করে অর্থাৎ কোন কারণে নিজের ইচ্ছা, সাধ, প্রিয়জন বা প্রিয় কোনকিছুকেই কারো কাছে ছোট করা সম্ভব নয়, সেজন্য তাকে যত মূল্যই দিতে হোক না কেন।

'ছায়াসূর্য'-এ দেখা যায় দুই বিপরীত ধর্মী নারী চরিত্রকে। একজন চিরাচরিত ঘরোয়া, মার্জিত, ভদ্র, সুশিক্ষিত নারী ও অপরজন অশিক্ষিত, বেপরোয়া, অবাধ্য এবং দেখতেও ঠিক রক্ষাকালীই বলা চলে। অথচ এরা সহোদরা। শিল্পীর লেখনী শিল্পের তাগিদে কোথায় যেতে পারে, একজন নারী তার স্বতঃস্ফূর্ততা নিয়ে নিজেকে কিভাবে মেলে ধরতে পারে এখানে তাই দেখা যায় ঘেঁটুর মাধ্যমে। ফুলের নামে দুই বোনের নাম — মল্লিকা ও ঘেঁটু। দুজনেরই রূপ এবং গুণ অনুযায়ী নামকরণ করা হয়েছে।

বিরাট তিনতলা বাড়ি, সমাজে সম্মানের সঙ্গে সকলেই প্রতিষ্ঠিত, তাদের ঘরের সন্তানেরাও সকলেই পড়াশোনায় আগ্রহী এবং উৎসাহী; অথচ তাদেরই ঘরে ঘেঁটুর মতো একটি মেয়ে কিভাবে জন্মালো তাই সকলের কাছে আশ্চর্যের বিষয়। যে মেয়ে শিক্ষা-দীক্ষার ধার ধারে না, মেয়ে হয়েও ছেলেদের সঙ্গে পুরুষালী খেলায় সারাদিন ধরে মত্ত; মেয়েলী সমস্ত বৈশিষ্ট্যের উর্দ্ধে যে মেয়ে, এবং কথায় কথায় তার অসামান্য গুণসম্পন্না দিদিকে হেয় প্রতিপন্ন করে, সেই ঘেঁটু একদিন তার কাকার কাছে প্রকাশ করল যে সেও একজনকে ভালোবাসে। অর্থাৎ মনের স্বতঃস্ফূর্ত স্বাভাবিক গতির কাছে সে ধরা দিয়েছে। দিদির মতো মোমের পুতুল হয়ে শো-কেসে শোভা পাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব, বরং সমাজে তাদের যশ-খ্যাতির তোয়াক্কা না করে মন যেখানে শান্তি ও ভালোবাসা খুঁজে পেয়েছে, সেখানেই সে ভালোবাসাকে লাভ করতে চেয়েছে। এতো বড়ো বাড়ির মেয়ে হয়েও লন্ড্রীর দোকানে কাজ করা একটি সাধারণ ছেলের কাছে নিজের প্রেমের ডালি উজাড় করে দিয়েছে।

এদিকে সারাবাড়ি যখন বিলেতে শিক্ষিত, প্রচুর রোজগেরে ছেলের সঙ্গে মল্লিকার বিয়ে নিয়ে মেতে আছে, তখন ঘেঁটু সমস্ত আনন্দ জগতের বাইরে তার সামান্য রোজগেরে প্রেমিকের অসুস্থতা নিয়ে ব্যস্ত। চব্বিশ-পঁচিশ হাজার টাকা খরচের মহোৎসব যখন চলছে, সে সময়ে মেজ কাকীমার পার্স থেকে একটি একশ টাকার নোট নিয়ে সে মৃত প্রেমিকের সৎকারের কাজে লাগায়। অথচ এই একশ টাকা নিয়েই বাড়িতে তুলকালাম হয়ে যায়।একশ টাকার ক্ষতিটা কেউ সইতে পারে না, কিন্তু ঘেঁটু জীবনের চরম ক্ষতিটাকে একা একা কেমনভাবে পার করে এসেছে। যাকে নিয়ে জীবনের মধুর স্বপ্নের জগতে প্রবেশ করতে চেয়েছিল, তাকে নিজের হাতে টাকা দিয়ে পোড়াবার কাঠ জোগাড় করে দিয়ে এল। কিন্তু তার দুঃখের অংশীদার হবার মত সঙ্গী একজনও তার বাড়িতে নেই। এমন একটি পরিবারের মেয়ের পারিবারিক সমস্ত প্রথা, কৌলিন্যকে অস্বীকার করে বেড়ে ওঠা ও এগিয়ে যাওয়া সত্যিই আশ্চর্যজনক। ঘেঁটুর কাকার একটি উক্তিই ঘেঁটুর সম্পর্কে যথেষ্ট মূল্যায়নের পরিচয় দেয়— "এতদিন যাঁকে আনাড়ি ভেবে এসেছি, সে কি সত্যই তাই?" *(পৃ. ১৩৯, স্বনির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্প)*। লেখিকা এই বিরাট জগৎ সংসারের বৈচিত্র্যময় মানুষের দিকে কতভাবে দৃষ্টি মেলে ধরেছেন এবং সেই বিচিত্র জীবনচিত্রকে এঁকে চলেছেন তারই দৃষ্টান্ত গল্পটি।

'বন্দিনী' (১৩৫৫ বঙ্গাব্দ) গল্পে হিন্দু বাঙালী নারী সমাজের আর এক চিত্র দেখা যায়। যেখানে নারীরা পড়ে পড়ে স্বামীর হাতে মার খাবে, লাঞ্ছিত হবে ও চরম অবমাননাসহ বেঁচে থাকবে কিন্তু তাদের এই কার্যকলাপের যদি কেউ প্রতিবাদ করে তবে আবার প্রতিবাদে গর্জে উঠবে সেই স্বামীরই হয়ে। তারানাথ তার স্ত্রী চারুবালা ও পুত্র শংকরকে কোনদিনই একটুও শান্তি বা স্বস্তি কোনটাই দেননি। তাই শংকর মাধ্যমিক পাশের পর আর বাবার ভরসা না করে সামান্য একটা চাকরী করে ও গোটাকয় টিউশন পড়িয়ে সংসারটাকে অত্যন্ত দীনহীনভাবে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কারণ বাবার

দায়িত্বহীনতা ও অভদ্রতা এবং মায়ের অসহায়তা ও কোমল মাতৃত্ব — এ দুয়ে মিলে শংকরকে অনেক বাস্তববাদী করে তুলেছে। ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছে মায়ের ওপর বাবার অত্যাচার। আর ছোট্ট শংকরের মনে হোত কোন এক দৈত্যের হাতে তার মা যেন বন্দিনী। অনেক বড় হয়ে সে এই দৈত্যের হাত থেকে মাকে উদ্ধার করে সুখে রাখবে।

বাজার করা নিয়ে একদিন বাঁধে চরম গোলযোগ। অলস, বদনেশাগ্রস্ত, অকর্মণ্য স্বামীর প্রতি চারুবালা ক্রমেই যেন ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে থাকত। তার কোন কথাই সহ্য করতে পারত না। শংকর সময়ের অভাবে বাজারে যেতে না পারায় তার বাবা যেতে চাইল, আর তাতেই চারুবালা কেমন অদ্ভুত হিংস্র হয়ে উঠল। তেলে-বেগুনে চিৎকার করে বলে ওঠে — "—লজ্জা করে না? লক্ষ্মীছাড়া নেশাখোর বেহায়া!" *(পৃ. ২৮, স্বনির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্প)*। অবাক শংকর 'থ হয়ে শুধু মা-বাবার রুক্ষ্ম দাম্পত্য চিত্রটাই দেখতে থাকে। কিন্তু বাবার হাতের কয়লার টুকরোর আঘাতে যখন মায়ের কপাল কেটে রক্ত বেরতে থাকে তখন আর শংকর নিজেকে সামলাতে না পেরে বাবার ঘাড়ে হাত রেখে গর্জে ওঠে — "বেরিয়ে যান ... এখনি বেরিয়ে যান।' ... আর এক দণ্ড এখানে নয়" *(পৃ. ৩০, ঐ)*। অস্নাত, অভুক্ত শংকর মায়ের এই করুণ দশায় মর্মাহত হয়ে অফিসের পথে পা বাড়ায়।

বিকেলে অর্ধেক অফিস সেরে মায়ের জন্য চিন্তিত অবস্থায় যখন বাড়ি ঢোকে শংকর, তখনকার দৃশ্য যেন তাকে বিস্ময়ের অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত করে। মহোৎসাহে তার মা-বাবা সমস্ত জিনিস, বিছানাপত্র বাঁধাছাঁদা করছে। অর্থাৎ শংকরের এই একবেলা অনুপস্থিতির সুযোগে সেই দৈত্যটা এই বন্দিনীটাকে একেবারে গ্রাস করে ফেলেছে। তারা কোথায় এবং কেন যাচ্ছে জানতে চাওয়া হলে — তার মা যেন বরফ কেটে কেটে ঠাণ্ডা ভাবে তৈরি করে কথাগুলো বললেন — "গলা ধাক্কা খেয়ে যাওয়ার আগে মানে মানে যাওয়াই ভালো! গুরুলঘু জ্ঞান যেখানে নেই, সেখানে — কোন্ সাহসে থাকবো বল? ..." *(পৃ. ৩১, ঐ)*। সারাজীবন ধরে দেখা মাকে যেন এই মুহূর্তে তার বড্ড অচেনা বলে মনে হচ্ছে। মাকে উদ্ধার করে সুখে রাখবার আশায় পড়াশোনা বাদ দিয়ে রোজগারের চেষ্টা এবং আরো অনেক অনেক সুখে রাখবার জন্য দুচোখ ভরে স্বপ্ন দেখা তার কাছে মিথ্যে হয়ে গেল। সারাটি জীবন ধরে যে স্বামীকে অবহেলা আর অপমান করে এসেছে, কিন্তু একবারের জন্যও তার দুঃখ হয়নি, অথচ আজ সন্তানের হাতে সেই স্বামীরই অপমান হতে দেখে চারুবালার ভেতরে যেন অন্য আর এক চারুবালা জেগে উঠল। স্বামীর দেওয়া রাশি রাশি অপমান তিনি ভুলে গেলেন এবং নিমেষের মধ্যে যেন পতিপ্রেমে ব্যাকুলা হয়ে উঠলেন। এই মা শংকরের প্রায় অপরিচিতই বলা চলে। এখানে এই চিত্রই মূর্ত হয়ে ওঠে যে, বাঙালী হিন্দু নারীরা কেমন সামান্য কারণেই নিজের পাহাড় প্রমাণ অপমানকে ভুলে যায় স্বামীর প্রতি অনুরক্ত হয়ে। এই আত্মসম্মান পুরাতন ধারা অনুসরণেই থেকে গেছে।

'কাঁচ পুঁতি হীরে' এই নামে আশাপূর্ণা দেবীর একটি গল্প সংকলন গ্রন্থও রয়েছে। এখানে এই নামকরণে রয়েছে একটি গল্প। নারী-চিত্তরূপের বৈচিত্র্য নিয়ে এখানে দেখা দিয়েছে শমিতা। শমিতা ও দীপক একত্রে জীবন-যাপন করে, কিন্তু তারা বিবাহিত নয়। সেই শমিতাই তার প্রাক্তন ভাসুরের মেয়ের বিয়েতে যাবার জন্য ক্ষেপে উঠেছে। তার শ্বশুরবাড়ি ছিল মুঙ্গের এবং ছেলেপক্ষের দাবী অনুসারে তারা কোলকাতায় এসে বাড়ি ভাড়া করে মেয়ের বিয়ে দিচ্ছে। আর সে সংবাদ শমিতা জানতে পারে দীপকেরই এক বন্ধুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ পত্র দেখে। শমিতা অনেক বলে দীপককে রাজি করায় যে, সে সেই বিয়ে বাড়িতে যেতে পারবে। তার পছন্দ মতো উপহারও কিনে আনে — নকল জড়োয়া সেট, যাতে আসল মণি-মুক্তোর বদলে আছে কিছু কাঁচ-পুঁতি। শেষ পর্যন্ত শমিতা সে বাড়িতে গিয়েছে, দীপকই তাকে নিয়ে গেছে। শমিতা আসলে সেই বাড়িতে গিয়ে দেখতে চেয়েছে তাকে ঘিরে সকলের মধ্যে কেমন প্রতিক্রিয়া জন্মায়। অনেকদিন আগে ছেড়ে আসা সংসার, স্বামী, ভাসুর, জা — এদের কাছে তার প্রতিমূর্তিটা এখন কেমন? এদের সঙ্গে তার সম্পর্কটা কেমন ছিল? আসল, না, সবই কাঁচ বসানো হীরের মতো। বিয়ে বাড়িতে এত লোকের মাঝে যদি তাকে দেখে সকলেই বিরূপ হয় তবে কি কি ধরনের উত্তর দেবে, তাও নিজের মনের মধ্যে সব সাজিয়ে গুছিয়ে রেখে দিয়েছে। এত বছর পরে লব্ধ এই সুযোগটা সে ছাড়তে চাইছে না। স্নেহের আতিশয্যও এতে রয়েছে, ফুলু মেয়েটা কাঁচ, পুঁতির গয়না খুব ভালোবাসত বলে সে ধরনের গয়নাও কিনেছে।

বিয়ে বাড়িতে গিয়ে শমিতা সকলের সঙ্গে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল এবং প্রত্যেকের কাছ থেকেই প্রায় নিরুত্তাপ আতিথেয়তা লাভ করল। কিন্তু এরূপ ব্যবহার সে আশা করেনি, ফলে বুঝতে পারছে না, সে তাদের কাছে কোন স্থানে অবস্থান করছে। শমিতাকে দেখে "ফুলু প্রথমে অচেনা চোখে তাকালো, তারপর বোকাটে ফ্যাল-ফ্যাল চোখে।" বিয়ের কনে, শমিতার এত আদরের ফুলু পর্যন্ত চমকালো না। ভাসুরপো দেবুর বৌ যখন মিষ্টি নিয়ে এল, শমিতা খেল না, কিন্তু সেজন্য কেউ পীড়াপীড়ি করল না; শুধু কনের মা বলল "বিয়েবাড়ি এসে মিষ্টিমুখ করতে হয়।" *(পৃ. ১৭৫, স্বনির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্প)*। এমনকি কনের কাকা যে শমিতার স্বামী ছিল এককালে, সেও আসার কারণ জানতে তো চাইলই না বরং শমিতার মুখে সে কেন এসেছে জানতে চাওয়ায় বলল — "জিগ্যেস করবার কি আছে? ফুলু খুব আদরের ছিল — বিয়ে হচ্ছে শুনে থাকবে কোথাও। দেখতে ইচ্ছে হয়েছে —"। রাগে আক্রোশে শমিতার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল — "ওঃ তাই! দয়া! মহানুভবতা!" — *(পৃ. ১৭৬, ঐ)*। হয়তো ফুলুর মায়ায় পড়ে বিয়েবাড়িতে এসেছে শমিতা, এমন তো অনেকেই আসে বিয়েবাড়িতে, যাদের মালিক পক্ষ থেকে করুণা জানানো হয়। এই মানসিকতাটাই শমিতার কাছে সবচেয়ে অপমানকর বলে মনে হয়েছে। সেটা দীপকও বুঝতে পেরেছে। তাই সে বলেছে তার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করাটাই হয়েছে অপমানের, এও বলেছে — "মানে, সব অভিযানটাই ব্যর্থ। যা

চেয়েছিলে হল না।" *(পৃ. ১৭৭, ঐ)*। শমিতা যে হেরে গেছে এবং সে যে দীপকের কাছে লুকিয়ে সত্যকার জড়োয়া সেট ফুলুকে দিয়েছে, এটাও দীপক ধরতে পেরেছে। শমিতা দীপকের সঙ্গে সংসার করলেও তার কাছ থেকে লুকিয়ে অতি সঙ্গোপনে মনের অন্তঃস্থলে যে তার প্রথম প্রেমই জাগরূক করে রেখেছে, তা একসঙ্গে অনেকগুলো দিন থাকা দীপকের আজ বুঝতে অসুবিধা হল না। নারী যে তার মন-মন্দিরে কীভাবে প্রথম প্রেমের বিগ্রহ তৈরি করে রাখে তা বুঝতে সময় লাগে। প্রেম, প্রথম স্বামী এদের শমিতা সংগোপনে মনের মধ্যে রেখে দিয়েছে, এটা দীপক খুব ভালোই আজ বুঝেছে।

নারীচিত্তের বৈচিত্র্য অনুধাবন করা সর্বদা সহজ ব্যাপার হয়ে ওঠে না, তার একটি প্রমাণ 'আফিং' (১৩৫৩ বঙ্গাব্দ) গল্পে পাওয়া যায়। শিক্ষা দীক্ষার দ্বারাই মানুষ তার রক্ষণশীলতা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়, আবার আভিজাত্যের সঙ্গে কখনো কখনো রক্ষণশীলতা মিলেমিশে একাকার হয়ে যেতে চায়। রক্ষণশীলতা যেখানে থাকবে সেখানে আধুনিক প্রগতিশীলতার কথা আসবেই আর তখনই দুরকমের পরিবেশের সূচনা হয়। তখন লড়াই চালিয়ে যাবার মত মনের জোরের প্রয়োজন হয় প্রাচীনের বিপক্ষে, নয়তো পারিবারিক ধারার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতে হয়। এই বাস্তবতাই সত্য হয়ে উঠেছিল গল্পের মূল নারী চরিত্র সুমিতার ক্ষেত্রে।

দুটো-তিনটে পাশ করা ইউনিভার্সিটির মেয়ে সুমিতা, যে নাকি রূপে না হলেও গুণে সমস্ত দিক দখল করে রয়েছে। মেয়েলি কাজ তথা রান্না-বান্নায়, সেলাই-ফোঁড়াইয়ে এছাড়াও তার শিক্ষাদীক্ষার জগতের লেখাপড়াই শুধু নয়, রবীন্দ্র-নজরুল-গজল-ভজন, কীর্তনাঙ্গ ও নানাবিধ রসের গানেও পটু। মেয়ে হয়েও বাঁশী বাজায় সে। শ্বশুর বাড়ীর কিছু কিছু লোক প্রথম দিকটায় তার নানা গুণপনায় বিভোর হয়ে থাকলেও ক্রমশঃ সুমিতা অন্তঃপুরচারিণীদের প্রচলিত স্রোতে অবগাহন করতে না পেরে পিছিয়ে পড়ল এবং রূপহীনতার সমালোচনায় জড়িয়ে পড়ল। আত্মীয়রা সুমিতার স্বামী সুধীরঞ্জনের কন্দর্প কান্তিরূপের পাশে তার তুলনা করতে লাগল এবং তার ব্যক্তিত্বমণ্ডিত মানসিকতা পরিবারের সকলের কাছে 'সং' ও 'পাগল' বলে পরিচিত হল। কিন্তু সুমিতাকে বোঝার মত মানসিকতা ঐ বাড়ীতে কোন নারীর ছিল না।

সুমিতা একমাত্র চারতলার খোলা ছাদে নিজেকে মেলে ধরতে পারতো রাতের অন্ধকারে আকাশের নক্ষত্রকুলের নীচে। সুধীরঞ্জনের বাড়িতে এতকাল রূপের মাপকাঠিতে পাত্রীর বিচার হোত, এই প্রথম গুণের নিরিখে সুমিতার আগমন। সুধীর প্রেমে সুমিতা নিমজ্জিত থাকলেও তার ভেতরেও যে একটা স্থূল দিক ছিল সেটাও একদা সুমিতার কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। তখন থেকেই ক্রমশঃ তার মধ্যে পরিবর্তন ঘটতে থাকে স্বামীর সম্পর্কেও। সুমিতার এক পিসতুতো ননদ সুধীর কাছে তার স্ত্রী সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে — "কালোয়াতি গানটান গাইতে পারে নাকি শুনলাম।" *(পৃ. ১৯৭, গল্প সমগ্র, ২য় খণ্ড)*।

"সব রকমই পারে" *(পৃ. ১৯৮, ঐ)* — সুধীর মুখে কেমন একটা স্থূল আত্মপ্রসাদের হাসি ফুটে ওঠে, যেটা দেখে সুমিতার হঠাৎ মনে হয় — "কী অশোভন! আর হঠাৎই ওর টুকটুকে ঠোঁটের হাসিটা দেখে মনে হয় পুরুষ মানুষের পান খাওয়াটা কি বিশ্রী বেমানান।" *(পৃ. ১৯৮, ঐ)*। সুমিতার মার্জিত রুচি এভাবেই স্থূল রুচি সম্পর্কে একটা বিতৃষ্ণার জন্ম দিল। আত্মীয়-স্বজনদের কলকোলাহল, অন্দরমহলের মেয়েদের চিরাচরিত কাজ, শিক্ষাদীক্ষাহীনতা — এসবের মাঝখানে বিদূষী সুমিতা যেন কোন প্রাণের ছোঁয়া খুঁজে পায় না। তাই সুধীর আহ্বানে ইচ্ছা-অনিচ্ছার ঊর্দ্ধে উঠে সাড়া দিলেও একসময় এই পরিবার ছেড়ে বাবার হাত ধরে বেরিয়ে যায়। সুমিতার এই বেরিয়ে যাওয়া রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে এক নীরব প্রতিবাদ। কারণ সে একা একটা গোটা পরিবারের বদ্ধমূল ধারণাকে কখনোই পরিবর্তনের স্রোতে আনতে পারবে না। এটাও হয়তো প্রগতিশীলতার পক্ষে একপ্রকারের পরাজয়। সুমিতা আর কোনদিনই ফিরে আসবে না এ বাড়িতে এই কথা বলে তার বাবা তাকে নিয়ে গেলেও শেষ অবধি সুমিতাকে আর ধরে রাখা গেল না। কারণ সমস্ত আধুনিকতা, শিক্ষাদীক্ষার ওপরে জয়ী হয় চিরাচরিত নারীজাতির আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা।

পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তনের পর সুমিতার আকাঙ্ক্ষিত বাড়ি-ঘর-শয্যা যেন তাকে আর পূর্বের ন্যায় আপন করে নিতে পারছে না। সমস্ত কিছু যেন শূন্য মনে হচ্ছে তার নিকট, সেই শূন্যতা হাহাকারের রূপ নিয়ে আছড়ে পড়ল তার বুকে এক ঝড়-জলের রাতে। বিদ্যুতালোকে দেখছে ঘরের শয্যা রিক্ত, নিঃস্ব আর তার সঙ্গেই ভেসে উঠছে সেই রাজকীয় শয্যা যেখানে "আলোয় গড়া মূর্ত্তির আগুনরঙা দুটি বাহু যাকে উদগ্র আগ্রহে বন্দী করে রেখেছে..." *(পৃ. ২০৩, ঐ)*। ঐ মূর্ত্তির নিকট নিজেকে উজাড় করে দিতে চাইছে সুমিতা, আর তাই স্বামীকে চিঠি লিখতে বসে যথাযথ বিরহিণীর মতো। সুমিতা আর বিদূষী নয়, বুদ্ধিমতী নয়, শিল্পী বা ব্যক্তিত্বসম্পন্না কোন নারী নয়, সুমিতা এখন একজন স্ত্রীলোক মাত্র। যদিও সুধী বিদেশ থেকে পড়াশোনা করে আসা, আকাশের চাঁদ বলে একসময় বন্দিত হয়েছে সুমিতার বাবার নিকট, তথাপি আজ আর সুমিতা তার কাছে সাহিত্যের ভাষা ব্যবহার করার প্রেরণা অনুভব করে না।

আসলে এ হচ্ছে শিক্ষিত নারীজাতির পশ্চাদপসরণ। যখন নারীরা মুখে রক্ত তুলে লড়াই করে যাচ্ছে নিজেদের জন্য একটু জমি সংগ্রহ করবার জন্য তখন জমি বিক্রি করে দিয়ে অন্যের অট্টালিকায় স্থান করে নেবার মত অবস্থা দেখা যায় এতে। মানসিক চাহিদাটা জৈবিক চাহিদার নিকট বিক্রি হয়ে গেল। সুধীর উদ্দাম শরীরী ভালোবাসার জীবন আজ সুমিতার কাছে বাঞ্ছনীয়, আর আজীবন যে শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠেছে তা আজ যেন অপাংক্তেয়। এভাবেই হয়তো অনেক অন্দরমহল তার নিজস্ব ধারা বজায় রেখে পার্শ্ববর্তী অনেক মহীরুহকেও সেই স্রোতে টেনে আনে। আবার অনেক নারীরাও নিজের গড়ে তোলা সম্পদকে অবহেলা ভরে নষ্ট করে ফেলে অর্থাৎ

কাঁচকেই হীরে ভেবে হাত বাড়ায়, হীরেকে ফেলে। এখানে সুমিতারও তাই হয়েছে, নিজস্ব জগতের চাইতে তার পক্ষে অনভিপ্রেত পৃথিবীই আজ কাঙ্ক্ষিত হয়ে উঠেছে।

নারী-পুরুষ সমান সমান, সর্বত্র তাদের সমানাধিকার দিতে হবে। নারীরা তা নানাভাবে অর্জনও করে নিচ্ছে। স্কুল-কলেজ-অফিস-আদালত থেকে শুরু করে বিশাল কর্মজগতের প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে তাদের অবাধ যাতায়াত। জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে আজ নারীদের কোমল হাতের স্পর্শ লেগে রয়েছে। 'মলাট' (১৩৫৬ বঙ্গাব্দ) গল্পে আশাপূর্ণা দেবী তাই বলতে চেয়েছেন যে, কর্মজগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়লেও সৃষ্টির জগতের সঙ্গে কিন্তু তাদের নিবিড় যোগাযোগ নেই।

অনীতা বিশিষ্ট একজন লেখকের স্ত্রী। তার নিজস্ব একটা সমাজ আছে। বন্ধু-বান্ধবী-প্রতিবেশী সকলকে নিয়ে। একদিন এমনই এক বান্ধবীর বাড়ি থেকে ফিরে এসে স্বামীর লেখার ঘরে হানা দিলেন হন্তদন্ত হয়ে, কারণ, তিনি একটি ম্যাগাজিনে বিতর্কিত একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। যা নাকি বোধের দিক থেকে এখনো ঊনবিংশ শতাব্দীর চিন্তাধারার সঙ্গে যুক্ত বলে মনে করছেন অনীতার পরিচিত মহল। কারণ তার স্বামী লিখেছে— "জ্ঞানের রাজ্যে মেয়েরা ভিক্ষাজীবী। 'গ্রহণ' আছে 'দান' নেই" *(পৃ. ১৩৬, গল্প সমগ্র, ৩য় খণ্ড)* —এই যুক্তির নিরিখে লেখক স্বামীটি বলতে চাইছেন — মেয়েরা যা প্রস্তুত আছে তা নিতে পারছে, তাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়ে নিজেদের পরিপুষ্ট করছে। কিন্তু যে পুস্তক পাঠ করে জ্ঞানার্জন করছে, সে ধরনের পুস্তকাদি রচনায় তাদের উৎসাহ নেই। যে অন্তরীক্ষে কর্মজগত খুলে বসেছে, সেখানকার কারিগরি জগতের উন্নয়নে কোন দান নেই। অর্থাৎ কর্মে কেবল নিজেদের যুক্ত করে বিস্তার লাভ ঘটাচ্ছেন কিন্তু সিসৃক্ষু মনোভাব নিয়ে নতুন পরিকল্পনায় যুক্ত হচ্ছেন না। আর এই কথাটাই অনীতার স্বামী 'মনীষা ও বঙ্গনারী' প্রবন্ধে বলতে চেয়েছেন। অনেক তর্ক-বিতর্কের পর অনীতা সম্পূর্ণ নিজের উদ্যোগে ও প্রচেষ্টায় একটা মাসিক পত্র বের করবে বলে বসে। তার স্বামী যা বলে এসেছে — পুরুষদের সাহায্য ছাড়া নারীরা কোন সৃজনাত্মক কর্মে সাফল্য লাভ করতে পারে না। তার সত্যতা প্রমাণের জন্য ম্যাগাজিন প্রকাশ করার কথায় বলেন — "সে কি গো আমি যে আজকাল বড্ডো ব্যস্ত রয়েছি।" অনীতা ঝংকারের সঙ্গে বলে — "তোমার সাহায্য কে চায়? সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় পারি কি না দেখো।" — *(পৃ. ১৪০, ঐ ৩য় খণ্ড)*।

সত্যিই একদিন চায়ের টেবিলে একখানা হৃষ্টপুষ্ট মাসিক পত্রিকা দেখা গেল, চকচকে রঙীন মলাটে ঢাকা। অনীতা এবারে অসাধ্য সাধন করে ফেলেছে — স্বামীকে না জানিয়ে তার কাছ থেকে 'আর্থিক সাহায্য না নিয়ে আস্ত একখানা বই প্রকাশ করে ফেলেছে। প্রচেষ্টার এই সাফল্য আনন্দজনোচিত হলেও অনীতার হাতের সম্পূর্ণ কাজটুকু করে দিয়েছে তার নিমাই ঠাকুরপো। অতএব স্বামীর ভূমিকা না থাকলেও কোন না কোন পুরুষের হস্তক্ষেপেই ঘটনাটি ঘটেছে। একের পর এক পত্রিকার সংখ্যা

প্রকাশিত হয়ে চলছে। নিমাই যথাযথভাবে দায়িত্বপালন করে চলছে, তথাপি একসময় অনীতা যেন হাঁপিয়ে উঠল। কারণ সমস্ত পত্রিকাখানি শুধু নারীদের লেখা দ্বারা পরিচালিত করবে, কোন পুরুষের লেখার সাহায্য নেবে না ঠিক ছিল। সেইমতোই চললেও একদা দেখা গেল শুধুই রূপচর্চা, সেলাই ফোঁড়াই, রান্নাবান্না, গৃহসজ্জা, নানাবিধ রোগ ও অন্যবিধ সমস্যার প্রতিরোধের উপায় রয়েছে। অনীতার স্বামী এসব দেখতে দেখতে হারিয়ে যান রসুন, আদা, লঙ্কার অরণ্যে। শুধু এ সমস্ত দ্বারা যে কোন পত্রিকা চলতে পারে না, সেটা অনীতা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে। তাই হয়তো বলছে— "উঠিয়ে দিলাম। ইচ্ছে করেই দিলাম। তোমার সঙ্গেই একমত হয়ে যাচ্ছি ক্রমশঃ।" *(পৃ. ১৪৪, ঐ, ৩য় খণ্ড)*। অর্থাৎ সাহিত্যের ও অন্যান্য ক্ষেত্রের সৃজনশীলতায় নারীর অবদান যে কম তার কাছে আজ সেকথা সত্যই বিশ্বাস্য বলে মনে হচ্ছে। অনীতা ক্রমশঃ বুঝতে পারছে শুধুমাত্র প্রশ্ন এবং উত্তরের দ্বারা 'প্রশ্নোত্তর' (পত্রিকাটির নাম) চলতে পারে না, সাহিত্যের গোত্রভুক্ত হতে গেলে সত্যিকার সাহিত্যই প্রয়োজন।

কোন নারী বর্তমান সভ্য সমাজে যতই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে থাক না কেন সে যদি সংসারের হাল ধরে না থাকে, অতিথি এলে আতিথেয়তা না করে, রোগে স্বামী-সন্তানের সেবা না করে, আত্মীয় বৎসল না হয়, এবং মাঝে মধ্যে সুস্বাদু পদ রান্না করে সংসারের লোকেদের মুখের সামনে তুলে না ধরে তবে তো সে আদর্শ মা, স্ত্রী, বধূই নয়। তাই হয়তো 'বিরাট' 'মহৎ', 'অসাধারণ' নয়, মেয়েলী মেয়েই প্রায় সকল পুরুষের পছন্দ। নারীরা প্রতিভার জ্যোতির্লোক থেকে নয়, পতিব্রতার বলয় থেকে সংসারে বিকশিত হোক এটাই যেন পুরুষের কাম্য। তাই হয়তো অনীতার স্বামী বলছে— "তাহলে চুপি চুপি বলি অনীতা, আমাদেরও ওটা মলাট। ... মুখে যতই বড়ো বড়ো কথা বলি আজও ... আমরা মনেপ্রাণে চাই — চিংড়ির চিত্তহারিণী'র মধ্যেই আমাদের চিত্ত হরণ করো তোমরা।" *(পৃ. ১৪৬, ঐ)*। নারী যদি তার নারীত্ববোধ হারিয়ে ফেলে তবে সংসার অচল — একথাই বলতে চাওয়া হচ্ছে। কিন্তু নারী 'মা' হয়ে মাতৃত্বের দায়িত্ব যতদিন পালন করে যাবে ততদিন সংসারকে ধরে রাখবেই। 'মলাট' গল্পের মলাটখানি অটুট থাকলেও বর্তমান সমাজে নারীরাও গ্রহণের পাশাপাশি সামান্য হলেও দান করতে সক্ষমা হচ্ছে। যদিচ নারীরা শিক্ষিতা আধুনিকা হলেও অত্যন্ত স্বল্পসংখ্যকই মলাটের বাইরে বেরতে পারছে বা বেরতো চাইছে।

নারীর অভ্যন্তরে গলিঘুঁজির সন্ধান হয়তো নারীর নিজেরই অজানিত থাকে, তাই রমলার পুরানো ভাড়াবাড়ি ছেড়ে তার সাধের নতুন ভাড়াবাড়িতে যাওয়া আর হয়ে উঠল না। **'বাড়ীভাড়া'** (১৩৬২ বঙ্গাব্দ) গল্পে লেখিকা আশাপূর্ণা দেবী এমনটাই বলতে চেয়েছেন। রমলার অনেকদিনের সাধ, ভালো একখানা বাড়িতে সংসার পাতবে। বিয়ের পর থেকে এসে পুরানো একটা বাড়িতে শাশুড়ী, ননদদের নিয়ে রয়েছে। তখন স্বামী সুরেশের আয়ের তুলনায় দায় ছিল অনেক বেশি; দুই ননদের বিয়ে, শাশুড়ীর মৃত্যু অনেক বাধা-বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়ে গেছে। আর সেজন্যেই অনেক

তাগাদা দিয়ে, সুরেশকে ছুটির দিনগুলোতেও উদয়াস্ত পরিশ্রম করিয়ে একখানা ভালো বাড়ির সন্ধান করেছে। বাড়ি বদলের জন্যে যখন প্রচুর পরিশ্রম গোছগাছ চলছে, সে সময় একদিন ছোট ননদ বেড়াতে এল; পাশের পাড়াতেই তার বিবাহ হয়েছে। দাদা-বৌদি, যারা মা-বাবার মতো মাথার ওপরে ছিল, তাদের চলে যাওয়ার সংবাদে সে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছে। এই মনোভাবে ননদের প্রতি রমলার মনে মনে রাগ হয়, দাদা-বৌদি একটু ভালোভাবে থাকবে ভেবে কোথায় আনন্দ করবে, কিন্তু তা না করে দুঃখ পাচ্ছে। এটা ঠিক নয়। ছেলেবেলার খেলার দু'একটা সামগ্রী হাতে নিয়ে বৌদিকে প্রণাম করে যাবার সময় ফিকে হাসি হেসে শুধু বলে গেল — "—আমার বিয়ের 'বসুধারা'টা রয়ে গেল এ বাড়ীর দেওয়ালে!" *(পৃ. ২৪৯, গল্প সমগ্র, ৪র্থ খণ্ড)*। ক্রমশঃ আনমনা হয়ে আসা রমলা দরজায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে যখন ঘরে এলো, ভাঁড়ার ঘরে পাশাপাশি আরো কয়েকটা বসুধারা দেখতে পেল। ছোট, মেজ ননদ, সুরেশের বিয়েরটা বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে, আর কোণের দেওয়ালেরটা বিয়ের নয়, অন্নপ্রাশনের।

রমলা যেন স্মৃতির অতলে তলিয়ে যেতে থাকে, সাতমাসের টোপর পরা শিশুটির মুখ কোনমতেই যেন মনে করতে পারে না। তিন-চারটি সন্তান পরে কোলে আসায় সেই কথা ভুলে গেলেও নতুন করে যেন মনটা উদাস হয়ে গেল। সমস্ত গোছগাছ করা হলেও ননদের প্রতি মমতায়, গত হয়ে যাওয়া সন্তানের প্রতি কোমল স্নেহে রমলা এমন এক জগতে হারিয়ে গেল যে, তার চোখের রঙীন স্বপ্নের জাল যেন ফিকে হয়ে আসতে শুরু করল। আর তাই অফিসফেরতা সুরেশ যখন মুটে, কুলি, গাড়ী নিয়ে এসে হাজির হয়, তখন শিথিল ভঙ্গীর রমলা বলে ওঠে — "ভাবছি গিয়ে আর কি হবে? থেকেই যাই না?" *(পৃ. ২৫২, ঐ)*। সংসারের লাভ-লোকসানের, আয়-ব্যয়ের হিসেব করা, সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে দিনাতিপাত করার চাইতে ভাঙ্গা ঘরে সকলের স্নেহ-ভালোবাসা, মৃত সন্তান, দেওর, শাশুড়ী, বিবাহিতা ননদ এদের শেকড়গুলো উপড়ে ফেলতে বুকের ভেতর যেন টনটন করে উঠলো, নতুন রমলাকে যেন দেখতে পেল সুরেশ।

বিবাহের পর স্বামীর ঘর করতে এসে যদি কোন মেয়ে স্বামীকে সর্বদাই কাছে না পায় তবে তার মনে স্বামী-সন্তান সহ একটি সুখের সংসার রচনা করার সাধ জন্মাতেই পারে। তেমনি স্বপ্ন দেখেছিল **'বদ্ধপাগল'** (১৩৬৩ বঙ্গাব্দ) গল্পের শকুন্তলা। বিয়ের পর থেকে শ্বশুর-শাশুড়ী তারপর ছেলে — এদের নিয়েই সংসার ধর্ম করে যাচ্ছে, কিন্তু মনের কোণে সযত্নে লালিত রয়েছে নিজের স্বাধীন সংসার রচনার স্বপ্ন। তাকে বাস্তবায়িত করতে এবার উঠে পড়ে লেগে গিয়েছে সে। স্বামীকে অনেক বলে কয়ে রাজি করাল। স্বামী সন্তোষও কোলকাতায় একটা ফ্ল্যাট বাড়ী ঠিক করে স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে যেতে এল। কিন্তু তিন বছরের ছেলে বিল্টু দাদু-ঠাকুমাকে ছেড়ে যেতে হবে বলে রাগে-রোষে চিৎকারে বাড়ী মাথায় করে তুললো। কিছুতেই সেদিন বিকেলে আর যাওয়া না হওয়ায় বাঁধা-ছাঁদা

জিনিসপত্রের পাশে শকুন্তলাও গোমড়া মুখে বসে রইল। দাদু-ঠাকুমার কিন্তু অন্য দৃশ্য, নাতি নিজে থেকে যেতে না চাওয়ায় পরোক্ষে যে তাদেরই জয় হল, এটা আচার-আচরণে প্রকাশ হয়ে যেতে শুরু করল।

কিন্তু পরদিন সকালেই ছেলে নিজে থেকে এসে বাবাকে বলল — "আমি রেলগাড়ি চড়ে কোলকাতা যাবো।" *(পৃ. ২৭৬, গল্প সমগ্র, ৪র্থ খণ্ড)*। সন্তোষকে যেন শান্তির বারি প্রদান করল তার পুত্র; কারণ গতকাল যেতে অসমর্থ হয়ে শকুন্তলা ক্ষেপে গিয়ে বলতে শুরু করে ছেলেকে রেখেই সে নিজে একা কোলকাতায় যাবে। সকলের জন্য নিজের জীবনের স্বপ্ন মধুর দিনগুলোকে এভাবে বিফলে যেতে দেবে না। ছেলে রাজি হওয়ায় সমস্যা মিটে গেল এবং গোরুর গাড়ী চড়ে তারা রওনা হল, সঙ্গে এগিয়ে দিতে গেলেন সন্তোষের বাবা নিশিকান্ত। অনেকটা পথ যাওয়ার পর যখন ফেরীঘাটে পৌঁছলেন তখন নাতির জন্য দাদু ঘুরেফিরে শালপাতার 'দোনা'য় 'পক্কান্ন' আর 'মেঠাই' সংগ্রহ করে আনলেন। ছেলে আড়ষ্ট অবস্থায় বাবাকে যাত্রাকালে প্রণাম সারলেও নাতির প্রণাম নেওয়া পর্যন্ত নিশিকান্ত দাঁড়াতে পারলেন না। তার দ্রুতগতিতে প্রস্থান আর জামার হাতায় বারবার চোখ মোছা শকুন্তলাকে কেমন বিমূঢ় করে দেয়। স্বামীর ডাকে সম্বিৎ ফিরে আসে, কিন্তু কোলকাতা যেতে অস্বীকার করেন। সন্তোষ রেগে তীক্ষ্ণস্বরে শুধোয় — "জিজ্ঞাসা করি, আমি পাগল না তুমি পাগল?" স্বামীর প্রশ্নের উত্তরে শকুন্তলা বলে, "তা বোধকরি আমিই। বদ্ধ পাগল! কিন্তু শোনো আর দেরী কোর না। বাবা হেঁটে ফিরছেন, আটকাও ওঁকে। সেই তো ফিরবোই আমরা, উনি কেন আর শুধু শুধু একলা একলা — " *(পৃ. ২৭৮, ঐ)*।

এই যে পরিবর্তন, যে আত্মসুখের সন্ধানে শিকড় ছিঁড়ে, গ্রাম ছেড়ে শহরের পথে পা বাড়িয়েছিল — নিজের অনুভূতি থেকেই একটা কল্যাণময়বোধ তাকে আবার পূর্বস্থানে ফিরিয়ে আনল। যে মূল স্বহস্তে উৎপাটিত করেছিল, তাকে পুনরায় মৃত্তিকার সঙ্গে সংযোগ সাধন করে দিল। তার মনে হল, একা নয়, একা একা মানুষ বাঁচতে পারে না, সকলের সঙ্গে থাকলেই বিকাশ ঘটে মনুষ্যত্বের। পিতা-মাতার স্নেহ-আবেগ-ভালোবাসা-অমূল্য সম্পদ মহীরুহের ছায়ায় বৃক্ষ-শিশুর বেড়ে ওঠাই অনেক ভালো। সেখান থেকে উৎপাটিত করে কৃত্রিমভাবে জল-আলো দিলেও তা সত্যিকারের গন্ধ ছড়াবে না। আর তাই হয়তো শকুন্তলা বলে ওঠে যাওয়ার জেদের কথা মনে করে — "মনের মধ্যে আর যেন মোটেই জোর পাচ্ছি না।" *(পৃ. ২৭৮, ঐ)*। নারীচিত্ত যে কোমলে-কঠোরে তৈরি এটাও তার একটা প্রমাণ। আর নারীর অন্দরমহলের গতিবিধিই যে সংসারের আবর্তনকে অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে, তাদের মনের অবস্থা যে নিমেষেই পরিবর্তিত হতে পারে — এটাও বিবেচ্য বিষয়।

পুরানো অট্টালিকার চিহ্ন যখন ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলে তখন কোথাও বালি পলেস্তারা খসে

পড়ে যায় এবং বছরের পর বছর সেখানে ঝড়-জল-রোদের আঘাতে তা শ্রীহীন রুক্ষ হয়ে পড়ে। তেমনি অবস্থায় রয়েছে **'মধ্যবিত্ত'** (১৩৬৩ বঙ্গাব্দ) গল্পের নির্মলা। তিন বোন এক ভাইয়ের মধ্যে নির্মলা মেজ। বড় এবং ছোট বোনের অবস্থা বেশ স্বচ্ছল, তাদের বাড়ী গাড়ীও রয়েছে, কিন্তু তাদের কাছে নির্মলা যেন চুনোপুঁটি। বাড়ি-গাড়ী, আর্থিক স্বচ্ছলতা — কোনটিই তার নেই, তথাপি সুন্দর স্বভাবের নির্মলা সমস্ত কিছু মানিয়ে নিয়েছে। স্বামীকে কোন কারণে ধার বা হঠাৎ খরচের হাতে যাতে পড়তে না হয়, তাই অনেক হিসেব করে সে সংসার পরিচালনা করে। দুই বোনে ভাইফোঁটায় ভাইকে জরিপাড় ধুতি দিয়ে থাকে কিন্তু নির্মলা একখানা মিলের ধুতিও দিতে পারে না, বাপের বাড়িতে প্রায় সকলের কাছে মুখ না থাকলেও অপ্রতিভ হয় না। কিন্তু সহজ, সরল উদারভাবে চললেও এক সময় অভাব যেন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে তার নখদন্ত বিস্তার করে প্রকাশ পেতে থাকে।

বিবাহে অনিচ্ছুক থাকায় অনেক সাধ্য সাধনা করে রাজি করিয়ে শেষে ভাইয়ের বিয়ে ঠিক করে মা-বাবা নির্মলার বাড়িতে নেমন্তন্ন করতে আসে। তিন ছেলে-মেয়ে নিয়ে গিয়ে যেন মেয়ে-জামাই ছ'সাতদিন আনন্দ-হুল্লোড় করে কাটিয়ে আসে। রবিবারের সকাল থাকায় নির্মলার স্বামী শচীন বাজারে গিয়েছিল আর তাই দেখা হয়নি শ্বশুর শাশুড়ীর সঙ্গে। কিন্তু অগ্নিতে ঘৃতের সংযোগ যেন সেখান থেকেই ঘটল। রবিবার ছুটির দিনে এসেও মা-বাবার সঙ্গে স্বামীর সাক্ষাৎ না হওয়ায় নির্মলার মধ্যে ক্ষোভ সঞ্চিত ছিল; বাজারের সবজির কচু, ঘেঁচু দেখে সেই ক্ষোভ ঠিকরে বেরিয়ে আসতে শুরু করল। এত কষ্ট সহ্য করেও যে নির্মলা সর্বদা হাসিমুখে থেকেছে, সে কখনো বলেনি স্বামীর অক্ষমতার কথা; যে আদরে ভালোবাসায় ভরিয়ে তুলেছিল, সে সহসা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো দপ করে জ্বলে উঠলো। রবিবার তাদের বাড়িতে চাঁদের হাট বসে দারিদ্র্যের শত জ্বালাকে উপেক্ষা করেও; অথচ সেদিন সামান্য একটা অপ্রীতিকর ঘটনায় স্বামীর সঙ্গে বচসা হয়ে গেল, ছেলেমেয়েদের কটু ভাষায় গালি দিয়ে, নিজের ক্ষুধার আহার ফেলে রেখে ভাঁড়ার ঘরের মাটিতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল নির্মলা। সন্তানেরা তাদের অচেনা মাকে দেখে আশ্চর্য হল। উপায়ান্তর না পেয়ে শচীন দেরাজের চাবিটা নিয়ে নিজের বিয়ের আংটিখানা বের করে। রাস্তায় যেতে যেতে এর পরিমাপ দেখে নিয়ে ভাবে, একজোড়া আধুনিক ডিজাইনের কানপাশা আর তিন ছেলেমেয়ের সিল্কের জামা হয়তো হয়ে যাবে, কারণ আংটিখানা হীরে বা জড়োয়ার না হলেও সোনা আছে বেশ কিছুটা। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে এসে বিনাবাক্যে নির্মলার কাছে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে। ঘটনার পরদিন সকালবেলা এগুলো কিনে বেরিয়ে গেলেও বেশ কিছুক্ষণ পর ঝড়ের বেগে এসে ঘরে ঢুকলো, কারণ সপরিবারে শ্বশুরবাড়ি যাবে বলে। আর নির্মলা এই জিনিসগুলো পাবার পর থেকে ভেবেই চলেছে এর উৎসের সন্ধান। কারণ শচীনের রোজগার, সঞ্চয় — সমস্ত কিছুই তার জ্ঞাতব্য; কিন্তু অকস্মাৎ এতটা খরচ করে ফেলবার ক্ষমতা যে তার নেই, এটা খুব ভালো জানে। তখনই তার মনে নানা

প্রশ্ন, নানা চিন্তার স্রোতের জন্ম হল। কোন অতলে যেন তলিয়ে যেতে থাকলো নির্মলা। কিন্তু শচীন ঘরে প্রবেশ করেই যখন দেখে ছেলেমেয়েরা শুকনো মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে, নির্মলা ঘরে জানালার দিকে তাকিয়ে কাঠ হয়ে বসে রয়েছে, বাপের বাড়ি যেতে অসম্মতি প্রকাশ করেছে তখনই কেমন যেন হিংস্রতা পেয়ে বসল তাকে। ছেলেমেয়েদের নিয়ে ওবেলা বরযাত্রী যেতে অনুরোধ করল স্বামীকে আর শারীরিক অসুস্থতার জন্য সে যেতে পারবে না তা জানাল। কিন্তু এটা কোন সমস্যার সমাধান নয়। নিজে বুদ্ধি খাটিয়ে নিজের অমন একটা ভালো জিনিস নষ্ট করে শ্বশুরবাড়িতে স্ত্রীর সম্মান রক্ষার চেষ্টা করেছে অথচ কৃতজ্ঞতার বদলে যখন স্ত্রীর বিপরীতে ব্যবহার লক্ষ করা গেল তখন শচীন বলে ওঠে — "আবার কিসের খোঁচ উঠলো মনে? নিজের বেনারসী শাড়ী নেই, তাই?" *(পৃ. ২৮৩, ঐ)* । ধিকিধিকি আগুনের এবার প্রজ্জ্বলন ঘটল, বাপের বাড়ি থেকে গতবার পুজোয় পাওয়া একখানি মাত্র সাধারণ শাড়ী স্বামীর গায়ের ওপর ছুঁড়ে মেরে বলল — "এই একখানা শাড়ী পরে বিয়ে বাড়িতে পাঁচদিন ঘুরে বেড়াতে পারলেই খুব মনুষ্যত্ব প্রকাশ পায়, কেমন? গৌরবে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে তোমার! লজ্জা করে না বড়ো বড়ো কথা কইতে?" *(পৃ. ২৮৪, ঐ)* । অবচেতন মনে দীর্ঘদিন সঞ্চিত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটল উদ্ভূত পরিস্থিতিতে; কিন্তু নির্মলা তো এতক্ষণ বসে বসে এসব কথা ভাবে নি? নিজের পানে ফিরে তাকায়নি, স্বামীর মঙ্গল-অমঙ্গলের কথাই ভেবে এসেছে। এখানেও লেখিকা দেখিয়েছেন সেই ভাঙা দেওয়ালেরই কথা, যার ওপর দিয়ে বছরের পর বছর ধরে শুধু ঝড় জলই বয়ে যাচ্ছে, নতুন করে পড়ছে না কোন পলেস্তারা, তেমনি অবস্থা তো নির্মলারও। শচীন ঘরে আসার একমুহূর্ত আগেও যে নিজের শাড়ীর কথা ভাবে নি, ঘরের একটিমাত্র জানালার সামনে যে ইঁট বের হওয়া দেওয়ালটা দাঁড়িয়ে আছে নির্মলা সেটাই দেখছিল। কল্যাণকর দিক নিয়ে সে ভাবলে কি হবে, পরিবেশ পরিস্থিতি তো তার অবনমন ঘটাচ্ছে, যা নাকি অনিচ্ছাকৃতভাবে অনেক নারীরই জীবনে ঘটে থাকে।

প্রায় প্রতিটি নারীই তার নিজের সংসার রচনার মধ্য দিয়ে শিল্পকর্মকে ফুটিয়ে তুলতে চায়, বর্তমান সময়ের, সমাজের পরিবারগুলো যে এককভাবে চলছে তাতে নারীদের সংসারকে সাজিয়ে গুছিয়ে রেখে আত্মতৃপ্তি অনুভব করার অনেক স্বপ্ন সার্থক হচ্ছে। কিন্তু আরো আগে সে সাধ থাকত চাপা। কারণ একান্নবর্তী সংসারের মধ্যে শাশুড়ী পরিবৃত থাকতেন বধূ-নববধূরা; তদুপরি প্রায় প্রতিটি সংসারেই থাকত বিধবা, বালবিধবা পিসিশাশুড়ী আর ননদরা। **'যুগলপাত্র'** (১৩৬৩ বঙ্গাব্দ) গল্পে তেমনি এক পিসিশাশুড়ীর ঘর করছে এক ভাইপোবৌ। স্নেহাংশু আর শিপ্রা দেড়খানা ঘরে পিসিমাকে নিয়ে সংসার পাতলেও তা আসলে পিসিমারই সংসার। শিপ্রাকে শুধু সংসার পরিচালনার ক্ষেত্রে শুচিবাতিকগ্রস্ত পিসিমার নির্দেশ পালন করতে হয়। বিবাহের পর চার বছর গত হলেও বাইরে যাওয়া বা পিসিমার নির্দেশনামা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে নি শিপ্রা। তাই তার সাধ, একবার দিন

কয়েকের জন্য বাইরে গিয়ে নিজস্ব সংসারের সাধ এবং ঘুরে আসার ইচ্ছাটাও পূরণ করে। সন্তানের আগমনবার্তা ঘোষিত হয়ে গিয়েছে, পরে হয়তো আরো যাওয়া হবে না, তাই বাইরে যাবার আয়োজনের বেশ তৎপরতা রয়েছে স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই। আর তার জন্য চলছে আয়োজন। বেড়াতে যাবার সাধের সঙ্গে যে বাসনা জুড়েছে তা হল — "অন্ততঃ এক সপ্তাহ একা সংসার করে দেখিয়ে দেবে শিপ্রা — 'শুধু দুজনে'র সংসার কতো হালকা, সুরুচি সম্পন্নভাবে চালনায় কতো আনন্দ!" *(পৃ. ২৮৬, গল্প সমগ্র, ৪র্থ খণ্ড)*।

চার বছরের সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার শেষে দিন কয়েকের ছুটির আবেদন মঞ্জুর হয়ে গেল। শিপ্রার সমস্ত গোছানো শেষ, বাড়ী পাহারায় কে থাকবে তা ঠিক করাও শেষ, কিন্তু অভিভাবিকা পিসিমাকেই যে জানানো হয়নি। দায়িত্বটা স্নেহাংশু নিলেও পিসিমাকে নিজেদের কথা জানাতে না পেরে বরং তাকে নিয়ে তার বাল্যকালের শ্বশুরবাড়ি ভগবান গোলায় যাওয়ার আর্জি মঞ্জুর করে এল। শিপ্রা স্বামীকে নিয়ে বাইরে কোথাও ক'দিনের জন্য বেড়াতে যাবে ও স্বহস্তে সাজিয়ে গুছিয়ে স্বাধীনভাবে সংসার করবে বলে স্বামীর কাছে আবদার করে, ঝগড়া করে বেশ কিছু জিনিসপত্র সংগ্রহ করেছিল। যেমন — "রঙিন ফুলকাটা ছোট চা-দানি ... নতুন ঝকঝকে ইকমিক কুকার ... মাখনের কৌটো ... বিস্কুটের টিন ... মাদ্রাজী বেড কভার ... বালিশ ঢাকা ... শান্তিনিকেতনী পর্দা।" *(পৃ. ২৯০, ঐ)*। এ সমস্ত জিনিসগুলো ধীরে ধীরে স্নেহাংশুর চোখের সামনে ভেসে উঠল। এই বস্তুগুলো তো আসলে একটি মেয়ের সংসার বাসনা চরিতার্থ করার জন্য রচিত যে শিল্পকলা — তারই উপাদান, যা পরম ভালোবাসা মমতা জড়ানো। কিন্তু পিসিমা, যিনি শ্বশুরবাড়ী গিয়ে বৃদ্ধ বয়সে একটি ভগ্নস্তূপের মধ্যে দাঁড়ালেন, অল্প সময়ে বেশ তৎপরতায় তিনি ভাঙা ঘর-দাওয়া পরিষ্কার করে পশমের ফুলতোলা কার্পেটের একখানি আসন পেতে পলকাটা কাঁচের গ্লাসে ধূমায়িত চা এনে দিয়ে স্নেহাংশুকে অবাক করে দিলেন। অপরিচিত এই আসনখানি দেখে স্নেহাংশুর বিস্ময় উদ্রেক যতখানি হল, তার চেয়ে বেশী বিস্ময় অপেক্ষা করছিল এর জন্মকথা বর্ণনায়। — "বাক্‌শোয় তোলা ছিল রে, এখানা বুনেছিলাম কবে জানিস? তুই তখন দামাল ছেলে, পশমের তাল নিয়ে বল খেলবি বলে কি কাড়াকাড়িই না করতিস!" *(পৃ. ২৯২, ঐ)*। সেই আসন আজ শ্বশুরালয়ে পিত্রালয়ের পরমকুটুম্বকে বসতে দিয়ে যেন জন্ম সার্থক করল। পলকাটা কাঁচের গ্লাস, চায়ের সরঞ্জাম ও আরো নানাবিধ টুকিটাকি যা সংসারের কাজে লাগে, বৃদ্ধা একটি মহিলা সে সমস্ত বয়ে এনে স্বাধীন, মুক্ত বিহঙ্গের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাঁর খেয়ে-খাইয়ে তৃপ্তিময় মুখের ছবি দেখে স্নেহাংশুর মনে পড়ে শিপ্রার কথা। যে স্বপ্নভঙ্গের ফলে ছোট 'চা-দানী'টা জানলা দিয়ে গলিয়ে ফুটপাতে ফেলে আছড়ে ভেঙে ফেলেছে। কি বৃদ্ধা, কি যুবতী — প্রতিটি নারীই যে নিজস্ববৃত্ত রচনা করে, নিজের নিপুণতা প্রদর্শন করে, কাছের পুরুষটিকে বিস্ময়ের ঘোরে ফেলে দিয়ে রহস্যময়ী, সুনিপুণা একজন সার্থক রমণী হয়ে উঠতে

চায় — লেখিকা এই বিষয়টাই পাঠকের বোধগম্য করাতে চান। বাবা-মা নয়, পিসিমা হলেও তার অভিভাবকত্বের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে, যা নাকি দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন ভেঙ্গে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। কারণ পিসিকে ফেলে স্ত্রীকে নিয়ে বেড়াতে যাওয়ার কথা একটি পুরুষ মানুষ অনেক চেষ্টা করেও উচ্চারণ করতে পারলো না। তখনকার নবীনাদের চারদেওয়ালের বাইরে মুক্ত — পদচারণার সাধের এভাবেই অপমৃত্যু ঘটত।

'যুগলপাত্র' গল্পের প্রতিবিম্ব দেখতে পাই **'তুচ্ছ'** (১৩৬৩ বঙ্গাব্দ) গল্পটির মধ্যে। শাশুড়ী-শ্বশুর এদের ভালো-মন্দ দেখাশোনা, তাদের সেবা করা পুত্র-পুত্রবধূর ধর্ম ঠিকই, কিন্তু নিজেদের শখ-সাধ-আহ্লাদ সমস্ত জলাঞ্জলি দিয়ে এই কর্তব্য কর্ম করে যাওয়াও যথেষ্ট দুরূহ ব্যাপার। 'যুগলপাত্র' গল্পে যেমন শিপ্রা আর স্নেহাংশু বিবাহের পর প্রায় চারটি বছর ধরে সযত্নে লালন করা স্বপ্ন এবং তিলে তিলে সঞ্চিত বস্তু সামগ্রী নিয়ে সবকিছু ঠিকঠাক সত্ত্বেও শুধুমাত্র পিসিমার অনুমতি নেবার সাহসের অভাবে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। বরং নিজেদের যাওয়ার বদলে পিসিমাকে তার শ্বশুরবাড়ি নিয়ে যেতে হল। 'তুচ্ছ' গল্পেও স্বামী কনক ও স্ত্রী অরুণিমা এবং তাদের বিধবা মা — এই নিয়ে সংসার। সংগীতের ওপর বেশ ভালো দুর্বলতা ছিল অরুণিমার, কিন্তু বিবাহোত্তর জীবনে কেরানী স্বামীর সংসারে এসে সবই প্রায় ভুলে গিয়েছে। বিবাহপূর্ব জীবনে বাড়ির কেউ সমাদর করে গান না শেখালেও সময় সুযোগ মতো রেডিও শুনে বা যে কোনভাবেই গলায় গানের সুর তুলে নিতো। অভাব তাদের ছিল না, কিন্তু গানের বিরুদ্ধাচরণ করা স্বভাবের বশে তার এতবড় গুণটা অবদমিত করে রাখতে বাধ্য হল।

তথাপি জীবনে একটা স্বপ্নাতীত সুযোগ এল, বান্ধবী সুরূপা জানতো অরুণিমার সুন্দর সুরেলা কণ্ঠের কথা; সে কোথাও সুযোগ পায় না শেখবার এবং শোনাবার। তাই সুরূপা একটা সুযোগ পেয়ে কার্ডে নাম-ধাম ছাপিয়ে নিয়ে অরুণিমার বাড়ি জানাতে গেল। স্বামী কনকও ব্যাপারটাকে সানন্দে গ্রহণ করল। কোথা থেকে খুঁজে পেতে একটা হারমোনিয়ামও কনক জোগাড় করল এবং অরুণিমা স্বপ্নসায়রে ভাসতে ভাসতে সংগীত সাধনা শুরু করল। কিন্তু অনুষ্ঠানের দিনে যাবার জন্য তো শাশুড়ীর অনুমতি প্রয়োজন; তা না নিলেও বাড়িতে থাকাটা তো বিশেষ প্রয়োজন। কনক তো অফিসে চলে যাবে; ফেরার পথে স্ত্রীর অনুষ্ঠান শুনে একসঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরবে। তিথি নক্ষত্রের হিসেবে দেখা গেল শাশুড়ীর বাড়ি থাকবারই কথা। কাজেই মনে মনে আজীবনের স্বপ্নপূরণের অসীম প্রতীক্ষা, উৎকণ্ঠা, আবেগ, আশা নিয়ে প্রস্তুতি পর্ব সারছে। কিন্তু দুপুরের দিকে শাশুড়ীর গলা শোনা গেল — "দোরটা দিয়ে যাও বৌমা, আমি একবার "মায়ের বাড়ি" ঘুরে আসি।" *(পৃ. ৩৫৪, গল্প সমগ্র, ৪র্থ খণ্ড)*। কিছুক্ষণ পরেই অরুণিমার ঝিয়ের সঙ্গে সুরূপার বাড়ি যাবার কথা — "অথচ শাশুড়ীকে বলতেও সাহস হলো না। ... নিঃশব্দে দোর দিয়ে এল।" *(পৃ. ঐ, ঐ)*।

শাশুড়ী গেলেন ঘণ্টা চারেকের জন্য, সমাধান হিসাবে মনে মনে অরুণিমা ভাবল খোকার মা ঝি এলে সে একটা রিক্সা ডেকে দেবে এবং বাড়ি পাহারায় থাকবে। নিজে একবার পুরো সাজসজ্জা করে নিয়েও পরে বেলা গড়িয়ে যাওয়ায় তা পরিবর্তন করল। কারণ বাদ সাধল ঝি। যত শীঘ্র সম্ভব হাত চালিয়ে কাজগুলো সেরে নিচ্ছে অরুণিমা, তখনই সুরূপা তাকে উঠিয়ে নিতে এল। কিন্তু বাড়ি পাহারার জন্য আর হয়তো যাওয়া হয়ে উঠবে না, ক্রমশঃ সেটা অরুণিমা বুঝতে পারছে। তার শাশুড়িও কোন কাজের তাড়া না থাকায় সন্ধ্যায় কালীঘাটে সন্ধ্যা আরতি দেখতে বসে গেল। তার স্বামী কনক অফিস ফেরত অনুষ্ঠান দেখে স্ত্রীকে নিয়ে ফিরবেন, সুতরাং একটা সময়ের আগে তারও আসার সম্ভাবনা নেই। স্বভাবতই অরুণিমাকে বাড়ি পাহারায় থাকতে হচ্ছে। শুধুমাত্র একটু সাহস করে যদি শাশুড়ীর অনুমতি নিতে পারত তবে হয়ত 'তুচ্ছ' কারণে যাওয়া বাতিল হত না। এই না যেতে পারা, যারা প্রতিভাধর হয়েও প্রতিভার বিকাশের সমস্তরকম সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকে, তারা এমনিতেই যথেষ্ট ব্যথিত চিত্ত থাকে; যদিওবা সামান্য সূচীমুখের মতো সুযোগ পেয়ে থাকে তা যদি কোন না কোন কারণে আবার ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় তবে সেটা যথেষ্ট পীড়াদায়ক হয়। অরুণিমারও তাই হয়েছে। এই জলসায় সুরূপার দয়ায় যে সুযোগ পেয়েছে, তা যদি কাজে লাগাতে পারত তবে হয়তো বড়ো কোন সুযোগের দ্বার তার নিকট অবারিত হয়ে যেত। কিন্তু চিরাচরিত ভয়, সংস্কার আর নিজেকে তুচ্ছাতিতুচ্ছ জ্ঞান করার জন্যই হয়তো তাকে যে তিমিরে ছিল, সে তিমিরেই লীন হয়ে যেতে হল। নারীদের নিজেদের এই যে অতি 'তুচ্ছ' জ্ঞান করা তা পরিবারের লোকেদেরই হোক বা নিজেকে নিজেই হোক — তাই তাকে প্রস্ফুটিত হতে বাধা দেয়।

একই ছকে বাঁধা আরো একটি গল্প রয়েছে, সেখানে বিধবা নারীর চাওয়া পাওয়াকে কেউ গুরুত্ব দিতে চাইলেও তিনি নিজে কিন্তু সেপথে হাঁটতে চান না। **'জীবনের আইন'** (১৩৬৩ বঙ্গাব্দ) গল্পে আমরা সেই নারীরই সন্ধান পাই। উমা তরুণী বিধবা, রুগ্ন দাদার সঙ্গে এসে ওঠে এক ভাড়া বাড়িতে। এই বাড়িরই আধখানাতে থাকতেন বুড়ো বাবা, বিধবা দিদি এবং সতীকান্ত নিজে। ধীরে ধীরে সতীকান্তর বাবা ও উমার দাদা নীরেন গত হলেন, যারা থাকলেন তাদের মধ্যে দিদির সাধ্য কম হলেও সাধ হল তীর্থে যাবার। যথারীতি দুটো পরিবারের মধ্যে সামান্য হলেও প্রীতির সম্পর্কের সূত্র ধরে সতীকান্তর অফিসের ভাতের দায়িত্ব উমার হাতেই দিয়ে দিদি বাড়ির বাইরে বের হলেন। ইতিমধ্যে উমা ও সতীকান্ত সংসার পরিচালনার সূত্রে অনেকটাই নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছে। অসুস্থ অবস্থায় দিদি তীর্থ থেকে ফিরে মারা যায়, দুটো সংসার মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়ে একটি সংসারে পরিণত হয়।

একটি অবিবাহিত পুরুষ ও একটি অল্পবয়সী বিধবাকে নিয়ে সমাজে বসবাসকারী মানুষেরা যেমন সরস আলাপ আলোচনা করে থাকে, এদের নিয়েও তেমনি শুরু হয়েছে। সতীকান্ত বাড়ির

বাইরে যায়, নানা ধরনের কথা প্রসঙ্গে এই যুক্তিটা তার সঙ্গত বলেই মনে হয় যে এভাবে না থেকে, আড়াল আবডাল সরিয়ে একটা সুস্থ সম্পর্কের মধ্য দিয়েই তো বাঁচা যায়। কিন্তু যারা সর্বদাই রহস্যের ওড়নায় নিজেদের অস্পষ্ট করে রাখে সেই উমা কিন্তু নিজেকে স্পষ্টভাবে প্রতিকায়িত করছে না। সংসার করছে, পরম যত্নে সতীকান্তর সেবা করছে, কিন্তু পাড়ার প্রাইমারী স্কুলে চাকরীর জন্য সুরেশ মাস্টার, যিনি স্কুলের সেক্রেটারী — তার কাছেও যেতে চাইছে। অর্থাৎ আর পাঁচটা মেয়ের মতো বিবাহ করে সংসারী হয়ে নিজেকে সাধারণ নারীর পর্যায়ে নিয়ে যেতে চাইছে না। সমাজে যত রকমের অবহেলিত মানুষ আছে, তাদের মধ্যে প্রধান হল অভিভাবকহীন, সহায়-সম্বলহীন বিধবারা। স্বামী সৌভাগ্যবতী, বিত্ত গরবে গরবিনীরা নিজেদের ওজন ও বৈপরীত্য বোঝাতে এসব অসহায়া নারীদেরই উদাহরণ হিসেবে উপস্থিত করেন। তাই কোন আত্মসম্মানবোধসম্পন্না নারী সহজে সংসারে কারো দায় হিসেবে বাঁচতে চায় না। উমা সে কারণেই সামান্য প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষিকার চাকরি নিয়ে নিজেই নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের দায়িত্বটুকু পালন করতে চায়। স্কুলের সেক্রেটারী এবং সতীকান্তর শিক্ষক সুরেশবাবু নিজে কন্যাকর্তা হয়ে সতীকান্ত আর উমার বিয়ে দিতে চাইলেও উমা রাজি হয়নি। বহিরঙ্গে সে এই বিবাহে সায় দিলেও অন্তরঙ্গে কিন্তু সেই দূরত্ব রয়েছে, যা সতীকান্তর ধরা ছোঁওয়া নাগালের বাইরে চলে গিয়েছে। আজীবনের জন্য একটা সুন্দর, ঝকঝকে সংসারের একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞী হয়ে বাস করতে পারত উমা, কিন্তু তার চেতনার অতল থেকে বেরিয়ে এল সেই নারী যে স্বয়ংসম্পূর্ণা হয়ে বিরাজ করবে স্বক্ষেত্রে। প্রয়োজনে আত্মাহুতি দেবে কিন্তু তবু নিত্যকার জীবনচর্চায় বাঁধা পড়ে নিজেকে প্রয়োজনের আর্বতে জড়িয়ে সহজলভ্য একটি বস্তু করে তুলবে না।

আত্মসম্মান বজায় রাখার জন্য নারীদের আত্মত্যাগ এবং পুরুষের ভোগের মাশুল দিতে গিয়ে জীবনপাত করার ঘটনা **'ভীষ্ম'** গল্পে সুন্দরভাবে বিকশিত হয়ে উঠেছে। ঘটনার মূল কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে রুণু নামের একটি মা-মরা এবং অকাল বিধবা মেয়ে। যে মামার অবর্তমানে সেখান থেকেও আশ্রয়চ্যুত হল; ঠাঁই মিলল সঞ্জয় ও বিজয় বলে দুই ভাইয়ের বাড়িতে। বিবাহিত বিজয় ও অবিবাহিত সঞ্জয়ের সংসারে একজন রাঁধুনি-আয়া-ধোবা ও সবসময়ের কাজের লোক হিসাবে রুণুকে পেয়ে ভালোই চলছিল। কিন্তু বাড়ির কর্ত্রী বিজয়ের স্ত্রীর অনুপস্থিতিতেই ঘটে সেই ঘটনা যার শিকার হয় রুণু ও অকৃতদার সঞ্জয়।

বিজয়ের স্ত্রী বাপের বাড়ি থেকে ফিরে এসে উদ্ধার করে সেই কাহিনি এবং যথারীতি ধীরে ধীরে তা বিকশিত হয়ে সুগন্ধের মতো চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। সত্যি কথা প্রকাশ করতে সে যখন উঠে পড়ে লেগে গেল, তখন বাধ্য হয়ে রুণুকে সত্যি কথাই বলতে হল। সকলের পরম শ্রদ্ধেয় ঋষিতুল্য সঞ্জয়ের সন্তানের জন্ম দিতে চলেছে রুণু। দুই-আড়াই মাস স্ত্রীর অনুপস্থিতির সুযোগে বিজয়ের ভোগ-লালসার শিকার হয়েছে রুণু কিন্তু এর পরিণামের দায় চাপিয়েছে সঞ্জয়ের ঘাড়ে,

তারই পরামর্শে; কিন্তু রুণু আদৌ তা করতে চায়নি। একটি নারীর সত্য উদ্‌ঘাটনের প্রয়োজনে অপর নারীর সমস্ত জীবন দিয়ে আত্মত্যাগ হচ্ছে মূল উপজীব্য। অথচ শেষ পর্যন্ত উদ্‌ঘাটিত হল মূল অপরাধী হচ্ছে বিজয়। সঞ্জয় যে সত্যি ঋষিতুল্য তার প্রমাণস্বরূপ এই বক্তব্যটি পাই—"তুই আমার ঘাড়ে সব দোষ চাপা দিদি, ... দিনে রাতে কত মিছে কথা কইছি আমরা, ... আর এই একটা তুচ্ছ মিছে কথায় যদি একটা সংসার বাঁচে, একটা প্রাণ বাঁচে, দোষ কি?" *(পৃ. ১৬৬, আশাপূর্ণার গল্প সমগ্র পঞ্চম খণ্ড)* ।এমনি করেই সঞ্জয় আর রুণু বিজয়ের স্ত্রীর প্রাণ, বিজয়ের সংসার বাঁচায়। শুধু যে বিজয়ের ও তার স্ত্রীর সংসারই সুস্থ রেখেছে তাই নয়, গ্রামে দেশের বাড়িতে গিয়ে এই ঋষিপ্রতীম, মহৎপ্রাণ মানুষ সঞ্জয় অপকর্মের সমস্ত দায় অবনত মস্তকে স্বীকার করে নিয়েছে। আর সেজন্যে রুণুও মাতৃত্বের পরিতৃপ্তি লাভ করে। মিথ্যা হলেও পিতৃ পরিচয় পায় দেশ গাঁয়ে গিয়ে ভাই -বোনের সম্পর্ক বজায় রাখা রুণুর ছেলে, এবং সঙ্গে রুণুর মাতৃসত্তাও ধীরে ধীরে সন্তান পালনের আস্বাদন পায়।

এভাবে কত পুরুষের লালসার শিকার হয়ে নারীরা জীবন অতিবাহিত করছে। অর্থাৎ বাইরের চেহারার ভিতরে অন্তঃপুরের অন্দরমহলে যে কত ধরনের অনুভূতি ও না বলা কথা বিরাজ করে এবং তা যে কি রূপ ধারণ করে বহির্জগতে প্রকাশ পায় তাই এখানে উল্লেখ্য। এর সঙ্গে নারীরা অবশ্যই স্বকীয় মহিমায় এবং চিরাচরিত আত্মত্যাগে জড়িত রয়েছে।

বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজে চিরন্তন, কল্যাণী মাতৃমূর্তির যে শাশ্বতরূপ আমাদের চোখে পড়ে তার অভ্যন্তরেও যে অনেক সময় অনাকাঙ্খিত কোন মা বেরিয়ে আসতে পারে নীচে আলোচ্য গল্পগুলিতে তা কিছুটা তুলে ধরার চেষ্টা করা হল।

'স্থিরচিত্র' গল্পের মর্মার্থ অনেকটা যেন সেইরকম। পিতা মালব্য সেন, মাতা সতী সেন এবং পুত্র দিব্যকুমার সেন — এই নিয়ে তাদের পরিবার। মালব্য সেনের যা আয় ছিল তার দ্বারা, পৈতৃক বাড়ীর স্যাঁতস্যাঁতে পুরোনো ঘরে অনেক কষ্টে অথচ যত্নে ও ভালোবাসায় লালিত হচ্ছিল দিব্যকুমার সেন। শ্রীমতী সতী সেন সব কষ্ট সহ্য করেও পুত্রকে একজন প্রতিষ্ঠিত সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে তৈরী করলেন। চাকুরী সূত্রে বিদেশ থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়ে আসার পর দিব্যকে কোম্পানী কর্মসূত্রে পাঠাচ্ছিল শ্রীলঙ্কার উদ্দেশ্যে। দমদম বিমানবন্দর থেকে আকাশে ওড়বার কিছুক্ষণ পরই বিমানটি ডানা ভেঙে মুখ থুবড়ে আছড়ে পড়ে ভারত মহাসাগরে এবং দিব্যসহ সমস্ত যাত্রী নিয়ে তলিয়ে যায়। সেন পরিবারে ঘটে এক বিরাট ইন্দ্রপতন।

শোকে পাথর মা সতী সেন, শোকে মুহ্যমান বাবা মালব্য সেন —এমতাবস্থায় তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে দিব্যের মামা নিরুপমবাবু এসে সমস্ত ব্যপারটা সামলাচ্ছেন। কোম্পানী তাদের কর্মীর অকালমৃত্যুর জন্য একলক্ষ টাকা নগদ দিতে চেয়েছেন, সেজন্য কিছু কাগজপত্রে দিব্যর মা-বাবার

সই প্রয়োজন। বাবা শোককে বুকে বেঁধে সব কাজ শুরু করলেও মায়ের কাছ থেকে সই সংগ্রহ করা বড়ই দুষ্কর হয়ে উঠেছে। একমাত্র সন্তানকে ঘিরে যার জীবনচক্র আবর্তিত হয়েছে সেই সন্তানহারার ব্যথা তাকে মূক ও বধির করে দেবে এটাই তো স্বাভাবিক ব্যাপার। তাই এই টাকার কথায় তিনি ভাবলেশহীন মুখে বলে উঠেছেন — "খোকার ক্ষতিটা পূরণ হয়ে যাবে এক লাখ টাকায়!" *(পৃ. ২১৪, স্বনির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্প)*।

মহাকালের প্রলেপে একসময় সতী সেনও গা ঝাড়া দিয়ে উঠলেন। পুত্রের মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ দিয়ে একটি স্মৃতিমন্দির তৈরি করবেন বলে স্থির করলেন। দিব্যর চাকরি হবার পর সে তার মাকে সুন্দর একটি বাড়ি তৈরি করে দেবে বলেছিল, যে বাড়ির স্বপ্ন সতীদেবী বহু বছর ধরে মনে মনে লালন করে এসেছিলেন। সেই রকমই একটি বাড়িকে স্মৃতিমন্দির হিসেবে রূপায়িত করতে তিনি উৎসাহী হয়ে উঠলেন। আবার যেন তিনি পুরোনো চেহারায় ফিরে গেলেন, যেমনভাবে তিলে তিলে মাতৃস্নেহে সন্তানকে বড় করে তুলেছিলেন, তেমনি শিল্পীর দরদ দিয়ে বাড়িটিকে তৈরি করাতে লাগলেন। পিতৃপুরুষের পুরোনো বাড়িটি ভেঙে ছোট্ট নতুন দ্বিতল অট্টালিকা উঠতে লাগল যার মাঝখানের ঘরটি সজ্জিত হল দেবমন্দিরের মতো করে। তার সাথে সাথে একতলায় আধুনিক ধাঁচে রান্নাঘর, খাবার ঘর, ভাঁড়ার ঘর ও দোতলায় শোবার ঘর, অ্যাটাচ বাথরুম, চারদিক জুড়ে সরু বারান্দা সমস্তই আজীবনের শখ অনুযায়ী গড়ে নিলেন। অবশেষে এল বহু প্রতীক্ষিত সেই দিন, যেন দীর্ঘকাল সাধনার পর লাভ করলেন — সেই কার্ত্তিকী পূর্ণিমা, যেদিন তার একমাত্র পুত্র দিব্য জন্মেছিল। মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্যও সেই দিনটিই ধার্য হয়, আর সেজন্যই আগের দিন সন্ধ্যায় তিনি আসেন সেখানে আল্পনা দেবার জন্য। বেরিয়ে আসার সময় যখন দেখছেন চাঁদের আলোয় সাদা রঙের বাড়িখানা যেন পবিত্র মূর্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, শরিকী ঘরের ছোট নাতিটি একটি চিঠি এনে হাতে ধরিয়ে দিয়ে যায়। এবারে ঘটে যায় অনাকাঙ্ক্ষিত ছন্দপতন।

'দিব্যস্মৃতি'র মন্দিরগৃহে যেখানে ঘরের মাঝে খাট পাতা হয়েছে তরুণ, স্মার্ট, ঝকঝকে চেহারার প্রাণবন্ত একখানি ছবি রাখা হবে বলে, সেখানে স্থান নিতে আসছে চার হাতপায়ের মধ্যে তিনটিই খুইয়ে বসা এক কদাকার চেহারার একটি মানুষ। সতী সেন যেন এক অতল সমুদ্রে পড়ে গেছেন, কোন কূল কিনারা খুঁজে পাচ্ছেন না। নাতির ধরিয়ে দেওয়া চিঠিখানি দিয়েছে সেই নিদারুণ যন্ত্রণাদায়ক সংবাদ। অপটু হাতে লিখে দিব্য জানিয়েছে তাঁর বেঁচে যাওয়ার কথা এবং তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়ার আবেদন। যে মায়ের ছেলে অন্ত প্রাণ, সেই মা আজ তার স্বপ্নের মন্দিরে সেই ছেলেরই অবস্থান মেনে নিতে পারছে না। তাকে দেখে মনে হচ্ছে তার যেন আজন্ম লালিত স্বপ্ন ভেঙে তছনছ হয়ে গেল। যে স্মৃতিসৌধ তিনি ধীরে ধীরে গড়ে তুলেছেন, তাতে তার সখ-সাধ সমস্ত মিটতে চলেছে, যা পুত্র সকাশে লাভ করতেন তা পুত্রের মৃত্যুতে লাভ করলেন। কিন্তু সন্তান স্নেহ

চিরন্তন হলেও তার আড়ালে যে নিজের সুখ ও স্বপ্ন চরিতার্থ করবার প্রবণতা লুকিয়েছিল তাই যেন নখ-দাঁত বের করে প্রকাশ হয়ে পড়ল। সেই মায়ের কাঙ্ক্ষিত সন্তান আজ আর কুৎসিত দর্শন জীবন্ত পুত্র নয়, ছবি হয়ে যাওয়া ঝকঝকে চেহারার মৃত পুত্র। আশাপূর্ণা দেবী এভাবে সত্যের ছুরি দিয়ে চিরে চিরে এক বাস্তবের মাকে দেখিয়েছেন। সতী দেবীর সুখের আকাশে তার অদ্ভুত দর্শনরূপী সন্তানটি একখণ্ড কালো মেঘের মত আবির্ভূত হয়ে সমস্ত আকাশ ছেয়ে ফেলুক তা তিনি আর চান না।

'বেশী জরুরী' গল্পে নারীর অন্তরের গল্পের অপর একটি রূপ উন্মোচিত হয়েছে। স্ত্রী-পুত্রকে ছেড়ে প্রহ্লাদ মণ্ডল গৃহহীন হয়ে হঠাৎ নিরুদ্দেশের পথে পা বাড়ালেন। অসহায়া নারী একমাত্র পুত্রকে নিয়ে বেঁচে থাকবার জন্য লড়াই শুরু করলেন। কাহিনি যখন আমাদের সম্মুখে এসে উপস্থিত হল সেই পটভূমি সারা গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তির আমন্ত্রিত হওয়া গরলগাছার প্রধানের বাড়িতে। আরো অন্যান্য যেমন — রাজনীতির, প্রশাসনের অনেক কর্তা ব্যক্তিরাও এসে উপস্থিত হয়েছেন প্রধান প্রফুল্ল মণ্ডলের বাড়িতে। বিরাট ভোজের আয়োজন চলছে। এই প্রফুল্ল মণ্ডলই নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তি প্রহ্লাদ মণ্ডলের ও সেই অসহায়া নারী সুশীলাবালার পুত্র।

বহুদিন বাদে প্রায় বারো-তেরো বছর ঘরছাড়া থাকার পর প্রহ্লাদ মণ্ডল গরলগাছায় নিজের বাড়িতে ফিরে এসেছেন। পথে প্রতিবেশী খুড়োর সাথে দেখা হয়ে যাবার পরই জানতে পারেন তার ছেলে মস্তবড় একজন কেউকেটা হয়েছেন এবং বাড়িতে তারই যজ্ঞি চলছে। শুনে আনন্দিত প্রহ্লাদ মণ্ডল ভাবলেন তার ছেলের এতবড় আনন্দের দিনে বাবাকে পেয়ে আনন্দের আরো বিস্তার ঘটবে, ছেলে বড়ই আহ্লাদিত বোধ করবে। অথচ প্রতিবেশী খুড়ো তাকে অন্ততঃ আজকের দিনে এত লোকের সামনে যেতে নিষেধ করলেন, তিনি না শুনে আজকের দিনটাকেই উপযুক্ত ভেবে বাড়ির পথে রওনা হলেন।

বাড়িতে প্রচুর অতিথি অভ্যাগতরা রয়েছে, তাদের মাঝখানে ফুলের মালা গলায় ছেলেকে দেখে আহ্লাদে আটখানা প্রহ্লাদ মণ্ডল ছেলের কাছে গিয়ে নিজের পরিচয় দিতে লাগলেন। অতিথি অভ্যাগতরা এবং প্রফুল্ল নিজে হতচকিত হয়ে একে পাগল বলতে লাগলেন। অবিশ্বাসের মোড়কে বাঁধা কথাগুলো বিশ্বাসযোগ্য না হওয়াতে চলল বেদম প্রহারও, শেষপর্যন্ত থানা থেকে পুলিশ এসে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে বেঁধে থানাতে নিয়ে গেলেন। অথচ প্রফুল্লর বাবার সন্দেহ ছিল ছেলে অথবা আর কেউ চিনতে না পারলেও স্ত্রী সুশীলাবালা তাকে ঠিক চিনতে পারবে। তাই মার খেয়ে বেহুঁশ অবস্থায় পড়ে থাকলেও থেকে থেকেই স্ত্রীর নাম ধরে ডাকছিলেন। থানা থেকে কনস্টেবল এসে মৃতপ্রায় অবস্থায় প্রহ্লাদ যা যা বলছিলেন তা বলে এবং মৃতকে সনাক্ত করার জন্য মা ও ছেলেকে বলে গেলেন। পূর্বে তারা যা বলেছিল প্রহ্লাদ মণ্ডল সম্পর্কে থানায় গিয়েও সেই একই কথা বলে এল

অর্থাৎ লোকটি তাদের অচেনা।

ফিরে আসবার পথে রিক্সায় বসে সুশীলা ছেলেকে বললেন বাড়ি ফিরে ঘাটে চুপি চুপি ডুব দিয়ে নিতে এবং অপঘাত মৃত্যুর জন্য 'তেরাত্র' অশৌচ পালন করতে। আর এসবের দ্বারা সুশীলা পুত্রকে বোঝাতে চাইলেন যে, ইনিই তার সত্যিকারের বাবা। এবার প্রফুল্ল পুত্রের দাবী নিয়ে মায়ের বিরুদ্ধে গর্জে উঠলো — "তার মানে তুমি জেনে বুঝে পুলিশের সামনে মিথ্যে সাক্ষী দিয়ে এলে? এর শাস্তি জানো? *(পৃ. ২৪৩, স্বনির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্প)* উত্তরে সুশীলাবালা একেবারে শান্ত শীতল গলায় বলে উঠলেন — "মিথ্যে সাক্ষী দিয়ে আর মিথ্যে কাগচে টিপ ছাপ দিয়ে দিয়েই তো তোরে এতোখানিটা টেনে এনেচি খোকা।" *(পৃ. ২৫৪, ঐ)*— এ থেকেই বোঝা যায় সুশীলাবালা কতটা কষ্ট করে সন্তানকে বড় করে তুলেছেন এবং তাদের সামাজিক স্ট্যাটাসটা কি ছিল। অর্থাৎ এক অসহায়া, সম্বলহীনা এবং স্বামী পরিত্যক্তা নারী মিথ্যে বনিয়াদের ওপর এবং উঞ্ছবৃত্তির ওপর ভিত্তি করে দিনগুলো কাটিয়ে ছেলেকে এই জায়গায় এনে দাঁড় করিয়েছেন। কিন্তু নিজেকে শেষ অবধি ক্ষমা করতে পারেন নি, আর তাই ছেলেকে নিয়ে থানা থেকে বাড়ি ফেরার পথে রিক্সা থামিয়ে পাড়ারই এক বিখ্যাত পুকুর 'বিরোদ দিঘি' তে নেমে ধীরে ধীরে মৃত্যুর মুখে এগোতে লাগলেন। পুত্রের আকুলতাপূর্ণ প্রশ্নের উত্তরে বললেন — "কাচে গিয়ে শুদোতে হবে না, কোতায় ছিলে এতদিন?" *(পৃ. ২৫৪, ঐ)*

প্রহ্লাদ মণ্ডলের স্ত্রী এবং প্রফুল্ল মণ্ডলের মা সুশীলাবালার মনের ভেতরের এই যে বিরাট পরিবর্তন — তা যথেষ্ট গুরুত্ব দাবী করে। অত্যন্ত হীন অবস্থা থেকে এক নিঃসম্বল যুবতী নারী সন্তানের হাত ধরে নানা কথাকৌশলের ফলশ্রুতিতে আজ এই আর্থিক স্বচ্ছলতা ও সামাজিক প্রতিপত্তিতে এসে পৌঁচেছে। তাই হয়তো স্ত্রী হয়েও স্বামীকে চিনতে চায়নি। কারণ চিনতে পারলেই লোক জানাজানি হবে এবং বহু কষ্টার্জিত ভদ্রাসন হয়তো কলুষিতও হতে পারে। সেইসঙ্গে গ্রামের প্রধান হিসাবে নির্বাচিত পুত্রের মুখে কালিও পড়তে পারে। কিন্তু সর্বোপরি নারী হিসেবে নিজেকে ক্ষমাও করতে পারল না, কারণ স্বামীর প্রতি তার নিজের এই ব্যবহার তাকে ভেতরে ভেতরে তীব্র অনুতপ্ত করেছে। আর তারই প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আত্মবিসর্জন দিলেন। পুত্রের জন্য আত্মত্যাগ, আর স্বামীর প্রতি প্রেমে আত্মাহুতি — চিরন্তনী নারী সত্তার দ্বৈত ভূমিকাই রয়েছে এখানে। শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে রয়েছে অপরিসীম সাহস ও মনের জোর — যার দ্বারা নিজের স্বামীকে অচেনার ভান করার সাহস রাখে।

'ছিন্নমস্তা' (১৩৫৪) গল্পে দেখা যায় — লেখিকা আশাপূর্ণা দেবী কি নির্মমভাবে চিত্ত বিদারণ ঘটিয়েছেন। শাশুড়ী জয়াবতী ও পুত্রবধূ প্রতিভার জীবনের গল্প, কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছেন জয়াবতীর পুত্র ও প্রতিভার স্বামী বিমলেন্দু। সদ্যবিবাহিতা পুত্রবধূ সদ্য বিধবায় রূপান্তরিত হলেও শাশুড়ী জয়াবতী

কেন পুত্রবধূকে 'অপয়া' ভাবেন না — এটা প্রতিবেশীদের কাছে অবাক কাণ্ড। তিনি বরং উল্টে প্রতিভাকে একান্ত স্নেহে আদরে ভালোবাসায় জড়িয়ে রাখতে চান। এর আড়ালেই আছে সেই কারণ — বিবাহের পর পুত্রবধূ শাশুড়ীর কাছ থেকে ছেলেকে একরকম কেড়েই নেন স্ত্রীর দাবীতে। শুধু তাই নয়, বিধবা শাশুড়ীকে ডাঁটা-চচ্চরি খাওয়া নিয়ে যেদিন খোঁটা দেন, সেদিনই অবস্থা চরমে উঠে। জয়াবতী ঠাকুরঘরে গিয়ে খিল লাগিয়ে কিভাবে যে দর্পহারী মধুসূদনের চরণে নিজের মনোবেদনা নিবেদন করলেন তা তিনি নিজেও জানেন না। যে সামান্য ডাঁটা চচ্চড়ি তার আদরণীয় ও লোভনীয় খাবার ছিল, আজ তারই পুত্রবধূ 'বিধবার প্রিয় খাবার' বলে বিদ্রূপাত্মক ইঙ্গিত করায় তার ব্যক্তিসত্তা আহত হয়। তার খাবারের এই দিকটি তার স্বামীও বেশ যত্নের সঙ্গে লালন করতেন। জয়াবতীর মাতৃত্ব চেতনাকে ছাপিয়ে যায় তার নারীসত্তা। অপর একটি নারীর প্রতি নারী হিসেবে তার মনে যে মানসিকতা ও প্রতিশোধস্পৃহা স্থান পায় সেখানে মাতৃত্বের কোমলতা নেই। এই প্রতিশোধমূলক মানসিকতা থেকে যে পরিণাম তার মনের অবচেতনে জেগে উঠেছে তা যে নিজেরই চরমতম সর্বনাশ হতে পারে — সেই বোধটুকুও তার লোপ পেয়েছে। তাই একমাত্র সন্তান বিমলেন্দুর মৃত্যু মা হিসেবে তাকে যথেষ্ট ব্যথিত করে তোলে কিন্তু তার চেয়ে বেশী উৎফুল্ল করে সদ্যবিধবা পুত্রবধূকে নিজের হাতে বিধবার খাবার রান্না করে খাওয়ানোতে। যে পুত্রবধূকে ঘিরে, বধূবরণের মধ্য দিয়ে অনেক স্বপ্ন লালন করেছিলেন, অনেক আয়োজন করেছিলেন — সেই বধূর নিকট থেকে প্রাপ্ত আঘাত জয়াবতীকে এমন নির্মম করে তুলেছে।

পড়শীদের চিন্তাভাবনায় জয়াবতীর পুত্রবধূকে স্নেহ করা প্রকৃতপক্ষে নিজে বিধবা বলে অপমানাহত নারীর পুত্রবধূর বৈধব্যে খুশীর নামান্তর। এই বিকৃত ব্যাখ্যা অবশ্যই সর্বকালের সমাজে সম্ভব। কিন্তু গল্পের একেবারে শেষে এসে লেখিকার সংলাপ আমাদের এক নির্মম বাস্তবের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয় — "আচ্ছা — জয়াবতীর কণ্ঠস্বরটাই শুধু কানে ঢোকে তাদের, দৃষ্টি পড়ে না মুখচ্ছবির পানে? ... কণ্ঠস্বরে মমতার যে প্রস্রবণ বয়, চোখের দৃষ্টিতে কি আছে তাহার স্নিগ্ধ ছায়া?" *(পৃ. ২৮৯, গল্প সমগ্র ২য় খণ্ড)* — এ থেকে বোঝা যাচ্ছে, কণ্ঠস্বরের মমতার সঙ্গে চোখের দৃষ্টির কোন মিলই নেই। অর্থাৎ দৃষ্টির জ্বলন্ত অগ্নিকে কোমল কণ্ঠের প্রলেপ দিয়ে প্রকাশ করছে। ঠোঁটের কোণে যে হাসির রেখা আছে, তাতে লুকিয়ে আছে বিষাক্ত আভা। যে সন্তানের মৃত্যু মাকে শোকের সাগরে নিয়ে যায়, আজ নারীত্বের অবমাননা সেই শোককেও জয় করেছে। অবিশ্বাস্য হলেও এটাই সত্য, কারণ, মানব চরিত্র বড়োই জটিল। পাঠক শিহরিত হলেও এখানে দেখা যাচ্ছে প্রতিশোধ স্পৃহাতে মা পুত্রের অমঙ্গল পর্যন্তও চাইতে পারে। মাতৃমনকে পর্যন্তও আশাপূর্ণা দেবী এমন সত্যের ছুরিতে ব্যবচ্ছেদ করেছেন।

'লোকসান' (১৩৫৮ বঙ্গাব্দ) গল্পে সমাজের যে চিত্র ফুটে উঠেছে তাতে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে

আর এক নির্মম সত্য। গল্পের যিনি কথক তিনি চাকুরিসূত্রে বাইরে থাকেন এবং সপ্তাহান্তে একবার করে বাড়িতে আসেন। এমনই এক সপ্তাহে বাড়ি আসার পথে শুনলেন পাড়ার মান্যগণ্য ব্যক্তি প্রবোধকাকার কৃতী সু-উপায়ী ছেলে প্রভাসের মৃত্যুসংবাদ। প্রবোধকাকা মাসে মাসে ছেলের কাছ থেকে চারশো সাড়ে-চারশো টাকা পেতেন মনি অর্ডারযোগে। হাজার বারো'শ টাকার বেতনভোগী ছেলের অকালপ্রয়াণ — এই পুত্রের শোক যে বড়ই দুর্বহ। এই চরম ক্ষতিকর মৃত্যুসংবাদে সারা পাড়া যে একেবারে উদ্বেল হয়ে উঠেছে তা গল্পের কথক অরুণবাবু পাড়াতে পা রাখা মাত্রই বুঝতে পারলেন। বাড়ি ফিরে মায়ের কথামতো প্রবোধকাকার সঙ্গে দেখাও করতে যান তিনি। বেশ কিছুক্ষণ সেখানে কাটিয়ে যখন উঠতে যাবেন, তখনই উদ্দাম বেগে এসে আছড়ে পড়ল উন্মাদের মতো বুকফাটা আর্তনাদ, যা নাকি বাঙালী চিত্ত একবারেই চিনতে পারে।

এই চিৎকারের উৎসস্থল শোকবার্তা বাড়ির থেকে কিছুটা দূরে। কিন্তু কোথায় এবং কেন এই বুকফাটা ক্রন্দন তার কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। সমস্যাটা সমাধান করে দিলেন প্রবোধকাকা নিজে — "শোন নি? শুনবেই বা কি? বলতেও ধিক্কার আসে লোকের — সুবলোটাও তো গেল।" *(পৃ. ২৬৯, গল্প সমগ্র ৩য় খণ্ড)*। — "গেলো মানে? মারা গেলো?" — পাশাপাশি দুটো মৃত্যু যেন সমুদ্র আর গোষ্পদের মতো বিরাট ফারাককে নিয়ে এসে হাজির হল অরুণবাবুর সামনে। কারণ প্রবোধকাকা জানিয়ে দিলেন — গোঁয়ার-গোবিন্দ ও অপদার্থ-নিষ্কর্মা ছেলের জন্য এতটা শোক প্রকাশ বড্ড যেন বাড়াবাড়ি রকমের হয়ে যাচ্ছে। কথক বাড়ি এসে যখন ব্যাপারটা মাকে জানাতে গেলেন, তখন শুনলেন ঘটনাটি নাকি সকলেই জানেন। যেহেতু প্রভাসের মৃত্যুর ক্ষতির সঙ্গে সুবলের মৃত্যুর ক্ষতি কোন তুলনাতেই আসে না, তাই তাকে জানানোর কোন প্রয়োজন আছে বলেই কেউ মনে করেন নি।

প্রভাসের মৃত্যুর দুদিন আগে সুবল মারা গেলেও সেই বাড়িতে তার মা যাবার সময় করে উঠতে পারেন নি, অথচ হাতের রান্না ফেলে রেখে সঙ্গে সঙ্গে প্রভাসের বাবার শোকের সমব্যাথী হতে ছুটে গেছেন। এখানে যেন মানবজাতির সেই রোগটিকেও প্রত্যক্ষ করা যায় — 'তেলা মাথায় তেল দেওয়া'। পুত্র অরুণের নিকট থেকে যখন মৃদু অভিযোগ এল তখনই তার মায়ের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল সেই প্রলেপহীন সত্য কথা — "সন্তানের কর্তব্য করলে তবেই না সন্তান? ... মায়ের মুখে এক গরস ভাত তুলে দেবার ক্ষ্যামতা ওর কখনো হোত?" *(পৃ. ২৭১, ঐ)*। আর প্রভাসের মৃত্যুর ক্ষতির তুলনা করতে গিয়ে বলেছে — "মাস গেলে চারশো সাড়ে চারশোখানি টাকা বিনাবাক্যে পাঠিয়েছে। ঠাকুরপোর 'ক্ষেতি'র তুলনা হয়?" *(পৃ. ২৭১, ঐ)*। আশাপূর্ণা দেবীর মনোজগতের এই বিশ্লেষণ এবং তার সত্যরূপের উদ্‌ঘাটন আমাদের প্রত্যেকটি চেতনার দ্বারে এসে আঘাত করে। কত স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন একজন মায়ের মধ্য দিয়ে আর একজন মায়ের শোকাবেগ প্রকাশের

হিসেবকে। একজন মা তার পুত্রের নিকট অর্থের দাঁড়ি পাল্লায় আর একটি মায়ের পুত্রশোকের বিচার করে দেখিয়ে দিচ্ছেন নারীচিত্তের অপর একটি দিককে। চিরন্তনী, স্নেহময়ী মায়েরও যে কত রূপ রয়েছে মনের অত্যন্ত সংগোপনস্থলে তা নানাভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। " পৌনে দু'শোর জন্যে কতোটুকু অধীর হওয়া শোভন? সীমারেখা টানা হবে কোথায়?" *(পৃ. ২৭১, ঐ)*। কথক মায়ের মুখে এই কথা শুনে যেন নিজেকেও এক প্রতিবিম্বের সামনে দাঁড় করিয়ে দিলেন, তার সামনে যেন সেই চিরন্তন এক কঠোর সত্য স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হল।

কোন মানুষের দিনই কখনো একভাবে যায় না, সুখ-দুঃখের চক্রের সাথে পরিবর্তিত হয় জীবনধারা। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, প্রতিটি মানুষই কিন্তু এই পরিবর্তনকে মেনে নেয় এবং অবস্থার বিপাক কাটিয়ে উঠতে সচেষ্ট হয়। অথচ এতকিছু বিপর্যয় মেনে নিলেও মানুষ যেটা মেনে নিতে পারে না তা হল কথা। কারো কথা কেউ সহ্য করতে পারে না। সংসার, সমাজ — সর্বত্রই, কথাকে কেউ কখনো অবহেলায় পড়ে থাকতে দেয় না। সংসারে ছোটবড় মিলে পাঁচজন মানুষ হওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র কথা বলার শোধ নিতে গিয়েই তৈরি হয় যে দূরত্ব এবং অন্তরের নির্মমতা তারই নিদর্শন মেলে **'ভগবান আছেন'** (১৩৬১ সন) গল্পে। এখানে 'ছিন্নমস্তা'র জয়াবতী ও প্রতিভার সঙ্গে যেন শাশুড়ী নিভাননী ও পুত্রবধূ অলকার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। শাশুড়িদের সাধের সংসারে পুত্রবধূদের রূঢ় ব্যবহার পরিস্থিতি-পরিবেশকে ভয়াবহ করে তুলেছে। দুখানি গল্পই নিটোল মধ্যবিত্ত সমাজের পরিবার কেন্দ্রিক গল্প। বিধবা মা পুত্র-পুত্রবধূ ও সংলাপের বাইরে উপস্থিত দুটি নাতি-নাতনী নিয়ে গল্পের বুনন। মানুষ যে নানা সাংসারিক দ্বান্দ্বিকতার টানা পোড়েনে এক বিরাট দোলাচলতায় অবস্থান করে তা এ ধরনের গল্পগুলো থেকেই বোধগম্য হয়।

সারা সকাল দেবু-অলকার মেয়েটি দিব্যি সহজভাবে হেসে খেলে বেড়িয়েছে, কিন্তু ভাত খাবার আগে একটু গা গরম ঠেকায় তাকে নিয়ে অলকা শুইয়ে দিয়েছে। ঠাকুমা নিভাননীর তা ভালো লাগে নি। আর তাই মনে মনে পুত্রবধূর অজ্ঞানতার কথা ভাবেন — "কচি ছেলের জ্বর, যতক্ষণ ঘুরে বেড়ায় ততক্ষণই ভালো, জ্বরাসুর জব্দ করতে পারে না। শুয়েছে দেখলেই চেপে ধরে। এই সামান্য জ্ঞানটুকু নেই অলকার?" *(পৃ. ৬৪)* এই কথাতেই বোঝা যায় শাশুড়ীর মতের সঙ্গে পুত্রবধূ অলকার মতের কতো অমিল। নিভাননী দেবী যেভাবে নিজের সংসার কার্য পরিচালনা করেছেন, অলকার কাছ থেকেও তদ্রূপ আশা করেন, কিন্তু অলকারও তো নিজস্ব বৃত্ত রয়েছে। বামুন ঠাকুরের কাছে মেয়ের পথ্য হিসেবে প্রস্তুত রাখবার নির্দেশ গিয়েছে ছানার জল আর ডাবের জল। এটাকেই শাশুড়ীর বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়েছে। তিনি ভাবছেন নিজের সময়ের কথা। প্রায় বিনা চিকিৎসায় মারা গিয়েছে তার তিন তিনটি সন্তান। বুবুর অসুখে ডাক্তার ছানার জলের পথ্য দেওয়ায় রোজ আধপোয়া করে দুধ রাখা হোত শুনে অলকার হাসির অন্ত ছিল না যেন। তাই আজ নিভাননীর

মনে হচ্ছে ছানার জলের মতো বস্তুর কেন প্রয়োজন; দুখানা গরম জিলিপি, একগ্লাস দুধ কিংবা একটু শুকনো মুড়িতেই তো চলে যায়। এই যে পার্থক্য শাশুড়ী-বৌমার চিন্তা ভাবনায় তাতে রয়েছে যুগের ব্যবধান অর্থনৈতিক ব্যবধান এবং সর্বোপরি মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার ব্যবধান। এই ঘটনাগুলোকে নিয়েই চরিত্রগুলোর নানা দ্বন্দ্ব প্রকাশিত হয়ে পড়ে। যেমন ছানার জলের কথা জানতে চাইলে শাশুড়িকে বৌ বলে ওঠে— "হ্যাঁ ছানার জল করতে বলে এসেছি, বলা অন্যায় হয়েছে? — 'ন্যায়' অন্যায়ের কথা তো কিছু হচ্ছে না বাছা, অমনভাবে কথা কও কেন?" ...

"জ্বরে ছুঁয়েছে কি শক্ত অসুখের বায়নাক্কা নিতে হবে? ছানার জল খাবার কি দরকার?

— তা হলে কি দেবো বলুন? চারটি পান্তা ভাত?" *(পৃ. ৬৫, ঐ)*

"বৌয়ের বাক্যি যেন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে"। *(পৃ. ঐ)*— লেখিকা এই মন্তব্য করলেন। শাশুড়ীর সময়ে যেহেতু ছানার জলটা দুষ্প্রাপ্য ছিল কঠিন অসুখের সময়েও, আর এখন সামান্য জ্বরে এর অপব্যবহার তিনি সহ্য করতে পারছেন না যেন। আর অলকারও শিক্ষিতা আধুনিকা নারী হয়ে এতটা কর্কশ হয়ে ওঠা যেন বেমানান। তারও বোঝা উচিত যে তারই স্বামীর বিলেতে পড়াশোনার খরচ চালাতে গিয়ে শ্বশুর-শাশুড়ীকে হিমসিম খেতে হত বলেই আধপোয়া দুধ রোজ রাখতো। এই ব্যাপারগুলো উপহাস করে হেসে কুটিপাটি হবার জন্য নয়, অতীতের ওপরই বর্তমানের ভিত দাঁড়িয়ে থাকে। আসলে সংসারে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের অস্তিত্বকে দাপটের সঙ্গে বজায় রাখতে চায়।

নিভাননীই ছেলেকে বিলেত পাঠানোর জন্য সংকল্প করে অটল হয়ে বসেছিলেন। নয়তো এমন সংসার থেকে এ দুরূহ কাজ করা যথেষ্ট দুঃসাহসের ব্যাপার। কিন্তু এখানেও কাজ করেছিল সেই অস্তিত্বের লড়াই এবং শোধ নেবার প্রবণতা। কারণ দেবনাথের বাবা যখন বিলেতের খরচ চালাতে অপারগ বলে জানিয়ে দিলেন তখনই হিসেব উঠে এল মাতৃহীন তিনভাইবোনের পড়াশোনা, থাকা-খাওয়ার খরচের, যারা মামার সংসারে প্রতিপালিত হচ্ছিল। নিভাননীর সন্তানদের ভাগ থেকেই যেহেতু তাদের খরচ চলছে তাই এ অবস্থার শোধ নিতে মা হিসেবে তিনি স্থির সংকল্প থেকে ছেলেকে বিলেত পড়তে পাঠালেনই। আর এতবড়ো খরচের ভার বহন করতে গিয়েই সংসারের বাকী সন্তানেরা দেবনাথের স্নেহের ভাইবোনেরা মৃত্যু কবলিত হয়ে পড়েছিল। তাই আজ এ পরিস্থিতিতে ছেলেও যেন মায়ের ওপর সে শোধ তুলল, মা যখন দুখানা ডাক্তার আসায় বলে উঠলেন —

"মেয়েকে একবেলা একটু জ্বরে ছুঁয়েছে কি সাত রাজ্যের ডাক্তার এনে জড়ো করছিস? টাকা চারটি না হয় হয়েইছে, তাই বলে যেখেনে সেখেনে ফেলে দিবি? উচিত অনুচিত দেখতে হবে না?"

মায়ের কথায় দেবনাথ বলে ওঠে — "তাহলে তোমার মতে উচিতটা কি মা? তোমাদের মতন, পয়সা খরচের ভয়ে ছেলে মেয়েকে বিনা চিকিৎসায় ফেলে রেখে মরতে দেওয়াই উচিত কর্তব্য।" *(পৃ. ৭০-৭১, ঐ)*

রাগে, দুঃখে সব ভুলে স্তম্ভিত হয়ে যায় মা। এই ছেলের জন্যই তার আজ সব গিয়েছে, সবকিছু বর্ণনা করেছিলেন ছেলের নিকট দেবনাথও ভাইবোনেদের জন্য দুঃখ পেয়েছেন। তাই মা যখন বললেন — "তিনি তো রাজা উজির ছিলেন না যে, সহজে স্বচ্ছন্দে — ছেলেকে বিলেতে পাঠাবেন? সংসারকে নিংড়ে ছিবড়ে করে সব সারটুকু পাঠাতে হয়নি তোকে?" বিলেত যেতে প্রবল আপত্তি ছিল দেবুর, অর্থনৈতিক অবস্থার জন্যই; তাই সে বলে — "কাঙালের ঘোড়ারোগ হলে ওই রকমই হয় মা। এমন যাদের অবস্থা, ছেলেকে বিলেত পাঠাবার সাধই বা তাদের হয় কেন?" *(পৃ. ৭১, ঐ)*।

এবারে মুখে চুপ করলেন নিভাননী। নিজের গর্ভের সন্তানের কাছ থেকে এ হেন আঘাত যে। এবার তিনি মর্মে অনুভব করলেন, কেউ সুযোগ পেলে কারো কথার শোধ না নিয়ে ছাড়তে চায় না। সামান্য কথা থেকে অনেক দূর অব্দি গড়িয়ে যাওয়া ঘটনাকে লেখিকা অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। সত্য ঘটনাকে প্রকাশ করতে একটুও কার্পণ্য করেন নি, তাইতো তাঁর লেখনি বলে উঠেছে — "শোধ নেওয়া নিয়েই তো জগত। মায়ে একটা অবুঝ কথা বলে ফেললে ছেলে তার শোধ না নিয়ে ছাড়ে?" *(পৃ. ৭২, ঐ)*। "তিনি স্বামীর ওপর শোধ নিয়েছিলেন, আজ ছেলে তার ওপর শোধ নিলো।"

— "এতো বড়ো অপমানের শেলটা যে মার বুকের ওপর বসিয়ে দিলি তুই, একবার ভাবলি না ভগবান আছেন!... ভাবলি না তাঁর আসল নাম দর্পহারী।" — *(পৃ. ৭২, ঐ)*।

এখানেই কোথায় যেন 'ছিন্নমস্তা'-র জয়াবতীর সঙ্গে নিভাননীর মিল খুঁজে পাওয়া যায়। নিজের অপমানের জ্বালা নিবারণ করতে যিনি পুত্রের অনিষ্ট চিন্তা করতেও পিছপা হননি। নিভাননীর মনেও যখন অপমানের শেলটা এসে বিঁধেছে তখন তিনিও অনায়াসে পুত্রের প্রতি মনে মনে এসব ভয়ানক বাক্যগুলো উচ্চারণ করতে পারলেন। নারী জাতির অন্তরের ভাণ্ডারটি পরিপূর্ণ হয়ে থাকে কোমলতা, মমতা ও কল্যাণ কামনায়। সন্তানকে যিনি নিজের প্রাণের চেয়েও বেশী ভালোবেসে আগলে রাখেন। কিন্তু সেই নারীর আঁতে যদি এসে কোন ঘা লাগে, তবে সেও যে বিষাক্ত সর্পিণীর মতো প্রতিশোধ স্পৃহায় ফোঁস করে ওঠে জয়াবতীর মতো নিভাননীও তার জ্বলন্ত প্রমাণ। "পাঁচটা ডাক্তার এনে ফেললেই কি 'সাধারণ জ্বর' 'অসাধারণ' হয়ে উঠতে আটকায়? তখন? কা'কে দোষ দিবি তখন? সন্তান-শোক যে কি জিনিস, তা যদি —" *(পৃ. ঐ)* আশাপূর্ণা দেবী তাঁর অনুভূতি এবং লেখনীর অপরিসীম দক্ষতায় নারীচিত্তের এই গূঢ় রহস্যটি নানা ঘটনা ও বিবাদের পারম্পর্যের মধ্য দিয়ে পাঠককুলের সম্মুখে উদ্ভাসিত করে তুলেছেন।

'মণি অর্ডার' গল্পে কাবেরী ও শিশিরের সন্তান খুকু ও দ্বিতীয় সন্তান হল বুটুন। খুকুকে নিয়ে তার বাবা ও মা দিল্লী গিয়েছিল কাকাতো বোনের বিয়েতে। ফিরে আসার সময় ট্রেনে এক অবাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয় এবং ঠিকানা দেওয়া নেওয়া হয়। আর সেই ভদ্রলোক খুকুকে এত

ভালো বেসেছিলেন তাকে স্টেশন থেকে নানা খেলনাও কিনে দেন। আজ পুরো এক বছর পরে সেই মেয়ের কথা স্মরণ করে একটা ফটো চেয়ে ও জন্মদিন না জানলেও আলাপের দিনটাকেই জন্মদিন হিসেবে মনে করে একশত টাকা পাঠালেন। অথচ যার জন্য পাঠানো সে আজ নেই। তাই এই টাকা তার মা-বাবা পাঠিয়ে দিতে চাইলেন।

অফিসের নানা ঝামেলায় টাকাগুলো আর পাঠানো হয়ে উঠল না। কিন্তু রাখতেও তাদের মন চাইছে না, আবার সেই ভদ্রলোককে দুঃখ দিতেও মন সায় দিচ্ছে না। ফলতঃ বিকল্প একটা কিছু ভাবতেই হয়। সেই ভাবনার সমাধানস্বরূপ কাবেরী বলে — "বুটুনটা তো বয়স ছাড়া বাড়ন্ত, আর দেখতেও অবিকল তার মত!... ছোট বাচ্চাদের চেহারায় কত বদল হয়। তুমি কাল ওকেই একবার কোন ফটোর দোকানে নিয়ে গিয়ে —" *(পৃ. ১৭৪, ৫ম খণ্ড)* আসলে মা কাবেরী এই একশত টাকা দিয়ে নানা খেলনা, পোষাক কিনে মনে মনে তার বুটুনের সামনে হাজির করছেন। যে সাধ আহ্লাদ টাকার অভাবে তার মনে অপূর্ণ ছিল তাকে পূরণ করে নিতে চাইছেন যেন এভাবে। চাইছেন বুটুনের জন্য একটা পেরাম্বুলেটর কিনতে, কারণ যখন দ্বিতীয় সন্তানের জন্মের সময়ে হাসপাতালে ছিল তখন ঝি খুকুকে স্যাঁতসেঁতে মেঝেতে বসিয়ে বসিয়ে ঠাণ্ডা লাগিয়েছিল আর তাতেই যত অঘটন ঘটে যায়, মৃত্যু হয় প্রথমা সন্তান খুকুর।

এখানে সেই নারী চরিত্রটিকেই দেখা প্রয়োজন যে মা নিজের মৃত সন্তানের কথা চেপে রেখে মিথ্যা অভিনয় করে স্নেহকাতর একজন ব্যক্তির সঙ্গে। যে অত্যন্ত ভালোবেসে হৃদয়ে পোষণ করে রেখেছিল সেই শিশুটিকে। অথচ এও সত্য যে, মা হয়েও তিনি অন্যায় কাজটি করতে পারলেন আর এক বাস্তব সত্যের দায় মেনে, কারণ শিশুকে সন্তানকে ভালো মন্দ জিনিস এনে দিতে, সাজাতে, খাওয়াতে প্রত্যেক মা-বাবার এই সাধ চিরন্তন। তাই আবেগ ও সম্ভাব্য ঘটনার বাস্তব হল এই সত্য। আশাপূর্ণা দেবী এই কথাটিই মানুষের মনের ভেতর থেকে টেনে এনে সকলের সামনে উপস্থিত করেছেন।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে যে স্থানে নারীদের এখনো অবস্থান রয়েছে সেই চিত্র প্রকাশ করেছে নিম্নোক্ত গল্পগুলি।

'লজ্জাশরম' গল্পে বি. ডি. ও. অফিসের পিয়ন ছিল বাঞ্ছারাম। অফিসের বাগানে মাটি কোপাতে গিয়ে সহসা তার পায়ে কোদাল লেগে যায়, কিন্তু কোন সুচিকিৎসা না হওয়ায় হাঁটুর নীচ অবধি পা কেটে বাদ দিতে হয়, ফলে সে এখন গৃহবন্দী। তাই সংসার রথচক্রের গতি যাতে ব্যাহত না হয় সেজন্যে বাঞ্ছার বৌকেই কাজে নামতে হয়েছে। সারাদিন লোকের বাড়ি কাজ করে মরছে — কখনো ঘাটে বাসন মাজছে, ক্ষার কাচছে, কখনো বা মাঠে ঘাটে ঘুরে ঘুরে গোবর কুড়িয়ে ঘুঁটে দিচ্ছে ,আবার কখনো বা কারো বাড়ির কাঠ কাটছে, কারো বা জল বইছে। এর থেকে যৎসামান্য আয়ে

চলছে সংসার, এরই মধ্যে আবার নিজের নগ্ন সংসারের আবরণের জন্য যত্রতত্র উপাদান যোগাড় করতে ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে। তার সংসারের দীনতা তার চেহারাতেই ধরা পড়ে, যেমন — নারকেলের ছোবড়ার মত লাল রুক্ষ্ম চুল, খড়ি ওঠা ও শিরা ওঠা হাত পা, ছেঁড়া ফাটা শাড়ী যাকে শুধুমাত্র শাড়ীর ভগ্নাংশ বলাই ভালো আর সর্বদাই তার কাঁধে ও কোচড়ে থাকে সংসারের জন্য সংগৃহীত নানা উপকরণ।

বি. ডি. ও. সাহেব জোয়ারদারবাবু একদিন বাঙ্কার বাড়ি এসে তাকে নানা উপদেশ দান করলেন এবং সঙ্গে এও জানিয়ে দিলেন যে, তার জন্য কিছু চাল ও টাকার ব্যবস্থা করেছেন। তিনি দিনের বেলা নানা কাজে এবং সন্ধ্যায় আহ্নিকে ব্যস্ত থাকবেন বলে সন্ধ্যার কিছু পরে কাউকে পাঠাতে বলে গেলেন। বাঙ্কার দুই ছেলেই যেহেতু পিসির বাড়ি বেড়াতে গেছে তাই তার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকেই পাঠাবেন বলে জানিয়ে দিলেন এবং একথা জানাতেও ভুললেন না যে তার স্ত্রী রাতচরার মতো সর্বদাই সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে পারে। তাই বলে — "ওর পেরাণে ভয় ভিৎ নাই বাবু। আপনি আজ্ঞে চালটা মাপিয়ে রাখুন গে। আর টাকাটা —" *(পৃ. ১৯৭, স্বনির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্প)*। বাঙ্কার স্ত্রী কিন্তু জোয়ারদার বাবুকে পছন্দ করেন না, কারণ তার চাহনি এবং ভাবভঙ্গিতে আদিম লোলুপতার একটা ছায়া প্রকাশ পায়, তাই তার যাবার ব্যাপারে আপত্তি জানিয়েছিল। স্বামীর আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে সে বলে উঠেছিল — "আমি যেতে টেতে পারবনি। ওই, মুখপোড়া বাবুটার চাউনি ভালো না।" *(পৃ. ১৯৭, ঐ)*। শেষ পর্যন্ত বাঙ্কার বৌকে তার স্বামীর জেদের নিকট হার স্বীকার করতে হয় এবং সাঁঝবেলার পর পরই তাকে জোয়ারদার সাহেবের বাড়ি যেতেও হয়। কিন্তু ফিরে আসে গভীর রাতে, বি. ডি. ও. সাহেবের পাশব লালসা চরিতার্থ করে। অন্তঃসত্ত্বা বলে বিন্দুমাত্রও রেহাই সে পায় নি, বরং তার সন্তানের ক্ষতি চাওয়ার জন্যই যেন অত্যাচারের মাত্রাটা আরো বেড়ে যায়।

অত্যাচারিত হবার দুঃখে, রাগে, আক্রোশে পাগলা কুকুরের মতো গজরাচ্ছে পা কাটা বাঙ্কার বৌ। বি. ডি. ও. সাহেব এবং তার পিয়নকে আক্রমণ করেছে রাগে, ঘৃণায় অন্ধ হয়ে, ফলে তাদেরকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে। আর বাঙ্কার স্ত্রীকে পাগল বলে চৌকিদার ও আরো পাঁচজনে মিলে বেঁধে থানায় নিয়ে যাচ্ছে। লোকে যা জানল তা হচ্ছে — সরকারের ঘরে অনেকদিন ধরে বাঙ্কার প্রাপ্য টাকা জমা ছিল তারই রাগের বহিঃপ্রকাশে সরকারের দুজন কর্মীকে এই আক্রমণ। কিন্তু সকলের চোখের এবং জানার আড়ালেই লুকিয়ে থাকল সত্যকার অপরাধ কি এবং অপরাধী কে। আজন্ম দুঃখে লালিত এবং দুঃখে গড়া জীবনে চূড়ান্ত পরিশ্রমের বিনিময়েও সে পেল এক অবাঞ্ছিত, লাঞ্ছিত জীবন। আর তার স্বামী, যে কিনা জীবনে তাকে কিছুই দিতে পারেনি, বরং উল্টে যতটা পারে নিংড়ে নিয়ে গেল সেও তাকে বুঝতে চাইলো না। বেঁচে থাকার রসদের লোভে স্ত্রীকে জোর করে পাঠাল শয়তানের আখড়ায়। যে সংসার, স্বামী, সন্তানের জন্য নারী উন্মাদিনী হয়ে যায় নিজের

যথাসর্বস্ব দিয়ে ভরিয়ে তুলতে চায়, সেই সংসার এবং আপনজনেরাই তার নিরাপত্তা, তার মন নিয়ে অনায়াসেই যেন খেলতে পারে এই গল্পে লেখিকা আশাপূর্ণা দেবী এটাই দেখিয়েছেন।

এই সংসারেরই উন্নতির জন্য আর এক নারীর আত্মদানের কথা পাই **'ছুটি নাকচ'** গল্পে। সজনেপোতার গড়াই বাড়ির ছেলে অমূল্য তার স্ত্রী মালতিকে নিয়ে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। দুজনে মিলে খেটে খাবে বলে শহরে চলে আসে। কারণ গ্রামে অভাবের তাড়নায় দোকানপাট উঠে যায়, ফলে জায়ে জায়ে ঝগড়াঝাঁটি লেগেই থাকত। তাই তারা শহরে এসে বস্তিতে একখানা আস্তানা তৈরি করে নিয়ে একজন রং মিস্ত্রীর কাজ ও অপরজন ঝিয়ের কাজ শুরু করে।

অমূল্য ও মালতীর জীবনে এল পুত্রসন্তান। অবশেষে এল সেই সুযোগ যার সদ্ব্যবহার করে মানুষ নিজের প্রাণপ্রিয় সংসারটিকে একটু উন্নতির মুখ দেখাতে চায়। আর তারই সোপান বেয়ে বেয়ে কিছুটা বিত্তশালী হবার স্বপ্ন দেখে। সুযোগটা এল মালতীর তরফ থেকেই। তার মনিব কন্যা বিবাহিত জীবন দীর্ঘকাল অতিবাহিত করেও ছিল নিঃসন্তান। বহুকাল পর তার সন্তান সম্ভাবনা দেখা দিলে শ্বশুর বাড়ি থেকে পুত্রবধূকে পিতৃগৃহে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু তাকে শাসিয়েও দেওয়া হয় এই বলে যে — এই বিরাট সম্পত্তির মালিক হিসেবে পুত্রসন্তান কোলে নিয়ে সে যেন ফেরে — "'মেয়ে' কোলে করে ফেরা চলবে না। ছেলে চাই। বংশের বংশধর! এত সম্পত্তির মালিকটা কে হবে," — *(পৃ. ৩০, আশাপূর্ণা দেবীর ছোটগল্প সংকলন)*। এখানে এই শাসানির মধ্যেও দেখা যাচ্ছে নারীর প্রতি অত্যাচার, অথচ বিজ্ঞান যেখানে বলছে সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারিত হয় পিতার থেকেই, অথচ পীড়িত হচ্ছে নারী। তারও চেয়ে করুণ অবস্থা সেই অনাগত শিশুটির যার শিরে অবহেলা আর বিরক্তির খাঁড়া ঝুলছে পৃথিবীর আলো দেখবার পূর্ব থেকেই। অবশেষে সেই অনাগত সন্তান পুত্র হয়েই এল, কিন্তু মৃত। তাই মনিব গিন্নী মালতিকেই ধরে পড়েছেন, যেখান থেকে যেভাবেই হোক একটি পুত্রসন্তান যোগাড় করে দিতে। তাকে পারিশ্রমিক হিসেবে দিলেন দশভরি সোনার একছড়া হার এবং কাজ সম্পন্ন করার জন্য নগদ এক হাজার টাকা। মালতি সংসারের স্বচ্ছলতা, সন্তানের ভবিষ্যতের কথা ভেবে রাজি হয়ে যায়। কারণ মনিবানীর উপকারের পাশাপাশি নিজের উপকারের কথাও ভোলেনি, তার প্রমাণ পাওয়া যায় তার স্বামী অমূল্যর সঙ্গে কথোপকথনে — "ওই দশভরি সোনা হাতে পেলে তুমি এই রংমিস্তিরির কাজ আর পঞ্চাননতলা বস্তি ছেড়ে দিয়ে দেশে ঘরে গিয়ে আগের মতন দোকান দিয়ে গুছিয়ে বসবে।" *(পৃ. ৩১, ঐ)*। শুধু পুরুষেরাই নয় একটি নারীও যে তার সংসারের মেরুদণ্ড শক্ত রাখতে কতটা ঝুঁকি নিতে পারে, এই কাজে মালতির রাজী হওয়াটাই তার প্রমাণ।

মালতি একটি শিশু সংগ্রহও করে শহরের উপকণ্ঠের এক দীনহীন হাসপাতাল থেকে এক জমাদারনীর সাহায্যে। কিন্তু শিশুহরণের ক্ষেত্রে সাহায্যকারী জমাদারনীর সঙ্গে অন্য একজনের বয়রা

ভাগাভাগি নিয়ে বচসা হওয়ায় শেষরক্ষা আর হল না। মালতি শিশুসমেত ধরা পড়ল। তিন বছরের জন্য কারারুদ্ধ হয় মালতি। অমূল্য নিয়মিত এসে দেখা করে যেত স্ত্রীর সঙ্গে; কিন্তু ধীরে ধীরে তা কমে আসে, মাসকয়েক পরে থেকে মালতি আর স্বামীর সাক্ষাৎ পায় না। এমনকি কারাগার থেকে ছাড়া পাবার দিনও তাকে নিতে স্বামী বা পুত্র কেউ এল না। জেলগেটে যখন মালতি তার আপনজনদের খুঁজছিল, তখনই দেখা হল আর একজন কয়েদী নিকুঞ্জর সঙ্গে। সামান্য সময়ের আলাপ হলেও বিশ্বাস করে তার সঙ্গেই পুরানো বস্তিতে ফিরে যায়। কিন্তু এতদিন পরে এসে দেখে শুধুই ফ্ল্যাটবাড়ি চারপাশে, বস্তির অস্তিত্ব সেখানে নেই। সঙ্গে সঙ্গেই চলে আসে সজনে পোতায় এবং পথেই দেখা পেয়ে যায় স্বামীর।

অমূল্যর বক্তব্যই স্ত্রী সম্পর্কে তার ধারণাকে প্রস্ফুটিত করে — "আর বল কেন? কোথা থেকে একটা পাগলি এসে — যত বলছি সরে পড়ো নড়ছে না। ..." *(পৃ. ৩৭, ঐ)*। অর্থাৎ স্ত্রীকে গ্রহণ তো করেই নি বরং পাগলি অভিহিত করে তাড়াতে পারলে যেন বাঁচে। মালতি আর দাঁড়ায় না, হনহন করে এগিয়ে চলে বাজারের দিকে যেখানে নিকুঞ্জ কয়েদী এখনো তার জন্য অপেক্ষা করে আছে। সম্পূর্ণভাবে সংসারের জন্য আত্মনিবেদিত একটি প্রাণ বিনিময়ে যদি স্বামীর কাছ থেকে এরূপ উক্তি শুনতে পায়, তবে তার মনের অবস্থা যে কতটা শোচনীয় পর্যায়ে যায়, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। মালতির এই বিরাট পৃথিবীতে একলা হয়ে যাওয়ার সঙ্গে যেন 'তাসের ঘর' এর মমতার কিছুটা মিল পাওয়া যায়। মধ্যবিত্ত ঘরের বৌ, অথবা চাকরাণী — সমাজে নারীরা কি একই গোত্রীয়? তবে সমাজে নারীচিত্তের যে উন্নয়ন ঘটেছে তার প্রমাণও এরাই। মার খেয়ে, অপমানিত ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিয়ে শুধু বেঁচে থাকার আশায় কেউ স্বামীর পদযুগল ধরে কৃপাপ্রার্থী হয়ে পড়ে থাকেনি, নিজেরা নিজের মতো করে উপযুক্ত পথ বেছে নেবার জন্য দৃঢ় পদক্ষেপে সম্মুখে অগ্রসর হয়েছে।

'ব্রহ্মাস্ত্র' গল্পে রয়েছে সেই চিরাচরিত পুরুষতান্ত্রিক প্রভাব। চাকরি খুইয়ে সতেরো মাস বসে থাকার পর সংসারের অচলাবস্থায় রণবীর স্ত্রী অসীমাকে একটা অভূতপূর্ব প্রস্তাব দেয়। অসীমার এককালের সহপাঠী এবং প্রেমিক বিখ্যাত 'ঘোষাল এণ্ড কোম্পানী'র কর্ণধার দেবব্রত ঘোষালের কাছে গিয়ে একটা চাকরির সুপারিশ করতে বলে। কিন্তু অসীমা তাতে রাজি নয়, সে কারো কাছে গিয়ে কোন সুযোগ নিয়ে সুবিধা আদায় করতে রাজি নয়। অথচ রণবীর নানাভাবে তাকে প্ররোচিত করতে থাকে, এমনকি অসীমার মত রূপসীকে যে একবার দেখেছে সে কখনো ভুলতে পারবে না — এই বলে তাকে যেতে বাধ্য করল।

রণবীর স্ত্রীকে সুপারিশ করতে পাঠাল ঠিকই, কিন্তু স্ত্রীর সুপারিশ করে পাইয়ে দেওয়া চাকরি করতে তার সম্মানে লাগতেই পারে — এটাও বসে বসে ভেবে যাচ্ছে। অসীমা কিন্তু স্বামীর মনোভাব বুঝতে পেরেছিল, আর তাই হয়তো চাকরিটা স্বামীর জন্য না করে নিজের জন্যই করিয়ে

এনেছিল। "ওকে সেলাম ঠুকে, ওর অধীনে কাজ করতে তুমি পারবে?" *(পৃ. ৯৫, স্বনির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্প)* —এই শঙ্কা অসীমার আগে থাকতেই ছিল, তাই তো শেষটায় তাকে বলতে শোনা যায় — "তুমি যে শেষ অবধি রাজি হবে না, এতো জানতামই" *(পৃ. ৯৯, ঐ)*। ছেলেরা যেমন চরম দুর্দশায়ও স্ত্রীদের কাছে মাথা নত করতে রাজি হতে চায় না, তেমনি মেয়েরাও বাইরের লোকের কাছে স্বামীর মান খাটো করতে রাজি নয়। কিন্তু পরিবর্তন ঘটে গেছে সেখানেই, যেখানে নারী পুরুষদের এই অহংবোধটা ধরতে পেরে সেখানে ঘা মারতে পেরেছে। পেরেছে বাইরের জগতে নিজেকে জনসাধারণের মধ্যে মিশিয়ে দিতে। এভাবেই নারী অন্দরমহলকে ছাড়িয়ে দায়িত্বের বোঝাকে আরো বহন করে বাঁচার লড়াইয়ে নেমেছে।

'ঊর্ণনাভ' (১৩৬২ বঙ্গাব্দ) গল্পটি সেই চিরন্তনী নারীর কথা বলছে, যারা স্বামীর দ্বারা অত্যাচারিত হলেও মুখ বুজে তা সহ্য করে সেই স্বামীর সুখেরই চেষ্টা চালিয়ে যায়। এখানে তারকদা আর তার স্ত্রীর কথা কথক বলছেন। কথক কর্মোপলক্ষে কোলকাতায় বসবাস করেন। কিন্তু দুর্গোৎসব উপলক্ষে পাড়ার ছেলেরা কোলকাতায় গিয়ে তার বাড়ি খুঁজে বের করে পাড়ায় এসে নানা ধরনের কর্মকাণ্ডে যোগ দেবার জন্য অনুরোধ জানায়। তিনি সপরিবারে আসেন এবং অনেক রকম অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন ও যোগদান করেন। পাড়ার কাকীমা, জেঠিমাদের নিকট বহুদিন যাবৎ শুনে আসছেন তারকদা নাকি তারক বৌদিকে কারো সামনে কখনো কোথাও বেরোতে দেন না। কথাটির সত্যতা যাচাই করতে একদিন সুযোগ পেলেন কথক নিজে। তারই উদ্যোগে এক ম্যাজিসিয়ান আসছেন গ্রামে ম্যাজিক দেখাতে। গ্রামের পক্ষে এই নতুন অনুষ্ঠান প্রদর্শন একটি উৎসবের আকার নিয়েছে যেন; সারা গ্রামের মেয়ে বৌ-রা 'নে-থো' গোছের কাজ করে মাঠে অনুষ্ঠান দেখবার জন্য উপস্থিত হয়েছে, কিন্তু অনুপস্থিত একমাত্র তারকবৌদি। গল্পের কথক বিজু নিজেই এবার চললেন — তারকবৌদিকে সংগ্রহ করে মাঠে নিয়ে যেতে। অনেক বলে কয়েও বৌদিকেই তিনি রাজি করাতে পারলেন না, কিন্তু স্বয়ং তরকদা প্রথমে না করলেও হয়তো বাইরের লোকের সামনে মান খাটো হবার ভয়েই স্ত্রীকে যেতে অনুমতি দিলেন। কিন্তু তা যে অসন্তুষ্টের অনুমতি সেটা বিজু বুঝতে পেরে চলে এলেন। অনুষ্ঠান শেষে দেখা গেল তারকবৌদি তার সন্ধান করছেন। কারণ তার স্বামী তাকে নিয়ে এসেছিল সঙ্গে করে; নির্দিষ্ট জায়গায় অপেক্ষাও করতে বলেছিল কিন্তু ভিড় পাতলা হয়ে গেছে। প্রায় সব গোটানো হয়ে গেলেও তারকদার দেখা না মেলায় পাড়ার দেওর বিজুর সঙ্গেই তিনি বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হন।

এবারই পাওয়া যায় তারকবাবুর আসল পরিচয়, যা নাকি বিজুবাবুর নিকট অবিশ্বাস্য ছিল। অনেক ডাকাডাকি দরজা ধাক্কাধাক্কির পর তিনি দোতলার জানলা খুললেন বটে, কিন্তু নামলেন না এবং নিজের স্ত্রীকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। অনেক অনুনয়, বিনয়ের শেষে তিনি নামলেন বটে,

কিন্তু বিরাট এক দিব্যি দিয়ে বসালেন স্ত্রীকে নিয়ে। সংসারের বাইরের কাজকর্ম করবেন, গোয়াল ঘরে থাকবেন, রান্নাঘরের ছায়া মাড়াবেন না এবং স্ত্রীকে তিনি 'মা' বলে সম্বোধন করবেন, স্ত্রী হিসাবে নয়। অর্থাৎ একরাত্রির অর্ধাংশ পাড়ার বৌ-ঝিদের সঙ্গে বসে একটু অনুষ্ঠান দেখায় সন্দেহবাতিক পুরুষটির রোষের শিকার হয়ে তারকবৌদির সমগ্র জীবনটাই বাতিলের পর্যায়ে চলে গেল। তবে নিজের সংসারে ঝিয়ের কাজ করেও তারকবৌদি থাকতে রাজি, কারণ এমন স্বামীর ঘর করে করে জীবনে বিতৃষ্ণাবোধটা এতটাই প্রখর হয়ে উঠেছে যে মৃত্যুকেও অনেক মহৎ বলে মনে হয়, তাই— মৃত্যু নয়, অভ্যস্ত বিতৃষ্ণার মধ্যেই ডুবে রইলেন।

লেখিকা আশাপূর্ণা দেবী এরপর এই নারীটিকে যেভাবে চিত্রায়িত করেছেন, তাই আমাদের পাঠক সমাজ এবং কথাকার বিজুকে অবাক করে দিয়েছে। এই ঘটনার প্রায় আটমাস পরে বিজু দেশের বাড়িতে এসে শোনেন যে, তারকদা বৌকে এতবড় নোংরা দিব্যি দিয়ে ত্যাগ করেছে, অথচ তিনিই আবার রাঁধুনী ছেলেটাকে আড়াল করে রোজ স্বহস্তে রান্নাবান্না করে থাকেন; পরিবেশন এবং ঘরের কাজ যদিও ছেলেটাই করে থাকে। পিসীমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে তারকবৌদিও এসে ঘরে ঢোকে। বিজু অবাক হয়ে যায় — এত যন্ত্রণা, অবহেলা সহ্য করেও বৌদি হাসিটিকে কেমন অম্লান করে রেখেছে এবং যে কথাগুলো বলছে তাতে রয়েছে অপরিসীম মনোবল — 'পৃথিবীতে দু-চারটে পাগল আছে বলে সুস্থ মানুষদের বেঁচে থাকতে লজ্জা করবে?' *(পৃ. ২৪৬, ঐ)*। এই কথায় ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বিজু বলে ওঠে "অহরহ এই যন্ত্রণা সহে টিকে থাকা বোধকরি আপনাদের পক্ষেই সম্ভব।" (ঐ) নারীজাতির ধৈর্য্যের প্রতি অপার বিস্ময় প্রকাশ পায় এই বক্তব্যগুলোতে। আরো অবাক করে দিয়ে তারকবৌদি যখন শোনায় — রান্নাবান্নার সময়টা বেশ কষ্টকর, কারণ বামুনদের ছোঁড়াটাকে দরজায় পাহারায় বসিয়ে লুকিয়ে রাঁধতে হয়, নয়তো টের পেলে অপমানবোধে হয়তো নাও খেতে পারে। প্রায় বাক্‌রোধ হয়ে যাওয়া বিজু তাই বলে ওঠে — "ওঁর সেই মান্য বজায় রাখবার জন্যে আপনার এই কৃচ্ছসাধন? অথচ যে আপনার মান মর্যাদা কিছুই—" *(পৃ. ২৪৭, ঐ)*।

— "কিন্তু কি করবো বল? খাওয়ার কষ্ট যে তোমার দাদা মোটে সহ্য করতে পারেন না, রান্না পছন্দ না হলে খাওয়াই হয় না সেদিন। অন্য কারুর হাতে পড়লে কি আর ওর শরীর টিকবে?" — *(পৃ. ঐ, ঐ)*।

এই ছিল আমাদের হিন্দু বাঙালী নারী চরিত্র। যারা স্বামীদের দ্বারা অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত, অপমানিত হতো দিনের পর দিন; শুধু নিয়ে যেতো হাত ভরে, দিতো না প্রায় কিছুই; যাদের মধ্যে মান-অপমান বোধ আছে বলেও ভাবতো না পুরুষেরা, তারা সেই স্ত্রীরা স্বামীর সুখের জন্য সব ভুলে যেত। মেয়েদের মান-সম্মানের দিকে তাকাতে নেই, তাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা, রাগ-রোষ, শখ-আহ্লাদ থাকতে নেই — এই ভাবনাতেই মেয়েরা নিজেরা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। আর তাই হাজারো কষ্ট-

অপমানেও ওরা স্বামীদের সুখ, শান্তি, মান-সম্ভ্রম, স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থেকেছে চিরকাল। নিজে পাঁকে দাঁড়িয়ে থাকলেও মনটা যে কত উঁচু তারে বাঁধা আছে সেটাই লেখিকা দেখাতে চেয়েছেন এখানে। কিন্তু এটাও সত্যি নারীরা নিজেদের তুচ্ছাতিতুচ্ছ ভেবে পুরুষদের যে পথে এগিয়ে দিচ্ছে তাতে পুরুষরা যে নিজেদের শক্তিই চিরকাল কায়েম করে যেতে চাইবে তাতে সন্দেহ নেই।

বিবাহ পূর্ব প্রেমের স্মৃতি অনেক নারীর বিবাহিত জীবনকেও আন্দোলিত করেছে এবং বিবাহোত্তর জীবনেও কেউ কেউ পরকীয়া প্রেমে কিঞ্চিৎ মাত্র হলেও দোলায়িত হয়েছেন। নীচে আলোচিত গল্পগুলোতে সে নিদর্শন মেলে।

'প্রলাপ' গল্পে আশাপূর্ণা দেবী আর এক নারী চরিত্রের চিত্র প্রকাশ করেছেন। সরমা শশাঙ্কের স্ত্রী, আর তার গানের শিক্ষক হল দিব্যেন্দু। ঘটনার দিন সন্ধ্যায় বিশাল জমিদার বাড়ীর ভেতরের বাগানে বেড়াচ্ছিল সরমা, কারণ গানের মাস্টারের অভাবে গানের আসর সেদিন বসেনি। তাই আঁধার ঘনিয়ে আসবার আগে ঘরের দিকে অর্থাৎ বারান্দা থেকে বাগান পর্যন্ত খোলা সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসতেই দেখলেন সেই দৃশ্য। বাড়ির চাকরের ছেলে মধু খোলা আলমারীর সামনে দাঁড়িয়ে। ছোট ছেলে শোবার ঘর, বসার ঘর সব ঝাড়পোঁছ করে, সর্বত্র তার অবাধ গতিবিধি, তাই চাবি কোথায় আছে না আছে সমস্তই তার নখদর্পণে, আর মধুরা তিন-পুরুষ ধরে কাজ করে আসছিল এই বাড়িতে, সেদিক থেকে যথেষ্ট বিশ্বাসভাজনও হয়ে উঠেছিল সকলের কাছে। কিন্তু বিশ্বাসঘাতক হয়ে যায় সে সরমার কাছে। সরমার মাথায় রক্ত চড়ে গিয়েছিল, তার আলমারীর সামনে দশবছরের ছেলেটিকে নোটের তাড়া হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে।

মধু কিন্তু অনুনয় বিনয় করে কেঁদে কেটে তার পায়ে পড়ল না, বরং বুনো ঘোড়ার মত ঘাড় বাঁকিয়ে বলে উঠেছিল, "ছেড়ে দাও বলছি! লাগছে না আমার?" *(পৃ. ৭৬, আশাপূর্ণার গল্প সমগ্র, ৫ম খণ্ড)*। এতে সরমা আরো অগ্নিশর্মা হয়ে চাকরদের উদ্দেশ্যে বলে ওঠেন—" মেরে ফেল মেরে ফেল! মারতে মারতে ওকে একেবারে যমের দক্ষিণ দোরে পাঠিয়ে দে।" *(পৃ. ৭৬, ঐ)*। রাগের তোড়ে গিন্নী এরকম গালিগালাজ চাকর-বাকরদের করতেই পারেন, কিন্তু চাকররাও বাড়ির কর্তার ও মধুর মায়ের অনুপস্থিতিতে তাদের ঈর্ষাকে বেশ কাজে লাগিয়েছিল। ঈর্ষার কারণ তিন পুরুষের বিশ্বাসভাজন চাকরদের বাচ্চা মধুকে মালিকের স্নেহের চোখে দেখা। মধুকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছিল, তার ওপর আক্রমণটা হয়েছিল অমানবিক। মধুর অপরাধ — সরমার শাড়ীর আলমারীতে শাড়ীর ভাঁজে গোপনে তার গয়না বিক্রি করা পাঁচ হাজার টাকা লুকিয়ে রাখা ছিল, আর মধু সেটাই নিতে গিয়েছিল।

সরমা ভাবছে কিভাবে পরিস্থিতিটা সামাল দেওয়া যায়, কারণ শশাঙ্ক তাকে বিশ্বাস করে আর দিব্যেন্দু তাকে 'স্বর্গের ফুল' ও 'অপার্থিব প্রতিমা' বলে স্তুতি করে থাকে। সরমা আজ অনুতপ্ত,

প্রায়শ্চিত্ত করতে চায়, হাসপাতালে গিয়ে তাকে দেখে এসে সবার চোখে মহানুভব হতে চায়। চাকর বাকরদের নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে নার্সদের অবহিত করতে চায়, আর চায় মধুর হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিয়ে আসতে। আসলে দশ বছর বয়সী সামান্য এই বালক যখন একঘর লোকের সামনে বলে উঠেছিল "বেশি রাগিও না বলছি, ভালো হবে না। আমি চোর, আর নিজে ভারি পয়গম্বর না?" *(পৃ. ৭৭, ঐ)*।— তখন ঘরের মধ্যে চাপা হাসির ঢেউ খেলে যাওয়ায় সরমার মাথা আর ঠিক থাকে নি। কারণ শশাঙ্কের বুদ্ধিশুদ্ধি আর গানের মাষ্টারের বয়স নিয়ে দাসদাসী মহলে হাসাহাসি আগাগোড়াই চলত।

অকস্মাৎ সাত তারিখের বদলে চার তারিখেই সরমাকে চমকে দিয়ে শশাঙ্ক এসে হাজির। স্বামী-স্ত্রীর কথাবার্তায় চলল সরমার উষ্ণ অভ্যর্থনা আর শশাঙ্কের উদাসীন কথাবার্তা। ধীরে ধীরে প্রকাশ পেল মধুর সমস্ত খবরই শশাঙ্ক অবগত এবং মধুর মাকে নিয়ে তিনিই থানায় ডায়েরী করিয়ে এসেছেন। কারণ মধু প্রলাপ বকছে যে "আমি চোর নই বাবু। চুরি করতে যাইনি আমি! আমি মাকে আটকাতে যাচ্ছিলুম।..... টাকা জোগাড় হলেই মা পেলিয়ে যাবে, টাকাগুলি নুকিয়ে ফেলছিলুম" *(পৃ. ৮১, ঐ)*।অর্থাৎ সরমা তার গয়না বেচার টাকা নিয়ে গানের মাস্টার দিব্যেন্দুর সঙ্গে পালিয়ে যাবার যে মতলব ভাঁজছিলেন তা ধরা পড়ে গিয়েছিল মধুর কাছে। আর মধু নিমকহারাম না হয়ে নুনের গুণ গাইতে যে কাজটি করতে যাচ্ছিল তা হল মুনিব বাড়ির কলঙ্ককে ঢাকার চেষ্টা। সরমা তার আজীবনের বিশ্বস্ততার স্থান তার স্বামীর বিশ্বাস হারিয়েছিল, কারণ তার স্বামী পুরো ব্যাপারটা নিজে হাতে সমাধান করেন এবং গানের মাস্টারের লেখা একখানা চিঠি নিজেই সরমার হাতে দেন। সরমা অত্যন্ত চতুর হয়েও শেষরক্ষা করতে পারল না এবং সর্বসমক্ষে সংযত থেকেও সে যে ভেতরে ভেতরে কতটা দ্বি-চারিণী এবং বিশ্বাসঘাতিনী তাই প্রমাণ হয়ে পড়ে। অর্থাৎ বাইরের আচরণই শেষ কথা নয়; বাহ্যিক আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে মানবিক ও মানসিক প্রবৃত্তিগুলো, সেই প্রবৃত্তির দ্বিচারিতার উদ্‌ঘাটনই এখানে লেখিকার বক্তব্য।

'মৃত্যুবান' (১৩৫৭ বঙ্গাব্দ) গল্পের মূল চরিত্রে আছে নিরঞ্জনের স্ত্রী সুন্দরী সুনন্দা। হারিয়ে যাওয়া সুনন্দা পুনরায় ফিরে এসেছে, অর্থাৎ তার স্বামী তাকে যেভাবেই হোক, যেকোন কিছুর বিনিময়েই হোক ফিরিয়ে এনেছে সশরীরে। স্বামী-স্ত্রীর সংসারে সুখী দম্পতি সুনন্দা একসময় হঠাৎ করে উধাও হয়ে গেল। পাঁচদিন সন্ধানের পর অনেক কষ্টে স্ত্রীকে উদ্ধার করতে পেরে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে নিরঞ্জন সমস্ত আত্মীয়-স্বজনকে ও বন্ধু বান্ধবকে ডেকে টী-পার্টির আয়োজন করেছে। সেদিনের অনুষ্ঠানের মধ্যমণি হল সুনন্দা, যে নিজমুখে সেই রোমাঞ্চকর কাহিনী বর্ণনা করেছে সকলের সম্মুখে সুচারুরূপে। সমস্ত অনুষ্ঠান চুকে যাবার পর গভীর রাতে স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথনে উন্মোচিত হল প্রকৃত রহস্য। সুনন্দা তার স্বামীর সঙ্গে অবিরত অভিনয় করে চলছে, আর সে পারছে

না, তাই এই বন্দী দশা থেকে মুক্তি চেয়েছে। উদ্ধারকর্তা হিসেবে সে চিঠি লিখেছে তার বাল্যবন্ধু তথা প্রেমিক কমলাক্ষকে। সে এই কংক্রীটের শহরের বাইরে, সমাজ সংসারের বাইরে গিয়ে নীরবে নির্জনে এক মনোরম সুখী গৃহকোণ রচনা করতে চায় তার প্রেমিক পুরুষটির সাথে। কমলাক্ষ তার আহ্বানে সাড়া দেয়, পূর্ব প্রেমিকার হাত ধরে সে বেরিয়ে যায় অজানার উদ্দেশ্যে। এই ঘটনার প্রায় পাঁচদিন পর নিরঞ্জন সুনন্দাকে এক মফঃস্বল শহরের ওয়েটিং রুম থেকে উদ্ধার করে বাড়িতে নিয়ে আসে। সুনন্দা স্বামীর সঙ্গে ফিরে আসে কিন্তু খোয়া যায় তার সমস্ত গয়নাগুলো যে বাক্সে রাখা ছিল সেটা। কারণ কমলাক্ষর সঙ্গে সুখের নীড় গড়ার সম্বল হিসেবে যে গয়নাগুলো যথেষ্ট একথা কমলাক্ষকে তিনি জানিয়েছিলেন এবং সঙ্গে নিয়েও গিয়েছিলেন। কমলাক্ষ সেগুলো নিয়ে সুনন্দাকে ওয়েটিং রুমে বসিয়ে রেখে পালিয়ে যায়।

নিরঞ্জন সমস্ত তথ্য সহ স্ত্রীকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে এবং চৌদ্দ'শ টাকার বিনিময়ে সুনন্দার লেখা চিঠিখানিও কমলাক্ষর কাছ থেকে উদ্ধার করে। এবার নিরঞ্জন সুনন্দার স্বামীর সংসার থেকে মুক্তি চেয়ে লেখা চিঠিখানি সহ সমস্ত ঘটনা স্ত্রীর সম্মুখে সুন্দরভাবে পেশ করতে থাকে ধীরে ধীরে। এইসময় যতই এগোচ্ছে সুনন্দার মুখ যেন ততই কালো হয়ে উঠছে। সে বুঝতে পারল দাম্পত্য জীবনের ভিত তার নড়ে গেছে; যে ঘটনা আত্মীয়-স্বজন সকলের চোখে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পেরেছে; শত চেষ্টা চালিয়েও স্বামীর চোখে তার ঘোর লাগাতে পারেনি। কিন্তু আদ্যোপান্ত চেষ্টা চালিয়ে গেছে মিথ্যাকে প্রতিষ্ঠিত করতে। কিন্তু একসময় যেন সমস্ত লাবণ্যকে ধুয়ে মুছে দিয়ে অস্থিসার চেহারাটা বের হয়ে পড়েছে নিরঞ্জনের সামনে। যাকে ঘিরে আজীবন সংসারবৃত্ত রচনা করতে হবে, তার সঙ্গে আর অভিনয় করে নয়, সত্যকে নিয়েই মুখোমুখি হয়ে টিকে থাকতে হবে, এই সত্য সুনন্দা উপলব্ধি করতে পারল। কিন্তু তার অভিনয় ক্ষমতা সত্যিই প্রশংসনীয়। যে স্বামী তাকে বিপদের সমুদ্র থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এল, তাকে পর্যন্ত পুনরায় অভিনয় দ্বারা বশীভূত করতে চাওয়ার মধ্য দিয়ে বোঝা যায় নারী হলেও সুনন্দা কতটা মানসিক বলে বলীয়ান। মিথ্যাটাকে কত সুন্দরভাবে একটুও বিকৃত না করে শিল্প চাতুর্যের দ্বারা ফুটিয়ে তুলেছে, নারীর এই অভিনয় দক্ষতা কি পরিণাম সৃষ্টি করল সংসারে তাই এখানে দেখাবার।

'আদিম' (১৩৫৪ বঙ্গাব্দ) গল্পের চরিত্র কস্তুরী নারী হিসেবে স্বামীকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবাসে। কর্মসূত্রে স্বামী-স্ত্রী একত্রে বসবাস করতে পারে না; তাই মাঝে মাঝেই কস্তুরী চলে আসে প্রদীপের কাছে, আনন্দে- ভালোবাসায়-আবেগে প্রায় যেন উড়তে উড়তে। এভাবেই আবার চলে এসেছে স্বামীকে কোন কিছু জানতে না দিয়েই। কস্তুরীর স্বামী তখন অফিসের কাজে ঘরে ছিলেন না, অফিসে থাকায় প্রাথমিকভাবে কথাবার্তা চলে চাকর নানকুর সঙ্গে। তখনই উদ্‌ঘাটিত হয় নতুন রহস্য।

প্রদীপ জঙ্গলে কোয়ার্টারে থাকে, জঙ্গলেরই অফিসার সে। আর কস্তুরী পড়াশোনার জন্য শহরে

রয়ে গেছে। দু-তিন মাস পর পর তাদের দেখা হয়। অগাধ-অপরিসীম আস্থা আর ভালোবাসাময় দাম্পত্য জীবন তাদের। অকস্মাৎ ঈশান কোণে ভেসে আসা এক টুকরো কালো মেঘের মত দেখা দিল একটি সন্দেহের দানা, যা উৎসারিত হল নানকুর মুখ থেকে। তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে প্রদীপের একটি অর্দ্ধসমাপ্ত চিঠি, যা কস্তুরীকেই লেখা। যাতে বলা হচ্ছে প্রদীপের অরণ্যবাসের অভিজ্ঞতা, তার সঙ্গে সঙ্গে তার রাত্রি জাগরণের কথা। প্রদীপ সারাদিন অফিসের কাজে ব্যস্ত থাকলেও রাত্রে একটুও ঘুমোতে পারে না। জানলার ধারে বসে বসে রাত্রির অরণ্যের মর্মরধ্বনি শোনে, আর কায়াহীন আত্মার ফিস্‌ফাস্‌ ধ্বনির হাহাকার শোনে। সৌন্দর্য হাহাকারের মধ্য দিয়ে প্রস্ফুটিত হয় কেন, আর কেনই বা প্রদীপের ঘুম চলে গিয়েছে রাতের পর রাত ধরে। মণিহারীর বৌ এসে তাদের সাহেবকে রান্না করা খাবার দিয়ে যায় আবার প্রয়োজনে রান্নাও করে দিয়ে যায় এসে। অথচ এই মনিহারীর বৌ সমাজচ্যুত হয়ে বাস করছে এই সাহেবেরই কারণে। মনিহারী সাহেবের (প্রদীপের) রাইফেল পরিষ্কার করতে করতে হঠাৎ গুলি খেয়ে মারা যায়, কিন্তু আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে সাহেবকে শাস্তি থেকে বাঁচিয়ে দেয় এই জোড়াতাপ্পি দেওয়া পোষাক পরা মনিহারীর বৌ।

কস্তুরী এখানেই খুঁজে পায়, আদিমতার গন্ধ। মনিহারীর সারারাত না ঘুমিয়ে জেগে থাকাটাই একটা আশ্চর্য ব্যাপার ছিল। "ও পাগলাটা কেন যে রাতভোর জেগে জেগে সাহেবের জানলায় চোখ রেখে ঘর পাহারা দিতো কে জানে! ওর চোখ দুটো ছিলো ঠিক বনবিড়ালের মতো।" *(পৃ. ২২৪, গল্প সমগ্র, ২য় খণ্ড)*। সমস্ত কাজ ও ঘুম ফেলে মনিহারীর অতন্দ্র প্রহরীর মতো জেগে থাকা, মনিহারীর স্ত্রীর পুলিশের নিকট আসল সত্য উদ্‌ঘাটিত না করা, কস্তুরীর স্বামীর জন্য মাংস রান্না করে চুপি চুপি রেখে যাওয়া — এগুলোই একত্রিত হয়ে এক জটিল আবর্ত সৃষ্টি করছে। যা থেকে এক অদিমতার ধুম্রজাল বেরিয়ে এসে কস্তুরীর চতুস্পার্শে ওড়নার মতো অস্পষ্ট জাল বিস্তার করেছে। আজ যেন সে প্রদীপকে চিনতে পারছে না।

'এখনও নেভেনি হোমের আগুন' (১৩৫৬ বঙ্গাব্দ) গল্পে আমরা আপাতদৃষ্টিতে দেখতে পাই পতিভক্তি পরায়ণা এক নারীকে। যিনি নাকি বিবাহের পর থেকেই বছরের পর বছর অসুস্থ স্বামীর জন্য নানা ব্রত, পার্বন, উপবাস করেই যাচ্ছেন। সংসার, সন্তান, সুস্থ দাম্পত্যজীবন যে নারী পায়নি তিনি হয়তো এই পুজো-আচ্চা নিয়ে মেতে থাকবেন, নয়তো বর্হিমুখী হবেন — এই দুটো ধারা ছাড়া আর পথও হয়তো থাকে না। তাই আমরা ললিতের স্ত্রী সুমিতাকে প্রথম পথেই হাঁটতে দেখি। প্রায় প্রতিমাসেই দশ-বারোটা করে উপোসে তার দিন কাটে। সংসারে তার আর এক সাথী ননদ নলিনী। এমনই একরাতে যখন প্রচণ্ড ঝড় শুরু হল তখন ঝড়ের শব্দে নলিনীর ঘুম ভেঙ্গে যায় আর স্বপ্নের ভয়াবহতায় সুমিতার ঘুম ভাঙ্গে।

কি ছিল সেই স্বপ্ন? সুমিতার পিতৃগৃহের নিকটবর্তী এক মন্দির — অরুণেশ্বরের (শিব) মন্দির;

সেখানে সিঁড়ি দিয়ে নৈবেদ্য সাজিয়ে নিয়ে উঠছিলেন পুজোর জন্য, এমন সময় একজন নেমে আসতে গিয়ে ধাক্কা লেগে সব পড়ে ছড়িয়ে গেল, সব নষ্ট হয়ে গেল। অসুস্থ স্বামীর মানতের পুজোর উপাদান ছড়িয়ে নষ্ট হয়ে যাওয়ার জন্যে নয়, যার সঙ্গে ধাক্কা লেগে গেল — তার জন্য স্বপ্ন হয়ে উঠেছে ভয়াবহ। তিনি হচ্ছেন সেই অঞ্চলের জমিদার — যার স্বপ্ন তাকে আজীবন বিভোর করে রেখেছে। যার সঙ্গে সূক্ষ্ম অথচ গভীর সম্পর্কের সূত্র এক মধুর আবেশ রচনা করে তুলতো তাদের উভয়ের মনে। কিন্তু প্রকাশিত হল না সে সত্য, স্বামীর অসুখের জন্য মানত করে বেড়ানো নারীর উতলা মনের পরিচয়ই প্রাধান্য পায়। ননদের উৎসাহেই যেতে হল সেই মন্দিরে।

জমিদারের নিজস্ব নিয়মে বেলা বারোটায় অরুণেশ্বরের মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে যায়, সেই চাবি চলে যায় জমিদারের পেয়াদার মাধ্যমে তার নিকট। আর বহুকষ্টে ধেয়ে আসা সুমিতা মন্দিরের সিঁড়িতে বসে অপেক্ষা করছে জমিদারের জন্য, যিনি আসবেন এবং দরজা খুলে দিতে বাধ্য হবেন। জমিদার এসে সব শুনে সকলকে বিশ্রামের অছিলায় সরিয়ে দিয়ে প্রাক্তন প্রেমিকার মুখোমুখি হলেন। জমিদার সুরেশ রায় পুজো দিতে আসা প্রগলভা মহিলাটিকে অনেক অনুনয়-বিনয় করেও বিকেল চারটের পুজোর সময়টাতে থাকতে রাজি করানো গেল না। সুমিতা বলল — "রুগ্ন স্বামীকে ফেলে রেখে এসে কোথাও সময় নষ্ট করার প্রবৃত্তি আমার নেই।" — *(পৃ. ১২১, ঐ)*।

— "বার বার তো বলছি — দুঃস্বপ্ন দেখে স্বামীর কল্যাণ কামনায় পুজো দিতে এসেছি আমি।"

— "যে কথা বার বার বলতে হয় সেইটার ওপরেই সন্দেহ হয় সুমিতা," — *(পৃ. ১২১, ঐ)*

সুমিতা যদি মন্দিরের দ্বার খোলা পেত, যদি নির্বিঘ্নে পুজো দিয়ে ফিরে যেত কোলকাতায়, তবে কি তার ভালো লাগত? নিজেকে যতই বোঝাত বা সকলের সম্মুখে তুলে ধরতে চেষ্টা করুক তার পতিভক্তি, তার ঈশ্বরে পরম নিষ্ঠার কথা — সেই তো একমাত্র সত্য নয়। যে কারণে ছোটবেলায় ভাইয়ের সঙ্গে পিসির বাড়ী ছুটে চলে আসত শিবমেলা উপলক্ষে এ যেন একরকম সেই ছুটে আসা। যেন ব্রতপালন ও উদ্‌যাপনের জন্য একটু প্রাণের রসদ সংগ্রহ করতে ছুটে আসা এখানে।

সুমিতার অন্তরের আর্তির মর্যাদাও পায় সে জমিদারের কাছ থেকে। তাই — "শিব কখনো ঘুমিয়ে পড়েন না, আমাদের অহংকারের বিরাট কপাটটাই আড়াল করে রাখে তাঁকে। তাঁর দরজা চিরদিন খোলা আছে, চিরদিন খোলা থাকবে।" *(পৃ. ১২২, ঐ)* — এই কথা থেকেই বোঝা যায় বাহ্যিক অহংকারের জন্য, কৌলিন্য, সামাজিক প্রতিপত্তির জন্যই তারা একে অপরকে ছেড়ে আছে, কিন্তু অন্তরে উভয়েরই সমান গতিবিধি। সতী সাধ্বী নারী বলে আমাদের যাকে মনে হয়েছিল — সেও যে কবেকার এক অতি কোমল গোপন প্রেমকে সযত্নে লালিত করে রেখেছে নিজের অন্তরের অন্তঃস্থলে তা সুমিতাকে না জানলে বোঝা যেত না। হয়তো সুস্থ স্বামী-সংসার-সন্তান পেলে সুমিতার এই প্রেমের ওপর একটা প্রলেপ পড়তে পারত, কিন্তু এসব সুখ থেকে বঞ্চিত থাকায় যেন পুরানো

প্রেমই হয়ে উঠেছে তার প্রাণরস ও সঞ্জীবনী সুধা।

'অসতর্ক' (১৩৫৭ বঙ্গাব্দে) গল্পে প্রবাসী বন্ধু নিরুপম আর অতিথি দম্পতি শুভ্রা-সরোজ। দীর্ঘ একটিমাস স্বামী-স্ত্রীতে এসে বন্ধুর কাছে কাটিয়ে যায়। উষ্ণ আপ্যায়নে তারা এতটাই খুশী যে দীর্ঘদিন আতিথ্য গ্রহণ করতে কোন দ্বিধাবোধ করেনি। স্বামী এবং স্বামীর বন্ধুর সান্নিধ্যে শুভ্রাও বেশ ভালোই কাটিয়েছে। তাই চলে যাবার আগের মুহূর্তে তিনজনেই বেশ বিষাদগ্রস্ত। রাতের খাবারটা অন্যদিনের মতোই সারছে, তবে বেশ বিষাদের করুণ সুর ছড়িয়ে পড়েছে, কারণ শেষ রাতে তাদের ট্রেন এতদিনের ভালোলাগাটাকে ধরে রাখতে শেষ পর্যায়ের আড্ডাতেও বসল সকলে অন্যান্য দিনের মত এবং যথারীতি আড্ডাও চলছে। কিন্তু একসময় সরোজ উঠে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেও শুভ্রা রাজি নয়, তার ইচ্ছা সে সারারাত জাগবে, ইচ্ছে হলে সরোজকান্তি উঠে যেতে পারে — "তোমার আর কি চিন্তা, শুধু ঐ ঘুমের তালেই আছো। বেশ যাও না তুমি, নিশ্চিন্ত সুখে ঘুমোওগে। আমরাও পরমানন্দে আড্ডা দিই বসে।" *(পৃ. ১৬৮, গল্প সমগ্র, ৩য় খণ্ড)* সরোজ নিজস্ব পরিহাসের ভঙ্গিতে বলে — "তোমাদের আড্ডাটা পরমানন্দের হবে সন্দেহ নেই, কিন্তু আমার ঘুমটা কি ঠিক নিশ্চিন্ত সুখের হবে?" *(পৃ. ঐ, ঐ)*। এই পরিহাসের চিত্র অচিরেই বিস্রস্ত আকার ধারণ করে। কারণ হিংসুটেরা কখনোই ভালো করে ঘুমুতে পারে না — এই বলার মধ্যে কোথায় যেন গোপন একটা ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে। যার প্রকাশ করতে গিয়ে সরোজ ক্ষিপ্ত হয়ে যায় — "ও তাহলে সত্যিই জাগতে চাও তুমি? আমি ভাবছিলাম ঠাট্টা করছো।" ... *(পৃ. ১৬৮, ঐ)* — বলে গট্‌গট্ করে বেরিয়ে গিয়ে নিজের ঘরে শুয়ে পড়ে দরজায় খিল দিয়ে।

এই পরিস্থিতির জন্য নিরুপম প্রস্তুত নয়। বন্ধু-পত্নীর সঙ্গে বন্ধুর অবর্তমানে এত রাতে আড্ডা দিতে সে নিজেও বেশ অপ্রস্তুত। আলোচনার বিষয় কমিউনিজমের মূলতত্ত্বই হোক আর দাম্পত্য বা বন্ধুত্বের সম্পর্কের সূত্রই হোক — রাতের আড্ডা এবং তদুপরি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আবেগঘন পরিবেশের তাল কেটে গেলে ব্যাপারটা আর নিশ্চিন্ততার পরিস্থিতিতে থাকে না। আবার সেটা যদি নিরুপমের মতো অবিবাহিত কোন পুরুষের ক্ষেত্রে হয়। যে শুভ্রাকে এতদিন চিনত — এ যেন সে নয়। আজ যেন অনেক উজ্জ্বল, প্রখর, স্পষ্ট। এই প্রাখর্য্য নিয়েই নিজের মনের দিকে তাকিয়ে নিজের ইচ্ছাকে প্রকাশ করতে চাইছে। মনের গতির রাশ টানতে আর রাজি নয় শুভ্রা। প্রকৃতির উদারতার সম্মুখে এসে মানুষের মনের চিত্র যেমন উদার হয়ে যায়, তেমনি হয়েছিল শুভ্রারও। সন্ধ্যের ট্রেনেই তাদের চলে যাবার কথা থাকলেও অজস্র গুণ কীর্তন করে নিরুপমই তাদের আটকেছিল, যদিও — "অসংখ্যবার পায়নি কি বিপদের সংকেত?" *(পৃ. ১৭৩, ঐ)*। পরিস্থিতি এমন ঘোরালো হবে ভাবতে না পারলেও শুভ্রার আচরণে কিছুটা হয়তো আঁচ করতে পেরেছিলেন। কারণ প্রতিটি নারীর ভেতরেই বিশেষতঃ বর্তমান যুগে, একটি স্বপ্ন থাকে, তিনি তার নিজস্ব জগতের ভালোলাগা, মন্দলাগা দিয়ে

পুরুষটিকে সাজাবেন, পরবর্তীকালে যিনি স্বামী হিসেবে জীবনে আসেন। নিজের শিক্ষা-দীক্ষা ব্যক্তিত্ববোধ এসবের সংমিশ্রণের আদর্শ রূপটি যদি প্রতিনিয়ত হয়ে উঠতে না পারে তখন শুরু হয় মানিয়ে নেবার পালা। যে পদ্ধতিতে আমাদের নারী সমাজ বেশী এগিয়ে চলছে। আর মানিয়ে নিয়ে চলার অর্থই হল বেশীরভাগ ক্ষেত্রে নিজের জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যকে পরিহার করা, নিজস্ব পদচারণার গতি শ্লথ করে দেওয়া এবং কখনো বা প্রতিভার অপমৃত্যু নয়তো প্রতিভার গতিমুখের পরিবর্তন ঘটানো।

শুভ্রার ক্ষেত্রে যা হয়েছিল, তা হল — প্রকৃতির সান্নিধ্যে এসে স্বামীর পার্শ্বে স্বামীরই এক অবিবাহিত বন্ধুকে পেয়ে প্রতি তুলনা করা সম্ভব হয়ে গিয়েছিল। পাশাপাশি ক্রমশঃ ধরা পড়ছিল, সরোজের কিছু আচার-আচরণ — যা দীর্ঘদিন ধরে তার নিকট হয়তো অপছন্দের তালিকায় ছিল। প্রত্যেকের চরিত্রের কিছু দিক থাকে যা একজনকে আকর্ষণ করে আবার অন্যজনের বিকর্ষণের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। নির্জনের বুকে অলস দিনগুলোতে হয়তো শুভ্রা নিরুপমের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। তার নিজের অন্তরাত্মা যে দিকগুলোকে বিকশিত না করে বরং চাপা দিয়ে রেখেছিল সেগুলো ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হয়ে তাকে যেন প্রগল্‌ভা করে তুলেছে। তাই সেই জোরেই সে নিরুপমের সঙ্গে সারারাত কাটিয়ে দেবার জন্য অতি সহজেই সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছে। কিন্তু নিরুপমই বা তার সিদ্ধান্তকে সানন্দে স্বাগত জানাবে কেন? তাই নিরুপম অত্যন্ত সুচারুভাবে জানিয়ে দেয় সামনের ফাঁকা মাঠের ধারে গাছের তলাতেই চাকর বুধনের উপস্থিতি, যে "ঘড়ির এ্যালার্মকে বোমার সাইরেন বলে ভুল করে বুক দিয়ে রক্ষা করতে ছুটে আসে।" *(পৃ. ১৭০, ঐ)*। সহসা নিরুপমকে তার ভীতু কাপুরুষ বলে মনে হয়, পাহারাদারকে জাগিয়ে রাখবার জন্য, এবং স্বামী সরোজ যে ঘরে শুয়েছে সেখানে চলে যায়। কিন্তু অনেক ডাকাডাকিতেও দরজা না খোলায় বাধ্য হয়ে অপমানিত শুভ্রা ফিরে এল নিরুপমের ঘরেই। এসেই উজার করে ঢেলে দিল তার সেই অন্তর নিঃসৃত নির্যাস যা এতকাল পোষণ করে রেখেছিল মনোমধ্যে অতি যত্নে। — "নিরুপম! জব্দ করে দাও ওকে, চিরদিনের মতো মাথা হেঁট করে দাও ওর। পালিয়ে চলো আমাকে নিয়ে। একলা ফিরে যাক ও।" *(পৃ. ১৭১, ঐ)*। এত বছর পর প্রকাশ্যে আনতে পেরেছে নিজের অন্তরাত্মার ব্যথাটাকে, কিন্তু নিরুপম পরপর ঘটে যাওয়া ঘটনায় যেন হতচকিত হয়ে যাচ্ছে, শুভ্রাকে বুঝে উঠতেই সময় লাগছে বলে নিজের এই মুহূর্তের কর্তব্য স্থির করতে পারছে না। সরোজের দরজা খোলার দায় বুধন নিজেই নিয়েছে এবং শুভ্রা প্রত্যাখ্যাতা প্রেমিকা সরোজের ঘরে গিয়ে এবার অপমানে পাল্টা অপমানে জর্জরিত হয়ে ক্ষ্যাপা কুকুরের মতো হয়ে উঠেছে। তৎক্ষণাৎ এই বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলে যেতে চাইছে স্টেশনে। প্রত্যাখ্যাত নারীর হৃদয় হিংস্র হয়ে ওঠে, নারীর দর্পণেই পুরুষরা তাদের পরিপূর্ণভাবে প্রতিবিম্বিত হতে দেখে, তাদের কেন্দ্র করেই শুরু হয় ভাঙাগড়া। যেমন শুভ্রাকে কেন্দ্র করে ভেঙ্গে গেল সরোজ-নিরুপমের বন্ধুত্ব। আর দর্পণের কাজ করে শুভ্রা নিস্তার পায় নি। নিজেকে উন্মোচিত করে দিয়েছে

দুটি পুরুষের সামনে, কিন্তু সে নিজে যে তিমিরে ছিলেন তাই রয়ে গেলেন। বাকী জীবন দুঃসহ হয়ে উঠবে হয়তো সরোজের সাথে কিন্তু সত্য উন্মোচনে মিথ্যার অভিনয় থেকে মুক্তি পাওয়াটাও একরকম নিজেকে নতুন করে যেন ফিরে পাওয়া।

অন্তঃপুরের অন্দরমহলের প্রতিটি অলিন্দ বাইরের কোন লোক এসে সহজে ধরতে পারে না; তেমনি নারী মনের অন্তরমহলের অলিন্দ পুরুষদের ধরতে বেশ কিছুটা সময় লাগে। তবুও বলা যায় অপরাধী যেমন তার অপরাধের সূত্র অজান্তেই রেখে যায় তেমনি কোন পুরুষ যদি সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করে তবে তার প্রয়োজনীয় অলিন্দের সন্ধান সে পাবে। কিন্তু নারীচিত্ত সহজ স্বাভাবিক পথ ছেড়ে কেন এই পথগুলো অবলম্বন করে। কারণও হয়তো পুরুষ নিজেই। হয়তো নারী তার স্বাভাবিক চাহিদা পূরণ করতে পারে না স্বামীর কাছ থেকে, তাই হয়তো অনেক কিছু পেয়ে আবার অনেক কিছু না পাওয়াকে পেতে অনেক সময় অসৎ পথ অবলম্বন করে বসে। **'একটি ভাঙাচোরা গল্প'** (১৩৫৮ বঙ্গাব্দ) তে শশাঙ্কশেখরের নীতি তেমনই এক রহস্য উদ্‌ঘাটন করে বসে। শশাঙ্কশেখর এবং তার রূপবতী স্ত্রী দুজনেরই অকালপ্রয়াণ ঘটে। ভূমিকম্পে বিরাট প্রাসাদোপম বাড়ি ধ্বসে বসে যায়, আর সেই বাড়ির নীচে চাপা পড়ে আছে এক বিরাট সিন্দুক। অর্ডার দিয়ে যার তালা বানানো হয়েছিল। সেই সিন্দুকের ছিল অদ্ভুত এক রহস্য।

অজানা নাম্নী সেই সুন্দরী নারী ছিল যথেষ্ট স্বামী-সোহাগিনী। কিন্তু তার স্বামীর স্ত্রী ও সংসারের চেয়ে বড় নেশা ছিল শিকারের নেশা। প্রায় সময়েই বাইরে বাইরে শিকারের সন্ধানে ঘুরে ঘুরে বেড়াত। সেই সময়ই কোন এক কর্মোপলক্ষে দেখা গেল শশাঙ্কশেখরের পাশের ঘরে সিন্দুকে রাখা পুজোর সমস্ত রূপোর বাসন চুরি হয়ে গিয়েছে। সেই থেকেই স্ত্রীর প্রতি স্বামীর সন্দেহ দানা বাঁধতে শুরু করে। ঘরে সর্বক্ষণ কর্ত্রী থাকা সত্ত্বেও ঘরে চুরি — স্বভাবতই অস্বাভাবিক ঘটনা। এরপর তিনদিনের জন্য শিকারে যান স্বামী, বিরহিণী স্ত্রীর অনেক অনুরোধ, উপরোধ এড়িয়েও। কিন্তু স্ত্রীর প্রতি সন্দেহপ্রবণতা তাকে কোন কর্মেই মনোনিবেশ করতে দেয়নি, তাই ছুটে চলে এসেছেন রাত দুপুরে নিজেরই শয়নগৃহের সামনে। প্রধান ফটক, খিড়কি বন্ধ হয়ে গেলেও হঠাৎ করে শশাঙ্কশেখরের চোরাকুঠুরির দরজাটা খোলা বলে মনে হল, এবং সেই পথ বেয়ে একেবারে ঘরের সামনে চলে আসেন। দরজায় শব্দ হবার পর কোন প্রশ্ন না করেই তার স্ত্রী দরজা খুলে দেন গভীর রাতে; শশাঙ্কশেখর কিন্তু ঘরে এসে পোষাক না ছেড়ে বিশ্রাম না নিয়ে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে থাকেন। যত সময় গড়াচ্ছে, ভোর হতে চলছে তত স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই অস্থিরতা বাড়ছে — একজনের রহস্যভেদের অস্থিরতা, আর অপর জনের রহস্যকে চেপে রাখার জন্য আকুলতা। অবশেষে সিন্দুকে তালা লাগাতে যেতে চাইতেই বিপত্তি — "কক্‌খনো না। এই দুপুর রাতে তুমি এখন আধমুণে তালাটা নিয়ে খালি সিন্দুকে লাগাতে যাবার মতো পাগলামি করতে পারবে না।" *(পৃ.*

২৮২, গল্প সমগ্র, ৩য় খণ্ড)। অর্থাৎ নিজের সিন্দুকে তিনি নিজের ইচ্ছেমতো তালা লাগাতে পারবেন না, কিন্তু ঘটনা তাই ঘটল। তালা পড়ল সিন্দুকে আর রানিও পাগল হলেন। কারণ তালা লাগানোর পর থেকে চাবিটা আর পাওয়া যায় নি। এই পাগলামির মধ্যেই তাকে পেয়ে বসে শ্বাসরোধকারী খেলা। নিজের একমাত্র সন্তানকে বালিশ চাপা দিয়ে মারতে চেয়েছেন — স্বামীকে তোষকচাপা দিয়ে মেরেছেন।

কারণ সিন্দুকে তার প্রেমিককে স্বামীর হঠাৎ উপস্থিতিতে লুকিয়ে রেখেছিলেন, স্বামী শিকারে গেলেই চোরাপথে সে আসত এই গৃহে। এই সুযোগেই ঘটতো প্রেমিক যুগলের মিলন। আর এই রহস্যের উন্মোচনের জন্যই শিকারের খেলা খেলতে হয়েছিল কর্তা মশাইকে। বাকী জীবন কেউ সুখী হননি। দুজনেই অপঘাতে মারা গিয়েছেন। হয়তো স্বামীর কাছে তার এমন কিছু পেতে বাকী থাকত যার জন্য তাকে অন্যত্র হাত পাততে হয়েছিল। এবং পদাধিকারবলে ছলচাতুরীতে ঐশ্বর্য পাওয়াও হয়তো সহজ হয়ে উঠেছিল। ধীরে ধীরে এতেই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন প্রেমিকযুগল। আর এভাবেই হয়তো বাসন চুরি, যা পুকুর চুরি একরকম তা সম্ভব হয়ে উঠেছিল। শিকার থেকে মাঝপথে চলে আসার পর বিনাবাক্যব্যয়ে দরজা খুলে দেওয়া এবং স্বামীর সঙ্গে উচ্ছল প্রেমে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠার মধ্যেই যেন বিরাট একটা কিছুকে লুকিয়ে রাখার প্রবণতা কাজ করছিল। তিনি যে অপরাধ করছেন তা তার বেশী পরিমাণে সহজ হবার অভিনয়ের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে চাওয়াটাই যেন অপরাধের সূত্রকে গ্রথিত করে। আর দেরীতে হলেও তার স্বামী এসব সূত্র ধরেই স্ত্রীর রহস্য উন্মোচন করেছেন একা নিজের হাতে, বাকী সকলেই তাকে বাসনের শোকে পাগলী বলেই জানত। সূত্রগুলো শুনে শশাঙ্কশেখরের বংশধর তার কল্পনাশক্তির সাহায্যে এই রহস্য উদ্ধার করেছেন।

নারীরা অন্তঃপুরবর্তিনী কিন্তু এখনকার সময়ে আর অন্তরালবাসিনী নয়। প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থায় নারীরাও সুশিক্ষিতা হয়ে সুপ্রতিষ্ঠিতা হয়ে উঠছে, কিন্তু পূর্বে তা না থাকায় নারীদের জীবন ছিল অন্দরমহলের অভ্যন্তরেই। **'গুণ্ঠনবতী'** (১৩৬২ বঙ্গাব্দ) গল্পেও দেখা যায় সংসার জীবনের গভীরে ঢুকে সংসারের সাধনায় নিমগ্ন হয়ে আছেন নিবেদিতা। পেয়ারার জেলি বানিয়ে কাঁচের বয়ামে পুরছেন। কাচা ধবধবে ওয়ার বালিশে পরাচ্ছেন, সারা বাড়িটিকে সর্বদা পালিশ করে ঝকঝকে, তকতকে করে তুলছেন। কোথাও তার সাজানো সংসারে এক তিলও এদিক-ওদিক হবার জো নেই। পনের বছরের নিবেদিতা বিবাহিতা হয়ে আসে সত্যশরণের হাত ধরে মামা-শ্বশুরের বাড়িতে; কারণ বিধবা মায়ের হাত ধরে একসময় মামার বাড়ীতেই আশ্রয় জুটেছিল তাদের। মামা-শ্বশুরের বাড়ির পরগাছার জীবন; পিতৃগৃহের দৈন্য অবস্থার কথা নিবেদিতা ভুলে গিয়ে নতুন সংসার রচনায় উৎসাহী হয়ে ওঠে। স্বহস্তে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সে সংসারকে সাজিয়ে গুছিয়ে তোলে, সংসার যাত্রা অবশ্য তাদের শুরু হয় মামা-শ্বশুরের বাড়িতেই শাশুড়ী মারা যাবার পর। সমস্ত কর্তব্যকর্ম নিখুঁতভাবে

সম্পাদন করে, মেয়েকে শ্বশুর ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে আজন্মের লালিত শখ পুরী যাওয়ার বাসনাকে জাগ্রত করতে শুরু করেন নিবেদিতা।

অনেক বাঁধাছাঁদার পর তারা স্বামী-স্ত্রীতে অর্থাৎ সত্যশরণ আর নিবেদিতা পুরী রওনা হলেন। পুত্র গৌতম এম. এ. পড়ছে, পরীক্ষা সামনে বলে বাবা-মায়ের সঙ্গে বেড়াতে আসেনি স্বামীটি সংসার যাত্রায় যথেষ্ট অপটু চাকরকে ছেলের দেখভালের জন্যে সঙ্গে রেখে আসায় পুরী পৌঁছে গুছিয়ে নেওয়াটাও পুরোটাই নিজে করলেন। কিন্তু দোকানপাটে যাওয়া, 'ক্ষেত্তরের' কাঁসার বাসন কেনা কোনদিকেই যেন মন নেই। ঘরে রান্না খাওয়া করছেন, সময় পেলেই 'বালির বৃন্দাবন' সমুদ্রতীরে গিয়ে বসে আছেন। নিবেদিতা যেন ছোট খুকিটি হয়ে গেছেন, ঝিনুক কুড়ানো, বালিতে ছোটাছুটি এই করে বেড়াচ্ছে। এই জীবনটা যে মুক্ত, বাঁধনহারা — সেটা বুঝতে পেরে নিবেদিতা যেন পাগল পারা হয়ে উঠেছে। এর মধ্যে আনন্দের গতি বৃদ্ধি করতে এবং বৈচিত্র্য প্রদান করতে এসে হাজির হলেন এক অকৃতদার অধ্যাপক, যতীশ্বর মুখার্জী। "গম্ভীর গলা, কিন্তু ভাষায় সরস কৌতুকের হীরক ধার।" *(পৃ. ১৩৩, গল্প সমগ্র ৪র্থ খণ্ড)*। তাদের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল সমুদ্রতীর ভ্রমণ করতে করতে। সত্যশরণ যেন অকূলে কূল পেলেন। কারণ, অফিস নেই, বন্ধু-বান্ধব নেই, সারা দিন রাত শুধু স্বামী-স্ত্রীতে কাটানো যা পূর্বে কোনদিন করেন নি, তাই তার কাছে বেশ অস্বস্তিবোধ হচ্ছিল। সবচেয়ে অস্বস্তির কারণ নিবেদিতার চির পরিচিত জীবনধারার পরিবর্তন। কেমন যেন বদলে গিয়েছে সে এখানে এসে। তাই তিনি বলে ওঠেন — "এখানে এসে তুমি যেন কিরকম বদলে গেছো।" উত্তরে উচ্ছল নিবেদিতা নিজের আনন্দের বহিঃপ্রকাশ ঘটায় এভাবে — "বদলানোই তো উচিত, চেঞ্জ মানে কি তাহলে? এতো টাকা খরচ করে আসার উদ্দেশ্য কি তবে?" *(পৃ. ১৩৭, ঐ)*। নারী যখনই চার দেওয়ালের আবদ্ধ সীমানা ছাড়িয়ে বহির্জগতের উদার আকাশের নীচে পা রাখলো তখন যেন হারিয়ে গেলো সাংসারিক নিয়মাবলী, বাঁধা-বন্ধন — সমস্ত কিছু। সংসারের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে নারী একটা ছকের আবর্তেই ঘুরপাক খেতে থাকে, সেখান থেকে কিছুদিনের জন্য মুক্তি ঘটলে তা যে কেমন বাঁধভাঙ্গা হয় সেটাই লেখিকা আশাপূর্ণা দেবী বলতে চেয়েছেন। স্বামী, সন্তান নিয়ে নারীরা যে অভ্যস্ত জীবন যাপন করছে, তা থেকে বের হলে দেখা যায় তাদেরও প্রাণের কোণে কোথায় যেন একটা স্বতঃস্ফূর্ততা রয়েছে, যা অনায়াসে অপর কোন পুরুষের গুণাবলীকে আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়ে ওঠে। নিবেদিতা যেমন অচেনা হয়ে উঠেছে স্বামীর কাছে, হারিয়ে যাচ্ছে কল্পলোকে, রোমান্টিক জগতের আবেশ তাকে যেন রহস্যময়ী করে তুলেছে। স্বামীর সঙ্গে এসেও পুরীতে সংসারের দায়িত্ব সামলেও যতীশ্বরের সঙ্গে এক সূক্ষ্ম জালে জড়িয়ে পড়ছেন; অর্থাৎ অন্তরের মণিকোঠা থেকে, সংসারী নিবেদিতার ভেতর থেকে এক প্রেমিকা নিবেদিতা বেরিয়ে আসছে, যা কুমারী হৃদয়ের চাইতে কম বিশুদ্ধ নয়। শাশুড়ী হয়ে যাওয়া নিবেদিতাও যেন উজ্জ্বল হয়ে ওঠা তন্বী মেয়েটি, আর

যতীশ্বর মুখার্জীরও অন্তরের নিভৃতে কোথায় যেন দোলা লাগা পুরুষটি। পরিণত বয়সের নারী-পুরুষ বলে তাদের বহিঃপ্রকাশ নেই, কিন্তু অন্তরের অভ্যন্তরের গতিবিধি তাদের নিয়মিত যোগাযোগ ঘটাচ্ছে। দম্পতি যুগলের মধ্যে একজন বাইরের পুরুষকে অবাঞ্ছিত মনে হলেও সত্যশরণ সবচেয়ে বেশি খুশী হন শুধুমাত্র স্ত্রীর সান্নিধ্যে সর্বক্ষণ থাকতে হয় না বলে; তিনি আড্ডা গল্প গুজবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে ভালোবাসেন। কিন্তু ব্যাহত যতীশ্বরের সঙ্গলাভের ইচ্ছায় সত্যশরণের মধ্যে যে আগ্রহের আতিশয্য লক্ষ করা যায়, নিবেদিতার মধ্যে তার একবিন্দুও দেখা যায় না। কিন্তু — "যতীশ্বরের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে নিবেদিতার চোখে মুখে যে আলো জ্বলে ওঠে, সে কি লক্ষের বাইরে থাকার মতো? সত্যশরণের মতো 'উদোমাদা' লোকের চোখে যদিও বা না ঠেকে, যতীশ্বরের তীক্ষ্ম দৃষ্টির সীমানা থেকে কি করে আত্মগোপন করবে সে জিনিস?" *(পৃ. ১৪৩, ঐ)*। যতীশ্বরের কুমার জীবনের নিস্তরঙ্গতাকে তরঙ্গে তরঙ্গে ভরে দিয়েছে নিবেদিতা, আবেগে যতীশ্বর ধরেছে নিবেদিতার হাত। উচ্ছল নিবেদিতা স্বামীর বোধবুদ্ধির আড়ালে নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করলেও নিজের অবস্থান সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিল। পুরী থেকে ফেরার দিন তার স্বামী বাড়ির চাবি দিতে মালিকের বাড়ি চলে গেলেও যতীশ্বরের সঙ্গে তিনি এক গাড়ীতে করে স্টেশনে আসেন। যতীশ্বর আবেগাপ্লুত হয়ে যখন নিবেদিতার হাত ধরে, তখন নিবেদিতা হেসে অনায়াসে হাতটি ছাড়িয়ে নেয়। কারণ নারী নিজেকে উজাড় করে নতুন রূপে আবিষ্কার করলেও তার বিশ্বস্ত আশ্রয়, নিশ্চিন্ত জীবন, এবং সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকার গরিমা ছেড়ে বেরিয়ে যেতে রাজি নয়। হয়তো সামনে এগিয়ে আসা হাতে হাত রাখলে নতুন অনেক কিছু পেতে পারে, কিন্তু বিনিময়ে আবার অনেক কিছু হারাতেও হতে পারে, তাই এই ভুল করতে রাজি নন নিবেদিতা। কিন্তু তার ভেতরের পরিবর্তন হয়তো আর তাকে আগের মতো ঘোরতর সংসারী করে তুলবে না। বাকী জীবন হয়তো সাংসারিক উদাসীনতার ভেতর দিয়ে প্রেমটিকে বাঁচিয়ে রাখবে, কিন্তু হারাবে না বিশ্বস্ততার নিশ্চিন্ত আশ্রয়। বহির্জগতের সুখকে আস্বাদন করার একটা সাধ, নিজেকে আবিষ্কার করে মনের স্বতঃস্ফূর্ততা অনুযায়ী পথচলা, সংসার আর প্রেম — দুটো অনুভূতি আলাদা করে উপভোগ করার অনুভূতি ও প্রকৃতি-সান্নিধ্যে মনের উদার-উদাস অবস্থা যেন এক নতুন নিবেদিতার জন্ম দিয়েছে। কিন্তু এত বিরাট পরিবর্তনেও নারী কতটা নিজেকে সংযমিত করে রাখে, সংসারের আবদ্ধতার মধ্যে মনের নতুন বৈশিষ্ট্য নিয়ে বাহ্যিক নির্লিপ্ততায় কাটিয়ে আজন্মের ভাবনাকে নীরবে ভাঙছে এবং 'মেয়েমানুষ' -এর খোলস ছেড়ে ব্যক্তি নারীর আবির্ভাব ঘটছে তারই ইঙ্গিত বাস্তববাদী লেখিকা আশাপূর্ণা দেবী নিবেদিতার মাধ্যমে প্রকাশিত করতে চেয়েছেন।

আমাদের সমাজে আশ্রিতা বিধবাদের প্রতি অন্যান্য মানুষদের যে অন্যায় আচরণ তা খুব একটা সুখকর নয়, নীচের গল্পগুলোতে তার কিছু কিছু নিদর্শন মেলে —

'ফল্গুধারা' (১৩৪৪-৪৭ বঙ্গাব্দ) গল্পে আছে তুষারমামী। তুষারমামার স্ত্রী, তিনি তুষারের মতোই শ্বেতবরণা ও সেই রকমেরই শীতল। তিনি আত্মীয় বাড়িতে দুবেলা, দুমুঠো অন্নের জন্য সমস্ত দুঃখ সয়েও রান্নাবান্নার কাজ করেন। আর তার সঙ্গে রয়েছেন তার অবিবেচক, অকৃতজ্ঞ শ্বশুর। এই শ্বশুরমশাই নিজের বাড়িতেই থাকতেন। আর পুত্রবধূর হাতের সেবা গ্রহণ করতেন। কিন্তু বিনিময়ে বৌমাকে দিতেন অজস্র গালি-গালাজ আর অপমান। এই অবস্থায় নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর স্ত্রী হিসেবে তুষারমামীর অসহায়তা ছিল অতল, সীমাহীন। অর্থাৎ তার পাশে আন্তরিক ভালোবাসা ও সামান্য সহানুভূতি নিয়ে দাঁড়াবার মতো একজন মানুষও ছিল না।

সমস্ত ঘটনাটা পর্যবেক্ষণ করে মীরা নামের একটি ছোট মেয়ে। যে মায়ের সঙ্গে মামার বাড়িতে বেড়াতে এসেছে। সে তার এই মামীর কিছুটা নিকটবর্তী হয়েছে এবং তুষারমামীও তাকে স্নেহবশত কাছে টেনে নিয়েছে। সকলের জন্য প্রাণপণ খেটেও অভিভাবকহীন এই অসহায়াকে মিথ্যে চারিত্রিক কলঙ্ক ও অপবাদ দিয়ে একসময় আত্মীয় বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। মিথ্যে অপমানের জ্বালায়, রাগে, দুঃখে অসহায়তায় স্তম্ভিত হয়ে নিজের মিথ্যে বদনাম ঘোচাতে তিনি চণ্ডীমণ্ডপে ফাঁসী দিয়ে আত্মহত্যা করেন। 'সর্পশিশু' গল্পে ফেলী যেমন স্নেহ-ভালোবাসার বিন্দুমাত্র ছোঁওয়াও লাভ করতে পারে নি, তেমনি একই অবস্থার শিকার হয়েছে এই তুষারমামী। স্বামী পরিত্যক্তা, নিঃসম্বল এই মহিলার পাশে কারো সহৃদয় হাত বাড়ানো তো দূর অস্ত, সকলেই তাকে নানাভাবে ব্যথা দিতে যেন প্রস্তুত সর্বদাই। অর্থাৎ অসহায়ারা যে চিরকাল অবহেলিত, অপাংক্তেয় ও সহায় সম্বলযুক্ত মানুষের কাছে করুণার পাত্রী একথা যেন তাকে মর্মে মর্মে অনুভব করিয়ে ছাড়তেন। তাদেরও যে মান, আত্মসম্ভ্রমবোধ আছে, সেটা ভাবতে চাইতেন না, বা ভাবলেও হৃদয়ে ব্যথাবোধ যে তার হচ্ছে, সেজন্যে বোধহয় আরো গোপন আনন্দ পেতেন। আর এসবের সমুচিত জবাব দিয়ে গেল যন্ত্রণায় ছিন্নবিচ্ছিন্ন এই অসহায় নিষ্পাপ রমণীটি। পড়ে পড়ে আর মার খেতে রাজী নয়, সম্মানহীনা হয়ে বেঁচে সকলের লাথি ঝাঁটা খাবার বদলে মৃত্যুই যেন এই নারীর কাছে অধিক শ্রেয়। বেঁচে থাকার কঠিনতম লড়াই-এ পরাজয়ও আসে। জীবনযুদ্ধে হেরে যাওয়া তুষারমামীর যন্ত্রণাক্লিষ্ট জীবনের ছবি অঙ্কনে আশাপূর্ণা দেবীর সমাজ ও সংসারের ভিতরকার বহু বিচিত্র চরিত্রকে খুব গভীর থেকে দেখার বিষয়টি প্রকাশিত হয়।

'পাকাঘর' (১৩৫৮ বঙ্গাব্দ) গল্পে নারীদের সেই চিত্রকে দেখানো হয়েছে যা নাকি শ্রীময়ী কল্যাণী মূর্তির ঠিক অপর পিঠে মুখোশ পরে অবস্থান করে, যা নাকি চট্ করে বুঝতে পারা যায় না। ঈর্ষাবোধ, আমিত্ববোধ এবং ধনের অহঙ্কার থেকে জাত অর্থকৌলিন্যবোধ। কোন একটি সংসারকে ধীরে ধীরে পতনের দিকে নিয়ে যেতে যার কোন জুড়ি নেই। এই বোধ যুগে যুগে সংসারে নারীজাতিকে চালিত করে আসছে।

মনোতোষ ও মহীতোষ দুই ভাই, পদ্ম ও চাঁপা দুই জা যেন দুই বোন। তারা গ্রাম থেকে কাজের সন্ধানে শহরে এসে একফালি জায়গা কিনে নিয়ে পাকা দেওয়াল ও করোগেটেড টিনের ছাদ দিয়ে দুখানাঘর তুলে বসবাস করছে। সংসারে সুখ না থাকলেও শান্তির প্রাচুর্য রয়েছে। দু'ভাই মিলে তেঁতুলের ব্যবসায় নেমে ধীরে ধীরে পসার জমাচ্ছে, সংসারেও সেইমত শ্রীবৃদ্ধি ঘটছে। একতলা বাড়ি দোতলা হল, নিঃসন্তান মনোতোষ ও পদ্ম সংসারের জন্য প্রচুর খাটাখাটুনি করলেও মহীতোষের শেয়ারের ব্যবসার পয়সার সঙ্গে সংসারের ফাঁকফোকর দিয়ে যেন অশান্তির বীজ প্রবেশ করতে শুরু করল। এতদিন সংসারে জ্যেষ্ঠের শ্রেষ্ঠভাগ থাকলেও পরিবেশ পরিস্থিতির চাপে তা যেন অর্থের শ্রেষ্ঠভাগের দিকে ধাবিত হতে শুরু করল। রাস্তার ওপর দক্ষিণ খোলা ঘরটা পদ্ম চাঁপাকেই থাকতে দিয়েছিল। ধীরে ধীরে জমানো ঘর সাজানোর পুতুল, খেলনা, মাছ — এগুলো দিয়ে নিজের ঘর সাজিয়ে চাঁপার ঘর সাজাতে গেলে প্রথম ধাক্কা খায় সে — "রক্ষে করো দিদি, ওইসব কুচ্ছিৎ জিনিস টেনে নিয়ে গিয়ে ওপরের ঘরে তুলতে হবে না আর। নতুন দেয়ালে দাঁত খিঁচিয়ে থাকবে একেবারে! 'ও' বলেছে — ও ঘরের জন্যে পটারির পুতুলের সেট, আর — ভালো ছবি খানকতক আনবে।" *(পৃ. ২২৯, গল্প সমগ্র, ৩য় খণ্ড)*। অথচ পদ্মর ঘরের বেলায় তা চাঁপার উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। এভাবেই চাঁপা যে অর্থশালী হয়ে উঠছে এবং পদ্মর সঙ্গে যে তার পার্থক্য গড়ে উঠছে তা অনুভব করতে লাগলো এবং সেইমতো সংসার পরিচালনার ভার স্বহস্তে তুলে নিতে চাইলো। দ্বিতীয়বার আঘাত এলো মহীতোষের মেয়ে চন্দনার বিয়ে প্রসঙ্গে। মহীতোষ চুপি চুপি পাত্র দেখে বেড়ায় ও খুব সাবধানে অত্যন্ত গোপনে চাঁপার গোচরীভূত করতে চায়। পদ্ম আঁচ করতে পেরে অভিভাবিকা হিসেবেই সমস্ত কিছু অবগত হতে চায়, কিন্তু চাঁপার বাক্যবাণ তাকে পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝিয়ে দেয় — "বিয়েটা তো আর নরলোকের অগোচরে হয়ে যাবে না, হলে সবাই দেখবে — সবাই শুনবে। আগে থেকে অতো উস্‌খুসুনি কেন তাও বুঝি না বাবা! আমার তো কই কারো কথায় মাথা গলাবার পিরবিত্তি হয় না?" *(পৃ. ২৩০, ঐ)*। মহীতোষের মেয়ে চন্দনার বিয়ের পরে জামাইকে দোতলা ছাড়তে হয়, মনোতোষ — পদ্মকে মহীতোষের ছেলে চিতুর পড়ার ঘরে থাকতে হয়, আর ওপর নীচ করতে করতে দু'তিনদিনের জ্বরে মনোতোষই চির বিদায় নিল। চিতুর পড়ার ঘর, দোতলার একটি ঘর একা বিধবা মেয়ে মানুষের তো সত্যিই আর প্রয়োজন থাকতে পারে না, তাই পদ্ম নিরামিষ রান্না-খাওয়া সমেত ভাঁড়ারেই স্থানান্তরিত হয়। অচিরেই অবশ্য পদ্মও গত হয়।

অনেক খোঁজাখুঁজি করে মহীতোষ ও চাঁপা পুত্রবধূ জোগাড় করে, বি.এ. পাশ ছেলের-বৌকে বাড়ির সবচেয়ে ভালো ঘরখানাই দেওয়া হয়। বিজলী বাতির আলো ঝলমলে পরিবেশে আধুনিক যুবক চিতুর ধীরে ধীরে মায়ের ব্যবহৃত আসবাবপত্র প্রাচীন বলে মনে হতে লাগলো। সেগুলো স্থানান্তরিত হয়ে শ্বশুর গৃহের দানসামগ্রীর আসবাবপত্র শোভা বর্দ্ধন করতে লাগলো। চন্দনার

শ্বশুরগৃহে সুখ-শান্তি কম থাকায় পিতৃগৃহে যাতায়াত বাড়লো। আর দাদার মতোই দু'তিনদিনের নোটিশে মহীতোষ নাতির আশা করতে করতে গত হল। সংসারে অর্থের প্রয়োজনে, নাতনীর চলাফেরার স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য চাঁপাকেও একদিন দোতলা ও নীচতলার ঘরগুলো ছেড়ে ভাঁড়ার ঘরে আশ্রয় নিতে হল। সেই একইভাবে পদ্মর চিত্র যে তার বেলাতেও অঙ্কিত হবে এভাবে তা কি চাঁপাই কোনদিন জানতো? তাই একদিন গঙ্গা নেয়ে বাড়ি ফেরার সময় দেখতে পেল ফিকে গোলাপী দেওয়ালের গায়ে ঘন সবুজ রঙের দরজা-জানলা দেওয়া রানীগঞ্জের টালি ছাওয়া বারান্দাখানা যেন ছবির মত ঝকঝক করছে। চাঁপা বুঝতে পারছে, অকারণ পদ্মর ওপর কতটা অত্যাচার ও মানসিক কষ্ট সে চাপিয়েছে, আজ যেটা সে নিজে ভোগ করছে। শুধুমাত্র টাকা পয়সার প্রভাবে অন্তরের সমস্ত আকর্ষণ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে প্রভুত্ব কায়েম করতে চাওয়া বোধ হয় নারীদের মনের আর একটি দিক। সমস্ত সুখ-ঐশ্বর্য নিজে ভোগ করে স্বাচ্ছন্দ্যের কিছু অংশ বাকীদের দিকে ছুঁড়ে দেওয়া যে তাকে দয়া করে যা দেওয়া হচ্ছে তাই ঢের। একান্নবর্তী পরিবারেও এই চিত্র ছিল, তবে তা খণ্ডচিত্ররূপে; আর এখানে তা চলছে দুজনের মধ্যে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম এই ধারা হয়তো মানব সমাজে নিরন্তর গতিতে বয়ে চলে বলেই চাঁপার জায়গায় আরো আধুনিকারূপে আবির্ভাব হয় তার পুত্রবধূ জ্যোৎস্নার। সমাজে নাকি নারীরাই নারীদের শত্রুতা করে থাকে বলে কথিত আছে। তবে তা যে মিথ্যে নয়, নানাভাবে তা প্রমাণিত। নারীদের দ্বিপ্রাহরিক বা দু'তিনজনের একত্রিত আলোচনার মূল বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায় যে — কোন নারীরই কোন কার্যকলাপের সমালোচনা, আর নারীদের কারণেই সংসারের চালচিত্র প্রায় বেশিরভাগটাই বদলে যায় এবং সম্পর্কের ওপরে তার প্রভাব বিস্তার করে।

'স্খালন' (১৩৫৮ বঙ্গাব্দ) গল্পেও এক নারীর কথা উঠে আসে, যে নাকি নিজের সদ্যমৃত স্বামীর ছবি আঁকিয়ে তাকে পূজা করতে চায়। সদ্য বিধবার পক্ষে এই ইচ্ছা উচ্চাঙ্গের প্রেমেরই পরিচয় বহন করে, কিন্তু তা হাস্যকর পর্যায়ে কেন গেল তা যাকে দিয়ে ছবি আঁকাতে চায় সেই অঙ্কনশিল্পীর স্ত্রীর মুখেই জানা গেল। কারণ বেঁচে থাকতে এই স্ত্রীর ব্যবহারেই সদ্যমৃত ব্যক্তি দু'দুবার দেশত্যাগী হয়েছিলেন। স্বামীর সঙ্গে তার আচরণ ছিল প্রায় অভদ্রজনোচিত।

সেই প্রসঙ্গেই তার মনে পড়ে গেল আর এক বিধবা রমণীর কথা। সুহাস বোষ্টুমী যিনি গোপালের সেবার্চ্চনায় দিন কাটাতেন আর পালা করে ব্রাহ্মণ বাড়ির কিশোর ছেলেদের নানা ব্রত-পার্বনে ভোজন করাতেন। ছবি আঁকিয়ে শিল্পী কিশোর বয়স থেকেই ছবি আঁকতে শুরু করেছিলেন তা যেমনই হোক না কেন। সেই কিশোর বালককে দিয়ে কি অপরিসীম স্নেহে আর ধৈর্য্যে অঙ্কিত করতে চাইলেন নিজের স্বামীর একখানি চিত্রপট। অনেক স্বামীহারা স্ত্রীদের মতো বোষ্টুমীও স্বামীর চিত্রপট পুজো করবেন বলে মনস্থ করেছেন। গোপাল পুজোতে আর মন উঠছে না, কুড়ি বছর বয়সে গত হওয়া স্বামীর মুখচ্ছবি স্মরণ করে করে তিনি বলবেন, আর শিল্পীরূপী মেজ খোকা তা

আঁকবেন। সুহাসের আকুলতার ওপর তার মমতা জন্মে গিয়েছিল বলে সে সাধ্যমতো চেষ্টা করে দুই দিস্তা কাগজ শেষ করেও কোন রকমেই সেই গৌরবর্ণ, ছিপছিপে গড়নের গৌরাঙ্গের মূর্তি আঁকতে পারছে না। সুহাসের যেন একরকম মনে হচ্ছে এই তার স্বামীপুজো। যদিও একদিন ধরা পড়ে ফাঁস হয়ে যায় সমস্ত সংবাদ এবং 'তুকতাক', 'বদমাইসী', 'মতলব' —নানা বিশেষণে ভূষিত হতে থাকে সুহাস আর সেইসঙ্গে হাস্যকর একখানি মানুষে পরিণত হয়। আজ সেই মেজ খোকার শিল্পী হিসেবে প্রসিদ্ধি আছে, ... নানা সুখ্যাতি রয়েছে, রাজা-মহারাজাদের প্রশংসাও তাকে প্রশংসিত করেছে, কিন্তু একটি সাধারণ অসহায়া বিধবা যুবতীর আকুল আকূতি তিনি পূরণ করতে পারেন নি, যা আজ হলে হয়তো পারতেন।

বিনা পারিশ্রমিকে তাকে দিয়ে ছবি আঁকাবার কথা আজ কেউ ভাবতে পারে না, সুহাস বোষ্টুমীও তাকে যথেষ্ট আদর-স্নেহ এবং আহার্য বস্তু দিত কিন্তু তার বোন টুলুর জায়ের সে ক্ষমতা নেই তাই শিল্পীর স্মরণশক্তি ও অঙ্কন দক্ষতার দয়ার উপরই নির্ভরশীল হতে হচ্ছে। তিনি একথা বুঝতে পারছেন যে, সমাজে বিধবাদের প্রতি সধবারা চিরকালই করুণার্দ্র, এবং তাদের জীবনচর্চায় নানা খুঁত খুঁজে বেড়ান স্বামী-সোহাগিনীরা। সংসারে বসবাস করেও যারা নিজের সংসার জীবনে পেল না, সন্তানের কাছ থেকে মা ডাক শোনার সৌভাগ্য যাঁদের হয়নি, যারা শুধুমাত্র নিয়ম অনুশাসনের কঠোর জালের মধ্যেই নিজেদের আবদ্ধ করে রেখেছেন, তারা একটু স্বপ্ন দেখলেই এবং কিছু চাইলেই সমাজে বিশেষত নারী সমাজে অপাংক্তেয় হাস্যকর হয়ে ওঠেন। সেটাই শিল্পী হিসেবে গল্পের পুরুষ চরিত্রটি হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন বলেই হয়তো ভাবলেন, বিশ্ব শিল্পী গোষ্ঠীর তালিকায় যখন নামোল্লেখ হয় তখন তিনি ইচ্ছে করলে একখানা ছবি নিশ্চয়ই দাঁড় করাতে পারবেন, যাতে করে একজন বিধবার স্বামী ভজনার তৃষ্ণা মেটে। **'স্বজাতি'** (১৩৫৯ বঙ্গাব্দ) গল্পেও আমরা চির পরিচিত অন্দরমহলের নারীদের দেখতে পাই। এই গল্পে কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে শিবানী, যার স্বামী নিখোঁজ। তিন ভাইয়ের মধ্যে মেজভাই ছিল ভূপতি। বেকার যুবক খোঁটা খেয়ে খেয়ে রোজগেরে দাদার প্রতি বিতৃষ্ণায় "যদি কখনো মানুষ হই তো গৃহে ফিরিব" *(পৃ. গল্প সমগ্র, ৪র্থ খণ্ড, ১৪০৮)*। লিখে প্রস্থান করেছিল বাড়ি থেকে। আর সেটাই যেন মহাপ্রস্থানে গিয়ে দাঁড়াল। পুরুষ মানুষ ভূপতি নিজে নিজের পথ বেছে নিল নিরুদ্দেশের মধ্য দিয়ে কিন্তু স্ত্রী শিবানীকে কোথায় ফেলে রেখে গিয়েছে? পুরুষরা এমনি করেই হয়তো শুধু নিজের মান-অপমান নিয়েই ব্যস্ত থাকতো। তার হাত ধরে যে নারীটি সংসারে এসেছে যার কথা স্বামী হিসেবে তারই সম্পূর্ণভাবে ভাবার কথা, সে যদি অকস্মাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে যায় তবে তো স্ত্রী হিসেবে সেই নারীর যে দুর্গতি মধ্যবিত্ত বাঙালী সংসারে হত তাতে কাকপক্ষীরও চোখে জল আসবার কথা। শিবানীর সঙ্গে যেন আর একটি চরিত্র 'তুষার মামী'-র মিল পাওয়া যায়, যেখানে তুষার মামাও নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিলেন। শুধু পরিণতিটা একটু আলাদা

রকমের হয়েছিল কিন্তু জীবন যাপনের ধরনটা ছিল একই।

সংসারে স্বামীর রোজগার যদি কম থাকে তার খেসারত দিতে হয় স্ত্রীকে পরিশ্রম করে। আর যার স্বামীর কোন অবদান নেই অথচ নিরুদ্দেশ হয়ে যায় তাকে শুধু শ্রম দিলে হয় না, পাশাপাশি অগ্নিবর্ষী কথার আঘাত সহ্য করার ক্ষমতাও তাকে ধারণ করতে হয়। সংসারের যাবতীয় কাজ করবার সময় কারো চোখে পড়ে না, যেন স্বাভাবিক নিয়মেই তাকে এসব কাজ করতেই হবে — এটাই সকলে ধরে নিয়েছে। কিন্তু যদি ক্লান্ত শরীরে তেল চকচকে মুখটা মুছে একটু ক্রীম বা স্নো পাউডার ঘষে মুখটাকে ভব্যযুক্ত করে তুলতে চায় তবেই সকলের যেন টনক নড়ে ওঠে। যাকে দেখবার কেউ নেই, স্বামী যার নিরুদ্দেশ, যার দিনরাতের সমস্ত উৎসাহ, শক্তি, কর্মক্ষমতা শোষণ করে নিচ্ছে রান্নাঘর, তার আবার সাজগোজের ঘটা কেন? এসব তো সধবা স্বামী সোহাগিনীদের, অবিবাহিতা মেয়েদের জগত। অর্থাৎ তাকে মুখে না বললেও কথার দ্বারা বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে, শিবানীর আচরণ বিধবার মতোই হওয়া উচিত। মেয়ে জামাই নাতি-নাতনী, জা, ননদ সকলকে নিয়ে বড়ো গিন্নী চাঁদের হাট বসিয়ে জলখাবার খাওয়াচ্ছেন সকলকে, আর এই সম্পর্কেই গল্প করছেন — "খাওয়া, পরা, কিসে লোভ নেই? ফুলকাটা ছিটের ব্লাউজগুলো দিব্যি পরছে! শুধু তাই? বুড়োমাগীর এখনো এমন প্রবৃত্তি, চুরি চামারি করে মুখে পাউডার ঘষে মরেন! ... এই তো কনক, সেই বাইশ বছর বয়স থেকে এক বস্ত্র সার করে বসে আছে। কেউ কখনো বলতে পারবে না একখানা সাবান নিয়ে মুখে বুলিয়েছে কোনদিন!" *(পৃ. ২৬, গল্প সমগ্র, ৪র্থ খণ্ড)*। ছাদ থেকে হঠাৎ করে নেমে আসা শিবানী এসব শুনে অবাক হয়ে যায়। আরো অবাক হয় যখন শুনতে পায় "এখনো পর্যন্ত আমার সঙ্গে সমান করে চ্যাটালো চ্যাটালো পাড়ের মিহি মিহি শাড়ীগুলো যোগাচ্ছেন! ছিঁড়তে না ছিঁড়তে সেমিজ জামা, দেখিস তো?" *(পৃ. ২৭, ঐ)*। দেবতার মতো ভাশুর পাওয়ার জন্যই যে এত সুখ আরাম সম্ভব এটাও বোঝাতে ছাড়েন না বড়ো জা। একজন অল্পবয়সী নারী স্বামী নিরুদ্দেশ বলে তাকে সেমিজ ব্লাউজ ছেড়ে দশ হাত খাটো শাড়ীখানা পরে ভাশুর দেওরের সামনে ঘুরে বেড়াতে হবে — একথা ভাবতে যেন সিঁড়ির সঙ্গে গেঁথে যাচ্ছে শিবানী। কিন্তু এসব বলে তাকে কষ্ট দিয়েই শুধু ক্ষান্ত হননি সবাই, এবার শুরু হল হিসেব করা — শিবানীর নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর নিরুদ্দেশ হবার সময়ের।

শাস্ত্র বলে, কোন লোকের নিরুদ্দেশ হবার বারো বছর পর তাকে মৃত বলে গণ্য করে তার পারলৌকিক ক্রিয়া কর্ম করে ফেলতে হয়। ভূপতির ক্ষেত্রেও সেই মেয়াদ পূর্ণ হবে কোজাগরী পূর্ণিমার আগের দিন। শিবানীর স্পষ্ট মনে আছে বাংলা সাতচল্লিশ সালের ৩রা কার্তিক শুক্রবার ছিল সেই দিনটি। সকলকে অনেক কসরৎ করে বের করতে হলেও শিবানীর মনে জ্বলজ্বল করছে তারিখটা, যদিও সেটা সে প্রকাশ করল না। তিথি অনুযায়ী বিধান মেনে কোজাগরী পূর্ণিমার দিনই হবে শিবানীর বৈধব্য গ্রহণ। তাই আগের দিন তাকে খাওয়ানোর জন্য বড়ো জা আনালেন মাছের

লেজ, ননদ কনক নিজের পয়সায় আনালেন ভেট্‌কী মাছের পেটি আর মৌরলা চুনো — কারণ এগুলো শিবানীর প্রিয় মাছ। উভয়েই দেখাতে চাইছেন যে, মেজবৌকে তারা অনেক ভালোবাসেন, শুধু সংসারের মঙ্গল সাধনের জন্যই শাস্ত্র মেনে চলা। নতুন করে ভূপতির জন্যে মেয়েমহলের শোক উথলে ওঠে। কনক বিধবা বলে নিজেই শিবানীর এই কাজটি করার দায়িত্ব তুলে নেন এবং ঘাট থেকে ফিরে এসে দরজার গোড়া থেকেই ডুকরে ডুকরে কাঁদতে থাকে। দূরাগত সঙ্গীতের মতো বড়ো জায়ের করুণ বিলাপ ধ্বনি ভেসে আসতে থাকে। আবার হয়তো ছোট বৌয়ের ঘরেও সে ভাশুরের শোকে চোখের জল ফেলছে। কিন্তু পাষাণ প্রতিমা হচ্ছে শিবানী নিজে। শুকনো চোখে সে সমস্তটা দেখছে, এসব দৃশ্য দেখলে তো অন্য মহিলাদের গা-পিত্তি জ্বলে যাবারই কথা। শিবানী বিলাপে ক্রন্দনে যদি সকলকে আকুল করে দিতে পারতো, যদি জায়েরা বা অন্যান্য আত্মীয় স্বজনরা সান্ত্বনা দিতে পারতো, তবে হয়তো কিছু বাড়তি করুণা সে তাদের কাছে আশা করতে পারতো। কিন্তু শিবানী যে স্বামী ফিরে আসবে বলে স্বপ্ন দেখতো, আশাটাকে সে গলা টিপে মেরে ফেলতে পারে না। তাই হয়তো অনেক কাজের ফাঁকেও নিজেকে একটু সাজাতে চাইতো, অনেক কটুকথা, উপেক্ষা সহ্য করেও ছাদের আলিসের ধারে দাঁড়িয়ে স্বামীর ফিরে আসা নিয়ে নানা কল্পনার জাল বুনতো। আশার স্বপ্নটুকুকে কেড়ে নেবার নির্মম পদ্ধতি শিবানীকে মূক করে তুলেছে। তাই হয়তো তার চোখের জলও শুকিয়ে গিয়েছে।

নারীচিত্তের আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন অপর একটি ছবি পাওয়া যায় **'নিরাশ্রয়'** (১৩৬২ বঙ্গাব্দ) গল্পে। বাস্তব যে কতটা কাঠিন্যে মোড়া, সত্য যে কখনো কখনো কত নির্মম রূপ নিয়ে মূর্ত হয়ে ওঠে — তা আশাপূর্ণা দেবী নিপুণ হস্তে অঙ্কণ করে এখানে দেখিয়েছেন। মানুষের বেঁচে থাকবার জন্য একটি আশ্রয়ের যে কত প্রয়োজন সেটা গল্পের কেন্দ্রিয় চরিত্র অন্নমাসীকে দেখলে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। এই অসহায় মানুষটির ক্ষেত্রে একটু সম্মানের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের জন্য পুত্রশোকও মিথ্যা হয়ে যায়। গল্পের মূল চরিত্র অন্নমাসি তার বৈমাত্রেয় বোনপো ও বৌমার সংসারে অসুস্থ শরীর সারাবার নাম করে আসে। প্রকৃত সত্য এই যে, একমাত্র পুত্র কেষ্ট তাকে অন্ন জল কিছুই দেয় না। পুত্রের হাতে অত্যাচারিত হয়ে একসময় মেয়ে জামাইয়ের সংসারে গিয়ে বসবাস করেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে মেয়েটি একসময় মারা যায়, ফলে বোনপো বিভূতির বাড়ি ছাড়া তার আর কোন গত্যন্তর থাকে না।

বিভূতি পেশায় উকিল, তার মাসীর মানসিক অবস্থাটা তিনি অতি সহজেই ধরতে পারেন। আর সেজন্যই মাসী যখন নানা কারণে ছুৎমার্গ প্রকাশ করে হইচই ফেলে দিতেন তখন এই বোনপোই ছলাকলা করে তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করিয়ে রাখতেন। হয়ত বলতেন, তারজন্যই এবার থেকে গেলেন। কারণে-অকারণে, হয়তো বা ঝি-চাকরের সঙ্গে বাদানুবাদ হবার পরও বলে

বসতেন — "এক্ষুণি আমার কেষ্টকে একটা 'তার' করে দাও — এসে নিয়ে যাক। বখাটে হোক, লক্ষ্মীছাড়া হোক, পেটের সন্তান তো বটে সে, তার ভাত মান্যির ভাত। ক্ষীর সরে কাজ নেই বাবা, ছেলের ঘরে খুদ সেদ্ধ করে খাবো ..." *(পৃ. ৩৩, স্বনির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্প)*। এই ধরনের কথা বলে রমলাকে আরো বুঝিয়ে দিতে সদা সচেষ্ট যে, বড়লোক বোনপোর কাছে থাকা স্বাচ্ছন্দ্যের হলেও অপমানের। আবার রমলাও নিজের সংসারে থেকে ও মাসী শাশুড়ীকে প্রতিপালন করে তার এত ঔদ্ধত্য সহ্য করতে চান না, তাই প্রকাশ করে ফেলতে চান সেই চরম সত্যকে, যেখানে লুকিয়ে আছে এমন শাশুড়ীকে জব্দ করার অমোঘ অস্ত্র।

"যে ছেলে আজ ছ'মাস হলো মরে ভূত হয়ে গেছে — এখনো তার অহংকার" — *(পৃ. ৩৪, ঐ)*। এই জলজ্যান্ত সত্যটাকে রমলা প্রকাশ করে দিতে চান। যে ছেলের জন্যে এত অহংকার, সে যে আর ইহজগতে নেই, 'মান্যির ভাত' যে ডানা মেলে উড়ে গেছে, এই কথাটা হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দিয়ে তার সমস্ত দর্প চূর্ণ করে দিতে চান।

অবশেষে একদিন সে সুযোগ মিলল। মক্কেলের এক কাজে বিভূতি দিন তিনেকের জন্যে আসানসোল যায়, আর সেই অবসরে রমলা সত্য উদ্‌ঘাটন করে। ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে আসে সমস্ত আস্ফালন, নিজেকে সম্পূর্ণ গুটিয়ে নিয়ে যেন শামুকের খোলের ভিতরে ঢুকে যায় অন্নমাসি। অথচ তিনি কেষ্টর মৃত্যুসংবাদ আঁচ করতে পেরেছিলেন, কিন্তু আঁচ করতে পারলেও পরিষ্কারভাবে জানতে চাননি। বিভূতিকে এর কারণও বলেন — "ভেবেছিলাম মোদো মাতাল যা হোক তবু তো 'ছেলে'। তার আশ্রয় জোরের আশ্রয়। ... নিরাশ্রয় হয়ে পরের ঘরে পড়ে থাকা যে বড়ো ঘেন্না।" *(পৃ. ৩৮, ঐ)* সত্যিকারের নিরাশ্রয় হয়ে পড়ার দুঃখে ও ছেলের শোকে তার অশ্রু গড়িয়ে পড়ে, তিনি এবারে সর্বহারা হয়ে যান। বাস্তবের জ্বলন্ত পরিস্থিতি যে মানুষকে কিভাবে কোথায় টেনে নিয়ে যায়, তা অকল্পনীয়। পুত্রশোকের মত শোককেও বুকে চেপে কেমন দম্ভের সঙ্গে চলে বেড়িয়েছেন প্রায় ছ'মাস ধরে — এখানেই নির্মম সত্য ধরা পড়ে। সমস্ত দুঃখ, কষ্ট, শোক, গ্লানির চেয়েও নিজের সম্মানের আশ্রয়টুকুই হয়ে ওঠে অনেক বড়। 'ছিন্নমস্তা'র জয়াবতীর পুত্রশোকের সাদৃশ্য ধরা পড়ে অন্নমাসি চরিত্রে।

আর অর্থ বিত্তহীনতা বিধবা অসহায়া নারীকে কতটা নিঃসম্বল করে তোলে তার চিত্র পাই নিরুপিসি চরিত্রটিতে। যিনি বিধবা হয়ে স্বামীর ভিটের অংশ বিক্রি করে বারো হাজার টাকা নিয়ে ভাইদের সংসারে এসে উঠেছিলেন। কোম্পানীর ঘরে টাকা রাখলেও তার সেই টাকার হিসেব আর পাওয়া যায়নি। অসহায়া বিধবাদের মানসিক অত্যাচার করতে এবং অর্থবিত্ত থাকলে তাকে আত্মসাৎ করতে আমাদের সমাজের নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই সুদক্ষ। এই চিত্রই **'নিঃসম্বল'** গল্পে আশাপূর্ণা দেবী প্রস্ফুটিত করেছেন। দিদির অর্থকে কোম্পানির শেয়ার কিনে ব্যবসা করে পরিমাণে

আরো বাড়িয়ে দেবার জন্য ভাইরা বারো হাজার টাকা নিয়েছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে যতদিন যাচ্ছিল তারা যেন দিদির সান্নিধ্য থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। অবশেষে ভাইদের ব্যবহারে দিদি বুঝতে পারেন তিনি কপর্দক শূন্য হয়েছেন। অবহেলা আর বঞ্চনাই তার জীবনের সঙ্গী এখন থেকে।

আশাপূর্ণা দেবীর অজস্র ছোটগল্পের মধ্যে প্রচুর বিষয় বৈচিত্র্যগত দিক রয়েছে। কিন্তু নারীদের অন্তর্জগত নিয়ে তিনি যে ছোটগল্পগুলো লিখেছেন তাকে কেন্দ্র করেই আমার গবেষণা পত্রে উপরিউক্ত বিভাগগুলো দেখানো হয়েছে। এছাড়াও আরো নানাভাবে তিনি বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে জীবনকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। সেই সমস্ত জীবনদৃষ্টিমূলক গল্পগুলো নিম্নে যথাসম্ভব আলোচিত হয়েছে/হল।

'গোড়েমালা' গল্পে রাঙামাসী তার মাসীর বাড়ির বিয়েতে নেমন্তন্ন খেতে এসেছেন। তার স্বামী হচ্ছেন 'ঋষিতুল্য'; শুধু তাই নয়, কম্বল শয্যায় সাধক এবং স্বামী ও স্ত্রীর বাসগৃহ পর্যন্ত আলাদা। রাঙামাসী নিঃসন্তান। বিয়ে বাড়িতে তিনি গোড়েমালা খোঁপায় জড়িয়ে সেজে নিয়েছেন। কিন্তু নিজেকে সুন্দর করে সাজিয়ে তোলা এবং সকলের সামনে মেলে ধরার বয়স যেহেতু তার আর নেই, তাই চল্লিশোত্তীর্ণা রাঙামাসী এই মালা সম্পর্কে নানা গল্পের জাল বিস্তার করেন। কখনো বলেন — তাকে নামিয়ে দিয়ে যাবার ফাঁকে কোন এক সময় রাঙামেসো মাথায় মালা পরিয়ে দিয়ে যান। স্বামীর এই কাজ অন্যরা যাতে বিশ্বাস করে তাই বলেনও —"আর বলিস কেন বর্ণচোরা আম!" *(পৃ. ৮৬, ঐ)*। এরপর কখনো বলেছেন — আশু অর্থাৎ যে মালাগুলো এনেছে, সে দিয়েছে। আবার কখনো বলেছেন, তার এক তুতো বোন বাঁশী, তার বর রাঙামাসীকে পেছন থেকে টুক করে মালা পরিয়ে দিয়েছে। সবশেষে রাঙামাসী সত্তরোত্তীর্ণা মাসীর কাছে স্বীকারোক্তি করেছে ফুলটুনির খোকা 'লাভদিদা' 'লাভদিদা' করে তার খোঁপায় মালাখানি পরিয়ে দিয়েছে।

রাঙামাসীর এই যে চিত্তের রূপ পরিবর্তন, এত অস্বাভাবিক ও অসংলগ্ন সব কথাবার্তা, — তার উৎস কোথায়? যার স্বামী ধ্যান-জপ-তপ নিয়ে মগ্ন, যিনি নিঃসন্তান, সংসারে তার কিসের বন্ধন আর কিসেরই বা আকর্ষণ। নতুন ফ্যাশান অনুযায়ী সাজতে ইচ্ছে হওয়ায় তার মালাপরা এবং সকলের কাছে ব্যাপারটি বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে নানা গল্পের অবতারণা। অথচ সকলেই এই নিয়ে শুধু ব্যঙ্গই করে গেল। রাঙামাসী ধবধবে সাদা বিছানায় বসে সামনের সাদা দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে থাকলেন শূন্যদৃষ্টি মেলে। এই সাদা দেওয়াল যে রাঙামাসীর সারাজীবনের শ্বেতশুভ্র শূন্যতার কথাই শুধু বলে যাচ্ছে, যে জীবন নানা ঘাত প্রতিঘাত, বাধা বিঘ্নতে উত্তাল ও বন্ধুর নয়, নানা চিত্রে রঞ্জিত নয়। যার মনের সত্যকার ব্যথা বেদনা উপলব্ধি করবার মতো কোন সহৃদয় বন্ধু নেই সে কি করবে পালংক কাঁপিয়ে একা একা কাঁদা ছাড়া। আমাদের অন্দর মহলের এই চিত্র কখনোই যেন বদলাবার নয়, প্রত্যেকেই যেন উন্মুখ হয়ে থাকে মানুষের দুর্বল স্থানে আঘাত দেবার

জন্য। রাঙামাসীর অন্তরের কোথায় ব্যথা, যন্ত্রণা — কিভাবে তা উপশম করা সম্ভব, সে চেষ্টা কোন আত্মীয়ের নেই; কিন্তু তাকে নিয়ে মজা করতে সকলেই ব্যস্ত। অথচ একজন মানুষ কোন্ পরিস্থিতিতে বাধ্য হয় এসব করতে, তা উদ্‌ঘাটন করার মত সহৃদয় বন্ধু নেই। যদি স্নেহ - কোমল বা উষ্ণ বন্ধু - হৃদয়ের সান্নিধ্য পেত তবে হয়তো রাঙামাসী অন্য সকলের মতোই সমান তালে চলতে পারত, হাস্যাস্পদ না হয়ে। নিতান্ত অবহেলায় ধীরে ধীরে সবাই রাঙামাসীর কথা ভুলে যাবে কিন্তু সত্যি সত্যি যে এই একাকীত্ব ও অসহায়তায় ভুগছে তার পরিণতি সম্পর্কে আমাদের সমাজ ও আমরা যা ভাবছি, তা সত্যিই চিন্তনীয়। আশাপূর্ণা দেবী যা দেখেছেন তাই গল্পাকারে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। রাঙামাসীর অসহায়তাকে পরম আন্তরিকতায় তিনি উপলব্ধি করলেও একবিংশ শতকেও নারীকুল এখনো তাকে নিয়ে রঙ্গব্যঙ্গেই মত্ত। তাকে আপন করে নিকটে এনে নিজেদের স্রোতে ভাসিয়ে নেবে এতটা মহত্ত্ব-উদারতা কারো নেই বলেই এটা চিন্তনীয় বিষয়। রাঙামাসীর মত মেয়েরা হয়তো নিজেদের সকলের সঙ্গে একীভূত করার জন্য অভিনয় সূত্রের সন্ধানই শুধু করে যাবেন।

'একটি দেশলাই কাঠির জন্য' গল্পে লেখিকা আমাদের চলমান জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনা থেকে সামান্য এক টুকরো ঘটনা নিয়ে গল্পটা তৈরি করে ফেলেছেন। সমগ্র নগরকে পুড়িয়ে দিতে একটি দেশলাই কাঠিই যথেষ্ট, কিন্তু সমগ্র জীবনের গতি স্তব্ধ হয়ে যায় একটি দেশলাই কাঠি না থাকার জন্য এই অদ্ভুত ঘটনাও ঘটতে পারে আমাদের নিত্যকার জীবনের স্রোত থেকেই। আগুন জ্বলে ওঠে বারুদের সাহায্যে, আগুনের শক্তি ও ভয়াবহতা নির্ভর করে বারুদের পরিমাণের ওপর। কত অবহেলা ভরে যে সেই বারুদের স্তুপ আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে থাকে আর একটু অগ্নিসংযোগ পেলে যে তা কিভাবে গ্রাস করে সমগ্র ভালো মন্দ বোধগুলোকে সেটাই এখানে দেখার বিষয়। মানুষ ভাবতেও পারে না, কত তুচ্ছ বস্তু থেকে বিরাট বিরাট অঘটন ঘটে যেতে পারে।

জহর ও জয়ন্তী স্বামী - স্ত্রী। তারা সুখেই সংসার করে যাচ্ছিল। আবেগের স্রোতে ভেসে যেতে যেতে দুজনেই হারিয়ে গিয়েছিল সেদিন তুচ্ছ সামান্য বস্তুর অনেক উর্ধ্বে। গোড়েমালা, জরিপাড় আকাশী শাড়ী আর অসংখ্য ধূপ, যা জ্বালাতে গিয়ে জহর সমস্ত দেশলাই কাঠিই পুড়িয়ে ফেলেছিল। পরদিন সকালে এই কাঠির প্রয়োজনেই সংসারের চাকা স্তব্ধ হবার যোগাড় রান্না বন্ধ করে সারা সংসার খুঁজেও কোন সুরাহা হল না জয়ন্তীর। স্বামীকেও জাগাতে চায় নি; ঝিকে দেশলাই আনতে বলাকে কেন্দ্র করেই অগ্নিসংযোগের সূত্রপাত ঘটল।

কথায় কথায় বাদানুবাদ শুরু হলে বস্তীবাসী ঝি সারদা চলে যায় সমস্ত বাসী কাজ ফেলে; জহর বিছানা ছেড়ে উঠে এসেও কোন সমস্যা সমাধান করে উঠতে পারে না। মাঝখান থেকে অস্নাত-অভুক্ত অবস্থায় জহরকে অফিসে চলে যেতে হয়। বিকালে জয়ন্তীর ঘুম ভাঙে কলে জল পড়ার শব্দে। সারাদিনের সমস্ত কাজ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল, জেগে উঠে সমস্ত

কাজ গুছিয়ে ওঠার সময় দেখতে পায় একটা দেশলাই কাঠি বারুদের টুপি মাথায় পরে অনেকগুলো মুখপোড়া কাঠির মধ্য থেকে যেন হেসে উঠেছে। জয়ন্তীকে এই কাঠিটাই যেন নিমেষের মধ্যে বদলে দিল। তার তখনি শাশ্বত নারী সত্তা জেগে উঠল; ইচ্ছে হল রান্নাঘরে আয়োজনের সমারোহ বইয়ে দেয়। যে কষ্ট সকাল থেকে জহর পাচ্ছে, তা যেন এক লহমায় জয়ন্তী মুছে দিতে চাইছে। নিমেষের মধ্যেই আবার সমস্ত মত বদলে সে চাইল জহরকে শিক্ষা দিতে। এখানে আমরা নারীদের অন্তরমহলের সেই চিত্র পাই যেখানে তারা কিছু হলেই ভাবে — মরে গিয়ে স্বামীকে শিক্ষা দেব-এই ধরনের কিছু একটা। তাই হয়তো জয়ন্তী ঘুঁটে কয়লার চুপড়িতে আগুন না দিয়ে সমস্ত কেরোসিনটা নিজের গায়ে ঢেলে দেয় এবং সেই বিরল একটা দেশলাই কাঠির সদ্ব্যবহার করে।

এখানে একটা দেশলাই কাঠিও অবশ্য এবং অতি প্রয়োজনীয় বটে তা থেকে যে ঘটনা ঘটেছে সংসারে সে ধরনের সামান্য কারণ থেকে বড় ঘটনা ঘটাও স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলে নিজের প্রাণ দিয়ে সে সবের সমাপ্তি ঘটানো এবং পরিস্থিতিকে সহজ না করে, সমাধান না করে জটিলতর করে তোলা হয়তো নারী চিত্তেরই এক অন্যরূপ। সর্বংসহা, চিরন্তনী কল্যাণী নারীও যেখানে সামান্য হাওয়াতেই ছিন্নভিন্ন ও ছারখার হয়ে যায়। অর্থাৎ 'কসাই' গল্পের মতো এখানেও দেখা যাচ্ছে সব ভালোবাসা ও সব ত্যাগের ওপরে যেন নিজের প্রতি কেমন একটা অমোঘ আকর্ষণ সবকিছু ওলোট পালোট করে দিচ্ছে, সেখানে স্বামী সন্তান পর্যন্ত দূরে সরে যাচ্ছে।

'স্বর্গচ্যুত' গল্পে বিরাট বাড়ির গৃহিনী সুরুচি দেবীর বাড়িতে উৎসবের আয়োজন। গুরুদেবের আগমনের ফলে এই উৎসব। গুরুদেব অর্থ-বিত্ত সম্পর্কে একেবারে উদাসীন কিন্তু তাঁর অজস্র শিষ্যদের মধ্যে নানা শ্রেণিভেদ রয়েছে। যারা নিজেরা নিজেদের বেছে নিয়ে আলোচনায় বসে পড়েছে। তাদের শ্রেণিবিভাগ হয়েছে ' সোনার চুড়ি আর বিছে হারের' মহল, আবার কোথাও 'জড়োয়া কঙ্কণ আর মুক্তোর শেলী'র মহল হিসেবে। কোথাও বা সোনা বাঁধানো শাঁখা পরা হাত ব্রোঞ্জের চুড়ি পরা হাতকে দিব্যজ্ঞান দিচ্ছে। এসবের মধ্যেও যেন আমাদের নারী সমাজের চিরন্তন একটি রূপ ফুটে ওঠে। অলংকারের দ্বারাই আভিজাত্যের পরিমাপ করার যে মানসিকতা সেই আদিমকাল থেকেই চলে আসছে তা যেন চলতেই থাকবে। তার মধ্য দিয়েই যেন সামাজিকতা, বন্ধুত্ব, আত্মীয়তা ফুটে ওঠে, টিকে থাকে, ঘনিষ্ঠ হয়। অন্দর মহলের এই চিত্র যেন আ-জীবন কাল চলতেই থাকবে।

গল্পের মূল অন্য জায়গায় প্রোথিত। গল্পের নায়িকা সুরুচি দেবী বিরাট হল ঘরের মাঝখানে ভেলভেটের গদি আঁটা আসনে উপবিষ্ট মহারাজজীর চরণ যুগল কোলে করে বসে আছেন। সমস্ত অনুষ্ঠানটি বিশালাকারে হলেও তা সুন্দরভাবে পরিচালিত হচ্ছে এই সুরুচি দেবীরই তত্বাবধানে; কিন্তু যিনি কর্তা, তিনি কোথায়? যার জন্য অনেকের কাছে ঈর্ষণীয় হয়েও সুরুচি স্বস্তিতে নেই!

মণিময়ের কথা ভেবে তার চিত্তবৈকল্য দেখা দিল, মহারাজজীর পদযুগল তার কাছে পাহাড় প্রমাণ হয়ে উঠল এবং সমস্ত সৌভাগ্যকে তুচ্ছ বলে মনে হতে লাগল। তিনি সব ফেলে মণিময়ের সন্ধানে চললেন। ষোল থেকে পঁচিশ বছরের কিছু মেয়েদের সঙ্গে তাকে খুঁজে পেলেন; দেখলেন সুন্দর পোষাক পরিহিত মণিময় তাদের সঙ্গে হুল্লোড় করে আইস্‌ক্রিম খাচ্ছে। সুরুচি দেবীর সমস্ত অধ্যাত্ম চেতনা নিমেষে অন্তর্হিত হল, স্বামীর প্রতি তীব্র ঘৃণা বিরক্তি ঝরে পড়ল। অর্থাৎ অধ্যাত্ম জগত ও চিত্তের যে বাহ্যিক আড়ম্বর আমাদের চোখে হামেশাই ভেসে ওঠে মূলতঃ তার অন্তরালে কি কি চলে থাকে আমরা এ থেকে যেন অনেকটাই আঁচ করতে পারি।

'কসাই' গল্পে কমলার চৈতন্যোদয় হয়েছিল স্বামী সমরেশের কথায়, এখানেও আমরা তেমনই দেখি সুরুচি দেবীর সমস্ত আয়োজন ও সৎকর্ম যেন এক লহমায় মিথ্যে বলে মনে হয় স্বামীর কথায়। স্বামীর বেহায়াপনায় সুরুচি ধিক্কার জানাচ্ছে তাকে — " তোমার কাছে কি লজ্জার বস্তু কিছুই নেই?" *(পৃ. ১০৫, গল্প সমগ্র ৫ম খণ্ড)*। মণিময় সুরুচির ধিক্কারে যেন আমোদ পেয়ে বলে ওঠে — "একবারে যে কিছুই নেই, তাই বা বলি কি করে? কিছু কিছু আছে বৈকি। ধরো — নিজেকে নিজে ঠকানো ভারী লজ্জার মনে হয় আমার , বেজায় লজ্জার ঠেকে! আপনার ওজন ভুলে ময়ূরপুচ্ছের গুমোর করা, আর নিজেকে অপদার্থ ভেবে লজ্জায় মরে যাবার মতো লজ্জার কথা তো ভাবতেই পারিনে আমি। ..... *(পৃ. ১০৫, ঐ)*।

অর্থাৎ সমস্ত আয়োজন এবং এর ভেতরে যে ভণ্ডামী আছে তার প্রতি যেন একটা অঙ্গুলি নির্দেশ পাওয়া যায় এতে। এছাড়াও সুরুচি এতে নিজের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে, বাইরের চাকচিক্য এবং অন্তরের অবস্থান তার কাছে সুস্পষ্ট আকার ধারণ করে। নারী চিত্তের এই আত্ম-আবিষ্কারের দিকটি, ভণ্ডামির পরিবর্তে যথার্থ সত্যময়তায় উদ্‌ভাসিত হওয়াকেই লেখিকা প্রতিফলিত করতে চান।

'মন্টি' গল্পটি একটি মেয়ের ভালোবাসার রূপের অভিনব প্রকাশ। সে যখন আবিষ্কার করল নিজেকে যে, কাউকে সে ভালোবাসে তখন সে তরুণী। সে যাকে ভালোবাসে বলে ভেবেছে পরে দেখল তার অনুভূতি অন্য কথা বলছে। তার সমগ্র মন ও চিন্তা চেতনা অন্য কারোর জন্য উন্মুক্ত হয়ে আছে, যাকে কিনা সে যথার্থ ভালোবাসে। অথচ তাদের মধ্যে কালোচিত ব্যবধান বিস্তর। যখন মন্টি পেরাম্বুলেটরে চেপে ঘুরে বেড়ায়, তখন তার সেই ভালবাসার মানুষটি নির্ভুলভাবে টাই বেঁধে কোর্টে যাওয়া আসা করছে।

'মন্টি' বাল্যেই মাতৃহারা বাবা দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেছে। সৎমা তাকে স্নেহের বাঁধনে বাঁধতে চাইলেও সে তাতে বাঁধা না পড়ে সারা পাড়াময় সকলের সঙ্গে মিলেমিশে কাটাত। কিন্তু সবচেয়ে আবদার বেশি প্রয়োগ করত তার ভালোলাগার মানুষটির ওপর। সে কোর্টে যাতায়ত

করলেও নাটক-নভেল লিখত। তার ঘরে সকাল বেলাতে এসে সে হয়তো ছেঁড়া কাগজ জোড়া দিচ্ছে, হয়তো বা ভিজে কাপড়ের টুকরো নিয়ে ঘষে ঘষে বইয়ের পাতার কালি তুলছে — এসবের সঙ্গে চলে অবিরাম বকবকানি। মায়ের অগাধ ভালোবাসা আবার বাবার ভালোলাগার বন্ধুত্ব প্রাণের বন্ধুর খোঁজটা তাড়াতাড়ি পেয়ে গেছে। কিভাবে যে সে অতটুকু বয়সেই বুঝতে পারে প্রাণের টানটা কোথায়, সেটা তার কথাতেই দেখি — " তোমাকেই আমি সত্যি ভালোবাসি, তুমি কদিন ছিলে না, কেঁদে কেঁদে মরছিলাম আমি। মামার বাড়ি যাওয়ায় তো কান্না পায় নি। সেই থেকেই তো ধরতে পারলাম তোমাকে আমি —" *(পৃ. ১৩, গল্প সমগ্র ৫ম খণ্ড)*। এই যে এক গভীর অনুভূতি, ভাব ও প্রেমে তাকে কিভাবে অর্জন করল এই অসমবয়সী একজন বালিকা। প্রেমের বোধ যে সমস্ত কিছু পরিবর্তন করে দেয়, অনুভূতির গভীরে তলিয়ে দেয় বাহ্যিক দৃষ্টির সমস্ত দুস্তর ব্যবধান, এই গল্পটি তারই পরিচায়ক।

আর যাকে ঘিরে সমস্ত কিছু আবর্তিত হচ্ছে সেই মানুষটিও তো আবিষ্কার করছে —নিজে যেন কোথায় বাঁধা পড়ে যাচ্ছে সেই বালিকার সঙ্গে জটিল বন্ধনে। যেন আর সব সাধারণ ও নিতান্তই খেলার সঙ্গে মেলাতে পারছে না মন্টির চিন্তা চেতনাকে। তবে কি তিনিও মন্টির কথা ভাবেন যে, সত্যিই তিনি তার প্রাণের বন্ধু। সেই উকিল ভদ্রলোক একবার অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি থাকাকালীন মন্টি বাড়িতে গুমরে মরেছে, আর তখনই আবিষ্কার এই অনুভূতির। হাসপাতালে যেতে হলে অন্য কারো সাহায্য প্রয়োজন, সেটা না পাওয়ায় আবদ্ধ অবস্থায় থেকেই মন্টি নিজের মনের প্রতিবিম্ব নিজেকে আবিষ্কার করেছে মাতৃস্নেহের কোমলতা ও নিরাপদ আশ্রয় বঞ্চিতা মন্টি অসমবয়সী একজন পুরুষের প্রাণেই তার হৃদয়ের সমস্ত আদর, আবদার, আবেগের জন্য নিশ্চিন্ত একটি আশ্রয়ের সন্ধান পেয়েছে। বয়সোচিত দুস্তর ব্যবধান মন্টির প্রেমের উন্মেষে বাঁধা হতে পারে নি।

'মফস্বল বার্তা' গল্পে এক বালিকার চিত্তের যে রূপ দেখানো হয়েছে, তাতেও বোঝা যাচ্ছে নারীচিত্ত যে সনাতন পথে চলে তারই একটি দিক হয়ত সেটা। সেলাই স্কুলের দিদিমণি নীলা ও তার মেয়ে খুকু একটি কোয়ার্টারে থাকে। দীর্ঘ এগারো বছর পর নীলার ঘরে তার মেয়ের অনুপস্থিতিতে তার নিরুদ্দিষ্ট স্বামী ফিরে এসেছে। যিনি কিনা খুনীর আসামী হিসেবে পরিচিত। স্বামী সান্নিধ্যে সমস্ত ব্যথা বেদনা ভুলে গেলেন নীলা এবং দুজনে সারা রাত নানা কথার মাঝে এও ঠিক করে নিলেন মেয়েকে কি ভাবে বাবার কথাগুলো বলবেন এবং এখান থেকে চলে যাবেন। খুনী হলেও খুন করে যে বিশ্বজিৎ কোন অন্যায় করে নি এটুকু বিশ্বাস স্বামীর ওপর নীলার আছে।

কিন্তু প্রথমে বাবার পরিচিত বিশেষ একজন এবং পরে 'আমাদের সবচেয়ে আপনার লোক' — কোন কথাতেই মেয়েকে নিজেদের মাঝে আনা যায় নি। সে তার ও মায়ের শুচিশুভ্র বিছানাতে

একজন অপরিচিত পুরুষের বসে থাকা, মায়ের সঙ্গে তার মেলামেশা ও তার চিরপরিচিত মায়ের বেশভূষার পরিবর্তন কোনটাই যেন খুকু মেনে নিতে পারে নি। সে তার বাবাকে মৃত বলে জানে, বাবার জায়গায় সে যেন কাউকে বসাতে রাজী নয়। এটুকু বয়সেই সে নারী পুরুষের রহস্যময় সম্পর্ক অনেকটা আঁচ করতে পারে যেন, তাই সন্দেহের চোখে তাকায় মায়ের দিকে। মা যখন তাকে বলে স্কুলে না যাওয়ার কথা, বলে এখান থেকে চলে যাওয়ার কথা, তখনই সন্দেহ তীব্রতর হয় ও পুলিশ ডেকে এনে চিলেকোঠার ঘরে থাকা অপরিচিত পুরুষ মানুষটিকে দেখিয়ে দেয়।

একটি শিশু কোন আত্মীয়-স্বজন ও নিকট কোন পুরুষের সান্নিধ্য ছাড়াই বড় হয়েছে; ফলে বড় হয়ে এই পরিস্থিতিকে তার অত্যন্ত অন্যায় বলে মনে হয়েছে। মায়ের কপালে সিঁদুরের টিপ, পরণে ঢাকাই শাড়ী তাকে আরো জেদী করে তুলেছে। মায়ের এই বেশ বদল যেন মাকে তার আবেষ্টন থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারে, তার চেনা মা যেন রহস্যের অরণ্যে হারিয়ে যেতে পারে বলে তার মনে হয়েছে। তার অদেখা এক সম্পর্কে ও আনন্দে মা জড়িয়ে পড়বে, মায়ের সেই শ্বেত শুভ্র ত্যাগী চেহারার বদলে বিলাস ব্যসনে জড়িত ভোগী চেহারা ভেসে উঠবে এ যেন তার স্বপ্নেরও অগোচর। সেই থেকে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে এবং ফলস্বরূপ তার অত্যন্ত নিকটজনকে কাছে না টেনে আবেগে, জেদে আরো দূরে হারিয়ে দিয়েছে, পুরো পরিচয়টা না জেনেই নিরুদ্দিষ্ট বাবাকে ঘিরে মহোল্লাসে মাততে সে রাজী নয়। বরং যে পুরুষের আগমনে স্নিগ্ধা মাকে হারাতে বসেছে তাকে পিতা নয়, শত্রু মনোভাবেই নিয়েছে। এই চিত্রটা আরো দু'একটা গল্পে দেখা যায়।

'শোক' (১৩৬৩ বঙ্গাব্দ) গল্পে আশাপূর্ণা দেবী দেখাতে চাইছেন শোক প্রকাশের ক্ষেত্রে পরিবেশের গুরুত্ব কতটা। প্রতিভা এবং শক্তিপদর একমাত্র পুত্রসন্তান নিয়ে সংসার বেশ সুখেই অতিবাহিত হচ্ছিল। অফিসে যাবার সময় শক্তিপদ যথানিয়মে আসা একখানি চিঠি ও একখানি ম্যাগাজিন দেখতে পায়। অভ্যাসবশতঃ তা তুলে নিয়ে দেখে প্রতিভার বাপের বাড়ি বর্ধমান থেকে আসা চিঠিখানি একখানি মর্মান্তিক দুঃসংবাদ বহন করে এনেছে। প্রতিভার মায়ের মৃত্যু সংবাদ, এই মুহূর্তে ভয়ংকর সংবাদটি শক্তিপদ প্রকাশ করার সাহস না পেয়ে ম্যাগাজিনের ওপর রেখে তড়িঘড়ি অফিসে চলে যান। তিনি ভেবেছিলেন, সারাদিনের অবসারে প্রতিভা চিঠিটি পড়ে তার প্রাথমিক ও প্রবল শোকের আঘাতটা সামলে উঠবে। কিন্তু অপরাহ্নে শক্তিপদ বাড়ি ফিরে শোকের সমারোহ বা চিহ্ন কিছুই দেখতে পেলেন না। পরিবর্তে দেখা গেল ভাবনার সঙ্গে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ চিত্র। আলুভাজা-পটলভাজা-লুচি সমেত জলখাবারের থালা সাজিয়ে শশব্যস্ত প্রতিভা হাজির শক্তিপদর সম্মুখে। তার সারাদিনের কর্মব্যস্ততার ফর্দ স্বামীর নিকট তুলে ধরতে শুরু করল স্বাভাবিক চপলতায়। খোকনকে কাঠ পিঁপড়েতে কামড়ে দেওয়া, তাই নিয়ে অস্থিরতা, নাওয়া-খাওয়া পর্যন্ত ঠিকমতো না হওয়া, ছেলের অনেক কষ্ট হয়েছে — এসব বর্ণনা করে যাচ্ছে প্রতিভা।

তবে কি প্রতিভা চিঠিটা পড়ে নি? না পড়লে চিঠিটা ম্যাগাজিনের ওপর থেকে নীচে গেল কি করে? আর চিঠির কোণে হলুদ ছাপটাই বা কিসের? শক্তিপদর এ চিন্তা যেন কূলহীন। প্রতিভাও চিঠি পড়েছিল, কিন্তু তার ভেতরে কাজ করছিল যে ধারণা তা হল — "দশ মিনিট আগে এল না চিঠিটা? তাহলে শক্তিপদ থাকত। থাকত প্রতিভার শোকের প্রচণ্ডতা বোঝাবার দর্শক। শক্তিপদ থাকলে — এখুনি শোকাহত উদ্‌ভ্রান্ত প্রতিভাকে নিয়ে ছুটত হাওড়া স্টেশনে।... প্রতিভার এতবড় দুঃখের সময় কৃপণতা করবে, এমন হৃদয়হীন লোক শক্তিপদ নয়!... কিন্তু এ কী হল? শোকের সমারোহের দিকটা একেবারে নিভে গেল যে!" *(পৃ. ৩৩৪, আশাপূর্ণার গল্প সমগ্র ৪র্থ খণ্ড)*। পরিবেশের প্রতিকূলতার জন্য মাতৃশোক পর্যন্ত চাপা দিয়ে রাখাও যে নারীর পক্ষে সম্ভবপর হয়ে ওঠে আশাপূর্ণা দেবী তাই দেখাতে চেয়েছেন। শক্তিপদর উপস্থিতিতে শোক আড়ম্বরপূর্ণ হয়ে উঠেছে পরবর্তীকালে।

'সম্ভ্রম' (১৩৫৬ বঙ্গাব্দ) ও **'পাতাল প্রবেশ'** (১৩৬২ বঙ্গাব্দ) গল্প দুটির বাহ্যিক আবরণ যেন কিছুটা প্রায় একই রকম হলেও ভেতরটা অন্যরকম। চাকরিহীন অবস্থায় ছেলে মেয়ে সকলকে নিয়ে বেশ কায়ক্লেশেই কনক-ভূপতি দিনাতিপাত করছে। তাই কনক দাদা এবং সুনীলকে স্বামীর একটা চাকরির জন্য অনুরোধ করেছিল, এবং তা হয়েও গিয়েছে। আর সেই সংবাদেই যত বিপত্তি। স্ত্রীর সুপারিশে শ্যালকের চেষ্টায় লব্ধ চাকুরিতে তার সম্মান হানি হতে পারে — এই ভেবে ভূপতি সেই চাকরি করতে নারাজ এবং কনক যেহেতু নিজে দাদাকে বলে চাকরির ব্যবস্থা করেছে সুতরাং ভূপতি যে এই চাকরি করবে না, সেকথাটা জানানোর দায়িত্বও তাকেই নিতে হবে। একে তো এখানে দেখা যায়, একজন পুরুষ স্ত্রী-পুত্রের ভরণপোষণ করতে না পারার জন্য মোটেও লজ্জিত নয়, যতটা অপমানিত বোধ করে শ্যালকের দেওয়া চাকরি নিতে। মেকী পৌরুষ নিয়ে বেঁচে থাকা লোকের সংখ্যাও সংসারে যথেষ্ট। লেখিকার উদ্দেশ্য হোল, দেখানো, সেই নারীটিকে যে দাদার কাছে স্বামীর 'সম্ভ্রম' বজায় রাখতে নিজের ঘরের লক্ষ্মীর কৌটো থেকে সিঁদুর মাখানো পয়সাটা পর্যন্ত মিষ্টি কেনার জন্য ছেলের হাতে তুলে দেয়। চাকরির খবর পেয়েও কনক দাদার কাছে সেই প্রাপ্তিসংবাদ চেপে যায় এবং মিথ্যে করে বলে যে, ভূপতি একটি ব্যাঙ্কে চাকরি জোগাড় করে নিয়েছে। সেই শুভ সংবাদে দাদাকে কনক মিষ্টি না খাইয়ে ছাড়তে চাইছে না। এদিকে অভাবের রাক্ষুসী তার সংসারের লক্ষ্মীর ভাঁড়ারের শেষ কানাকড়িটা পর্যন্ত গিলে খেয়ে নিল। হিন্দু নারীরা স্বামীর অহেতুক মেকী আত্মসম্মান বজায় রাখতে বাধ্য হয় অভাবের চরম সীমায় পৌঁছেও। হিন্দু নারীর স্বামীর প্রতি এই অস্বাভাবিক পাতিব্রত্য দেখাতেই এই গল্পের অবতারণা। অভাবের ছোবল খেতে খেতে ক্ষয়ে যাওয়া নারীও স্বামীর সম্মান রক্ষায় কতটা তৎপর।

'পাতাল প্রবেশ' গল্পে স্বামীর সম্মান বজায় রাখতে স্বামীর শখটাকে বজায় রাখতে সচেষ্ট দেখা

যায় গল্পের নায়িকা আরতির মাকে। কিন্তু দুটো গল্পের যে সূক্ষ্ম একটা মিল দেখা যায় তা হল — স্বামীর সম্মান রাখতে কনক তৎপর ভয়ঙ্কর দারিদ্র্যকে উপেক্ষা করেও, তেমনি দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জরিত আরতিও পারে না বারবার ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে নিজেকে ছোট করতে। আরতির বাবা-মা অত্যন্ত দরিদ্র। তার বাবা বাড়ির বাইরে আসেন কাজের সূত্রে, কিন্তু যা রোজগার করেন তা নিজের জন্যই খরচ হয়ে যায়। আরতি ও তার মায়ের সংসার চলে মামার দেওয়া কিছু টাকায় ও প্রতিবেশীদের বদান্যতায়। কিন্তু মাঝে মাঝে যখন তার বাবা বাড়ি আসে তখনই ঘটে বিপত্তি। আরতিকে তার মেজ জ্যাঠাইমার কাছে চাল-আলু-ঘি-মাছ আবার কখনো টাকা ধার চাইতে যেতে হয়। ছোটবেলায় যেতে তার আপত্তি ছিল না, কিন্তু যখন বুঝতে শিখল তখন এই কাজকে তার ভিক্ষাবৃত্তি বলে মনে হয়। বাবাকে মনে হয় 'বাপ তো না, খাবার কুটুম।' *(পৃ. ১৫৫, গল্প সমগ্র ৪র্থ খণ্ড)*। তার বাবা পরিবারের প্রতিপালনে কোন ভূমিকা তো গ্রহণ করেই না, বরং বাড়ি আসার পর বাড়িতে নানা ধরনের যত্ন - আত্তি - খাবার - দাবার আশা করে। আরতি ক্ষোভে আক্রোশে বাবার প্রতি কটূক্তি করতে ছাড়ে না — "অমন লোকের গলায় দড়ি দিয়ে মরাই উচিত।" *(পৃ. ১৫৯, ঐ)*। বাবার প্রতি মেয়ের এই উক্তি একটা মেয়ে যে কতটা দুঃখজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে করতে পারে তা বলাই বাহুল্য। সেই আরতিই অবাক হয়ে দেখে, মেজ জ্যেঠির বাড়ি থেকে পাঠানো আলু, ঘি, মাছের তেল-কাঁটার ছ্যাচরা দিয়ে পরিতৃপ্ত ভোজন দৃশ্যের দুটি মুখ। একজন গোগ্রাসে গিলছে, অপরজন পাশে বসে খাইয়ে পরিতৃপ্তির হাসি হাসছে। এদের প্রতি আরতি যেন করুণা ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না। একটি সামান্য অশিক্ষিত গ্রাম্য মেয়ের যে ব্যক্তিত্ব ও আত্মসম্মানবোধ, যার প্রভাবে সে বাবার মৃত্যু কামনা পর্যন্ত করতে দ্বিধা করে না এই দিকটি গল্পে ফুটে উঠেছে।

'পদ্মলতার স্বপ্ন' (১৩৫৩ বঙ্গাব্দ) গল্পে পদ্মলতা ছিল যদু লাহিড়ীর বাড়ীর রাধুঁনী বামনীর মেয়ে 'পদি'। সারাদিন কাজ করে বেড়াতো; সামান্য ছুঁড়ে দেওয়া খাবার খেয়ে বড় হয়েছে। সেই পদির বিয়ে হয়ে গেছে সকলের আর্থিক সাহায্য ও সহযোগিতায়। এই ঘুঁটে কুড়ানীর মেয়ে পদি সোনাপলাশী গাঁয়ে ফিরে এসেছে রাজরানী হয়ে। যদু লাহিড়ীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ির বোল-বোলাও চলে গিয়েছিল, কিন্তু পদ্মলতা আসার পর যেন বাড়িতে বোল ফুটেছে। পদি পদ্মলতা হয়ে আসাতে তাকে ঘিরে যেন উৎসব শুরু হয়ে গেছে; প্রায় সকলেই যার যার বাড়িতে পদ্মলতাকে খাওয়াতে পারলে যেন ধন্য হয়ে যাচ্ছে। সেও পাড়ায় প্রতিটা বাড়ি ঘুরে ঘুরে সকলের খোঁজ-খবর করছে, প্রয়োজনানুযায়ী সাহায্য করছে এবং অনেকগুলো শাড়ী কিনে পাড়ার অনেক গিন্নী-বান্নীদের বিতরণ করে প্রত্যেকের আরো চোখের মণি হয়ে উঠেছে। পদ্মলতা এই পরিবেশ পরিস্থিতিটাকে ভীষণভাবে উপভোগ করছে। এদিকে তার স্বামী ছোট্ট পায়রার খোপের মতো স্যাঁতসেঁতে ঘরে নড়বড়ে বিছানার ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে স্ত্রীকে চিঠির মাধ্যমে তার সমূহ সর্বনাশের কথা জানাচ্ছিল।

পাটনার চাকরিটা তার হয় নাই এবং জমিজমা যথাসর্বস্ব বিক্রি করে চাকরিতে সিকিউরিটি দেবার জন্য সংগৃহীত দুই হাজার টাকা ঘর থেকে উধাও হয়ে গিয়েছে।

এ থেকে বোঝা যাচ্ছে, স্বামীর যথাসর্বস্ব ধন লুকিয়ে এনে পদ্মলতা বাপের বাড়ির দেশে সকলের মধ্যে বিতরণ করছে অথচ তার সংসারেও অনটনের অন্ত নেই। এই যে হৃত সর্বস্ব হয়েও সকলের মধ্যে নিজের পুরানো অবহেলার জায়গায় রানী হয়ে ওঠার বাসনা, সম্মানের শিখর চূড়ায় অবস্থানের বাসনা এও যে মানুষের এক ধরনের চরিত্র বৈশিষ্ট্য তাই চরিত্রের মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে। নারীচিত্তে প্রতিষ্ঠার, যশের মোহ যে কতখানি তীব্র, হতে পারে, নিজেকে নিজ অবস্থায় থেকে বড় করে দেখানোর ইচ্ছা যে কত ভয়মকর হতে পারে, লেখিকা সেরকম চরিত্র ও যে সমাজ পরিমণ্ডলে দেখেছেন এবং সেই চরিত্রকে গল্পে ভাষারূপ দিয়েছেন তা এখানে লক্ষিত হচ্ছে।

'দেশলাইয়ের বাক্স' যেমন অবহেলা ভরে পড়ে থাকে পকেটে, তাকে, রান্নাঘরে, বিছানায় — নানাভাবে, প্রায় একইভাবে অবহেলাভরে পড়ে থাকে একরাশ বারুদ বুকে নিয়ে নারীরাও। নিমেষের মধ্যে লঙ্কা কাণ্ড বাঁধিয়ে সমস্ত কিছু ছারখার করে দিতে পারে সামান্য দেশলাই। নমিতাকে কেন্দ্র করে যে ঘটনাটি ঘটল তাতে তাকে দেশলাই বাক্সের সঙ্গেই তুলনা করা চলে। মস্ত তিনতলা বাড়ির বৌ হয়েছে নমিতা রূপের জোরে। তাকে দিয়েই বলতে গেলে তার মা যাবতীয় কাজকর্ম করিয়ে নেয়। অর্থাৎ সময়ে অসময়ে মেয়েকে চিঠি লিখে টাকা চেয়ে পাঠায় — মেয়ে রাজরানী এবং জামাই মহানুভব বলে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এই চিঠি এবং চিঠির বক্তব্য নিয়ে নানা ধরনের কথা, ব্যঙ্গ, বাগ্‌বিতণ্ডা সবই হয়ে থাকে; আবার টাকা পাঠানোও হয়ে থাকে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই একদিন বারুদ জ্বলে ওঠে। নমিতার নামে তিন দিন আগে আসা তার মায়ের চিঠি উদ্ধার হয় অজিতের পকেট থেকে। তার মায়ের চিঠি কিন্তু তাকে না দেখানোতে যথারীতি স্বামীর কাছে সে কৈফিয়ৎ তলব করে এবং দু'এক কথায় কথায় পারদ ক্রমশঃ চড়তেই থাকে। অজিত একসময় বলে ওঠে — "বেশ করব চিঠি খুলব। করবে কি? পারবে কিছু করতে?" নমিতাও সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণ করে " পারি কি না দেখবে?" *(পৃ. ১০৭, স্বনির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্প)* বলেই দেশলাইয়ের বাক্সখানা নিয়ে পরনের শাড়ীর মিহি আঁচলে আগুন ধরিয়ে দিল।

অজিত ঘটনার আকস্মিকতায় তাৎক্ষণিক হতভম্ব হয়েও পরক্ষণেই দুই হাতের থাবায় আগুন নিভিয়ে বুঝতে পারে মেয়েরাই এক একটি দেশলাইয়ের বাক্স। অবহেলাভরে সংসারের সর্বত্র মেয়েরা নানাভাবে পড়ে থাকলেও প্রয়োজনে এক বুক বারুদ নিয়ে সমস্ত কিছুই জ্বালিয়ে দিতে পারে। যদিও তার অনেকটা শুধু স্বামীর সামনেই প্রকটরূপ ধারণ করে, বাদবাকীদের কাছে গেলে তা আবার সহজ স্বাভাবিকরূপেই প্রতিভাত হয়। এভাবেই তাদের ভেতরকার ব্যক্তিত্ব, প্রতিবাদের ছবি প্রকাশিত হয়। এও মানব চরিত্রের একটি দিক, যা আশাপূর্ণা দেবী অভিজ্ঞতার আলোয় পেয়েছেন।

'দত্তাপহারক' গল্পে এক বৃদ্ধা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে, কেন ঈশ্বর মানুষকে সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়েও ধীরে ধীরে বয়স হলে আবার সব কেড়ে নেন। এই সংসারে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের প্রতি সংসারে আর পাঁচটা সদস্যের কি মনোভাব থাকে, বিশেষতঃ মেয়েদের আচার-আচরণ কেমন হয় তাই দেখানো হয়েছে। বৃদ্ধা সরোজবাসিনী তার ভাইপোর সংসারে আছেন; এমনি নয়, সমস্ত বাড়ির মালকিন হয়ে। দৃষ্টিশক্তি হারালেও কারো করুণা তিনি গ্রহণ করতে রাজি নন। সমস্ত কিছু আগের মতো জানতে, বুঝতে, শুনতে ইচ্ছে করে। তাই সকলকে বিরক্ত করেন যাতে তার চেয়ে অন্যান্যরা বিরক্ত বোধ করে অনেক বেশি। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে বৃদ্ধা হলেও সরোজবাসিনী কারোর দয়া ভিক্ষা না নিয়ে নিজের বাড়িতে নিজের দাপটে চলতে চান আর তার বৌমা-নাতনী এরা চায় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বৃদ্ধা যেন পরলোক প্রাপ্ত হন। আমাদের সমাজের বাস্তব অবস্থার একটি দৃশ্য এটি। এই বৃদ্ধারই ভাগ্নী বীণা মাসির ওপর বিরক্ত; কারণ মাসি বিধবা বলে দাদু এই মাসিকেই এই এতবড় বাড়ির মালিক করে রেখে যান। এই বীণার কথাই শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধা মাসীর কাছে বিধাতার প্রতি অভিযোগের উত্তর হয়ে এল — "আরে বাবা, চিরকালই যদি সব ভোগ করবি, তবে ভগবান কেন একে একে চোখ, কান, দাঁত, কোমর সব কেড়ে নেন? আশী বছর বাঁচবি বলে আশী বছর ধরেই সব ভোগ করবি?... কবে আর তবে আমরা প্রাণ খুলে হাসবো? গলা খুলে কথা বলবো? মন খুলে সংসার করবো?" *(পৃ. ১৯১, স্বনির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্প)*

সংসার যে চাকার মতো পরিবর্তিত হয়, প্রত্যেককেই যে তার নিজস্ব জায়গা ছেড়ে দিতে হয় এবং বৃদ্ধ-বৃদ্ধা হলে সংসারের প্রতি আসক্তির পরিমাণ কিঞ্চিৎ কমিয়ে দেওয়া অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং সুখকরও বটে — এটা সরোজবাসিনী উপলব্ধি করলেন। তাই হয়তো ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে মনে মনে বললেন — "বৃথা তোমার ওপর অভিমান করছিলাম। করুণার তোমার শেষ নেই। অনেক আঘাত থেকে বাঁচাবার জন্যেই তুমি তোমার দেওয়া জিনিসগুলি কেড়ে নাও।" *(পৃ. ১৯১, ঐ)* এতেই বোঝা যায় জীবনের ও সংসারের চিরাচরিত প্রথা কি, এবং সংসারে নারীর মনই নারীকে নানা রূপ পরিবর্তনে, সত্য ও অপ্রিয় সত্য উদ্‌ঘাটনে সহায়তা করে।

পিতা মাতা সন্তান জন্মাবার পর থেকে তাকে অপরিসীম স্নেহ ও ভালোবাসা দিয়ে বুকে করে মানুষ করে তুলতে চেষ্টা করেন। জীবন ধারণ করতে গিয়ে যতটা পারা যায় নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য নিংড়ে সন্তানকে উজাড় করে দিয়েই যেন সুখ। সেই সন্তান ধীরে ধীরে যত বড় হতে থাকে মাতা পিতার অপত্য স্নেহের সঙ্গে ততই মৃদুগতিতে যুক্ত হতে থাকে নানা রকমের আশা ও স্বপ্ন। কখনো তা এমন পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ায়, সেই অপূর্ণ স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যস্থল হয়ে ওঠে উক্ত সন্তান। জীবনের সমস্ত সুখ, স্বপ্নের রসদ নিংড়ে রস সিঞ্চনে যাকে বড় করে তুলেছেন তার নিকট হতে যেন সব সাধপূর্ণ করে নিতে চান।

'একটি মৃত্যু এবং আর একটি' গল্পে এই সমাজের বুকে ঘটে যাওয়া কিছু চরম সত্যের জীবন্ত ছবি পাওয়া যায়। কোন এক নারী নিজমুখে স্বীকার করেছেন নারীদের মানসিক অবস্থার কথা। কিভাবে নারীকে নারীরাই নানা কথার জালে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলে এবং প্রয়োজনে দগ্ধ পর্যন্ত করে থাকে। আর এই গল্পে দেখানো হয়েছে এর প্রেক্ষিতে কি ঘটে থাকে।

অধ্যাপক প্রিয়তোষবাবু আর তার স্ত্রী সুনয়নী দেবীর সংসারে আছে দুই কন্যা আর তাদের এক কাকা। প্রিয়তোষবাবুর মামাতো ভাই অলক শখের চিত্রশিল্পী। যিনি নাকি রোজগারের দিকে কোনদিনই নজর দিতেন না। প্রিয়তোষবাবুর দুই মেয়ে বুলি আর বাবলি বলতে গেলে তাদের অলককাকুর হাতেই মানুষ, তারা ধীরে ধীরে বড় হয় এবং একসময় তাদের বিবাহও হয়ে যায়। অকস্মাৎ ঘটে যায় এক অঘটন; প্রিয়তোষবাবু হঠাৎ মারা যান। তখনই প্রকাশিত হয় সেই চিত্র, যা প্রায় সকলের কাছেই অপ্রত্যাশিত।

প্রিয়তোষবাবুর বাড়ি থেকে শোক ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে সব আত্মীয়-স্বজনেরা একে একে চলে গেলে সুনয়নী দেবী তার মেয়েদের বলতে বললেন তাদের অলককাকুকে চিরদিনের মত এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে। বুলি আর বাবলি যেন চলতে চলতে সহসা একটা বিরাট ধাক্কা খেল। কারণ, অলককাকু এ বাড়ি ছেড়ে চিরকালের জন্য চলে যাবে — এ তো ধারণারও অতীত। দুই বোনের আলোচনায় এটাই প্রকাশ পেল যে, যেহেতু তিনি ভাল কোন রোজগার করেন না, তাই হয়তো তাকে আজ এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার কথা সুনয়নী দেবী এত সহজে বলতে পারছেন। এতদিন শুধু প্রিয়তোষবাবুর ভাই বলে বলতে পারেননি, তাঁর অবর্তমানে একথা বলা অত্যন্ত সহজ হয়ে পড়েছে। তবে কি সুনয়নী দেবী এতদিন অভিনয় করে এসেছেন?

না অভিনয় তিনি করেননি, কিন্তু দেবরকে বাড়ি-ছাড়া তিনি করেছেন এবং এই দায়িত্বটা নিজেই কাঁধে তুলে নিয়েছেন। আর এই কাজটির অন্তরালে যে উদ্দেশ্য লুকিয়ে আছে সেটাই বাস্তব সত্য। বুলি আর বাবলির কাছে প্রকাশ পেল সেই সত্য — চিরকালের সুহৃদ মামাতো দেবরকে নিয়ে এক বাড়িতে থাকলেও একটা সময় দেখা যেত যে, নিজের লোকেরাই তাদের নামে মিথ্যা কলঙ্কের জাল বুনে একটা কলঙ্কিত সম্পর্ক উপহার দিতে আসত। যদিও মেয়েরা এই কথা মানতে নারাজ — "ইঃ! এই বয়েসে, জামাই হয়ে গেছে, কে তোমায় কি বলতে আসতো শুনি?" *(পৃ. ২২, আশাপূর্ণা দেবীর ছোটগল্প সংকলন)*। এর উত্তর দেন সুনয়নী দেবী বিদ্রূপের হাসি হেসে, বলে ওঠেন — "নিজের মা বোনই আসতো!... শুনে তোরাও ছাড়তিস্ না কি? 'মা' বলে রেহাই দিতিস? মেয়ে মানুষই মেয়ে মানুষের গায়ে এক কথায় কালি ছিটিয়ে বসে বাবলি। আর সেটা আপন জনেরাই করে। মেয়েরা কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে জানে না, ভালোবাসতে জানে না"। *(পৃ. ২৩, ঐ)* নারী ও পুরুষকে ঘিরে মানুষের এই কৌতূহল এবং কুৎসা রটানোর উৎসাহ হল চিরন্তন। আর সেই কার্যে

নারীরাই বেশিরভাগ ব্রতী হয়ে ওঠেন, তারাই যেন ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে এগুলো উপলব্ধি করেন এবং তাকে ঘিরে নানান গল্প রচনা করেন। অনেক সুন্দর মধুর সম্পর্ককে টেনে হিঁচড়ে নরকের পঙ্কিল আবর্তে টেনে ফেলে দিতে পারেন। কিন্তু দরদ দিয়ে, আন্তরিকভাবে মমতার সঙ্গে কেউ কারো মানসিক অবস্থাকে উপলব্ধি করতে চায় না। বরং অত্যন্ত আপনজন বলে যারা পরিচিত তারাই দুর্বল জায়গাগুলোকে আঘাতে আঘাতে ক্ষত বিক্ষত করে দিতে পারলে একধরনের নিষ্ঠুর আনন্দ লাভ করে। আর বাস্তবের এই পরিস্থিতিকে যে অগ্রিম বুঝে উঠতে পারে তাকেই হতে হয় ভীষণ কঠোর। যেমনটা হয়েছিলেন সুনয়নী দেবী। আশাপূর্ণা দেবী অন্দরমহলের নারীদের অন্তরের এই বিরাট বাস্তব সত্যের অনুভূতিকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই তা সুন্দরভাবে চিত্রিত করেছেন এই গল্পে।

'ভয়' (১৩৫১ বঙ্গাব্দ) গল্পটির মধ্যে লেখিকা বার্ধক্যের মধ্যেও মৃত্যু-ভয়ে ভীত এক নারীর চিত্র এঁকেছেন। শোকে, আঘাতে জর্জরিতা একটি নারী যে বার্ধক্যকে সঙ্গী করে এগিয়ে চলছে সেও কিনা মৃত্যুকে ভয় পাচ্ছে? এখানে কাজ করেছে মৃত্যুভয়। মৃত্যু এসে একটি মানুষের জীবনে এক এক করে অনেক ছিনিয়ে নিতে নিতে একসময় উপলব্ধি করতে পারলো যে, নিজেই মৃত্যুকে প্রচণ্ড ভয় পাচ্ছে।

এই গল্পের মূল চরিত্র হচ্ছে দ্রবময়ী। তিনি অনেক অল্প বয়সেই শোকের আঘাতে জর্জরিত হয়ে পড়েছেন বারবার। বিবাহিত জীবনে তিনি এই শোকের আঘাতে মুহ্যমান হয়েছেন প্রথম সন্তান কাতুর মৃত্যুর পর। এরপর দুই ছেলে এবং সুন্দর ফুটফুটে কন্যা শৈল জন্মাল। কিছুদিন পর সে মেয়েও মারা গেল। এরপর এল কালো মেয়ে সুধা, এবং তারপর আরো একটি ছেলে গিয়ে পরপর চার-চারটি ছেলেমেয়ে দ্রবময়ীর কোল আলো করে বিরাজ করতে লাগলো। সর্বমোট চার ছেলে ও তিন মেয়ে নিয়ে তিনি সংসারচক্রের ঘূর্ণাবর্তে পাক খেয়েছেন। সন্তানদের ভাত-পৈতে-বিয়ে-তত্ত্বতালাস-নতুন জামাই, কচি বৌ ও নাতি-নাতনি নিয়ে বিশাল সংসারের কর্ণধার হয়ে বিকশিত হতে লাগলেন। ছেলেদের সংসারের নানা ঝামেলা — বড় ছেলে আনন্দ বিরাট বাড়ি বানাচ্ছে, তার ঝক্কি, সুধালতার মেয়ের বিয়ে, সেটা সামলানো, পদ্মলতার দুবার যমজ সন্তান প্রসবের ফলে মা ও সন্তানের যত্নআত্তি — সমস্তই নিজের হাতে করে সামলে নিয়েছিলেন। সংসারের জটিল আবর্তে পাক খেতে খেতে ধীরে ধীরে বাবা-মা-ভাই-বোন এবং এমনকি স্বামীকেও পর্যন্ত হারিয়েছেন। তাই তার গৃহে ছোটপুত্রবধূ ইরাবতীর তিন বছর বয়সী ভ্রাতৃবিয়োগের ফলে শোকপ্রকাশকে যেন বড্ড বাড়াবাড়ি বলেই মনে হচ্ছে। কারণ নিজে একসময় আছাড়ি পিছাড়ি খেলেও সংসারের হাল ধরার জন্য তাকে সবকিছু ভুলে উঠে দাঁড়াতে হয়েছে। কিন্তু ইরাবতীর তা নয়, যেন শোকের সাগরে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছে।

আনন্দ, গোবিন্দ, মুকুন্দ ও মুরারী এবং সুধালতা, স্নেহলতা এবং পদ্মলতা — একে একে প্রায়

সকলেই যেন পালা করে দ্রবময়ীকে ছেড়ে চলে যেতে লাগল। অর্থাৎ শুরু হল তার জীবনে অন্য এক পালা। গড়ার পাশাপাশি ভাঙা চললেও এখন যেন শুধুই ভাঙন চলছে। নতুন বাড়ি আনন্দভবনে আর আনন্দর প্রবেশ করা হল না, যে ছিল বটবৃক্ষের মত পুত্র এবং সমস্ত সংসার মায়ের সংসার বলে আগলে রাখত, মায়ের সমস্ত আব্দারও হাসিমুখে পালন করত — তারও মৃত্যু হল। সুধা ও স্নেহলতা তো প্রায় পাশাপাশি সেজেগুজে মায়ের কাছ থেকে চিরবিদায় নিল। আর মায়ের সামনেই পদ্মলতার সমস্ত সাজসজ্জা সবাই কেড়ে নিল এক হিমশীতল রাতে। রাতে ঘুমের মধ্যে মুকুন্দের মৃত্যু এবং দীর্ঘকাল রোগভোগের পর গোবিন্দর মৃত্যু — সকল সন্তানেরা একে একে চলে গেলেন তাদের মাকে ছেড়ে। থাকল শুধু শিবরাত্রির সলতের মতো কনিষ্ঠপুত্র মুরারী।

বয়সের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সুখবোধ, দুঃখ, শোক-ব্যথা সমস্তই গিয়ে বেড়ে উঠছে যেন শুধু ক্ষুধা আর তৃষ্ণাবোধ। প্রয়াত গোবিন্দর বৌ তাই হয়তো বলে ওঠে — "এখনো চাল কড়াই ভাজা খান কোন সাহসে মা? ধন্যবাদ দিই বাবা লোভকে।" *(পৃ. ৩৬৭, গল্প সমগ্র ৩য় খণ্ড)* আবার এও বলেন — "ছোট ঠাকুরপোর প্রাণটুকু থাকতে থাকতেও আপনার যাওয়া উচিত।" *(পৃ. ঐ, ঐ)* — "এখনো ওটুকু থাকতে থাকতে গেলে তবু আগুনটা পেতেন, তা' যা হাল হল ওর শরীরের দেখছি — সে আর হয়েছে!" *(পৃ. ঐ)*। শেষ অবধি সত্যি সত্যিই আর মুখ রক্ষা হল না দ্রবময়ীর, মুরারীকে অনেক সাহেব ডাক্তার দেখিয়েও আর বাঁচানো গেল না। এতগুলো সন্তানের জননী হয়েও তাঁকে মুখে একফোঁটা জল দেবার জন্যও কেউ রইল না।

শেষ সন্তান মুরারীর শ্রাদ্ধবাসর — প্রচুর লোকজনের আনাগোনা চলছে। দ্রবময়ী হাতে লাঠি নিয়ে এমনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বাড়িময়, মনে হয় যেন সমস্ত কিছু তদারক করছেন। অকস্মাৎ তার চোখের সামনে যেন সবকিছু কাঁপতে শুরু করে এবং তার নিজের সারা শরীরও কাঁপতে কাঁপতে একসময় মাটিতে এলিয়ে পড়েন। জ্ঞান ফিরে আসার পর দেখেন পাড়ার ভূষণ কবিরাজ তার নাড়ী টিপে দেখাশোনা করছে, তা দেখে নিরাশ গলায় বলে ওঠেন — "কে ভূষণ? সায়েব ডাক্তার আসে নি?" *(পৃ. ৩৭০, ঐ)* মুরারীকে যখন সাহেব ডাক্তার দেখতে আসতো তখন থেকেই তার মনের গোপনে একটু সুচিকিৎসার আশা রয়ে গেছে, এবার ভেবেছিলেন সেটা পূরণ হবে। দ্রবময়ীর এই যে মৃত্যুর প্রতি এক ভয়াতুরতা কাজ করে এটাই যেন সকলের দৃষ্টিকে, চিন্তাকে আহত করে। এই বোধটাকে তারা বেঁচে থাকার অপার ইচ্ছা বলে ধরে নেন। আর এই মর্মেই তাকে নানাভাবে মানসিক আঘাতও করা হয়। তাই বলেন — "বাঁচতে আর সাধ নেই... কিন্তু মরতে যে বড়ো ভয় করে বাবা ... " *(পৃ. ৩৭০, ঐ)*। একজন নারী যিনি তার সমস্ত প্রিয়জনদের হারাতে হারাতে তলানিতে এসে ঠেকেছে তারও নিজের মৃত্যুকে এত ভয়, নিজের হারিয়ে যাবার এত ভয় — এটা যেন প্রতিটি মানুষের অন্তরের সত্যকেই সর্বসমক্ষে তুলে ধরে। সত্যি সত্যিই আর বলা যত সহজ, সেই মতো

করে অন্যের জন্যে বোধহয় মৃত্যুকে বরণ করা যায় না। দ্রবময়ী কনিষ্ঠ পুত্রটিকে হারিয়েও নিজে বেঁচে থাকতে চেয়ে সেই শাশ্বত সত্যকে সকলের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন।

'স্বর্গের বারান্দায় উঠে' গল্পে লোকনাথ ও দেবারতি স্বামী-স্ত্রী। প্রায় সারাটি সংসার জীবন তারা মল্লিক বাজারের নোনা সুরকি ঝরা বাড়িতেই কাটিয়ে এলেন। তারাই আবার একমাত্র পুত্রের রোজগারে কেনা অভিজাত পাড়ার ফ্ল্যাটে উঠে এলেন। এই যে বিরাট পরিবর্তন তাকে মানিয়ে নেওয়া, এই কাজটা নারীরা চিরকাল দক্ষতার সঙ্গে করে আসছেন। এই মানিয়ে নেওয়া বা অভিযোজন ক্ষমতাই নারীদের চিরন্তন ধর্ম, এবং সেটা যত ভালোভাবে যে সম্পন্ন করতে পারবে সে তত সুখী হবে। অথচ লোকনাথবাবুই এই স্বচ্ছলতাকে যেন মেনে নিতে পারছেন না, এত আনন্দ আর প্রাচুর্যকে যেন বাধ্য হয়ে সহ্য করে যাচ্ছেন।

পুত্র অশোক সংসারের সমস্ত দায় দায়িত্বকে কাঁধে নিয়ে বাবাকে মুক্তি দিয়েছে, বিরাট এক ফ্ল্যাটবাড়ি কিনে মা-বাবা-বোনকে নিয়ে সুখী হতে চেয়েছে। বোন এবং স্ত্রীকে নিয়ে সদ্য কেনা নতুন গাড়ীতে করে মাঝে মাঝেই তারা বেড়াতে বের হয়, তখন মেয়ে ফুলটুসিকে মা-বাবার কাছে রেখে যায়। আয়া ও ঝি থাকা সত্ত্বেও, দেবারতি দেবী নিজেই সব তদারক করেন ও ঝক্কি-ঝামেলা সামলান। আর সেখানেই তার স্বামীর যত আপত্তি। মা হয়ে সংসার সামলে ও ঠাকুমা হয়ে নাতনী সামলে তিনি আনন্দ ও তৃপ্তি খুঁজে পেতে চান, কিন্তু তার স্বামী এর মধ্যে খুঁজে বেড়ান অতৃপ্তি। তার কাছে সেই মল্লিক বাজারের গলির পানের দোকান, সেই পথ বড্ড টানে। এখানে তাকে অশোক বোসের বাবা ছাড়া তার নিজস্ব পরিচয়ে কেউ চেনে না। কিন্তু আগের জায়গায় তার মস্ত কদর। সেই আকর্ষণে তিনি সেখানেই ফিরে যেতে চান। স্ত্রীর এই খাপ খাইয়ে নেওয়া তৃপ্ত মুখখানিকে তিনি কখনো কখনো আঘাতও করে থাকেন — "তোমরা আজকাল রীতিমত বড়লোক হয়ে গেছ কি বল?" আবার কখনো বলেন — "তা বেশ তো খাপ খাইয়ে নিচ্ছও। হাঁড়ি কড়া ছেড়ে ইংরেজী বাসনে রাঁধছ।" *(পৃ. ২৪২, স্বনির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্প)* তখনই শোনা যায় দেবারতির মুখে — "তা খাপ খাইয়ে নেওয়াই তো নারীর ধর্ম। খাপ থেকে বেরিয়ে পড়াই কি ভালো?" *(পৃ. ২৪২, ঐ)*। অতি পরিচিত এবং অত্যন্ত শাশ্বত সত্য একটা লঘু প্রতিবাদের সুর প্রকাশিত হয় দেবারতির কণ্ঠে। এই ক্ষীণ কণ্ঠের প্রতিবাদই হচ্ছে সমস্ত নারীজগতের অন্যতম বক্তব্য। নারীরা যদি যুগোপযোগী হয়ে মানিয়ে নিতে না পারেন তবে সমস্ত সংসার অচল হয়ে পড়বে এবং নারীর প্রতি সংসারের ও সংসারের প্রতি তার নিজের একটা ঔদাসীন্য চলে আসবে। সংসারের কেন্দ্রবিন্দুটি প্রতিনিয়তই সজীব ও মনোরম হয়ে ওঠে নারীদের সুচারু পরিচালনার মধ্য দিয়ে। তাই কি মল্লিক বাজারের এঁদো গলি, কি বহুতল ফ্ল্যাটবাড়ি সর্বত্রই দেবারতির মত নারীরা একই প্রকার, সংসার ও পরিস্থিতির খাপে খাপে তারা নিজেদের ঠিকমতো মিলিয়ে নেন। নারীদের এই দিকটি সংসারে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বহন করে।

সংসারের স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে নজর দিতে, সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে ও একটু সুখ পেতে নারীরা যে কত লড়াই করে, ত্যাগ স্বীকার করে তার জ্বলন্ত নিদর্শন হচ্ছে — 'লজ্জাশরম' ও 'ছুটি নাকচ' এর মতো গল্পগুলো। নারী শুধু দিয়েই যায় সংসার, স্বামী, সন্তানকে আপন ভেবে, তাদের নিজের একান্ত সম্পদ ভেবে বুক দিয়ে আগলে রাখতে চায়, কিন্তু বিনিময়ে জোটে শুধু লাঞ্ছনা, গঞ্জনা আর বঞ্চনা। সংসারের মতো সমাজও এদের বুঝতে চায় না।

'উদ্‌ঘাটন' গল্পে দেখা যায় মা ও মেয়ের সংসার। মেয়ে রুমা অসুস্থ, শয্যাশায়ী; বাবার মৃত্যুর পর বাবারই অফিসে তার মায়ের চাকরি — এই হচ্ছে গল্পের কাহিনি। এর মধ্য দিয়েই ফুটে উঠবে নারীচিত্তের আর এক রূপ। স্বামীর মৃত্যুতে শোকাতুরা সবিতা যেন নিথর হয়ে গেছে। তবু মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকে চাকরি নিতে হয় এবং অফিস থেকে ফিরে একটা টিউশনিও নিতে হয়। কারণ অসুস্থ মেয়ের রোগ নিবারণে চিকিৎসা ও পথ্যের প্রয়োজন পড়ে। আর রুমা সারাদিন বিছানায় শুয়ে শুয়ে মায়ের ফিরে আসার প্রহর গোণে। তার সমস্ত জগত, চিন্তা ভাবনাটা মাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হতে থাকে। তাই মায়ের কোনকিছুই তার নজর এড়িয়ে যায় না। মায়ের যে শোকবিহ্বল মূর্তি দেখে রুমা বাবার বিয়োগ ব্যথা ভুলতে বসেছিল সে মূর্তি যেন কোথায় অদৃশ্য হতে বসেছে। কারণ তার মা ধীরে ধীরে যেন এক রঙীন জগতের দিকে এগোচ্ছিল। ক্রমশঃ বাইরের কাজে এত ব্যস্ততা বেড়ে যাচ্ছিল যে, রুমার বাবার ছবিতে মালা, ধূপ দিতেও ভুলে যাচ্ছিল।

সবিতা অফিস থেকে ফিরে এসে মেয়ের পোষাক পাল্টে, তাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে, চুল বেঁধে খাইয়ে দাইয়ে নিজে টিউশনিতে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়। কিন্তু রুমা সব পাওয়া সত্ত্বেও যেন মায়ের ভেতরে ভেতরে বদলে যাওয়াটা বুঝতে পারত; আর তাই মা পিঠে ঘষে ঘষে পাউডার লাগায় — সেটা তার কাছে অসহ্য ঠেকতো। ইচ্ছে হতো, পাশ বালিশটা যদি থান ইঁট হতো তবে মায়ের পায়ে ছুঁড়ে মারতো। একটি কিশোরী কোথায় দুরন্ত গতিতে ছুটে বেড়াবে তা না করতে পেরে তাকে বিছানায় পড়ে থাকতে হয়, ভালোবাসার এক আশ্রয় বাবার মৃত্যু ও অপর আশ্রয় বিদ্রোহী করে তুলেছে। তার নিজের ওপর একটা ধিক্কার এনে দিয়েছে। একরাশ ঘৃণা নিয়ে তাই মাকে সে বলে ওঠে — "তুমি কি আর মা আছ? তুমি তো খারাপ হয়ে গেছ। নিশ্চয়ই তুমি কারুর সঙ্গে ভাব করেছ।... " *(পৃ. ২১১, স্বনির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্প)*। রুমা যেন সমস্ত রহস্যের উদ্‌ঘাটন করতে পেরেছে, আর পেরেছে মাকে আঘাত করে সমস্ত কিছুর উপযুক্ত জবাব দিতে। ধীরে ধীরে যে ক্ষোভ জমে পুঞ্জীভূত হয়েছে এ হচ্ছে তার বহিঃপ্রকাশ। স্বাভাবিক জীবনযাত্রার সমস্ত সুখ থেকে যে বঞ্চিত মনোভাব আসে, তা থেকেই এই ক্ষোভের জন্ম, আর মায়ের প্রতি আক্রোশে তা পায় পূর্ণমাত্রা। মায়ের জীবনের এই পরিবর্তনটাকে স্বাভাবিকভাবে রুমা যেন কিছুতেই মেনে নিতে পারে না।

নারী ছলনাময়ী, এই বিশেষণে নারী অভিহিত হয়ে আসছে বহুযুগ ধরে। অনেক পুরুষ

অনেকভাবে হয়তো এর প্রমাণ পেয়েছেন। তদ্রূপ **'স্বপ্নভঙ্গ'** গল্পের নায়ককেও আমরা এইরকমই কিছু বলতে শুনি। তিনিও জীবনের কোন একসময় চলার পথে এ ধরনের পরিচয় পেয়েছেন, কিন্তু কথাটা কতটা সত্য ছিল সেটাও পরে তিনি অনুধাবন করেন।

গল্পের নায়ক বা কথক বাড়ির ছোটছেলে বলে যথেষ্ট আদরে লালিত, কিন্তু রোজগেরে হবার আশায় পাড়ি দিলেন ব্রহ্মদেশে। সেখানে তার বন্ধু সুরেশ থাকে এবং ব্যবসায় সে যথেষ্ট সাফল্যের মুখ দেখেছে। বাড়ির সকলের অনুনয় বিনয় অগ্রাহ্য করে জাহাজে উঠলেন, পৌঁছলেনও বর্মা মুলুকে। সুরেশের কাছে যাবার পর পরই বিকেলে চাকুরির স্থলে সাহেবের সঙ্গে দেখা করবার উদ্দেশে বাড়ি থেকে বের হলেন। অপরিচিত জায়গা, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, টিপটিপ বৃষ্টি, কোনমতেই আর সঠিক জায়গায় পৌঁছে উঠতে পারলেন না। ফিরে আসার পথেও গন্তব্য ভুল বলে পরিগণিত হল। পৌঁছলেন এক অন্ধকার আর আলোয় মাখামাখি এক গলিঘুঁজি জায়গায়, যেখানে মেয়েরা মুখে খড়ি মেখে টিমটিমে আলোয় দাঁড়িয়ে থাকে। এর মধ্য থেকেই কানে আসে সেই মধুবর্ষী বাক্য — "আপনি কি বাঙালী?" *(পৃ. ১৫৩, গল্প সমগ্র, ২য় খণ্ড)*। এভাবেই তার বীনাপাণির সঙ্গে আলাপ হল। প্রেমের ফাঁদে পা দিয়ে সুদূর বর্মা মুলুকে আজ তাকে এই হীন কাজে ব্যাপৃত থাকতে হচ্ছে। বাঙালী পেয়ে যেন নিজের অতি আপনার জনকে খুঁজে পেয়েছে বীনাপাণি, এইভাবে তার সমস্ত আবেগ ঢেলে দিয়ে জীবনের পতনের আখ্যান শোনাতে লাগল। আর এই অবস্থা থেকে কিভাবে ধীরে ধীরে উত্থানের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে অতি সংগোপনে তার কথাও এই লোকটিকে খুলে বলল। অর্থও যে তার উত্থানের ক্ষেত্রে একটা প্রতিবন্ধকতা স্বরূপ তাও বলতে ভুলল না। সে কারণেই কোন অসহায় মানুষের রান্না করে দিয়ে, কারো কোন কিছু সেলাই করে দিয়ে, নানা উঞ্ছ বৃত্তির সাহায্যে বিন্দু বিন্দু করে কিছু টাকা সঞ্চয় করেছে। বীনাপাণি স্কুলে পড়ার সময় একজন মিশনারী মেম, মিসেস উড সেলাই শেখাতেন। আর বীনাপাণী সেই সঞ্চিত অর্থ দিয়ে মিসেস উডের আশ্রয়ে অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে যেতে চাইছে, যেখানে এসব অধঃপতিত ও পতনোন্মুখ মেয়েদেরও সামান্য আলোকিত ভবিষ্যৎ দেখাতে সাহায্য করা হয়। মিসেস উডের সঙ্গে যোগাযোগ করে যেন সমস্ত শক্তি দিয়ে আবার উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে এই অসহায়া সম্বলহীনা ভয়ার্ত মেয়েটি। সমস্ত পুরুষজাতির প্রতি এক অপরিসীম ঘৃণা নিয়ে শয়তান, রাক্ষস জাতীয় পুরুষদেরই সঙ্গদান করে আসছে সে। অনেক আশা, অনেক স্বপ্ন নিয়ে মেয়েটি বাঁচতে চাইছে, "আঃ, একবার যদি যেতে পারি মিসেস উডের আশ্রয়ে। নিশ্চিন্ত আশ্রয়, যেখানে অন্তত পুরুষ মানুষ নেই।" *(পৃ. ১৫৮, ঐ)* কি অপরিসীম ঘৃণাবোধ জন্মালে একটি নারী বলতে পারে — সে পুরুষজাতির মুখদর্শন পর্যন্ত করতে চাইছে না, চাইছে এমন কোন দেশে যেতে যেখানে পুরুষ মানুষ নেই। অবশ্য সে এই বাঙালী ভদ্রলোকটিকে সেইসব পুরুষদের থেকে বাইরে রেখেছে এবং যথেষ্ট সম্মানের সঙ্গে অতিথি সৎকার করতে চেষ্টা চালিয়ে

যাচ্ছে। বীনাপাণির প্রতি মমত্ববোধ, দয়া সব যেমন অন্তর্হিত হয়ে গেল তেমনি বীনাপানিরও পুরুষের প্রতি সামান্যতম আলোর আভাস্বরূপ বিশ্বাসটুকু হারিয়ে গিয়ে আরো তীব্র ঘৃণার জন্ম হল।

বাঙালী ভদ্রলোক এই অনাথা মেয়েটির জীবনের কাহিনি শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছিল নিজের অজান্তেই এবং সূর্যালোকের রেশ আসতেই জেগে উঠলেন। কিন্তু কথকের পকেটে পঁচিশটি এক টাকার নোট ছিল। পকেটে হাত দিয়ে দেখলেন টাকাগুলো নেই। তৎক্ষণাৎ তার মনে হল 'নারী ছলনাময়ী'। এক নিমেষে তার মনে হতে লাগল, মানুষ কত শয়তান হতে পারে, দুটো করুণ কথা, চোখের জলের সাহায্যে যে পরিবেশ গড়ে তুলেছিল তা অকল্পনীয়। আর তার ঘুমিয়ে পড়ার সুযোগে বীনাপাণি টাকাগুলো আত্মসাৎ করে নিয়েছে— এই মনে করে তিনি সারা ঘর জুড়ে জিনিসপত্র সব ওলোটপালোট করে দেখছেন। সমস্ত মমত্ববোধের পরিবর্তে জন্ম নিল এক অপরিসীম ঘৃণা। এতটুকু ছোট আস্তানায় টাকাগুলো পুঁটুলি আকারে রাখা অবস্থায় খুঁজে পেতে তার বেশি বেগ পেতে হয়নি। খুঁজে দেখলেন চব্বিশখানি এক টাকার নোট রয়েছে। একখানি নিয়ে হয়ত কিছু কেনাকাটা করতে গিয়েছে, এই ভেবে টাকাগুলো পার্সে ভরে নিয়ে রাস্তায় নামলেন এবং রাস্তাতেই পেয়ে গেলেন সেই ছলনাময়ীর সাক্ষাৎ। সে বলছে — "আপনি চলে যাচ্ছেন? মুখ ধোয়ার জন্য ভালো জল আনলাম।" উত্তরে কথক ঘৃণাভরে বলে — "যাক্, যথেষ্ট হয়েছে — ... হ্যাঁ ভালো কথা, তোমাদের ঘরে রাত্তির কাটালে দাম দিতে হয় না?" *(পৃ. ১৬০, ঐ)* এই বলে দুটি টাকা তার সামনে ফেলে দিয়ে চলে গেলেন। বীনাপাণির কোন প্রতিক্রিয়া তার আর জানবার প্রবণতা রইল না। বীনাপাণির প্রতি মমত্ববোধ, দয়া-মায়া সমস্তই যেন অন্তর্হিত হয়ে গেল নিমেষের মধ্যে। কথক যখন বীনাপাণির গৃহ থেকে বের হয়ে তার বন্ধু সুরেশের আশ্রয়ে এসে উপস্থিত হন তখন তার সমস্ত ভ্রান্ত ধারণার নিরসন ঘটে। বীনাপাণি প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে কষ্টের কথা, পথ ভুলে যাবার কথা বলার পর সুরেশ বলে — "এত কেয়ার লেস্ তুই? এতগুলো টাকাসুদ্ধু কোটটা আলনায় ফেলে চলে গেছিস?" অবাক হয়ে কথক বলে — "টাকাসুদ্ধু কোট!" *(পৃ. ১৬১, ঐ)*। এবং এরপর কথক বিমূঢ়, হতবাক চাহনি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। অর্থাৎ টাকাগুলো যে কোটের পকেটে ছিল, সেই কোটটা বাদ দিয়ে তিনি অন্য একটা কোট পরে গিয়েছিলেন এবং ভুলবশতঃ বীনাপাণির টাকাগুলোকেই নিজের ভেবে নিয়ে এসেছেন। এই সত্যটা বুঝতে পারার পর কথকের মনের অসহায় অবস্থাটা হল অবর্ণনীয়। সমস্ত অনুভূতির ঊর্দ্ধে এক বোধশক্তি রহিত জগতে যেন তিনি দাঁড়িয়ে আছেন বলে মনে হচ্ছে।

আসন্ন জ্বরের অবসন্নতায় তার মনে হচ্ছে যেন অন্ধকার গহ্বরের দিকে কাকে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে ফেলে দিলেন। — "ভয়ার্ত একখানা মুখ ..... বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টি ..... মাথা তুলিয়া তলাইয়া যাইতে থাকে ..... নীচে — আরো নীচে জাহান্নামের অতল তলায় নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে।" *(পৃ. ঐ, ঐ)*। কথক ভাবছে — একটি চরম অসহায় ভয়ার্ত মেয়ের একটু সুস্থভাবে বেঁচে থাকবার অপরিসীম

আশায় অক্লান্ত পরিশ্রম করে জমানো টাকাগুলো তার দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গ করে যাবে আজীবন। এই মেয়েটির হয়ত এই জীবনে আর উত্তরণ নাও ঘটতে পারে। স্বপ্নভঙ্গের অতলে হয়তো তলিয়ে অন্ধকার জগতেই আবার মিশে যাবে সে এবং পৃথিবীর প্রতিটি পুরুষ মানুষের প্রতি আরো নতুন করে জন্মাবে অনেক অনেক ঘৃণা আর অবিশ্বাস। জীবনে বাঁচার ইচ্ছাকেই হয়ত বলি দিয়ে বসবে একদিন।

'কঙ্কণ' (১৩৫৩) গল্পের মূল চরিত্র হল অঞ্জলি, যে একটা অফিসের অত্যন্ত সাধারণ এক কেরানীর স্ত্রী। আশি টাকা মাইনের কেরানীর বাড়িতে গ্রাম্য পরিবেশের সবুজের-সজীবতায় দারিদ্র্যের কশাঘাত ঢাকা পড়লেও গৃহাভ্যন্তরের মালিন্য কিছুতেই যেন ঢাকা পড়ে না। তথাপি তার স্বামী সুধীরের অফিসের 'বড়সাহেব' একদিন এদেরই সাদরে আমন্ত্রণ জানালেন, কারণ তিনি অঞ্জলির এক তুতো দাদা হন। বিবাহের পূর্বে মনীশের সঙ্গে অঞ্জলির সুসম্পর্ক বজায় ছিল, আর আত্মীয়তার সূত্রে এই আমন্ত্রণের প্রকাশ। 'শুভ-উপনয়ন' উপলক্ষে আমন্ত্রিত হয়ে সুধীরের অফিসে তার ওজন যেন অনেক বেড়ে গেল — এইভাবে সুধীর বেশ হৃষ্টচিত্ত।

কিন্তু অঞ্জলি এই আমন্ত্রণে উৎসাহিত তো হয়ই না বরং কিছুটা যেন বিব্রত বোধ করে। কারণ একটি মেয়ে হয়ে তিনি জানেন যে, মেয়েলী মহলে নারীত্বের গৌরবের মাপকাঠি কি। কোন নারীই কখনো স্বামীর হীন অবস্থাকে, নিজের দীনতাকে অন্যান্য সকলের সামনে সহজে তুলে ধরতে চায়না; বরং প্রয়োজনে নিজের সমস্ত সাধ আহ্লাদকে দাবিয়ে রাখে। বন্দকী ভিটে বাড়ী ছাড়াবার জন্য এক এক করে সমস্ত অলংকার স্বামীর হাতে তুলে দিয়েছিল, তাই আজ তার শুধু শাঁখা জোড়া ছাড়া আর কোন অলংকারের অধিকারিণী সে নয়। অথচ অন্যান্য সাধারণ মেয়ের মতো খোঁটা দিয়ে স্বামীর অক্ষমতা প্রমাণ করতে, কলহ করতে তার রুচিতে বাঁধে। ব্যক্তিত্বের চাদরে অঞ্জলি সমস্ত কৌতূহলকে, আবেগকে মুড়ে রাখতে পারত। আর তাই স্বামীর অফিসে যেদিন ম্যানেজার বদলী হয়ে নতুন ম্যানেজার এম. এন. চ্যাটার্জীর আবির্ভাব ঘটেছিল সেদিনটায় অঞ্জলি কেমন যেন একটু উদাস, আনমনা হয়েছিলেন। পুরানো দিনের একটু স্নেহের সম্পর্ক, ভালোলাগার দিকগুলো মনে পড়ে গেলেও আবেগকে প্রশমিত রাখতে পেরেছিলেন। সাধারণ মধ্যবিত্তদের গৃহেই কোন নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণে অভিযোগের ঝড় ওঠে, ওঠে অশান্তির কালো মেঘ, লাগে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কলহ, চিড় ধরে দাম্পত্যের শান্তির নীড়ে। কারণ নিজের পরিচয়ে পরিচিত হয়ে সমস্ত আভরণের ঊর্দ্ধে উঠবার স্তরে তারা যেতে না পেরে নিজেদের মর্যাদাকে, দম্ভকে আভরণের মাধ্যম হিসাবে প্রকাশ করতেই তারা ব্যগ্র; আর অঞ্জলি এসবেরই ঊর্দ্ধে। আর তাই শুধু নিজের জ্বলে যাওয়া হলেও অসাধারণ রূপ ও সাদামাটা পোষাকেই রওনা হয়ে যায় মনীষের সাথে।

"শুদ্ধ দুগাছ শাঁখের শাখা! জামাইবাবুর এ কুটুম্বটি আবার কোন গোকুলে ছিলেন?" *(পৃ. ১৮১,*

গল্প সমগ্র ২য় খণ্ড)

"মরণ আর কি, লজ্জাও নেই ছাই! আমাকে তো বাবা কেটে টুকরো টুকরো করলেও অমন হাড়ির হাল করে লোকসমাজে আসতাম না।"

"পাড়ার লোকের দু'খানা গয়না কাপড় চেয়ে আনলেও পারতিস ... এ যে আমাদের শুদ্ধ মুখ পোড়ানো" *(পৃ. ১৮২, ঐ)*

"এখন তোমার সংসারের ঘি দুধের মায়া কাটিয়ে কবে নড়েন দেখো! আসতে মাওরই তো সন্দেশ রসগোল্লার ছড়াছড়ি।" *(ঐ)*

নানাজনের নানাবিধ মন্তব্য দৃঢ়চেতা অঞ্জলিকে বিমূঢ় করে তোলে। কিন্তু এই অন্দরমহলই কঙ্কণের জন্য। ভরি চারেকের একজোড়া কঙ্কণ তাকে যেন নিমেষের মধ্যে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু করে তোলে, যা নাকি এই বাড়িরই কর্তা মনীশ তার হাতে দিয়েছিল সুধীরেরই পাঠিয়ে দেওয়া বলে। কিন্তু এত কৌতূহলের মুখে জল ঢেলে স্ত্রী কাছ থেকে কঙ্কণ জোড়া প্রায় জোর করে খুলে নেওয়া সবই কেমন মন্ত্রমুগ্ধের মতো ঘটে যায়।

"এসো ঠাকুরঝি, খাবে এসো। খিদে নেই? সে কি কথা, তা বললে শুনছি না ভাই, ছাব্বিশ মাইল পথ ভেঙে নেমন্তন্ন খেতে এসেছো, 'খাবে না' বললে চলে?" — *(পৃ. ১৮৩, ঐ)*। এ হেন অপমানও অঞ্জলি সহ্য করেছে। কিন্তু মনীশেরই তৎপরতায় ও চালাকিতে সে সেখান থেকে পরদিনই বেরিয়ে যেতে পারে, কারণ মনীশ অফিসে গিয়েই চলে আসে, এসে খবর দেয় সুধীরের ভেদবমি হচ্ছে তার এখনি যাওয়া প্রয়োজন। অঞ্জলিকে ঘিরে যে আগ্রহ ও কৌতূহলের জন্ম হয়েছে তা একমাত্র মনীশ বুঝতে পেরেছে এবং এ বিষয়টাও তার বোধগম্য হয়েছে যে, অঞ্জলিকে এনে কাজটা ভালো হয়নি; কারণ তাকে নানা গঞ্জনার শিকার হতে হয়েছে। তাই মনীশ নিজেই পথ আবিষ্কার করে অঞ্জলিকে ঐ পরিবেশ থেকে মুক্তি দেয়। কিন্তু বাড়ি ফিরিয়ে দিয়ে যাবার পথে পুনরায় অঞ্জলির হাতে একজোড়া কঙ্কণ দিয়ে তা রাখতে বিশেষ অনুরোধ করে। সে দেখে মনীশের আঙুলের শোভা বর্দ্ধনকারী হীরের আংটিটা আর যথাস্থানে নেই।

অঞ্জলির দুদিন পরে আসার কথা, তাই যথারীতি বাড়ির দরজায় তালা লাগিয়ে সুধীর অফিসে চলে গিয়েছে, স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে পরিণতিটা ভাববার সাথে সাথে এও ভাবছে এখন কি করবে। প্রতিবেশীর বাড়িতে চাবির খোঁজ করতে যাবে, কিন্তু তখনই নজরে পড়ল হাতের কঙ্কণের দিকে। অনুষ্ঠান বাড়ির পরিবেশে তার ভূষণহীনতা যেমন ছিল বেমানান, তেমনি আবার পাড়াগাঁয়ের পরিবেশে এই ভূষণের আধিক্য সেটাও তো বেমানান। তবে? অঞ্জলি এখন কি করবে? তার কি করা উচিত? এই কঙ্কণ জোড়া নিয়ে তার নিজের সংসারেও তো কলহের, অশান্তির ঝড় উঠতে পারে; তার পক্ষে এগুলোর মায়া কাটিয়ে সংসারকে সুখে রাখাই শ্রেয়কর বলে মনে হতে লাগল। তাই ছোট্ট

ঢিলের মতো কঙ্কণ জোড়া ছুঁড়ে ফেলে দিল সামনের পুকুরের জলে, যা ছোট্ট ঢেউ তুলে মিলিয়ে গেল। নারী শুধুমাত্র অলংকারের আবর্তে ঘুরে মরে না, নিজের আত্মসম্মান, সংসার এদেরও ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে, তাই চার ভরির কঙ্কণজোড়া পুকুরে ছুঁড়ে ফেলে দিতে একবারও হাত কাঁপে নি, এবং মন ভারাক্রান্তও হয়নি। নিজের সম্ভ্রমবোধকে বজায় রাখতে অঞ্জলিকে অনুষ্ঠান বাড়িও যেমন কাছে টানে নি, তেমনি স্বর্ণালংকারও কোন লোভের আবরণে আবৃত করতে পারে নি। অঞ্জলি হয়ে উঠেছে নির্লোভ, ত্যাগ ও সহিষ্ণুতার প্রতীক, এক সাধারণ অথচ ব্যক্তিত্বমণ্ডিত নারী, যিনি ঐশ্বর্য্যের নগ্ন অহংকার এবং দারিদ্র্যের প্রখর লজ্জার মধ্যেও ঋজু।

'অপচয়' (১৩৫৪ বঙ্গাব্দ) গল্পে ব্যক্তিত্বময়ী, স্বাধীনতা-আন্দোলনকারী এক নারীর দেখা পাওয়া গেল, যিনি বারবার বৃটিশ সরকারকে হেনস্থা করিয়েছেন। নানাবিধ আন্দোলনের মাধ্যমে অজস্র দাবী দাওয়া আদায় করে নিয়েছেন দেশের জনগণের জন্য। কয়েকবার কারারুদ্ধও হয়েছেন। তার প্রতাপে সরকার থাকত থরহরি কম্পমান, একসময় তিনি অকস্মাৎ সকলের আড়ালে চলে যান শান্তি, মৈত্রীর বাণী নিয়ে — ইনি হলেন মনীষা দেবী।

সারা দেশব্যাপী ইনি কাজ করে বেড়ান, শান্তিস্থাপনের দ্বারা সমস্ত দ্বন্দ্ব-কলহ-অসামঞ্জস্যের বিধান করে থাকেন। তিনিই একটি ছোট্ট মফঃস্বল শহরে দাঙ্গাবিধ্বস্ত এলাকায় আসছেন মৈত্রীর বাণী প্রচার করতে। মনীষা দেবী দলভিত্তিক কাজ করবেন; তার পাঠানো একটি দল উক্তস্থানে চলে আসে; আর তাদের অভ্যর্থনা করবার কমিটিতে যারা ছিলেন তাদের একজন অন্য একজন মহিলাকে মনীষা দেবী বলে ভুল করে। কিছুতেই তার এত কঠিন সমস্ত পদক্ষেপের সঙ্গে এই মহিলাটির চেহারার ছাপ, ভার, গাম্ভীর্য মেলাতে পারছিলেন না। প্রগলভা মহিলাটিকেই স্বনামখ্যাতা ভেবে, মানসিকভাবে তার নিকটবর্তী হতে পেরেছেন ভেবে যারপরনাই খুশী হচ্ছিলেন। কিন্তু সত্যকার নারীটিকে যখন দেখলেন তখন তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হলেন — এ নইলে নেত্রী হওয়া সম্ভব নয়।

মহিমান্বিত নারীমূর্তিতে বোঝা গেল, অসাধারণত্ব এদেরই সাজে। সারারাত ট্রেনের ধকল কাটাবার জন্য এদের বিশ্রামের প্রয়োজন হয় না, স্নানাহারের জন্য ব্যস্ত হন না, বরং আগে থেকে পাঠানো দলের নিকট তিনদিনের কাজের রিপোর্ট তলব করেন। "নির্ম্মলবাবু যতো তাড়াতাড়ি পারেন একটা ম্যাপের খসড়া করিয়ে দিন।... উভয় সম্প্রদায়ের কয়েকজন বিশিষ্ট লোকের নামের লিস্ট দিন দিকিন আমায়। ...আর চারদিকে প্রচার করে দিন আমাদের আসার সংবাদ।..." *(পৃ. ২৭৭, গল্প সমগ্র, ২য় খণ্ড)*। এই যে কথা বলার দৃঢ়তা, "প্রত্যেকটি কথার ওপর জোর দিয়ে পরিষ্কার উচ্চারণ করে যাচ্ছেন মনীষা দেবী, ঝরঝর করে ঝরে পড়বার মতো এলোমেলো অপ্রয়োজনীয় কথা নয়। ভালো করে কান পেতে শোনবার মতো কথা। ভুলে গেলেই সর্বনাশ!" *(পৃ. ঐ, ঐ)*। এক একটি বাক্য যেন এক একটি আদেশ, শিরোধার্য না করে উপায় নেই যেন। পরিকল্পনা করে কাজটি সারতে

নির্মলবাবুদের (কথক) যে কাজটি করত মাসখানেক লাগতো, সেই কাজটি তিনি একদিনেই সেরে ফেলেছেন; তদুপরি বলা যায় তাদের ক্ষেত্রে কাজে সাফল্য কতটা আসত তা অনিশ্চিত। গল্পের স্বল্প পরিসরের মধ্যে তিনি আবির্ভূত হলেও একজন নারীর এরূপ ব্যক্তিত্বপূর্ণ, নির্মেদ, ঋজু, গুরুগম্ভীর ভাবমূর্তি নারীজগত সম্পর্কে মানুষের প্রচলিত ধারণাগুলো পাল্টে দেয়।

'প্রস্তাব' (১৩৫৩ বঙ্গাব্দ) গল্প নারীজীবনের চিরন্তন চাওয়া-পাওয়া তথা স্বামী, সংসার, সন্তান-এর মূর্ত প্রকাশ। আটত্রিশ পেরোতে চলা মিস্ অনিমা ঘোষ নিজেকে সর্বদা ত্রিশের পরতে মুড়ে রাখেন যাতে তাকে বয়সের ছাপের নিকট হার মানতে না হয়। আর তার ভাইঝি হচ্ছেন তার সংসার জীবনের একমাত্র আকর্ষণ। তাকেও পোষাকে-আষাকে সর্বদা শিশু তথা কচি মেয়ের মতো করে রাখতে চান। সমস্তই তার ইচ্ছে মত চলছিল, কিন্তু অকস্মাৎ বাচ্চা ভাইঝিটা গোল বাঁধিয়েছে। শাড়ী পরবার গোঁ ধরেছে, শিশুর রাজত্বে বসবাসের পাট চুকিয়ে ফেলতে চায় সে।

পেশায় অনিমা ঘোষ চাকুরিজীবি; 'বেকারের বারাণসী' নামে সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টে চাকরি করেন। তার আগে কোন স্কুলের দিদিমণি ছিলেন। তিনি অফিস ফেরতা অবস্থায় সন্ধ্যে ছ'টা থেকে সাতটা পর্যন্ত নিয়ম করে প্রত্যহ পার্কে বসে একঘণ্টা হাওয়া খেয়ে যান। আজকাল দেখতে পাচ্ছেন পার্কের লোহার বেঞ্চটার উল্টোদিকের একটা বেঞ্চে একটা অল্পবয়সী ছেলে এসে বসে থাকে এবং তাকে লক্ষ্য করে ঘন ঘন তাকায় এবং তার মধ্যে যেন একটা অস্থিরতা কাজ করে। এই পরিবেশটাই একজন বয়স্কা অবিবাহিতা বিশেষতঃ অনিমা ঘোষের মত মহিলার পক্ষে যথেষ্ট। ছেলেটিই সাহসে ভর করে একসময় এগিয়ে এসে কথা বলে। আর তাতেই একজন বয়স্কা হলেও কুমারী হৃদয়ের সমুদ্রতটে যেন বিরাট বিরাট ঢেউ আছড়ে পড়ে। তিনি ভাবেন তার সমস্ত প্রচেষ্টা, বয়সকে ঢেকে রাখবার নানা পন্থা অবলম্বন করার যে সাধনা — তা আজ সার্থক। তার রূপের ছটা, তার ব্যক্তিত্ব আজ কোন না কোন পুরুষের হৃদয়ে দোলা দিয়েছে। তারও হৃদয়ের অভ্যন্তরে বিরাজিত যে বিরাট আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থেকে গেছে এবারে হয়তো তার পূর্ণতা ঘটতে চলেছে। সেই আশায় তিনি আপ্লুত হয়ে গেছেন। অর্থাৎ যে কর্মেই প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন, যতটা উঁচুতেই যাক না কেন নারীদের চিরন্তন সত্তার যে কল্যাণী বধূ ও মাতৃমূর্তিতে প্রকাশ — তা না ঘটলে কোন নারীই আত্মতৃপ্ত বা পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে না। তাই হয়তো ছেলেটির লজ্জাজনিত ব্যবহারের পরিপ্রেক্ষিতে বলেই ফেললেন — "কি? বিয়ের প্রস্তাব করতে চান — এই তো?

"বিলম্বিত প্রতীক্ষায় আর থাকতে পারেন না মিস অনিমা ঘোষ, এই সুদীর্ঘকাল প্রতীক্ষার শেষে।" *(পৃ. ৩২৫, গল্প সমগ্র, ২য় খণ্ড)*।

এহেন উৎকণ্ঠিত অবস্থায় তার আকাঙ্ক্ষিত কথাটি ছেলেটির মুখে শুনবেন বলে উদ্‌গ্রীব হয়েছিলেন, সে স্থলে তাকে কিনা শুনতে হল তারই ভাইঝি মিনাকে বিবাহ করার প্রস্তাব। এ যে তার

বুকে কতটা শেল বিঁধল তা একমাত্র সেই বলতে পারে। নিজের বয়স লুকিয়ে রাখা, ভাইঝিকে "এত শিশু আর মিষ্টি মেয়েটা" — *(পৃ. ৩২৪, ঐ)* এই হিসেবে পরিগণিত করা — সমস্ত চেষ্টা বৃথা হয়ে গেল। ভাইঝির বিয়ে হয়ে গেলে তো অনিমা ঘোষের আজীবন নিঃসঙ্গ কাটাবার জন্য যে মুষড়ে না পড়া — সেটা আর হয়তো বজায় থাকবে না। বাইরে প্রকাশ না পেলেও ভেতরে ভেতরে লালিত চিরন্তনী মানবী হয়ে ওঠার প্রচেষ্টা — স্বার্থশায়িত হবার আর কোন পথ খুঁজে পাবে না। এবারেই হয়তো ব্যর্থ নারীজীবনের জ্বালা তাকে আঁকড়ে ধরবে আর সেটাকে বোঝা হিসেবে টেনে নিয়ে যেতে হবে জীবনভোর।

নারী যে শুধু স্নেহময়ী, কল্যাণীমূর্তির আধার তাই নয়, অতিথিপরায়ণাও বটে। আর তার সঙ্গে অভিনয় করতে পারাটাও নারীর পক্ষে প্রায় জন্মগত অধিকার বলেই মনে হয়। **সভ্যতার সঙ্কট** (১৩৫৪ বঙ্গাব্দ) গল্পে দেখা যায় — সংসারে দু'জন মানুষই মন্টু আর রমা, স্বামী-স্ত্রী। টুকটুক করে দুজন মানুষের সংসার বেশ ভালোই চলছিল। অকস্মাৎ সেখানে এসে হাজির হন মন্টুবাবুর মামাতো দাদা তারক, তার স্ত্রী ও ছয়টি সন্তান এবং বাক্স-বিছানাসহ। শ্বশুর বাড়ি যাবার পথে তুতো ভাইয়ের বাড়িতে কটি দিন বিশ্রাম নিতে। আর রমার হচ্ছে সিনেমা জগতের সংবাদ রাখবার সখ। সংবাদপত্র হাতে এলেই কোন সিনেমা হলে কি ছবি চলছে, চলছিল এবং কি কি কোথায় আসছে — এ সমস্ত খবরাখবর নেওয়া। অথচ কালেভদ্রেও স্বামীর সঙ্গে তার সেখানে যাওয়া হয়ে ওঠে না। আর সেদিনই তাদের দুজনের জন্যে দুখানা টিকিট কেটে আনা হয়েছিল, বাড়ি এসে দেখেন ঘরের সামনে জিনিসপত্রের ছড়াছড়ি, আর ঘরে বাচ্চাদের চিৎকার চেঁচামেচি।

রমা দু'জনের সংসারে আলাদা করে আটজনের আদর, অভ্যর্থনা, যত্ন-আত্তি বেশ ভালোই করেছে এবং শুরুর দিনেই তাদের নিজেদের জন্যে কেটে আনা টিকিটে আত্মীয় স্বামী-স্ত্রীকে সিনেমা দেখতে পাঠিয়ে দিল। আত্মীয় বৎসলতা ছাড়াও অভিনয়ের যে কথা উঠেছে তা হল — এতগুলো মানুষকে চট করে আর কেউই খুব যে আনন্দে বরণ করে নেয় তা নয়, রমাও নেয়নি। অথচ তার বাইরের রূপ দেখে সেটা বোঝবার উপায় ছিল না। বিশেষতঃ আত্মীয়রা যদি এ ধরনের মানসিকতার হয়। যেমন — "এক ঘণ্টার কম আমার গা ধোওয়া হয় না। কি করে যে লোকের শিগ্‌গির হয়! ... হ্যাঁ, গোসলখানায় সাবান আছে তো? নতুন সাবান? আমি আবার ঘষা সাবান মাখতে পারিনে বাপু!" *(পৃ. ৩২৮, গল্প সমগ্র, ২য় খণ্ড)*। রমার ঘরের সাজানো, গোছানো অবস্থা সব ছড়িয়ে ভেঙ্গেচুরে একাকার করে এই ছেলেপুলের দল। রমার অনেক সাধের কাঁচের পুতুলগুলো সব গুঁড়ো গুঁড়ো। রাগে, দুঃখে তার চোখ ফেটে জল আসে যেন, তবুও মুখে হাসিটি টেনে এনে বাচ্চাদের আদর করে কোলে টেনে নেয়। বাচ্চাকে মায়ের অনুপস্থিতিতে দুধ খাইয়ে দিয়ে অন্যায় করা — "কলকাতার দুধের কথা আর জানতে বাকী নেই আমার। ছোট বাচ্চার পক্ষে সাক্ষাৎ বিষ!..." *(পৃ.*

৩৩১, *ঐ*)। এতগুলো লোককে আলাদা বিছানাপত্র দেওয়া নানা অবস্থার রকমারীতে রমা-মন্টুর অসহ্য ও অসহায় অবস্থা।

অথচ এদের সামনে হাসিমুখে অভিনয় করে এভাবেই সাত-সাতটি দিন চালিয়ে দিল রমা। বরং আন্তরিকতার উষ্ণতা আরো বাড়াবার জন্যে যে কথাগুলোর ব্যবহার—"কি আনন্দেই যে কটা দিন কাটলো দিদি!... আপনারা রয়েছেন, ছেলেপুলে খেলে বেড়াচ্ছে, দেখে যেন চোখ জুড়োচ্ছে!" *(পৃ. ৩৩২, ঐ)*। এমনকি বড়ো জাকে বিদায় জানাবার বেলায় কাঁদো কাঁদো হয়ে তাকে পুনরায় বারবার করে আসতে বলে দেওয়ার মধ্যে আতিথেয়তার পরাকাষ্ঠা ফুটে উঠেছে সুন্দরভাবে দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের সংসারের নারীদের এভাবেই দিনের পর দিন বহিরাগতদের সম্মুখে নিজেদের আন্তরিক উষ্ণতাকে পরম সমাদরে জাহির করতে হয়। ভেতরে স্বামী-স্ত্রীর কতই না শলা-পরামর্শ হয়েছিল তাদের তাড়াবার ব্যবস্থা করার জন্য, সামনে এসে আর তা সম্ভব হয় নি। বরং পরম যত্ন-আত্তি করে পাশে থেকে আনন্দ পেয়েছেন অনেক তাই বুঝিয়েছেন। অভিনয়ের যদি একটুও খামতি থাকতো এখানে তবেই সমস্ত সম্পর্কগুলো কোমল মূর্তির আড়াল থেকে ভয়ঙ্কর রূঢ়তা নিয়ে প্রকাশ হয়ে পড়ত।

'বাজে খরচ' (১৩৫৪ বঙ্গাব্দ) গল্পে রয়েছে অপরিণামদর্শিতার পরিণাম। যামিনীমোহন পুলিশবিভাগে কাজ করতেন, সেই সূত্রে আলো-আঁধার উভয় পথেই তার ঘরে লক্ষ্মী আসা যাওয়া করত। তার সঙ্গে যোগ হয়েছিল তার স্ত্রী সন্তোষিণীর শিথিল গৃহিণীপনা। সংসারের রাশ তৎকালীন সময়ে কর্তারা ধরে থাকলেও অন্দরমহলখানি পরিচালনার পুরো ভারটাই ছিল গৃহিনীর এবং গৃহিনীর মিতব্যয়িতা থাকলে অমিতব্যয়ী স্বামীরা অনেকাংশেই সঠিক পথে চলতেন। অবসর গ্রহণের পর শুধুমাত্র সরকারী দাক্ষিণ্যের ফলে তার সংসারে দেখা দিয়েছে অনটনের ছায়া, ছেলেরা উপায়ী হলেও সুউপায়ী কেউ নয়, যে এই সংসার সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার দায়ভার গ্রহণ করবে। স্বভাবতই সংসারে আয়-ব্যয়ের হিসেবের প্রয়োজন হয়ে পড়ে, আর সেই সকলের অপছন্দের কারণটিতে হাত লাগান বাড়ীর কর্তা নিজে।

সংসারে নানা ক্রিয়াকর্ম, ছেলেমেয়েদের বিয়েতে অজস্র খরচ এমনকি স্ত্রীর বাপের বাড়ির অভাবের সংসারের ভার চিরকাল ঘুচিয়ে এসেছেন। অথচ এই টাকাগুলো কিভাবে সংসারে আসতো সন্তোষিণী তা ভালভাবে জেনেও কোনদিন সে পথ থেকে বিরত থাকতে বা খরচের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সঞ্চয়ের পথ অবলম্বন করার কথা নিজেও ভাবেননি এবং স্বামীকে সে বিষয়ে পরামর্শও দেননি। নিজেদের চিন্তাভাবনাকে জলাঞ্জলি দিয়ে সমস্তটাই অপ্রয়োজনকেও অতিপ্রয়োজনীয় করে বাজেখরচ করে গেছেন। অথচ সকলের মুখে মুখে বাজেখরচের খাতায় আজ যার নাম উঠে এসেছে সে হল যামিনীমোহনের নিকট আজন্ম লালিত তার এক ভাগ্নের নাম। কোন উপার্জন না করে শুধু

মামীর ফাই-ফরমায়েস খেটে যায়, আর তার স্ত্রী সারা অন্দরমহলের অজস্র কাজ করে দিন অতিক্রম করে। প্রায় প্রত্যেকের চক্ষুঃশূল হয়ে (ভাগ্নে) গোবিন্দ সস্ত্রীক বাড়ি থেকে বিদায় হলে মানসিকভাবে আঘাত পেয়ে তার মামা যামিনীমোহন গত হন।

সন্তোষিণী চাইলেও তার পুত্ররা কেউ পিতার শ্রাদ্ধে বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ করতে রাজি নন, কারণ পিতা তাদের জন্য কিছু রেখে যাননি — এই আক্রোশটা এস্থলেও কাজ করলো। কিন্তু যামিনীমোহনের আকস্মিক মৃত্যুতে অত্যন্ত ব্যথিত, শোকসন্তপ্ত গোবিন্দই স্ত্রীর অলংকার বিক্রি করে মামীর হাতে সমস্ত টাকা তুলে দেয় যথাযোগ্য মর্যাদায় মামার শ্রাদ্ধ করার জন্য। সন্তোষিণী যে এতকাল দুইহাতে কতটা অবহেলায় বাজেখরচ করে এসেছেন সংসার, সন্তানের জন্য আজ তা মর্মে মর্মে অনুধাবন করতে পারলেন। সযত্ন লালিত সন্তানেরা তাদের উচিত কর্মে উদ্যোগী হল না, অথচ অযত্নে, অবহেলায় আর সকলের নিকট সংসারের 'বাজেখরচ' বলে অভিহিত গোবিন্দ মামার জন্য সন্তানের কর্তব্য করে গেল। নারীদের মধ্যে শিক্ষাদীক্ষা বেশি না থাকলেও সংসার পরিচালনা নারীর জন্মগত সহজাত অভ্যাস। যত প্রাচুর্য্যের মধ্যেই থাকুক না কেন, নিজের কার্যকলাপে সংযম ও মিতব্যয়িতা আনা অবশ্যই প্রয়োজন। কারণ তাতে অমিতব্যয়ী স্বামীও সচেতন হন এবং সংসারে ধীরে ধীরে বড় হয়ে ওঠা সন্তানেরাও মায়ের এই গুণগুলো দ্বারা প্রভাবিত হয়। আর তার ব্যতিক্রমী হলে, শিথিল হলে, সন্তানেরাও যে শিক্ষালাভে বঞ্চিত হয়, ফলে হয়ত, একদিন নিজেকেই সন্তানদের নিকটও বাজেখরচের খাতায় চলে যেতে হয়।

নারীরা চিরকাল স্বামী-সন্তান নিয়ে সুখের সংসার করতে ভালোবাসে। হাজারো কাজের ঝামেলায় নিজেকে জড়িয়ে রেখে একপ্রকার নিশ্চিন্ত জীবন কাটায়। জীবনে অনিশ্চয়তা, দ্বন্দ্ব, টানাপোড়েন এদের খুব একটা ঘটে না, বরং এর চেয়ে বেশি ঘটে যতটা ঘটে এর-ওর কথা নিয়ে অন্দরমহলের ঝড় এবং ঘূর্ণাবর্ত। এর মধ্যেই নারীর মধ্যে থাকে সমুদ্রের মতো অতলান্তিক ভালোবাসা, স্নেহ ও প্রেম। সংসারের কর্তব্যকর্মের টানাপোড়েন শুধু নয়, স্নেহ, প্রেম নিয়েও নারীকে কখনো চরম দোলাচলতায় পড়তে হয়। তাই এক জটিল টানাপোড়েনের মুখোমুখি হয়ে এক নারী তার সমস্ত বোধশক্তি যেন হারিয়ে ফেলতে বসেছে। তাকে কতটা জটিল আবর্তে পড়তে হয়েছে সেটাই আশাপূর্ণা দেবী 'দ্বন্দ্ব' (১৩৫৪ বঙ্গাব্দ) গল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন। কমলা টাইফয়েডে ভুগে ভুগে এতটাই অসুস্থ হয়ে পড়েছে যে, ডাক্তারের পরামর্শ মতো তার স্বামী মনোজ স্ত্রী-পুত্র নিয়ে বায়ু পরিবর্তনে আসেন।

কোলকাতার একটি বাড়িতে অনেক লোকের বাস, সুস্থির ভাবে নিঃশ্বাস ফেলবার সময় নেই। আর তারা যেখানে এসে উঠেছেন সেখানে মুক্ত বাতাস, খোলামেলা জায়গা দেখে কমলা যেন এক অবোধ শিশু হয়ে উঠেছে। তার মনে হচ্ছে সে যেন এখানে এসেই হৃত শক্তি ফিরে পাচ্ছে। স্বামী আর

সন্তানকে নিয়ে ছোট্ট সংসার, নিশ্চিন্ত জীবন আর একচেটিয়া গৃহিণীপনা করতে পেরে, স্বামীকে সর্বক্ষণ একান্ত নিবিড়ভাবে কাছে পেয়ে একেবারে যেন পাগল-পারা হয়ে উঠেছে। এত সুখের মধ্যেই ধীরে ধীরে তার জীবনে নেমে আসে বিরাট অগ্নিপরীক্ষা। কোলকাতা যাবার দিন এগিয়ে আসতে থাকে, সহসা একদিন খোকন কেমন যেন ঝিম্ মেরে গেল, ধীরে ধীরে তাকে জ্বর এসে গ্রাস করে। সেদিনই রাতে কমলার স্বামীও জ্বরে আক্রান্ত হল, সঙ্গে গলাব্যথা — ডিপ্থিরিয়া। এমতাবস্থায় একা একটি নারী বড্ড অসহায় বোধ করে — "কলকাতার বাড়ির সেই অবান্তর মানুষগুলোও এখন যেন রীতিমত দামী হয়ে উঠেছে কমলার মনের কাছে।" *(পৃ. ৩৭২, গল্প সমগ্র, ২য় খণ্ড)*। যে নিকটজনদের ছেড়ে এখানে এসে যে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল। সেই লোকগুলোই যে নিরাপত্তার কত বড় আশ্রয় এখন সে মর্মে মর্মে অনুভব করছে।

সেদিনই মনোজের সঙ্গে পরিচিত হওয়া এক ডাক্তারকেই ভরসা করতে হল, তিনি গৃহকর্তার ডাকে চায়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসেছিলেন। এমতাবস্থায় দিশেহারা হয়ে নবপরিচিত ডাক্তারবাবু বহু দুষ্প্রাপ্য ঔষধ ক্রয়ের জন্য শহরে ছুটে যান। এসে দেখেন উভয়েই চূড়ান্ত অবস্থায় গিয়ে উপনীত হয়েছে। দুজন রোগী, ঔষধ একজনের; ডাক্তার এবার সিদ্ধান্তের দায় চাপালেন কমলার ওপর — "একজনের জন্যে শেষ চেষ্টা দেখতে হবে — বলুন কাকে দেব?" *(পৃ. ৩৭৪, ঐ)*। একজন একাধারে স্ত্রী ও মা — সত্যিই কি এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারে? কোন নারী এ পরিস্থিতির মুখোমুখি হলে তার পক্ষে কখনো কি সিদ্ধান্ত দেওয়া সম্ভব? স্বামীর প্রয়োজনীয়তা কতটুকু তার পরিমাপ করে ঔষধ প্রয়োগ, যার ওপর নিমেষে অভিমান করা যায়, যাকে নিবিড় করে পাবে বলে চলে আসা শহরে, লোকালয়ের বাইরে এই গ্রামের নির্জন এক কোণে — তাকে ছাড়া বাকী দিনগুলো ভাবা যে অসম্ভব। আর সন্তান দেহ-মনের ভালোবাসার নির্যাস। তার ক্ষেত্রেও তো হিসেব-নিকেশের কোন বালাই থাকে না। নারী তো আবর্তিতই হয় এই দুটি কেন্দ্রকে পরিভ্রমণ করে। এদের সেবায় পরিচর্যায়ই তো তার সমস্ত সুখ-দুঃখ-বেদনা-আনন্দ — সর্বোপরি সমগ্র জীবনটা ব্যয়িত হয়ে থাকে। যে অন্তঃপুরের নারী এতদিন অন্দরমহলের ঘেরাটোপে বড় হয়েছে, যে স্বামীর পক্ষপুটে আশ্রয় নিয়ে আদরে সোহাগে নিজের সত্ত্বা ভুলে তার সঙ্গেই লীন হয়ে গেছে — সে তো কোমল প্রাণ এক নারী মাত্র। আর তার সন্তান — যে মধুর 'মা' ডাকে জগত ভুলিয়ে দেয়, যে অসহায় শিশুর প্রধান অবলম্বনই হচ্ছে মা, মা কি কখনো তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে। জীবনের এই কঠিনতর ক্ষণ যে কোন নারীর পক্ষেই ভয়াবহ, ভয়ানক। তবু তাকে মতামত দিতে হবে, বাধ্য হয়ে। উপায়ান্তর না পেয়ে পাগল পারা অবস্থা হলেও তাকে মত দিতে হল, মাতৃত্বকেই তিনি জয়ী করতে চাইলেন।

কিন্তু কি পেলেন কমলা? কাউকেই নয়, স্বামী ধীরে ধীরে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করছে দেখে সইতে না পেরে দ্বিতীয় বার যখন ডাক্তারবাবু ছেলেকে ইন্‌জেক্‌শন দিতে প্রস্তুত হলেন কমলা তখন তার

হাত চেপে ধরল — "ডাক্তারবাবু আমায় ক্ষমা করুন, একে দেখুন, বাঁচিয়ে দিন আমার স্বামীকে — আপনার পায়ে পড়ছি ডাক্তারবাবু, রক্ষা করুন আমার স্বামীকে, আমার স্বামীকে! ছেলে চাই না আমি — ওকে ভগবানের হাতে ছেড়ে দিন।" *(পৃ. ৩৭৬, ঐ)*। উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায় পড়ে বিরক্ত ডাক্তারবাবু দেহাতি সাঁওতাল মেয়েটি যে কমলার সঙ্গে ছিল এতক্ষণ তাকে বলে — "পাগলের প্রলাপ শোনবার জন্য আমি এখানে আসিনি। — এই এঁকে পাশের ঘরে নিয়ে যা।" *(পৃ. ঐ, ঐ)*।

ডাক্তারবাবু চেষ্টার শেষে খোকনের জন্য আশ্বাসবাণী দিয়ে গেলেন, আর চেষ্টায় থাকবে মনোজ তা জানিয়ে গেলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সাঁওতালী মেয়েটা বন্য জন্তুর মত চিৎকার করে উঠল — 'ই-ইয়ে — মাইজী, বাবু মরগেই" —। কমলা ছেলের কাছ থেকে ছুটে এসে দেখল প্রাণহীন দেহটাকে, বাক্‌রোধ হয়ে গেল তার। কিন্তু এত লড়াই করে বাঁচানো তার ছেলেটাও নিথর হয়ে গেল — কোলের ফুল-লতা কাটা ভারী কাঁথাটা ছুটে আসার সময় কোল থেকে ছিটকে ছেলের নাকে মুখে পড়ে শ্বাসরোধ হয়ে গেছে। জীবনের হিসেব নিকেশের বাইরে এসব ঘটনা মানুষের জীবনে অন্তিম পরিণতি ডেকে আনে, বিশেষত নারীদের ক্ষেত্রে। পুরুষরা আবার নতুন করে জীবন আরম্ভ করতে পারে, দুঃখ ভুলতে চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু নারী? কমলা? জীবনের সমস্ত মূলধন, আশা, আশ্রয়, ভালোবাসাই তো চলে গেল। আমাদের সমাজে তার ঠাঁই কোথায় তা সহজেই অনুমেয়।

'সত্যাসত্য' (১৩৫৩ বঙ্গাব্দ) গল্পটি নারী চরিত্রের কয়েকটি দিক বিকশিত করেছে। রাধারানী বিভূতির স্ত্রী, যারা বাড়ি ভাড়া দিয়েছিল। ভাড়াটে হিসেবে এসে ঢুকেছিল অমল ও তার স্ত্রী অরুণা; আর এই সুসম্পর্কের মাঝে ভগ্নদূতের মতো হাজির হলেন অরুণার দিদি। রাধারানী বন্ধ্যা, দুজনের সংসার সর্বদা টিপটাপ করে শুধু সাজিয়ে গুছিয়ে আর রান্নাবান্না করেই কেটে যায়। তাদের নীচতলায় দুটো ঘরে বিভূতির অফিসেরই অধস্তন কর্মীকে ভাড়া দেওয়া হয়েছে। সন্তান সম্ভবা অরুণাকে পেয়ে রাধারানী নিমেষে যেন ভুলে গেলেন তাদের সম্পর্কটা, ভালোবেসে বুকে টেনে নিলেন। এমনকি কিছুদিন বাদের ভাবী মাকে রান্না থেকে পর্যন্ত ছুটি দিয়ে দিলেন অথচ হিসাব নিকাশের এত যেন বালাই নেই। স্বামীর কথায় তিনি বলেন — "আমি অত হিসেব নিকেশের ধার ধারি না। আপনার লোকের সঙ্গে আবার হিসেব! মাসী-পিসির পেট থেকে না পড়লে সে আর আপনার হয় না, কেমন?" *(পৃ. ৯৮, গল্প সমগ্র, ২য় খণ্ড)*। আসলে অমলের দেওয়া টাকা পয়সা তিনি সঞ্চয় করে অরুণাকে সাধের সময় চুড়ি দেবেন বলে ঠিক করে রেখেছেন। আর অরুণার মনোভাবটিও আমরা পাশাপাশি দেখলে বুঝতে পারবো পার্থক্য কতটা — "দাদাকে তুমি বিভূতিবাবু বল কেন অরুণা? তোমাদের সেই 'বট্‌ঠাকুরপো' না কি যে বলতে হয় ভাসুরকে" — অমলের এই প্রশ্নের উত্তরে অরুণা বলে, "দিদির সামনে তাই বলি, সত্যি তো আর ভাসুর নয় যে নাম করতে নেই?" — *(পৃ. ৯৮, ঐ)*।

এই উক্তিগুলো অতি সহজেই দুজন মানুষের মনের অবস্থাটিকে স্পষ্টরূপে চিত্রিত করে তোলে। শুধু একটি অনাগত শিশু কিভাবে রাধারানীকে আপন পর সব ভুলিয়ে দিলো, যেন নিজেরই দায়, দায়িত্ব সহকারে তা পালন করা কর্তব্য আর এতটা আন্তরিকতার মুখেও, এত সেবা, অভিভাবকদের মতো দেওয়া আশ্বাস, নিশ্চিন্ত আশ্রয় পেয়েও অরুণার আপন পর বিচার করতে বসা কেমন যেন বেমানান। বাড়ীর সবচেয়ে ভালো ঘরখানাকে (দোতলায়) আঁতুর ঘর করা, সময় মতো অরুণার যত্ন করা, অনাগত শিশুটির মুখ দেখবার জন্য অমৃতি পাকের বালা গড়ানো, বিভূতিকে 'মুখ দেখানি' তে গিনি দেবার কথা বলা — এসবের মধ্যে কখনো আপন পর ভাব থাকতে পারে না, থাকলে মনটা এত উদার হওয়া সম্ভব হোত না। নিজের জীবনের অসম্পূর্ণ দিকগুলো এদেরকে কাছে টেনে নিয়ে পরিপূর্ণ করে তুলতে চায়। অরুণার মনের ভেতরে একটু আপন পর ভেদ থাকলেও বাইরে তার প্রকাশ ছিল না।

এত সুন্দর সংসারে অকস্মাৎ এসে আবির্ভূত হলেন এক ভগ্নদূত — অরুণার দিদি, যিনি বিপদের দিনে পাশে এসে না দাঁড়ালেও এখন বেশ উৎসাহের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছেন। আঁতুরের সময় এসে দুটো টাকা দিয়ে বাচ্চার মুখ দেখে বোনের কানে রাধারানীর সম্পর্কে বিষ ঢেলে গেলেন। আর যেহেতু অরুণার আগে থেকেই দোলাচল চিত্ততা ছিল তাই খুব সহজেই তা গ্রহণীয় হল। যত দিন যেতে লাগলো অরুণার দিদির যাতায়াতও বাড়তে লাগলো এবং সংসারেও জটিল আবর্ত শুরু হতে থাকল। আর তা চূড়ান্ত রূপ ধারণ করলো অরুণার নামে কাটা লটারির টিকিটের টাকাটা পাবার পর। অথচ তখনও দেখা যায় রাধারানী এদের আপনার জন বলেই ভেবে যাচ্ছে, যেমন — "সত্যি যে আবার লটারীতে টাকা পাওয়া যায় — এমনি নিজের লোকদের নামে প্রাইজ ওঠে, কক্‌খনো শুনিনি কিন্তু! তুমি কখনো কাউকে পেতে দেখেছ ঠাকুরপো? অরুণা শুনেছিস? *(পৃ. ১০২, ঐ)*। এতটা আবেগ জড়ানো উষ্ণ হৃদয়ের ওপর কৃতঘ্নতা ও অবহেলার ধুলো ছুঁড়ে দিয়ে অরুণা তার দিদি-জামাইবাবুর দেখে দেওয়া আশী টাকা ভাড়া দিয়ে আস্ত একখানা বাড়িতে গিয়ে উঠলো।

কিন্তু অমল? না, সে যায়নি, এই বাড়িটাকেই সে নিজের বাড়ি বলে ভেবে নিয়েছে, তাছাড়া ওপরওয়ালার সঙ্গে বচসার জেরে বিভূতিবাবু চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। এমতাবস্থায় দাদা বৌদিকে ছেড়ে যাবার কথা সে ভাবতেই পারে না। যেদিন অরুণারা চলে যায় সেদিন নতুন বাড়িতে রাতে পৌঁছায়, কিন্তু থাকতে নয়, বাড়িঘর কেমন সাজানো হল দেখতে। অরুণা আর তার দিদি সম্মিলিতভাবে যে ঘরবাড়ি সাজিয়ে তুলেছে, সেখান থেকে অমল নিজের বিছানাটা উঠিয়ে নিয়ে আসতে চায়। আর স্বামীকে ছাড়া তো সংসার হতে পারে না, তাই অরুণা প্রশ্ন করে — "তুমি তাহলে এ বাড়ীতে থাকবে না? অমলের উত্তর — "আমি? পাগল হয়েছো? সত্তর টাকার কেরাণী, আশী টাকার বাড়ীতে বাস করলে গায়ে ধুলো দেবে যে লোকে!" — *(পৃ. ১০৫, ঐ)*। অর্থাৎ যে

স্ত্রী এত সুন্দর একটা সম্পর্ক এবং বিশেষ করে যখন হন্যে হয়ে অমল বাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছিল সেই বিপদের দিনে পাশে দাঁড়িয়েছে, যারা তাদেরকে ছেড়ে চলে আসতে পারল সেই স্ত্রীর টাকা পয়সাকেও আর নিজের বলে ভাবতে পারছে না। আশাপূর্ণা দেবী দেখাতে চাইছেন কল্যাণী নারী মূর্তির পাশাপাশি সংসার ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দেবার মতো নারীরাও যে যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে, তাই তো সংসার মাঝে মধ্যে অসার বস্তু বলেও পরিগণিত হয়।

'দাসত্ব' (১৩৫৫ বঙ্গাব্দ) গল্প প্রমাণ করে অন্তঃপুরচারিণী নারীরা সর্বদাই মুক্তির আকাশ দেখতে ভালোবাসে। সামান্য একখানি ঘর নিয়ে তাদের সংসার — প্রভাত, শুভ্রা, নীলু, বেলু আর খোকন। গ্রামের পুরানো ধ্বসে পড়া বাড়িটা ছেড়ে অনেকদিন হল কোলকাতা শহরে এই দোতলার ফ্ল্যাটটায় চলে এসেছে। শহরে বিজলি বাতি, কলের জল, রেডিওর গান এবং তার সঙ্গে ঈশ্বরের দান মনে করে শুভ্রা ঘরের সংলগ্ন ঝুল বারান্দাটাকে। যা নাকি বারান্দার পকেট সংস্করণ, আর যেখানে এলে শুভ্রা সমস্ত কিছু ভুলে যায়। "গভীর রাত্রে — চাঁদ উঠলে অথবা না উঠলে, ... শিশির ভেজা ভোরে কিংবা রোদে পোড়া ভর দুপুরে, মেঘলা আকাশের ম্লান ছায়ায়, কি পড়ন্ত বিকেলের সোনালীর আলোয় — সব সময় সমান ভালো।" (পৃ. ১৮, ৩য় খণ্ড) এই বারান্দাখানায় দাঁড়িয়েই শুভ্রা নিজেকে রাজরাণী ভাবে। বিপরীত দিকের বাড়ীগুলো দেখতে, রাস্তায় হাঁক দিয়ে চলা ফেরিওয়ালাগুলোকে ডেকে ফেলতে যেন কোন আপত্তি নেই। সে না খেয়ে থাকলেও সারাদিন অজস্র কাজ করলেও সমস্ত ক্লান্তি যেন এই বারান্দাটাই টেনে নেয়। বারান্দার প্রতি প্রবল আকাঙ্ক্ষা আমরা দেখেছি আশাপূর্ণা দেবীর 'ট্রিলজি'র ২য় খণ্ড 'সুবর্ণলতা'য়। নায়িকা সুবর্ণ তার স্বামী প্রবোধের কাছে নতুন বাড়িতে এই রকমই একফালি বারান্দার জন্য হা-পিত্যেস করেছিল।

যে মানুষটা সারাদিন কলের পুতুলের মতো পরিশ্রম করে সংসারের জন্য, তাকেই কিনা এই সুখটুকু, যা তার নিকট স্বর্গসুখ, বলে মনে হয় সেখান থেকে বিচ্যুত করা হবে। কারখানায় ছাঁটাই হওয়া কর্মীদের দলে প্রভাত পড়েছে, তাই খরচ কমাবার জন্য স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সব গ্রামের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়ে সে নিজে একটা সস্তার মেসে গিয়ে উঠবে ভেবেছে। শুভ্রার কোন কথায় যখন কাজ হবার নয়, তখন সে ভাবছে এই একান্ত ব্যক্তিগত শখটুকুকে বাঁচিয়ে রাখা যায় কিভাবে। যে কোন কিছুর বিনিময়েই যেন শুভ্রা এই সাধের জায়গাটুকু ছাড়তে চায় না। সে তাই নিজেই রোজগার করবার জন্য সচেষ্ট হয়। যেখানে চাকুরিজীবীদের চাকরি চলে যাচ্ছে, সেখানে নতুন করে চাকরির চেষ্টা যে প্রায় হাস্যকর তা আবার মাধ্যমিক পাশ করে — তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তবুও অনেক সাধ্য সাধনার শেষে তা সে পেল, কিন্তু অফিসে নয়। একটি বাড়ির গৃহিণী শয্যাশায়ী — তার সংসার, সন্তান দেখা শোনার কাজ করা। পারিশ্রমিক হিসেবে পাবে একশত টাকা, প্রবোধও সারা মাস কাজ করে যা পেত। বিনিময়ে সমস্ত স্বাচ্ছন্দ্যগুলোকে সে বজায় রাখতে পারলো, পেরেছে

গ্রামে ফিরে যাওয়া আটকাতে, আর তার একান্ত নিজস্ব জগৎ, তার প্রাণের আরামের জায়গা সেই বারান্দাটি — এটাও তো বজায় রাখতে পেরেছে। শুভ্রার মধ্যে আমরা একটি নারীর মানবী হয়ে ওঠা দেখতে পাই। যে নাকি আপনার পছন্দকে ভালোলাগাকে সংসারের হাজারো কাজের মধ্যে পিষে মেরে ফেলেনি। যাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য সে আজ পথে বেরিয়েছে। নিজের সংসারের কাজগুলোকে নিপুণ হাতে গুছিয়ে রেখে আবার রোজগারের জন্য ঘরের বাইরে পা রেখেছে। অর্থাৎ অন্দরমহল-বহির্মহল তার নিকট সমান গুরুত্ব পেয়েছে। মানুষ যে ক্রমাগত অভ্যাসের দাস হয়ে ওঠে এটা তারও একটা প্রমাণ।

কিন্তু যে সাধটুকুকে বাঁচাবার জন্য এত লড়াই, সেটাই এক ফুৎকারে নিভে গেল। যেদিন একমাসের আগাম মাইনে নিয়ে কাজে যোগ দিল সেদিনই দেখতে পেল তার মনিবানী, অসুস্থা মহিলাটিকে দেখতে এসেছেন তাদের সামনের বাড়ির ডাক্তারের বৌ।

— "ও মা আপনিই কাজে লেগেছেন এখানে। আমাদের সামনের বাড়ীতে থাকেন না। দোতলার ফ্ল্যাটে বুঝি?" — *(পৃ. ২২, গল্প সমগ্র, ৩য় খণ্ড)*। কিন্তু না, একথার জন্য শুভ্রা কাজ ছেড়ে দেয় নি; ছেড়েছে শুধু ওই বারান্দাটা, যাকে কেন্দ্র করে তার এত লড়াই। সে আজকাল কোনরকমে শুধু রিক্সায় গিয়ে বসে কাজে যাতায়াতের ক্ষেত্রে। তার পোষাকে এসেছে পারিপাট্য, কিন্তু সেটা কাউকে দেখানোর আর প্রয়োজন মনে করে না, আগে যেটা করতে সে ভালোবাসত। শুভ্রার আত্মসম্ভ্রমবোধ যথেষ্টই আছে, আর সেই বোধটাই তাকে কর্মপ্রেরণা যুগিয়ে গেছে। সংসারের হাল ধরা, সন্তানদের মুখের হাসিটুকু বজায় রাখা, নিজের শখ চরিতার্থ করা — এর জন্য যে মানসিক শক্তির অধিকারী হওয়া প্রয়োজন, তাই শুভ্রা সময় ও পরিস্থিতির প্রভাবে আয়ত্ত করতে পেরেছে। সে আজ আর শুধু অন্তঃপুরচারিণী নয় জীবন সংগ্রামে লড়াকু একজন মানুষ।

'অপরাধ' (১৩৫৫) গল্পে নারীর কল্যাণী মূর্তি প্রকাশিত হয়েছে কিভাবে তা দেখা যাক্। কল্যাণী ও পরেশের সংসারে লক্ষ্মী দেবীকে নিয়ে সর্বদা টানাপোড়েন চলতে থাকে। অভাবের আনাগোনার মধ্যে শুধুমাত্র মাসের তারিখ গুণে খেয়ে পরে তাদের বেঁচে থাকা চলে। কারখানায় সামান্য বেতনের কাজ করে পরেশ, গুটিকয়েক ছেলেমেয়ে রয়েছে। স্বাচ্ছন্দ্য বলে যে শব্দ ও তার অর্থ — তার সঙ্গে পরিচিত নয় পরেশ কল্যাণীর সংসার। ন্যূনতম প্রয়োজনটুকু মেটাতেই তাদের হিমসিম খেতে হয়, সাধ করে বাছাদের হাতে কিছু তুলে দেবেন তা আর সম্ভব হয় না। এমতাবস্থায় পরেশের খুড়তুতো ভাই নীরেন পত্র মারফৎ জানিয়েছে তিনি সাহিত্য সম্মিলিনী সভায় যোগ দিতে আসছেন বলে তার 'নতুন দা'র অর্থাৎ পরেশের বাড়িতেই তিনি উঠবেন।

এই সংবাদ অবগত হবার পরই তাদের স্বামী-স্ত্রীর হর্ষের চেয়ে বিষাদে মন পরিপূর্ণ হয়ে আছে। কারণ যিনি আসছেন তিনি আজন্ম সুখে বিলাসে লালিত। অভাবজনিত দুঃখ কাকে বলে তিনি

জানেন না। তাদের চালচলন ও জীবনযাত্রা সম্পর্কে উভয়েই যা জানেন তা হল — "ও বাড়ীর কাকার বাড়ী গিয়েছি তো দু'একবার — নতুন বৌ ছিলাম যখন। কি সুন্দর বাড়ি! কি চমৎকার সাজানো! কত গয়না খুড়িমার!" কল্যাণীর এই উক্তির উত্তরে পরেশ বলে

— "তেমনি কি সুন্দর অহংকার। কি চমৎকার লম্বা চাল! নতুন খুড়ি আমাদের মা জেঠিমার সঙ্গে ভাল করে কথাই বলতেন না, বুঝলে?" *(পৃ. ৫৩, গল্প সমগ্র ৩য় খণ্ড)*। সুতরাং এদের সামনে নিজেদের একটু ভদ্রস্থ প্রতিপন্ন করতে গেলে তো বালিশ-বিছানা ছেলেমেয়েদের জামা-কাপড় বাসন-কোসন এমনকি অতিথি আপ্যায়নের জন্য খাবার দাবারেও বেশ ভালোরকম প্রলেপ লাগাতে হয়। কিন্তু এতে যে তাদের আকণ্ঠ ঋণে ডুবে যেতে হবে। এসব ভাবনার মধ্যেই নির্দিষ্ট সময়ের কিছু আগেই নীরেনবাবু এসে উপস্থিত হন।

ভদ্রলোকের বাড়ি অতিথি এলে যেভাবে সাধ্যমতো আতিথ্য করা সম্ভব তা চালিয়ে যায় সব মিলে। এর পাশাপাশি অতিথিও তার নিজের মতো করে চালচলন বজায় রাখেন। অর্ধেকটা রসগোল্লা খেয়ে বাকী অর্ধেকটা জলে ডুবিয়ে দিচ্ছেন; আবার অনেক কষ্টে কিনে আনা ও বহু যত্নে রান্না করা পদটা অনায়াসে পাতের বাইরে ফেলে দিচ্ছেন, খাঁটি ডালডায় ভাজা মুখরোচক কিছু খাবার হয়তো তার অপছন্দ বলে উঠোনে ছুঁড়ে মারছেন। এ সমস্ত হামেশাই চলছে; আর এসব দেখে স্বামী-স্ত্রীর হৃদয় ভেতরে ভেতরে যেন হাহাকার করে উঠছে। যে বস্তুগুলো তাদের সন্তানদের নিকট দুর্লভ বস্তু তার এত অপচয় সহ্য না হবারই কথা। অতিথি কিন্তু নিজের মর্যাদা বজায় রাখবার জন্য ছেলেমেয়েদের প্রচুর খেলনা উপহার দিয়েছে, কল্যাণীর জন্য দামী একখানা শাড়ী কলকাতা থেকে কাজ সেরে আসার সময় নিয়ে এসেছে। এমন সোনালী জড়ির তাবিজ পাড় টাঙাইল শাড়ী কল্যাণী অনেকদিন পরতে পায়নি। কিন্তু অতি সহজে হাত পেতে গ্রহণ করতে তার বাধে, অনেক জোর করার পর তা তাকে নিতে হল। কিন্তু অন্দরমহলের আতিথেয়তার স্রোতকে বইয়ে নিয়ে যেতে পরেশ আর রাজী নয়, একপয়সাও সে আর ধার করতে রাজী নয়। কিন্তু তা বললে চলবে কেন? কল্যাণী বিরাট এক লিস্ট ধরিয়ে দিয়েছে, মানরক্ষার জন্য এগুলো না আনলেই নয়। এ কয়দিন মাঝেমধ্যেই সকলে মিলে একটু হৈ হৈ করে আশেপাশে বেরিয়ে পড়া — এই করে যথেষ্ট আনন্দেই কাটালো সকলে মিলে, যেন একটু মুক্তির বাতাস, আনন্দ উপভোগ করল কল্যাণীরা সকলে।

নীরেন যাবার আগের দিন ঘটল সেই ঘটনা। কল্যাণী বুঝেছে সে নিজে যদি কোন কাজে হস্তক্ষেপ না করে তবে হয়তো এই ঋণের জের অনেকদিন ধরে তার সংসারকে দিয়ে যেতে হবে। তাই তার 'রাঙা ঠাকুরপো' দালানের আলনায় রাখা সিল্কের পাঞ্জাবীটা পরতে গিয়ে দেখে পাঞ্জাবী থাকলেও তাতে পরানো ছিল নীরেনের বিয়ের আশীর্বাদী সোনার বোতাম, সেটি নেই। অথচ এ বাড়িতে কোন ঝি-চাকর নেই। সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজেও পাওয়া যায় নি। নীরেনের চেয়ে

বেশি খুঁজেছে পরেশ, গুম্ মেরে বসে থাকা নীরেন একসময় বলে ওঠে — "জানতাম পাওয়া যাবে না, মিথ্যে খাটলে।" *(পৃ. ৫৯, ঐ)*।এতে পরেশের আত্মসম্মানে লাগে, এ নিয়ে ভাইয়ে ভাইয়ে তর্ক হয়, স্ত্রীর সঙ্গে পরেশের বচসা হয়। পরেশ কল্যাণীকে বলে — "কাল যে বত্রিশ টাকা দিলে — কোথায় পেয়েছো সে টাকা? *(পৃ. ৬০, ঐ)*। সন্দেহ ক্রমশঃ ঘনীভূত হতে হতে নিজের মৃত্যুকামনায় গিয়ে ঠেকে, আর এ অবস্থাতেই কারখানায় ছোটে পরেশ, কল্যাণী নিথর।

নীরেন চলে যাচ্ছে, কাউকে কিছু না বলে পরেশের অনুপস্থিতিতে বাড়ি থেকে বের হবে। তার পকেটে আছে সেই কাগজ যা পরেশের চিরুণী তল্লাশীর সন্ধানে বের হয়ে পড়েছে — স্যাকরার হিসেব। বিক্রীত বোতাম জোড়ার হিসেব, বাকী কিছু টাকা রয়ে গেছে বলে স্যাকরার হিসেব লিখে দেওয়া কাগজখানা নতুন বৌদি কল্যাণীর হাতে ধরিয়ে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। দু'কথা শুনিয়ে দেওয়া দূর অস্ত, ডাক দেবারও শক্তি হারিয়ে ফেলেছে যেন নীরেন। ওই মুখটাতে যেন রয়েছে লজ্জা, ভয়, ঘৃণা, কষ্ট সহ্য করতে করতে নিথর হয়ে যাওয়া সর্বংসহা এক প্রতিচ্ছবি। সংসারের হাল তো এই নারীদেরই ধরতে হয়। সন্তানদের ক্ষুধার্ত মুখ, অতিথি সেবার তৎপরতা ও আতিথেয়তা রক্ষার সম্ভ্রম বজায় রাখা ও তার সঙ্গে সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম স্বহস্তে করা — এসব করতে গিয়ে নিজের কোন অস্তিত্ব কি তাদের আর থাকে? নিজের ভালোলাগা, ভালোবাসা, ক্ষুধা-তৃষ্ণা সর্বোপরি নিজের অবস্থান সম্পর্কেই যে এরা বোধশক্তিরহিত হয়ে থাকেন। এই সংসার যন্ত্রটিকে সর্বকুলমান রক্ষা করে চালিয়ে নিয়ে যেতে যে কাজ কল্যাণীকে করতে হয়েছে, একজন গৃহস্থ ঘরের বৌ-এর পক্ষে এ যে কত বড় কষ্টদায়ক — এটা নীরেন হৃদয়ঙ্গম করতে পেরে নিঃশব্দে চলে যায়। ধ্বংসের ইতিহাস আঁকা সেই আনত মুখকে উঁচু করে তোলার আশায় পরেশের কারখানায় গিয়ে তার দুর্ব্যবহারের জন্য মাপ চেয়ে আসে এবং বোতাম জোড়া যে তার 'ইনসাইড' পকেটে ছিল তা জানিয়ে আসে। পরেশ হৈ হৈ করতে করতে বাড়ি ফিরে এসে বড়লোকের কাণ্ডখানা বলতে থাকে, নিজেরা যে নির্দোষ তার প্রমাণ হয়েছে নীরেনের কাছে সেই খুশীতে আনন্দিত হয়। কিন্তু কল্যাণীকে নীরেন যতটা চিনেছে তার নিজের এতদিনকার সঙ্গী স্বামী সেটুকুও চিনতে পারেনি। পরেশ কল্যাণীকে নির্দোষ ভেবে আনন্দিত আর নীরেন দোষ দেখতে পেয়েও তা বিচার করতে গিয়ে মুগ্ধ, বিস্মিত; সে কারণেই দোষটা নিজের মাথায় নিয়ে কল্যাণীর কল্যাণী রূপকে সম্মানের আসনে বসিয়ে রেখে গিয়েছে। জীবনকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গিই লেখিকাকে এ ধরনের চরিত্র অঙ্কনে সাহায্য করেছে।

'সামনের বাড়ী' (১৯৫৫ সাল) গল্পটি প্রাচীন ও অর্বাচীন কালের দুই নারীর মানসিকতাকে সুন্দরভাবে পরিস্ফুট করে তুলেছে। প্রাচীনা বলতে যে নারীর কথা বলা হচ্ছে তিনি বয়সে প্রাচীনা নন, বিমলেন্দুর স্ত্রী, উমারাণী। নবীনা বলতে বিমলেন্দুর সামনের বাড়ির চৌধুরী সাহেবের স্ত্রী। বয়সে

উভয়েই সমবয়সী, কিন্তু মানসিকতায় রয়েছে বিস্তর ফারাক। সম্পূর্ণভাবে রক্ষণশীল পরিবারে বেড়ে ওঠা, সেই রকম পরিবারেরই বধূ হয়ে আসা — এর মধ্য দিয়েই নিজের সংসারকে গুছিয়ে নেওয়া, প্রতিটি কাজে প্রাচীন, অশিক্ষিত, রক্ষণশীলতার ছাপ রয়েছে। আর মিসেস চৌধুরী নিজে শিক্ষিতা, বাইরের জগতের সঙ্গে তার সমস্তরকম যোগাযোগ রয়েছে সংবাদপত্রের মাধ্যমে, নানা সংগঠনে কাজ করার মাধ্যমে। এমনকি বাড়ি এবং অন্দরমহলের গঠনেও রুচির পার্থক্য রয়েছে। দুটো বাড়ি মুখোমুখি এবং একই প্ল্যানের অথচ, এদের সাজানো গোছানোতে কোনদিকেই কোন মিল নেই। চৌধুরী সাহেবের বাড়িতে সামনের জানলা দুটোয় ঝুলছে ফিকে নীল রঙের দুটো পর্দা, আর এ বাড়িতে ঢুকতেই চোখে পড়বে ঘুঁটে, গুল, পায়ে ঠেকবে হয়তো ছেঁড়া জুতোর পাটি, খাবারের শালপাতা — আরো অনেক কিছু যত্রতত্র ছড়ানো ছিটানো। দরজা বা জানলায় কোন পর্দা রাখা চলবে না, কারণ দেওয়াল কেটে জানলাগুলো বসানো হয়েছে পর্দা দিয়ে ঢেকে রাখবার জন্য নাকি নয়। উমার কথায় এগুলো 'ফ্যাশান ম্যাশান'; আরো বলছে — "নিজেরা পথে ঘাটে সর্বত্র বিনুনি ঝুলিয়ে পিঠে আঁচল দুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, আর যতো লজ্জা ঘরের!" *(পৃ. ৬৩, গল্প সমগ্র, ৩য় খণ্ড)*। উমার সংসারে চাকর, বামুন সবই রয়েছে; তথাপি সারাদিন বাড়িতে ঠাকুর, চাকর, গোয়ালা, ঘুঁটেওয়ালা, ধোপা — এদের সঙ্গে চিৎকার আর ছেলেপুলেদের সঙ্গে চেঁচামেচি লেগেই আছে। অর্থাৎ কণ্ঠ-সরস্বতীর বিরাম নেই, আর নেই সংসার যাত্রায় কোন শৃঙ্খলা। আর চৌধুরী সাহেবের বাড়ি চলে শুধুমাত্র একটি চাকর দিয়ে, রান্নবান্না নিজেরাই করে নেন, তথাপি সারাদিনে একটি টু শব্দও নেই। মিসেস চৌধুরী এবং তার ননদ মিস চৌধুরী দুজনে সমাজের কল্যাণমূলক নানা কাজের সঙ্গেও আবার জড়িয়ে আছেন। কোথাও রিলিফের কাজে বাইরে যাচ্ছেন, সাহেব তখন চাকরের রান্নাই খাচ্ছেন, আবার কখনো পাড়ার সাংস্কৃতিক উৎসবে যোগ দিতে যাচ্ছেন। অর্থাৎ শিক্ষিত, কু-সংস্কারমুক্ত মন হলে যা করা সম্ভব। চৌধুরী পরিবারের এই স্বতঃস্ফূর্ততাই উমার নিকট বিশাল অপরাধের সামিল।

কিন্তু একদিন পরিস্থিতি এমনই জটিল আকার ধারণ করল যে এই চৌধুরী পরিবারের কাছেই সাহায্যের হাত বাড়াতে হল। রাতে জল খেতে উঠে বিমলেন্দু হঠাৎ করে অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন। প্রতিভা, বিমলেন্দুর বোন, জানলায় ঢিল ছুঁড়ে তাদের ডেকে ওঠালেন। টেলিফোনের সাহায্য চাইবার উদ্দেশ্যে তাদের ডাকলেও মিস্টার এবং মিসেস চৌধুরী নিমেষের মধ্যে তাদের গেটে এসে হাজির হন। কিন্তু উমারানী তাদের কোন ফোন নম্বরই দিতে পারে না, কারণ ফোন করতে যে নম্বরের প্রয়োজন হয়, এই বোধটুকুকেও কাজে লাগাতেন না তিনি। চৌধুরী দম্পতি নিজেরা ডাক্তার আনিয়ে চিকিৎসা করালেন এবং সারারাত সেবা শুশ্রূষা করলেন রোগীর — নিজের বাড়ি থেকে আইসব্যাগ, ফরসা তোয়ালে ও জল গরম করার উপযুক্ত এনামেলের গামলা এনে। রোগীকে কথা বলিয়ে,

হাসিয়ে তবে তারা বিদায় নেন এবং এও আবিষ্কার করেন যে রাত্রের আহারে খিচুড়ী আর ইলিশ মাছ ভাজা খাওয়ায় হজমের গোলমালই এই অসুস্থতার কারণ।

এবারে আবির্ভূত হলেন উমারানী একরাশ অভিমানের ডালি নিয়ে। তার স্বামীকে সারারাত বাইরের লোকেরা আগলে রাখায় স্ত্রী হয়েও যাকে একগলা ঘোমটা টেনে দূরে বসে ঘেমে নেয়ে একাকার করে সময় কাটাতে হয়েছে। তার মতে তার স্বামী ডাক্তার বা ওষুধে সুস্থ হয়নি — "মা কালীর কাছে কেঁদে পড়ে হাতের শাঁখা বাঁধা রেখে মানত করলাম না? কাজ যা হবার ওতেই হয়েছে, বুঝলেন মশাই?" *(পৃ. ৬৯, ঐ)*। "সংকট থেকে উদ্ধার হলে — মা সঙ্কটচণ্ডীর নাম করো তা নয় — ওঁরা, ওঁরা। ওরা কী এতো হাতী ঘোড়া করেছে জানি না। ... আমরা শত বিপদেও যদি পড়ি — পর পুরুষের বিছানায় গিয়ে বসবো? ছিঃ ছিঃ! গলায় দড়ি" — *(পৃ. ৬৯ ঐ)*।

যাদের নিকট রোগে সময়মত ডাক্তার, ঔষধের চেয়ে দেবতার কাছে মানতই প্রাধান্য পায়, সহযোগিতার স্থানে পরপুরুষের প্রসঙ্গ আসে, স্বভাবতই তারা অতিমাত্রায় প্রাচীনপন্থী। শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত বলেই স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ততার বদলে অধোগামী চিন্তা মনে স্থান পেয়েছিল। এই মনোভাব যতটাই কুসংস্কারে আচ্ছন্ন আবার ততটাই কৃতজ্ঞতাহীনতায় পরিপূর্ণ। পাশাপাশি দুটি ধরনের নারীচিত্তের বিস্তর ফারাক বুঝিয়ে দেয় আমাদের নারীসমাজে শিক্ষাদীক্ষা ও জ্ঞানের আলোর কতটা প্রয়োজন। একবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভলগ্নে এসেও অনেক ক্ষেত্রে এখনও চোখে পড়ে স্বাভাবিক প্রগতিশীল সভ্য সমাজের পরিপন্থী হিসেবে অন্দরমহলের আলোছায়াময় ঘুপচিতে অগোছালো সংসারের আবর্তে পাক খেয়ে মরা কিছু সংকীর্ণমনের নারীদের। যাদের নিকট বহির্জগত বলে কোন জগত নেই। জগতে শৃঙ্খলাপরায়ণতার সঙ্গে যেন একমাত্র নিজেরাই চলেন, এই মনোভাব এবং বহির্জগতের শিক্ষিতা নারীদের সবই অর্থহীন — এই ধরনের নারী জাতির বিরোধিতা করে করেই আজকের নারীরা এগোচ্ছে তাদের প্রার্থিত লক্ষ্যে। শুধু সমাজই নয়, পুরুষরাও নয় — এসব অন্দরমহলের অ-শিক্ষিতা নারীরাও যে নারী প্রগতির পথে এক বিশেষ অন্তরায় তা লেখিকা সমাজ পরিমণ্ডল থেকে জেনেছেন, বুঝেছেন এবং তাদের রক্ষণশীলতার চূড়ান্ত রূপকে গল্পের বিষয় করে পাঠকের দরবারে পাঠিয়েছেন।

'আকস্মিক' (১৩৫৫ বঙ্গাব্দ) গল্পে সেই মেয়েটির কথা জানি, যে ধীরে ধীরে বাবার প্রশ্রয়ে ও আদরে বড় হয়ে উঠেছে, কারণ আজ উনিশ বছর হল তার মা গত হয়েছেন, অর্থাৎ শিশুকালেই সে মাতৃহারা হয়েছে। সেই থেকে পিতৃস্নেহে লালিত হয়ে ওঠা। এখন সে প্রাণবন্ত, যৌবনা। প্রেমিকের সঙ্গে বিবাহের সময় নিয়ে অবধি আলোচনা প্রায় সমাপ্ত। শুধু বাবাকে জানানোর অপেক্ষা। তাই 'নখ দন্ত সম্বলিত পাকিস্তান সমস্যা' তে ছাত্রী-আবাসের প্রায় সকলেই থেকে গেলেও সে থাকছে না, বাড়ি চলে যাচ্ছে। দীপককে প্রায় কথা দিয়েই ফেলেছে এবার বাবাকে সব জানিয়ে ঠিকঠাক করে আসবে।

বাড়ি ফিরে কিন্তু বাবাকে কোনভাবেই আর বলা হয়ে উঠছে না। তার বাবা সীতেশবাবু মেয়েকে খাওয়ানো পরানোর যত্ন আত্তিতেই মশগুল হয়ে উঠেছেন। অস্থির হয়ে উঠেছে সুমিতা বাবাকে কিভাবে জানানো যেতে পারে ভেবে। শেষাবধি পুরো ব্যাপারটা লিখেই জানাবে ঠিক হলো। কিন্তু তার আগেই তার প্যাডে তার বাবা নিজের কিছু কথা লিখে গেছেন। যিনি নাকি দীর্ঘ উনিশ বছর পরে নিজের জীবনের একাকীত্ব ঘোচাতে দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করতে ইচ্ছুক। এক লহমায় সুমিতার নিজের জীবনের সমস্ত ইচ্ছা কোথায় উড়ে গেল নিজেই বলতে পারছে না। বরং এত দীর্ঘকাল কিভাবে তাঁর বাবা একা একা কাটিয়েছেন সেটাই এখন সহমর্মিতার সঙ্গে ভাবতে চাইছে, অনুভব করতে চাইছে। সে মেয়ে হয়ে বাবাকে বিবাহের কথা বলতে যখন এত দ্বিধান্বিত, তার বাবারও নিশ্চয়ই আরো অনেক বেশী কষ্ট হবার কথা এ ব্যাপারে — সেটা বুঝতে পেরে সুমিতা নিজেই যেন মরমে মরে যাচ্ছে। সমস্ত দিন ভেবে তাই সে নিজে কানপুরে একটা চাকরি পেয়েছে বলে বাবাকে মুক্তি দিতে চাইলো, কারণ তার সামনে বাবা বিবাহিত জীবন যাপনে অস্বস্তিবোধ করতে পারে এই ভেবে তার দূরে সরে যাওয়াই শ্রেয় মনে হল। দীপকের সঙ্গে নিজের বিবাহ সম্পর্কিত বিষয়টি ভুলে গিয়ে বরং তার মনে পড়ল দীপকই কানপুরে কর্মখালির সংবাদটা দিয়েছিল তাকে। অবশ্য বাবাকে তার মতামতটা জানাবার আগে পর্যন্তও ভাবে নি এই বিষয়টা। তার বরং মনে হয়েছে বাবাকে একটু সুখ দিতে পারলে তার নিজেরও ভালো লাগবে এবং বাবা ও মেয়ে পাশাপাশি বিবাহ করাটা কখনোই শোভনীয় নয়।

বিপত্নীক বাবাদের অনেক বিবাহ করতে দেখা গেলেও খুব কম সংখ্যায়ই মেয়েদের এভাবে বাবার বিবাহ নিয়ে ভাবতে দেখা যায়। সৎমা আসবে বলে তারা খারাপ দিকটির কথাই ভাবে। সুমিতা একটি শিক্ষিতা নারী হওয়ায় নিজেকে চাকুরী লাভের মাধ্যমে সুন্দরভাবে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে বাবাকে সুখে সংসার করবার সুযোগ দিয়ে গেল নিজের সুখকে বিসর্জন দিয়ে; কারণ বাবার কথা ভাববার সময় দীপককে যে আশ্বাসগুলো দিয়ে এসেছিল সেগুলো বেমালুম ভুলে গেছে এবং সেগুলো উত্থাপন করা উচিত নয় বলেই সে মনে করল।

মানব চরিত্র এবং প্রকৃতি গড়ে ওঠার পেছনে পরিবেশের একটা বিশেষ ভূমিকা থাকে। পরিবেশ পরিস্থিতি মানুষের জীবনকে অনেকটা বদলে দিতে পারে। আর এই বদলে যাওয়াই হচ্ছে জীবনচক্রের নামান্তর। মানুষ যখন বিপদে পড়ে তখন খড়কুটোর মতো যাকে পায় আত্মীয় পরিজনের মধ্যে বা পরিচিতির মধ্যে তাকেই আঁকড়ে ধরে। আবার বেশীরভাগ মানুষ সুখের মুখ দেখলে দুর্দিনের কথা ভুলেও যায় এবং অতি সহজেই নিত্য নতুন চাল-চলনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। সেরকমই একটি গল্প হচ্ছে 'সিঁড়ি' (১৩৫৫ বঙ্গাব্দ)।

গল্পের কথক জানাচ্ছে পেসাদী এবং পেসাদীর মায়ের জীবনের গল্প। মাসের প্রথমে মাইনে

পেয়ে বাড়ী এসে তিনি দেখেন তার স্ত্রীর হাতে পায়ে ধরে এক মহিলা অনুরোধ উপরোধ করে যাচ্ছেন যাতে তাকে আর তার মেয়েকে কাজে বহাল করে। "চরণে ঠাঁই দিতেই হবে বৌদি, নইলে ওই অপোগন্ড মেয়েটাকে নিয়ে এইখেনে পড়ে হত্যে হবো" *(পৃ. ৮৩, গল্প সমগ্র, ৩য় খণ্ড)*। গৃহিণীও পরম মমতায় তাদের কাছে টেনে নেন — "সত্যিই তো, দেশের লোক আমাদের আশ্রয়ে আসবি না তো যাবি কোথায়!..." *(পৃ. ঐ, ঐ)*। এভাবেই এরা আশ্রয় পেয়ে যায়। আর পল্লীগ্রামের লোক বলেই হয়তো সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর খাওয়া পরার নিশ্চিন্ত ব্যবস্থা পেয়ে সবকিছুকেই কৃতার্থ মনে করে। তার এবং ছোট মেয়েটার দেওয়া শ্রম যেন কিছুই নয়।

এভাবে বছর দশেক চললেও ইভ্যাকুয়েশন সময় যখন নিরাপদ একটি আশ্রয়ের নিজেদেরই প্রয়োজন হয়ে পড়ল তখনই পেসাদী আর তার মাকে নিয়ে সমস্যা উপস্থিত হল। এ বাড়ীতে থাকতে থাকতে নিজেদের মত হলেও অন্য বাড়ীতে বা আত্মীয়রা তো বিবাহযোগ্যা, সুন্দরী ঝিয়ের মেয়েকে রাখতে রাজি নাও হতে পারে। কথক স্ত্রী-পুত্রকে গ্রামের ভিটেতে রেখে আসে, আর পেসাদীরা পাশের বাড়িতে রান্নার কাজ নিয়ে দুর্যোগ থেকে বাঁচতে চাইছে। এখান থেকেই তাদের মা মেয়ের জীবনের মোড় ঘুরতে শুরু করল। বছর দেড়েক পরে গ্রাম থেকে স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে এসে সংসার জুড়তে শুরু করলেন এবং পেসাদীদের খোঁজ করলেন। কিন্তু ওরা তখন সেই কর্তার ভাগ্নে, না, ভাইপো তাদের বাড়ি কাজ নিয়ে চলে গেছে। "আমাদের অনুপস্থিতির জন্যই মানুষটা বেঘোরে ভাসিয়া গেল।" *(পৃ. ৮৬, ঐ)*। — যখন ভাবছে তখন তাদের ভাগ্যের চাকা ঘুরতে শুরু করেছে।

নিজে চাকরি-বাকরি করলেও কর্তামশাই নিজের পুত্র সন্তানটিকে গড়তে পারেন নি, বছর দেড়েকের ব্যবধানে সে আর পড়াশোনা করতে রাজি হল না। কিন্তু পেসাদীকে তার নতুন মনিব বাড়িতে বেশ যত্ন করে লেখাপড়া শেখাচ্ছে, গানের তালিম দেওয়াচ্ছে। তারা নিজেরা আশ্রয় দিয়ে যতটা উদারতা দেখিয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী উদার হয়তো এই মনিব যিনি মেয়েটিকে গড়ে পিটে নিচ্ছে। পেসাদী ও তার মা একদিন দেখা করতে আসার পর ধরা পড়ে তাদের কিছুটা পরিবর্তন — "মায়ের পরিধানে ধবধবে সেমিজ, মিহি ফুলপেড়ে ধুতি" — "মেয়ের পরিধানে ছিটের জামা, ডুরে শাড়ী, হাত ভর্তি কাঁচের চুড়ি ...।" আবার পরবর্তীকালে এসেছে বিপরীত মেরুতে অবস্থানকারী মানুষ হিসেবে। যখন তাদের প্রথম আশ্রয়দাতার চাকরী নেই, ছেলেটিও অশিক্ষিত তক্‌মা এঁটে নানা ধরনের ব্যবসার ধান্দায় ঘুরে বেড়াচ্ছে যত্রতত্র — সেই সময় পুনরায় মাতা পুত্রীর আবির্ভাব ঘটে।

যেখানে প্রথমদিন এসে কেঁদে পড়েছিল সেখানেই সতরঞ্চের উপর মা মেয়েতে বসে। গলায় চওড়া বিছাহার, কালাপাড় দেশী ধুতি, সাদা ফুলহাতা ব্লাউজ পরা মা, আর মেয়েও তথৈবচ। পেসাদীর নতুন নামকরণ আজ মন্দালিকা। সে আজ সিনেমার নায়িকা। তার মায়ের মতে, ইচ্ছে

করলেই সে নাকি আজ চার-পাঁচটা লোকের কাজের ব্যবস্থা করে দিতে পারে এবং সত্যিই তাই সম্ভবও। এমনকি তাদের আর্থিক দুর্গতির কথা শুনে উপকার করার মানসিকতারও উদয় হয়েছে — "... তা বোলো দাদাবাবুকে ... আমাদের ফেলাটের নম্বরটা বলে দিয়েছিস মন্দালিকা? আহা দেশের লোক — কষ্টে পড়েছে!" *(পৃ. ৮৮, ঐ)*। যে কথা আমরা পেসাদী এবং তার মায়ের মনিবাণীর মুখে প্রথমদিকে শুনেছিলাম, সেটাই আবার শুনলাম পুরোপুরি বিপরীত চিত্রে। তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতাবশত একথা পেসাদীর মায়ের মুখে উচ্চারিত হয়নি, হয়েছে অনুকম্পা করার দৃষ্টি নিয়ে। দেশের লোক, কষ্টে পড়েছে — অথচ তার নিজ মুখোচ্চারিত শব্দ ছিল, যাদের মনিবের মতো শ্রদ্ধা করেও এসেছে আজীবন। কিন্তু শেষমুহূর্তে নিজেদের অবস্থান ভুলিয়ে দিচ্ছে রাজা প্রজার ফারাককে। হয়তো অর্থের এমনই যাদু থাকে। নয়তো যে নারী স্টুডিও কে 'ছুডিও', শ্যুটিং কে 'ছুটিং', আর 'সিনেমা' কে 'ছিনেমা' নামে অভিহিত করে — তার শিক্ষাগত দিক সম্পর্কে কোন প্রশ্ন ওঠে না। কৃতজ্ঞতাটুকু প্রকাশ করতে গিয়ে যে করুণার বর্ষণে সিক্ত করে দিয়েছে তা যেন করুণার বদলে করুণা ফেরত দেওয়া।

শশাঙ্কমোহন তার স্ত্রী নিভাননীকে নিয়ে সংসার পাততে এসেছিলেন কোলকাতায়। গ্রাম নয়, শহরে গিয়ে স্বামী-স্ত্রী সংসার ধর্ম করবে, রহস্য-রোমাঞ্চের স্বাদ উপলব্ধি করবে এই আশায় শহরে আসা। কিন্তু অপটু হস্তে ঝোল-ভাত করতেই তার সারাদিনমান লেগে যেত। আর সে কারণেই ধীরে ধীরে হাত লাগাতে হত সারদাকে। সারদা হচ্ছে যে বাড়ি তারা ভাড়া নিয়েছিল সেই বাড়ির বাড়িওয়ালি বিধবা এবং কতকটা বাচালও। এই সারদার কথা নিয়েই তৈরি হয়েছে **'বেঁহুশ'** (১৩৫৬ বঙ্গাব্দ) গল্পটি।

সারদার সবকিছুতে এসে হাত লাগানো, তার আন্তরিক আপ্যায়ন কোনটাই নিভাননীর পছন্দ হোত না। তাকে বলা "কি গো বৌদি, মুখটুখ দেখতে দেবে না নাকি? অতো ঘোমটা কিসের? বাব্বাঃ দেখেই প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছে যে।" *(পৃ. - ৯৮, গল্প সমগ্র, ৩য় খণ্ড)*। এই আন্তরিকতার বদলে নিভা বলে উঠেছিল — "অসভ্যর মতো হাসছে দেখো। বিধবা মানুষের অতো হাসি কেন? দেখলে গা জ্বলে যায়।" *(পৃ. ৯৮, ঐ)*। অর্থাৎ এখানে আমরা দেখতে পাই সেই চিত্র যে, বিধবা বলে নারীদের মধ্যে স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ততা বলে যেন কিছু থাকতে নেই। নারীরাই নারীদের অনাদরে, অবহেলায়, অবজ্ঞায় ভরিয়ে দিতে চায়। নানা ছলছুতোর আলাপচারিতায় সারদার শ্বশুর বাড়ীর খোঁজ নেওয়া, এই বাড়ীর ধন-সম্পদ সে সবই সারদার বোবাকালা ভাই কেষ্টর — তা বুঝিয়ে দেবার জন্য যেন নিভাননী সর্বদাই উন্মুখ থাকতো। নিভা কাজে অপটু হলেও কথাবার্তায় যে মোটেও অপটু নয় — সেটা তার উক্তিগুলো শুনলেই বোঝা যেত।

"—আচ্ছা সারদা দিদি, তোমার শ্বশুর বাড়ীতে বুঝি কেউ নেই।... এতো সব আছে তো যাও না

কেন সাত জন্মে? নিয়ে যায় না বুঝি?"

— "যাবো কি করে? কেষ্টর কি হবে? ওকে আঁচলে বেঁধে নিয়ে শ্বশুরবাড়ী গিয়ে উঠলে কি আর ঠাঁই দেবে কেউ?"

— "তা আর কে কবে দেয় ভাই? বিধবা ভাসুরবৌকে যদি ভাত দেয় তাই ঢের। ... তা কেষ্টর জন্যে একটা ভালো মতন ঝি রেখে দিলেই পারো? ... — *(পৃ. ১০০, গল্প সমগ্র ,৩য় খণ্ড)*।

শুধুমাত্র স্বামীর গরবে গরবিনী নিভাননী সারদাকে নস্যাৎ করে দিতে চাইছে; যথেষ্ট ধনসম্পদ থাকা সত্ত্বেও তাকে অবহেলার পাত্র হিসেবে দেখতে চাইছে, এ যেন নিভাননীর ভেতরকার প্রাচীনা রক্ষণশীলা মনের এক কুটিলা রমণী আত্মপ্রকাশ করছে। সারদা বিধবা, সে দাপটের সঙ্গে তার পিতৃসম্পত্তি নেড়েচেড়ে ভাইকে ভালোবেসে তদারক করে সংসার চালাচ্ছে — এটা এই ধরনের অর্থাৎ চিরাচরিত নারীপ্রকৃতির ভালো না লাগারই কথা। তার মন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠতো আজ যদি বিধবা সারদা শ্বশুর বাড়ির লোকেদের গলগ্রহ হয়ে উঠতো, উঠতে বসতে তাকে কথা শুনে অপমানে জর্জরিত হতে হোত। এরপরেও সারদার জন্য আরো আলোচনা ও সমালোচনা অপেক্ষা করে ছিল, কিন্তু নিভাননী অকস্মাৎ অসুস্থ হয়ে বসন্ত রোগে মারা গেলেন। শশাঙ্ক বাড়ি ছেড়ে দিয়ে মেসে যেতে চাইলেও সারদাকে একা ফেলে আর যাওয়া হোল না। এভাবে আটাশটি বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল। নিভাননীকে নিয়ে আসার পর থেকে তিরিশ বছর। সারদার সামান্য অনুরোধ — "এই শরীরে মেসের ভাত খেলে আর বাঁচতে হবে না, আর দুদিন থেকে যান। আমাকে তো রাঁধতে বাড়তে হচ্ছেই... মানে যা লাগে — চাল ডাল কিনেই দেবেন না হয়।" *(পৃ. ১০০, ঐ)*। স্ত্রী গত হবার পর টাইফয়েড হয়ে নিজেও দুর্বল হয়ে গেছেন বলে শশাঙ্কমোহন আর আপত্তি করেন নি, কিন্তু সেই থেকে যাওয়াই এই অবস্থায় রয়েছে।

চাঁদা সংগ্রহে আসা পাড়ার ছেলেদের কথায় তার চেতনা ফিরে এল। তাদের পছন্দমতো চাঁদা দিতে না চাওয়ায় — "কঞ্জুষ বুড়োর কথা শুনলি? 'হাত খাটো করা উচিত', হুঁঃ বাবা উচিত বৈকি খুব উচিত, ভাত কাপড় তো একলার জোগাড় করলে হবে না, 'বাড়ীউলির' জন্যেও যে চাই!... বেহায়া বুড়োর রস কম নয়। ... মাগীরও ঢং কতো, গঙ্গা নেয়ে আসে যেন কতোই ধর্মিষ্ঠি। ... এই ভণ্ড বুড়োবুড়িগুলো না সরলে আর — " *(পৃ. ৯৭, গল্প সমগ্র ৩য় খণ্ড)*। এই উক্তিগুলো শশাঙ্কমোহনকে কেমন ধাক্কা দিয়ে যায়। ভাবতে থাকে তার নিজের দুবার বড় কঠিন অসুখ হওয়ায়, 'যায়-যায়' অবস্থায় চার বছর কাটিয়ে সারদার ভাই কেষ্টর মারা যাওয়া, একবার সারদার তীর্থে যাওয়ায়, বাড়ি পাহারা দেওয়া একবার অনন্ত চতুর্দশীর ব্রত উদ্‌যাপন করায় সমস্ত উদ্‌যোগ করে দেওয়া। এছাড়াও অনেকবার যাবার পরিকল্পনা তো করেছিলেন — কিন্তু যাওয়া আর হোল কই। কিন্তু তাহলেও তো অন্য কোনদিকে তার মন যায়নি কখনো। একটি দিনের পর আর একটি নতুন

দিন আসে কিন্তু কোন রাতের ব্যবহার শশাঙ্কর কাছে ছিল না। সারদা শশাঙ্কর সম্পর্ক আপনি থেকে কবেই 'তুমি' তে দাঁড়িয়েছে সমস্ত কথাবার্তা অভিযোগ, অনুযোগ — সবই রয়েছে এই বাইরে, অন্য কিছু কখনোই শশাঙ্কর মনে জাগে নি। বিধবা সারদার স্পর্শবাতিক বজায় রাখতে কখনোই তার ব্যবহৃত তৈজসপত্রের দিকও মাড়ায়নি শশাঙ্ক। নিভাননী যাবার পর রাতগুলো তো তার নিকট মৃত ছিল, অথচ এই দিকটাই ছিল ভাবনার বাইরে, তাকে নিয়েই ভাবিয়ে দিয়ে গেল। তার ভেতরকার সুপ্ত পৌরুষ যেন এক লহমায় বাইরে বেরিয়ে এল। কিন্তু সারদা — তার যেন কোন ভ্রূক্ষেপ নেই বলে মনে হচ্ছে শশাঙ্কর। আসলে শশাঙ্ক তো একথা নতুন শুনেছে, সারদা দিনের পর দিন শুনে শুনে তাতেই অভ্যস্ত হয়ে গেছে। সে কখনো এর সত্যতা নিরূপণের জন্য কারো কাছে যায়ও না; আবার লোকের কথার আঁচটি যাতে শশাঙ্কর গায়ে না লাগে সেজন্যে তার সঙ্গেও কোনদিন আলোচনা করেনি।

— "পাড়ার ছেলেরা। ... বলে গেল — তুমি আর আমি — মানে — তোমার সঙ্গে আমার — মানে আমরা নাকি খারাপ।"

— "এই কথা।" ...

— "এই কথা? ... কে না বলে? সবাই বলে। চিরকালই বলে আসছে।" *(পৃ. ১০৩, ঐ)* অর্থাৎ এই কথাগুলো সারদা চিরকাল শুনে শুনে অভ্যস্ত হয়ে গেছে এবং নিজেকে স্পৃশ্য অস্পৃশ্যতার আবরণে মুড়ে রেখে শশাঙ্কর নিকট থেকে দূরে সরে থেকেছে, আর মনের তৃপ্তি লাভ করেছে। তার ভেতরে কখনো অতৃপ্তিকে জাগতে দেয়নি, নিজেও অতৃপ্ত আছেন বলে বোধ করত না, যদিচ সকলই বুঝতেন। সমগ্র নারীজীবন একটি পুরুষের সেবা করে গেলেন আন্তরিকতার সঙ্গে, তাকে নিয়ে প্রায় দাম্পত্য জীবনের মতো কাটালেও শারীরিক দিকটিকে কর্মপটুতা, স্পৃশ্যতা দোষের দ্বারা এত সুন্দরভাবে এড়িয়ে প্রৌঢ়ত্বের দ্বারে উপনীত হওয়া সত্যিই অত্যন্ত সংযমী নারীর লক্ষণ। এ সমস্ত কাজেই তিনি আসলে মত্ত হয়ে থাকতে ভালোবাসতেন। আর শশাঙ্ক মোহন এই জীবনেই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন; জৈবিক চাহিদা, যৌনইচ্ছা তার কোনদিনই জাগেনি তাই তাকেও 'বেহুঁশ' বলা হয়েছে।

'চৌরঙ্গী' (১৩৫৬ বঙ্গাব্দ) গল্পে লক্ষ করা যায় — গল্প লেখক বিনু নিজের খেয়ালে গল্প লেখেন, কিন্তু বিষয়বস্তু অবশ্যই চতুষ্পার্শ্বের সমাজজীবন। এই গ্রন্থরাজির একটি সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থ নিয়ে লেখক বিনুর ঘরে সহসা ঝড়ের বেগে আবির্ভূত হন তার রাসুদা। উনি নিজে বই পুস্তকাদি পাঠ করেন না, কিন্তু তার স্ত্রী সর্বদাই তার 'বিনু ঠাকুরপো'-র লেখাগুলো পড়ে। তার নির্দেশেই বলতে আসা — যেন গল্পের চরিত্রগুলোর একটু বদল হয়। কারণ গল্পকার মনস্তাত্ত্বিক গল্প লেখেন এবং স্বভাবতই মনের অলি-গলি-ঘুঁজিগুলোতে তাকে প্রবেশ করতে হয় ও প্রায় সব মানুষের ক্ষেত্রেই ভালোর চাইতে মন্দ দিকের সংখ্যা বেশী থাকায় সেগুলোই প্রতিফলিত হয়ে ওঠে। তাই রাসুদা বলে

চলে — "তোর বৌদি বলেছে — তুই একটি বিশ্ব নিন্দুক। মনস্তত্ত্ব না কাঁচকলা। মানুষের মনের অন্ধিসন্ধির গোলকধাঁধায় ঘুরে ঘুরে শুধু জঞ্জালগুলোই চোখে পড়ে তোর?" *(পৃ. ১০৪, গল্প সমগ্র, ৩য় খণ্ড)*।

— "সহরে যেমন দর্জি পাড়ার গলি আছে, তেমনি চৌরঙ্গীও আছে তো? ... চৌরঙ্গীর দিকে একটু তাকাতে শেখ বিনু।" *(পৃ. ১০৬, ঐ)*। — রাসুদার এই কথা সামান্য হলেও ভাবায় তাকে।

চৌরঙ্গীর সঙ্গে তুলনীয় হতে গেলে হতে হবে মহৎ একটি চরিত্র, সাধারণ জনজীবনে অতি সহজে যার তুলনা মেলে না। এগুলো ভাবতে ভাবতে সকালের ডাকে আসা চিঠিপত্র হাতড়ে পান এক অজানা হস্তাক্ষর সম্বলিত চিঠি, যা নাকি তার সুনীতি মাসীর লেখা। পত্রপাঠ চলে যাবার কথা বলা আছে সেখানে। অকস্মাৎ যেন চৌরঙ্গীর সন্ধান পেয়ে গেলেন বিনু। কারণ তার সুনীতি মাসি ছিলেন বিশাল বিত্তশালী পরিবারের কুলবধূ। তার মেসোমশাই ছিলেন একমাত্র সন্তান, অকাল মৃত্যু হল তার। ষোলো বছর বয়সে সুনীতি মাসি বৈধব্যের আবরণ অঙ্গে চড়ালেন এবং হলেন সম্পূর্ণ আভরণহীনা। আত্মীয়-স্বজন ও আর পাঁচজনের হৈ-হৈ, হায়-হায়, সব বন্ধ করে দিয়ে উনি বাইশ বছর বয়সে দীক্ষামন্ত্র নিয়ে কাশীতে বাবা বিশ্বনাথের চরণে আশ্রয় নিলেন। আর বিপুল সম্পত্তি দিয়ে গেলেন জেঠতুতো ভাসুরপো রাজেন, ব্রজেন এই দুই ভাইয়ের নামে, যা নাকি সমস্ত আত্মীয়-পরিজনদের চোখের আলো ঘুচিয়ে দিল। — "ভবিষ্যতের কথা কে বলতে পারে? রাজেন, ব্রজেন যদি এরপরে তোমায় না দেখে? নিজের বলতে কিছু না রাখা ভালো হলো? — ... বিধবা খুড়ি বলে হাত তুলে যদি কিছু দেয় ওরা, মাথায় করে নেবো, কিন্তু হাতের পাঁচ রেখে আবার দান কি?" *(পৃ. ১০৮, ঐ)*। এই চিত্র বিনুর জানা ছিল, অকস্মাৎ মনে পড়ে গেল সব। এ ধরনের ঘটনা — যা আমাদের সমাজে সত্যই বিরল। যেখানে মানুষ নিজের একপাটি ছেঁড়া জুতোর স্বার্থখানাও ছাড়তে রাজি হয় না, সেখানে তুতো ভাসুরপোদের অগাধ সম্পত্তি দান করে দেওয়া নিঃশর্তে এবং নিজে সম্পূর্ণ কপর্দকহীন হয়ে যাওয়ার রাজপথের সঙ্গে তুলনীয়। এই চৌরঙ্গীর (উঁচু মনের) সন্ধানেই গেলেন সুনীতি মাসির বাড়িতে। ভাবলেন হয়তো আধ্যাত্মিক জগতের কোন বিরাট কেউকেটাও হয়ে যেতে পারেন তিনি, কারণ অনেকদিন থেকেই যেহেতু অধ্যাত্ম জগতের সঙ্গেই যুক্ত আছেন। কিন্তু যখন বাড়ীতে ঢুকলেন দেখলেন অন্যরূপ। মাসী ছুটে এলেন — "কে এলি? বিনু? আমি ঠিক জানি চিঠি পেলেই ছুটে আসবে। আর কিছু নয় — আমাদের ঝাড়!" *(পৃ. ১০৮, ঐ)*। অর্থাৎ সংবাদ অবগত হওয়ামাত্র ছুটে আসবার মানসিকতা বা প্রবণতা তাদের বংশের মানুষের মধ্যে আছে, এই দরদটুকু, মনুষ্যত্ব বোধটুকু রয়েছে। যা নাকি নেই তার শ্বশুরকুলের লোকেদের মধ্যে। থাকলে আজকে বিনুকে এই কারণে তলব করতে হোত না। কারণ রাজেন-ব্রজেন আর তাদের খুড়িকে টাকা পয়সা দিয়ে দেখে না। অথচ তার দেওয়া সম্পত্তি ভোগ করছে ওরা।

রাজেন-ব্রজেনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হবে — তাই উকিল ভাগ্নেকে ডেকে এনেছেন।

"শ্বশুরের ভাইপো — ভারী একেবারে, অভাবে পড়লে দশটা টাকা দেয় না আমায়, আর এই রাজার সম্পত্তি বেমালুম ভোগ করছে বসে বসে! ... গাড়ী, বাড়ী, বৌদের গায়ে ঝুড়ি ঝুড়ি গয়না, সুখ কতো! বলি এসব কার থেকে পেলি? আমায় বঞ্চিত করে যে সর্বস্ব খাচ্ছিস, ধর্মে সইবে?" *(পৃ. ১০৯, ঐ)*। জীবনের শুরুতে যখন দান ধ্যান করেছিলেন তখন সুনীতি দেবীকে আত্মসুখ ত্যাগের তৃপ্তি ও মহিমাতে পেয়ে বসেছিল, কিন্তু যখন ধীরে ধীরে তিলে তিলে বাস্তবের সঙ্গে এক একটি করে দিনাতিপাত করতে লাগলেন তখনই দেখলেন বাবা যেমন তেমনভাবে জীবন চলে না, তবে পৃথিবীতে ধন সম্পদের জন্য এতো 'চাই-চাই' রব উঠতো না। বেঁচে থাকতে এরও ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু একদা যাদের ঢেলে সমস্ত দিয়ে দিয়েছেন তাদের নিকট বিনিময়ে কিছুই পাননি। ক্রমশঃ এই অবহেলা তাকে প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থ করতে অনুপ্রাণিত করল, তখনই উকিল ভাগ্নের খোঁজ পড়ল। তিনি দানপত্র করে দেওয়া সম্পত্তিকে দুঁদে উকিলের সাহায্যে খরচা করে তবে শিখলি কি এতদিন? সেকথা (দানপত্র) নাকচ করে দিবি তুই, বলবি — আমাকে অসহায় বিধবা পেয়ে ওরা জাল দানপত্তর তৈরি করে নিয়ে ফাঁকি দিয়েছে আমাকে —" *(পৃ. ১০৯, ঐ)*। যে চৌরঙ্গীর সন্ধানে এখানে বিনু ছুটে এসেছিল, দেখতে পেল সেই রাজপথ যেন কোথায় কোন গলি ঘুঁজিতে গিয়ে অকস্মাৎ হারিয়ে গেল। মানুষের চিরপরিচিত, সদা সর্বদা চোখে দেখা যায় এরূপ এঁদো গলি, কানা গলি, শুধু যে বিপথেই ঘুরে বেড়ায় তা নয় পথেও ঘুরে বেড়ায়। বাস্তবের কঠিন মাটির স্পর্শই যে এক বিরাট সত্য তা সুনীতি মাসি বুঝেছেন, তাই তার দান ধ্যানের মোহ কেটে গেছে। তার ধনসম্পত্তিই তাকে বঞ্চিত করছে, তার দয়ার জিনিস লুটেপুটে খাবার সময় তাকে সমীহ করা হচ্ছে না — তাকে একবারও বলা হচ্ছে না যে তোমার দয়ায় আমাদের সুখভোগ — এই বোধটাই সুনীতি দেবীকে পীড়িত, ও কঠোর করে তুলেছে। অর্থাৎ মানুষের স্বাভাবিক প্রত্যাশা — প্রতিটি গুণের যথাযোগ্য বিচার মানুষ চায়। যেমন গুণের প্রশংসা, দানের জন্য কৃতজ্ঞতাবোধ, সমীহ বোধ ও আনুগত্য — এগুলোর অভাব এক সময়ের ত্যাগের প্রতীক একটি নারীকেও নাড়া দিয়ে গেছে। নিজেকে বঞ্চিত করে মহান থাকবার প্রলোভন তিনি ত্যাগ করতে চাইছেন ছলাকলার আশ্রয় নিয়ে। লেখিকা আশাপূর্ণার গল্পের বিষয়ে এ হেন নারী চরিত্রও উঠে এসেছে। আসলে মানুষের বৈচিত্র্যময় চরিত্র ও প্রকৃতি লেখিকাকে বহু বিচিত্র জীবন অঙ্কনে অনুপ্রাণিত করেছে।

এমন কিছু নারীরা রয়েছেন যারা চিরাচরিত প্রথায় সংসার জীবনে চলতে ভালোবাসেন, বলতে ভালোবাসেন। যারা অপরের দুঃখে সমব্যথী হয়ে সেটাকে উপভোগ করেন কিন্তু সঠিক সমাধানে আবার মুখর হয়ে ওঠেন। যাদের নিকট বাহ্যিক আচরণের সৌষ্ঠব বংশ কৌলিন্যই বড় হয়ে দেখা দেয়, প্রগতিশীলতাকে মুখে মেনে নিলেও কার্যতঃ তার বিরোধিতাই করেন। **'একটু কথোপকথন'**

(১৩৫৭ বঙ্গাব্দ) গল্পে তারই চিত্র দেখা যায়। সংবাদপত্র পড়তে থাকা স্বামীকে ডেকে কথা বলতে চাইছে তার স্ত্রী, যে দৃশ্য নিজে পর্যবেক্ষণ করে এসেছে সেগুলো বলার জন্য উদ্‌গ্রীব। সকালবেলা স্বামীর অফিসে চলে যাওয়ার পর 'ঠাকুরবাড়ী' গিয়েছিল, দেখতে পেল অনেক লোকের জটলার মাঝে বসে আছে একটি মেয়ে। 'পাকিস্তান' থেকে আসা, পরিবারের অন্যান্য সকলকে মেরে কেটে ফেলেছে, নয়তো কেউ পালিয়ে গেছে আর ওকে — "সোমত্ত বয়সের মেয়ে — কতো দুগ্‌গতি ভোগ করে এসেছে কে জানে। গুণ্ডায় ধরে নিয়ে গিয়েছিল!" *(পৃ. ১৬২, গল্প সমগ্র, ৩য় খণ্ড)*।

"ওই ফুলের মতো মেয়ে সেইসব রাক্ষসের মতো গুণ্ডার হাতে পড়ে — বুঝতেই পারছো?" *(পৃ. ১৬২, গল্প সমগ্র, ৩য় খণ্ড)*। মেয়েটির পরিচয় দিতে গিয়ে বলল — "বলছে নাকি কলেজে পড়তো — আই, এ, একজামিন দেবার কথা। বাপ উকিল, গাড়ী বাড়ি সব ছিল ... খালি কান্না, আহা সে কান্না দেখলে অতি বড়ো পাষাণেরও বুক ফেটে যায়।" *(পৃ. ঐ,)*। এই যে দুঃখকে উপভোগ করে দুঃখী হতে চাওয়া অথচ মেয়েটি অনেক অনুনয়-বিনয় করে যখন সকলের কাছে একটু থাকবার জায়গা চাইছে সেটা কেউ দিতে রাজি নয়। একা, একা রিফিউজী ক্যাম্পে না থেকে ভদ্রলোকের মেয়ে ভদ্রলোকের বাড়ি থাকতে চাইছে।

— "তারপর? দিলে কেউ?" স্বামীর প্রশ্নে স্ত্রীর উত্তর — "পাগল নাকি তুমি? ও মেয়েকে কে আশ্রয় দিতে যাবে?" *(পৃ. ১৬৩, ঐ)*। গরীব, ছোটলোক মেয়ে হলে তাকে দিয়ে সংসারের কাজকর্ম করানো যায়, তাই রাখা চলে। কিন্তু শিক্ষিতা, বিদূষী তরুণীকে দিয়ে তো আর সমস্ত কাজকর্ম করানো চলে না। তায় আবার উচ্চবিত্ত ঘরের মেয়ে, বাবা ছিলেন মস্ত উকিল, তার চালচলনও আর দশটা মেয়ের থেকে একটু আলাদা।

মেয়েটির পরিণতিতে যখন ভদ্র, সভ্য সমাজে ঠাঁই পেল তখন আবার এই নারীরাই সনাতন হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যান করতে লেগে যায়। কারণ ভট্টাচার্য্য বাড়ির মেজ ছেলে মেয়েটিকে রিফিউজী ক্যাম্পে রেখে আসতে গিয়েও সেখানে না রেখে এক বন্ধুর বাড়িতে রেখে এসেছে।

— "এখন শুনছি ওই মুরারী ছোঁড়া নাকি তাকে বিয়ে করবার জন্য ক্ষেপেছে। ছি! ছি! গলায় দড়ি! তিনি আবার নাকি একজমিন দেবার 'তালে' আছেন। সখ দেখো একবার! মরছিলি ... আবার একজামিন। ইচ্ছেও বা করছে।" *(পৃ. ১৬৪, ঐ)*।

এতটা হেনস্থা, কষ্ট ভোগ। এরপর আবার 'যথাপূর্বং তথাপরং' অবস্থা হয়ে গেল মেয়েটার; এ যেন মেনে নেবার পক্ষে বেশ কষ্টদায়কও বটে। মেয়েটিকে যদি সকলের দয়া-করুণা ভিক্ষা করে পথে বিপথে পড়ে দিন কাটাতে হোত — তাতে মেয়েটির দুর্দশা উপভোগ করতে পারতো এই নারীমহল। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে তাকে কিঞ্চিৎ দয়া করতে পারলে কিছু একটা করেছে ভাবতে পারতো, কিন্তু তা না হয়ে উল্টো পরিস্থিতি হওয়ায় অনেকেই খুশী হলেও তার মতো মেয়েরা শান্তি

অন্ততঃ পায়নি। একটা ম্লেচ্ছ ছোঁওয়া, জাত খোয়ানো, কায়স্থ মেয়ের সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ বংশে বিবাহ হওয়ায় গুণের চাইতে দোষটাই যে তাদের চোখে বেশী করে ধরা পড়ে। তবে কি 'নারীরাই নারীদের শত্রু' পুনরায় প্রমাণিত হল? আর এ ধরনের নারীরাই সমাজ, জাতি, ধর্ম বজায় রাখবার কাজে যেন নিযুক্ত রয়েছেন দায়িত্বশীলতার সঙ্গে।

বিরাট এক রাজপ্রাসাদের মত বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল একটি সাধারণ মানের মেয়ে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে গেট ঠেলে ঢুকে পড়ল এবং বেল টিপে দাঁড়িয়ে থাকল। সে হাতে করে এক টুকরো কাগজ এনেছে যাতে একটি শিশুর জন্য গৃহশিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞাপন ছিল। বাড়ির গৃহকর্ত্রী এবং টিউটর হিসেবে আপাতদৃষ্টিতে দেখা সাধারণ ঘরের মেয়েটির অন্তর্লোকের উন্মোচনই হল **'ব্যাঙ্ক ফেল'** (১৩৫৭ বঙ্গাব্দ) গল্পের বিষয়বস্তু। সরকারী ইঞ্জিনীয়ার ডি. মজুমদার বিরাট একখানি বাড়ি বানিয়েছেন, তাতে ছয় বছরের কন্যা ও স্ত্রী সমেত বসবাস করেন। তারই মেয়ের জন্য কাগজে বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কিন্তু সাক্ষাৎকার পর্ব গ্রহণ করেন মিসেস মজুমদার এবং কিছুক্ষণ কথাবার্তা চলার পরই প্রার্থী বাতিল হয়ে যায়। কারণ সুন্দরী, ছিপছিপে, বিদূষী কোন যুবতী নারীকে বাড়িতে রাখতে ভরসা পান না। সর্বক্ষণ বাচ্চাকে দেখাশোনা করার সূত্রে তার বড় ধরনের সর্বনাশও তো হয়ে যেতে পারে, আর তাই হয়তো বলেও ফেলেন — "আপনার মতো এত কমবয়সী লোককে ঠিক উপযুক্ত মনে করতে পারছি না আমি।" — *(পৃ. ২১২, গল্প সমগ্র, ৩য় খণ্ড)*। নানা অছিলায় তাকে তাড়িয়ে দিতে চাইলেও তিনি যে কিছুতেই যেতে চাইছেন না, মিস্টার মজুমদারের নিকট হতে কাজটি পাবার আশা রাখছেন।

কিন্তু পারমিতা? সে তো একজন উচ্চবিত্ত ঘরের গৃহিণী, তবে তার এ সাধ কেন? মিস্টার মজুমদারই বা তাকে একটি ফাঁকা চেক দিয়ে সাহায্য করবার ইচ্ছা পোষণ করলেন কেন? কারণ একদা ওরা একে অপরের প্রতি আসক্ত ছিলেন। এই অনুরক্তিই ক্রমশঃ আসক্তিতে পরিণত হয়েছিল। আসক্তি হয়তো প্রেমের পর্যায়ে চলে যায় আর সেই প্রেমের সূত্র ধরেই উচ্চবিত্ত ঘরের গৃহিণী পারমিতা যথেষ্ট গরিব এক চাকুরীপ্রার্থী সেজে হাজির হয় মিস্টার ডি. মজুমদারের বাড়ির গেটে। নিজের সত্যিকার বর্তমান পরিচয় গোপন রেখে কি তবে সর্বক্ষণের জন্য প্রেমিক পুরুষটিকে প্রত্যক্ষ করতে চেয়ে এই ছলাকলা, না, তার সন্তানটিকে নিয়ে নাড়াচাড়া করে হয়তো বা একটু শান্তি পেতে চায়। এই যে কৌতূহল, নিজেকে নিয়ে ছলাকলার আশ্রয় নেওয়া, অথচ প্রয়োজন কতটা আছে সেটা খতিয়ে দেখবার দরকার নেই। কারণ আপাতদৃষ্টিতে কণ্ঠে অনুনয়ের সুর — "দেখুন, আমার বড়ো বেশী দরকার — " *(পৃ. ২১৩, ঐ)*। যতই দেখা যাক না কেন, আসলে সেটাও তো তার অভিনয়। নারীচিত্তের এই যে খেয়াল — এই বাড়ির বেশ কিছুটা দূরে পারমিতা স্বামীকে নিজের গাড়ীতে বসিয়ে রেখে, যাতে এসব না জানতে পারে এভাবে সে এ সমস্ত করছে, তা তো খেয়ালও বলা চলে।

পুরানো প্রেম, প্রেমিক এদের স্মৃতি তাকে বারবার হয়তো তাড়া করে বলেও সে একাজ করতে পারে। মিসেস মজুমদারকে দেখা গেল স্বামীর প্রতি অবিশ্বাসিনী হতে আর পারমিতাকে দেখা গেল স্বামীর অলক্ষে পুরানো প্রেমের দ্বারস্থ হতে ছলাকলার মাধ্যমে। বাইরে থেকে মনে হলেও পরিপূর্ণ বিশ্বাসে সংসারে কেউ অবস্থান করছে না। আবার পারমিতার স্বামী "গরীব বন্ধুর বাড়ী আসছো বলে — এতো ঘটা করে গরিবটরিব সেজে এলে — সব বাজে হলো?" *(পৃ. ২১৭, ঐ)*। প্রশ্ন করলে উত্তরে পারমিতা জানায় বন্ধু মারা গিয়েছে। সকালবেলা কাগজে দেখামাত্র যে কৌতুক পারমিতার ভেতরে সর্বক্ষণ কাজ করেছিল মিস্টার মজুমদারের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর — "কাজটা যদি দিতে পারতাম তাহলে — তা'হলে নিজেকে শ্রেষ্ঠ সুখী মনে করতাম পারমিতা!... এই নাও আমার চেক বই, যা খুশি ফিগার বসিয়ে নাও —" *(পৃ. ২১৬, ঐ)*। পারমিতা তার দীপকের (মি. মজুমদার) কাছ থেকে করুণার কথা শুনতে পেয়ে যেন ধাক্কা খেয়ে বাস্তবের মাটিতে আছড়ে পড়ে। দুহাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ওঠে পারমিতা, কেন? হয়ত ভালোবাসা আজ করুণার স্তরে পৌঁছে গিয়েছে বলে।

গল্প **'বাকী-খাজনা'** (১৩৫৭ বঙ্গাব্দ) — সন্তান-হারা মায়ের চিত্র ফুটে উঠেছে এখানে। নারী কল্যাণী, শ্রীময়ী, গৃহিণী সেইসঙ্গে জায়া এবং জননী তো বটেই। জায়া এবং জননী রূপের প্রাধান্যেই সংসারে তার আবর্তন। কিন্তু একমাত্র সন্তানের বিয়োগ ব্যথায় যদি নারী অধীর না হয়, শোকের প্রতিমূর্তি না হয়ে ওঠে তবে তার আত্মীয় স্বজনই বা ছাড়বে কেন? শোকের বহিঃপ্রকাশরূপে আছারি-পিছারি খাওয়া, নাওয়া-খাওয়া বন্ধ রেখে চিৎকার চেঁচামেচি করা যদি নাই হয় সমাজের লোকেদের কাছে মুখ দেখাবে কি করে? কারণ সাধারণ মানুষের তথা সমাজের নারী মহলের তো ধারণা — শোকের প্রকাশে যদি আড়ম্বর না থাকে তবে ভালোবাসার গভীরতায় ঘাটতি থেকে যায়। যে ঘাটতি দেখা গিয়েছিল এই গল্পের প্রধান চরিত্র সীতার মধ্যে। সীতার একমাত্র সন্তান শ্যামলী, পেন্সিলের ছুরিতে হাত কেটে অকস্মাৎ মারা গিয়েছে। কিন্তু সেই হিসেবে তার মায়ের যা সহজ স্বাভাবিক চিত্র হবার কথা ছিল তা নেই। সীতা শোকে আকুলা হয়ে ওঠেনি।

সুখে-দুঃখে আত্মীয়-স্বজনেরা না এলেও শোকে তো তারা আসবেনই। তাই সীতার আত্মীয়-স্বজনেরাও যথারীতি এক এক করে এসে সকলেই অত্যন্ত সুচারুভাবে বুঝিয়ে গেলেন যে এগুলো হচ্ছে সব 'কম্মফল'। মানুষকে তার কর্মফল ভোগ করতে হয়।

— "অধৈর্য্য হয়ো না মা, সোমেনের মুখ চাও, পৃথিবীর নিয়মই এই, অধৈর্য্য হলে চলবে কেন মা, কি করবে? সবই কর্মফল —" *(পৃ. ২২০, গল্প সমগ্র, ৩য় খণ্ড)*। এই মৃত্যুটা বিধাতার হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতা নয়, দৈবের কোন খেয়াল নয়, ভগবানের অন্যায় অবিচার নয় — সব 'নয়' এর মাঝখানে শুধুমাত্র 'কর্মফল' বলেই তাকে মেনে নেওয়াতে বাধ্য করছেন তার আত্মীয় পরিজনেরা। সীতার আহারের সময় তাকে পরিবৃত করে আছেন আত্মীয়রা এবং নিদ্রার সময় আগলে রেখেছেন — এক

জ্যাঠতুতো খুড়শাশুড়ী, যিনি দেশ থেকে এসেছেন দুটি আইবুড়ো মেয়ে, একটি ক্ষ্যাপাটে ছেলে, একটি বিধবা বৌ, আর গুটি তিন-চার নাতি নাতনী নিয়ে। "সোমেনের কাছে না শুলে তার ঘুম আসে না।" *(পৃ. ২২২, ঐ)*। অর্থাৎ মেয়ের জন্য শোক তাপে গ্রাস করারই কোন সুযোগ সম্ভব হচ্ছে না, সে কারণে তার চিত্তে কোন রেখাপাতই গভীর হতে পারছে না। এই সান্ত্বনাপূর্ণ পরিবেশ থেকে সে পালাতে চাইছে, সোমেনের সঙ্গ চাইছে। তাই বাধ্য হয়ে সীতা ও সোমেন প্রায় একরকম বাড়ি থেকে পালিয়েই এলো বলা চলে।

একজন পুরুষের কাছে ভারবহ বস্তু হচ্ছে সবচেয়ে ভারাক্রান্ত নারী হৃদয়, তাকে বয়ে বেড়ানো পুরুষের পক্ষে সত্যিই দুর্লভ। তাই সীতাকে নিয়ে বেরোবার পর তার ডালমুট কিনে খাওয়া, মাটির ভাড়ে অখাদ্য চা খাওয়া দেখে সোমেন ভেবেছে তার স্ত্রীর পক্ষে হয়তো শোকটা সামলোনো সম্ভব হয়ে উঠেছে। কারণ পুরুষ চায় ক্ষতিকে মেনে নিয়ে শোককে চাপা দিতে, যা নাকি নারীদের পক্ষে সম্ভব হয় না। সীতা যদিও পালিয়ে এসে একটা অখ্যাত স্টেশনে নেমে বলে উঠলো — "উঃ বাবা, বাঁচা গেছে। 'কর্মফলের' হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া গেল তো তবু।" *(পৃ. ২২৩, ঐ)*। কিন্তু স্টেশনে নেমে পরিবেশের এই অদ্ভুত পারি-পার্শ্বিকতায় চিতা সাজানো পড়ন্ত বেলার আকাশের দিকে তাকিয়ে সীতার যেন এতদিনে সত্যিই মনে হলো শ্যামলী নেই। চিৎকার করে বুকফাটা আর্তনাদে ফেটে পড়ল মায়ের প্রাণ। নিমেষের মধ্যে অজস্র লোক জড়ো হয়ে গেল চারপাশে। সোমেনের কোলে মাথা রেখে সীতা অঝোর ধারায় কেঁদে চলেছে, যা এই ছত্রিশ দিন করেনি। ওখানেও ঝাড়ুদারণী হরিজন মহিলাটি বোঝাচ্ছে — "ভগমানকো কুচ্ছ দোষ না আছে, এতো তুম্‌কো করমফল।" স্টেশন মাস্টার বলতে এসেছেন — "শুনলাম সমস্তই। কি আর করবে বলো মা সবই —" *(পৃ. ২২৪, ঐ)*। সীতা নিবিড় করে নিজের মধ্যে শ্যামলীর বিয়োগ ব্যথাকে ধরতে পারছে না, কারণ ঘরে বাইরে সর্বত্রই কর্মফলের ফলভোগের কথা শুনে শুনে। শোকের কাঁটার জ্বালায় সীতা অস্থির হয়ে গিয়েছে। সে তার স্বামীর সঙ্গে একান্তভাবে শোক-দুঃখ ভুলতে চাইছে দুজনে ভাগাভাগি করে নিয়ে। কিন্তু তার এই স্থানটাকে কেউ ধরতে পারছে না। একজন প্রাণের মানুষের বিয়োগে আর একজনকে যে তার মন ভীষণভাবে কাছে চাইছে সে বোধটুকু কারও মধ্যে জাগছে না। লেখিকা আশাপূর্ণা দেবী মানব চরিত্রকে কত বিচিত্রভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন তারই ফলশ্রুতি এই গল্পটি। জীবনকে নানাভাবে দেখার চোখ আছে বলেই না এরকম গল্পের বিষয় ও তার চরিত্রগুলি এত স্পষ্ট রূপ পেয়েছে।

বিধবাকে নিয়েই তৈরি হয়েছে আর একটি গল্প **'নেশা'** *(১৩৫৮ বঙ্গাব্দ)*। অল্পবয়সী বিধবা শান্তা পিতৃগৃহে ভ্রাতার সংসারেই অবস্থান করছে পতি বিয়োগের পর থেকে। দুখানা কাঁটা আর পশমের গোলা নিয়ে তার সারাদিন এবং রাতের প্রায় অর্ধাংশ কেটে যেত। শান্তার ভাইঝি কৃষ্ণা, ছোট বোনেরা, মা-বাবা — এদের নিয়ে সংসার; আর পার্থ এদের বাড়িতে রোজ সন্ধ্যায় নেশাগ্রস্তের

মতো আসে আড্ডা দিতে। নির্ভেজাল আড্ডা, কৃষ্ণার সঙ্গে সে সর্বদা বসে আড্ডা দেয় তা নয়, আলোচনা সকলের সঙ্গেই হয়। সকলেই যেন অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে এক নেশায় জড়িয়ে গিয়েছে। কিন্তু আড্ডার মধ্যে থেকেও এসবের বাইরে পশম আর কাঁটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে থাকতেন শান্তা এবং অদ্ভুত এক নীরবতার প্রতিমূর্তি হয়ে। শান্তার পাহারাকে সামনে রেখেই কৃষ্ণা এবং পার্থ গল্প গুজব বা পড়াশোনা সম্পর্কিত আলোচনা চালাত। এভাবে ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে সূক্ষ্ম সম্পর্ক দানা বাঁধতে শুরু করলেও বাড়িতে সকলের মুখে মুখে যখন পার্থর প্রতি সন্দেহের জাল বিস্তার হতে শুরু করল তখনই পার্থ এবং কৃষ্ণা নিজেদের মধ্যে কথা বলে নিজেদের দূরে সরিয়ে নিল। আপাতদৃষ্টিতে কৃষ্ণা ও পার্থর সম্পর্ক নিয়েই সকলে ভাবলেও গল্পের অন্তর্নিহিত আকর্ষণ কিন্তু অন্যদিকে বাঁক নিয়েছে। পার্থর সন্ধ্যেবেলা আসা বাদ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সবার ভেতরে সেই বোধটা এল ঠিকই, কিন্তু শান্তা যে প্রস্তরমূর্তির মতো ছিল, তাতে যেন দোলা লাগল। তার হাতের পশম বোনা বন্ধ হয়ে গেল, পাওয়ারফুল বাল্বটাকে যেন অনেক কমজোরী মনে হতে লাগল। যন্ত্রের মতো যার দুই হাত চলত কিন্তু কণ্ঠ থাকত বাক্‌রুদ্ধ, সে ধীরে ধীরে কথা বলতে শুরু করল, কিন্তু হাতের কাজ গেল বন্ধ হয়ে।

পার্থর অনুপস্থিতির কারণ হিসেবে শান্তাকে যখন কৃষ্ণার বাবা গণ্য করলেন তখন তিনি শুধু শান্ত গলায় এই সম্পর্কে প্রথম উক্তি করেন — "আমি আজ পর্যন্ত পার্থর সঙ্গে কোন কথা বলি নি।" *(পৃ. ২৫৫, গল্প সমগ্র, ৩য় খণ্ড)*। কিন্তু তিনিই বললেন শেষ কথা পার্থকে, যখন তাকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আসা হল, অথচ যে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু সেই কৃষ্ণারই কোন দেখা না পেয়ে কিছুক্ষণ বক্‌বক্ করে পার্থ যখন চলে যেতে চাইল — "শোন, চলে যাচ্ছ?

... একদম আসো না কেন আর? দাদা দুঃখিত হন, বলেন — 'বিশ্রী ফাঁকা লাগে সন্ধ্যেটা।' তোমার আসা অনেকটা নেশার মতো হয়ে গিয়েছিল! এসো, বুঝলে? যেমন আসতে রোজ। আসবে তো?" *(পৃ. ২৫৭, ঐ)*। কৃষ্ণা-পার্থর প্রেমের অঙ্কুরোদ্গম অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা, কিন্তু পার্থর আগমনে শান্তার এই অপেক্ষা, ভালোলাগা, অনুরাগ প্রমাণ করে যে শান্তা ফুরিয়ে যায় নি। তারও ভেতরে ভালোবাসার ফল্গুধারা বয়ে চলে, সেও কারো জন্যে অপেক্ষা করে, কারো জন্যে তার কাজের প্রতি অমনোযোগিতা — যা প্রেমিকা হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ তা যেন ফুটে উঠেছিল শান্তার মধ্যে। স্ট্যাচুর মতো বসে থাকলেও তার ভেতরে যে স্বপ্নের জাল ক্রমাগত বিস্তারিত হয়েই চলছে, বাইরে থেকে তার বিন্দুমাত্রও বোঝা যেত না। সারাটি দিন শুধু কৃষ্ণা নয়, শান্তাও যে এই ক্ষণটির জন্য আগ্রহ ভরে অপেক্ষা করত, শুষ্ক মরুভূমিতে বারি সিঞ্চন করেছিল পার্থ, ফুরিয়ে যাওয়া জীবনে একটু আশার আলো বিকিরিত করেছিল। স্বপ্নের জগতে বিচরণ করে মানুষের নেশায় বিভোর হয়েও যে একটি বিধবা নারী অনেক অনুশাসনের মধ্যে আবদ্ধ রেখে বাঁচতে চায় — একথা যেন শান্তার

কথায় প্রকাশ পেল। শুধু একটু উপস্থিতিমাত্র, তার জন্য সকাতর অনুরোধ। সে কথা বলতে চায় না, বেরোতে চায় না, দেখারও কোন উৎসুক্য নেই, কেবল উপস্থিতির আনন্দেই সে যেন পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভ করতে চায়।

সংসারে সংসারী মেয়েরা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কতটা পরিবর্তিত হয়ে যায় তার প্রমাণ মেলে **'দুজনে একলা'** (১৩৫৮ বঙ্গাব্দ) গল্পে। অলকা আর ইন্দুভূষণ বিয়ের পর একান্নবর্তী পরিবারের সকলের সঙ্গে একবার পুরী গিয়েছিল। সকলে মিলে ভালো কাটালেও নববিবাহিত দম্পতির কথা কেউ মাথায় রাখে নি। গ্রুপ ফটোর বাইরে তাদের কোন ফটো পর্যন্ত তোলা হয়নি। অনেকজন একত্রে যাওয়ায় পুরুষ এবং মহিলাদের আলাদা দুটো ঘরে সকলের শোবার ব্যবস্থা হয়। নবদম্পতি অনেকবার আলাদা হতে চেয়েও পারে নি কোনভাবেই। তাই সেখান থেকে ফিরেই অলকা ঠিক করে রাখে আবার সে পুরী যাবে, তবে এবার 'দুজনে একলা'। আর সেই থেকে স্বপ্নের দিনগুলোর জন্য মনে মনে চলে তার মানসিক প্রস্তুতি। সংসারে ধীরে ধীরে একাধিক সন্তানের জন্মদান, তাদের লালন-পালন, বিবাহাদি ও অন্যান্য কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে পুরী যাবার বাসনাটিকে স্মরণ করে নেয়। অবশেষে এল সেই সুযোগ, বিবাহের সাতাশ বছর পরে চললেন দুজনে পুরী।

ছেলেবেলার দুখানা রঙীন সিল্কের শাড়ী, বিয়ের বেনারসীর চৌকো গলা, ঘটি হাতা ব্লাউজখানি, একশিশি গন্ধ তেল, একটা স্নো, একটা পাউডার — অত্যন্ত সাবধানে ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়ে পড়লে এগুলো বাক্সে ভরলেন। জীবনের শেষপ্রান্তে এসে হয়তো পৌঁছলেন কিন্তু রয়ে গেলেন দ্বৈতজীবন শুরুর দিনগুলোতে। যে সময়ে স্বপ্নগুলো দেখতেন সেই লালিত স্বপ্নগুলোকে সার্থক করে তুলতে দুজনেই বেশ উৎসাহী হয়ে উঠলেন। কিন্তু যখন গিয়ে পৌঁচেছেন তখন শুরুতে উদ্যম থাকলেও ধীরে ধীরে বয়সের ধর্মের হাতে নিজেদের যেন সঁপে দিতে বাধ্য হলেন। তাদের মনের জোর ছিল এই ভেবে যে, "বুড়ো না সাজলে সংসারে ভালো দেখায় না, বুড়োমি না করলে সমাজে স্থান থাকে না, বুড়ো হওয়াতো এইজন্যেই? নইলে মনেপ্রাণে কি আর বুড়ো হয়েছে তারা? *(পৃ. ২৬৩, গল্প সমগ্র, ৩য় খণ্ড)* অর্থাৎ যৌবনের বেদনারসে সেই দিনগুলোকে রাঙিয়ে তুলতে উভয়েই বদ্ধপরিকর ছিলেন। সেই সময়ে যে যে বিষয়গুলো অলকার খুব শখের ছিল সেগুলোকে যেমন — বালিতে পা ডুবিয়ে হাঁটা, দুজনে ছবি তোলা, সমুদ্রের ধারে বসে দুজনের রবীন্দ্রনাথের চয়নিকা পড়া, রঙীন শাড়ীতে নিজেকে জড়িয়ে নিয়ে বিহঙ্গের মতো উড়ে যাওয়া — এসবের মধ্যে ডুবে গিয়েছিলেন তারা। অকস্মাৎ ইন্দুভূষণের হাঁচি মনে করিয়ে দেয় প্রকাশ করতে না চাওয়া প্রৌঢ়ত্বের কথা। উদ্‌ভ্রান্ত যৌবনে যে শরীরের শক্তির একটা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে, যা কিনা এ বয়সের নেই তা তাদের মানতেই হল। স্বামীর পাঁজর কাঁপানো হাঁচি দেখে ব্যস্ত অন্যমনস্কতায় রুমালে মোড়া শখের চটি জোড়া আর ইন্দুভূষণের শখের চয়নিকা একত্রে বাক্সে তুলে রেখে 'ভীকস্' এর শিশি খুঁজতে বসে

অলকা। সংসার ছেড়ে আসবার সময় বার বার পাখী পড়া করে বোঝানো, ভাঁড়ার, বাসনপত্র, ঘর-দোর এবং এখানে নিয়ে আসার জন্য ওষুধপত্র রান্নাবান্নার সরঞ্জামের আয়োজন, স্বহস্তে পাক এগুলোই নববিবাহিত দম্পতিকে তাড়া করত না। যা আজ সংসারী অলকার বিশেষ চিন্তা ভাবনার বিষয় হয়ে উঠেছে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে নারীদের সাবধানতা, চিন্তাভাবনা ও সচেতনতা অনেক বৃদ্ধি পেয়ে যায়, যা নাকি পরিপূর্ণভাবে রোমান্টিক রসে আর জারিত করতে পারে না অনেক ইচ্ছে থাকলেও — এটাই লেখিকার প্রতিপাদ্য বিষয়।

নারীরা আজ স্বাধীনভাবে সংসার যাপন করতে চাইছে। অর্থাৎ একান্নবর্তী পরিবারগুলো কিভাবে মুখ থুবড়ে পড়তে চাইছে কিভাবে সেই জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে তাই দেখানো হচ্ছে **'শাড়ী মাহাত্ম্য'** (১৩৫৮ বঙ্গাব্দ) ও **'স্বাধীনতার সুখ'** (১৩৫৮ বঙ্গাব্দ) নামক গল্পে। একান্নবর্তী পরিবারের যে একাত্মতা, আন্তরিকতা এর মধ্য থেকে ধীরে ধীরে ভাঙ্গনের বীজ অঙ্কুরিত হচ্ছে। আর এর সূত্রপাত ঘটাচ্ছে নারীরা, তাদের মধ্যে স্বাধীনতার আস্বাদবোধের জাগরণ ঘটছে। নিজেদের স্বামীর রোজগারের হিসাব বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে। হৃদ্যতা এবং স্বার্থ কখনো পাশাপাশি থাকতে পারে না, তাই হয়তো স্বার্থবোধ যখনই জাগ্রত হচ্ছে তখনই হয়তো আন্তরিক প্রীতিময়, দ্বন্দ্বপূর্ণ, সুখ-দুঃখ মিলেমিশে এক হয়ে যাওয়া একটা মেলবন্ধনে ভাঁটা পড়েছে। সবচেয়ে আশ্চর্য যে, সংসারে ভাঙনও ধরাচ্ছে কোন না কোন নারী, তাও আবার অন্য এক নারীর দ্বারা প্ররোচিত হয়ে, সেও হয়তো কোন এক নিকটজনও হতে পারে। সুতরাং অন্দরমহলে থাকলেও নারীর পক্ষেও বহির্মহলে ফাটল ধরানো অত্যন্ত সহজ হয়ে উঠছে যেন।

'শাড়ী মাহাত্ম্য' গল্পে এমন একটি বাড়ির কথা বলা হচ্ছে যেখানে এগারোজন লোক বাস করে কিন্তু সেখানে একজনও স্ত্রীলোক নয়। বিধবা, বিপত্নীক, বিরহী আর অবিবাহিত এই চাররকমের নারী ও পুরুষ মানুষে বাড়ি ভর্তি। তিনভাই, দুজন ভাগ্নে, একটা জ্ঞাতি কাকা, একজন পাতানো মামা, একজন বিধবা পিসি ও জেঠি এছাড়াও রয়েছে দুজন চাকর। তাই বারান্দার আগাগোড়া একখানা গিট বাঁধা লম্বা দড়িতে শুধু ধুতিরই সমারোহ দেখা যায়। ঠিক সেই বাড়ির উল্টো পাশের বাড়িতে থাকেন কথক, তারই নীচতলার মাসিমার ঘরে এলেন বর্ধমানের ভাইঝি। আর তখনই মুখোমুখি দুই বাড়িতে শুরু হল আনাগোনা — নেমন্তন্ন, থিয়েটার দেখা, পিকনিক যাওয়া, ঘুরে বেড়ানো 'রবীন্দ্র সদন', দক্ষিণেশ্বর, বেলুড়, বোটানিক্যাল গার্ডেনে। প্রথমে পরিবারকেন্দ্রিক, তারপর ধীরে ধীরে সকলে সরে পড়লেও রয়ে গেলেন বর্ধমানিনী এবং তিনজনের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাটি। এভাবেই তিনি প্রবেশ করলেন সেই এগারোজনের সংসারে। আর সংসার জীবনের শুরুতেই সংসার এবং গণিতশাস্ত্র পাশাপাশি চলতে থাকল। আর সেই ভ্রান্তিবহুল অঙ্ককে সুস্থ এবং সঠিক রূপ দিতে অনেক বিয়োগ করতে হল এবং বাড়ির শোভা বর্দ্ধন করতে কিছু যোগও হল। বিয়েবাড়ির আবহাওয়া থিতু হবার

সঙ্গে সঙ্গেই মামাটি বিদেয় হলেন, এর কিছুদিন পর গেলেন কাকা, নানা বিচার বিবেচনার পাল্লায় ওজন করে সরানো হল ভাগ্নেদের। একদিন ভরদুপুরে একখানি ভাড়াটে গাড়ীতে চড়ে বিধবা পিসি জ্যেঠি জোড়াও বিদায় হলেন। থাকলেন শুধুমাত্র জ্যেষ্ঠের সহোদর দুজন। ধীরে ধীরে জায়গা করে নেওয়া — একটি দুটি করে এখন সারা বাড়িতে শুধু শাড়ীর সমারোহ। ঢাকাই, ফরাসডাঙা, বিষ্ণুপুরী, ধনেখালি এসবের মধ্যে গিঁট বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে দু তিনখানা অতি মিহি ফুলপাড় আটচল্লিশ ইঞ্চি ধুতি। তিনখানার বিরক্তিতেও আকাশে মেঘ জমে, ধুলো বাতাস সঞ্চিত হয়। গুমোট অবস্থায় একদিন কালবৈশাখী আসে, উড়ে যায় দুখানা ধুতি অর্থাৎ সহোদররাও বাড়ি ছাড়েন। যোগ হয় আরো দুখানা চাকর, যারা একা একা বাড়ির শ্রী ফেরাতে এবং ধরে রাখতে পারছিলো না। একটি নারী এতবড় সংসারটাকে ভেঙে খান্ খান্ করে দিয়েছে, শুধু তাই নয় সেই টুকরোগুলো যে কোথায় ছিটকে পড়েছে তার খোঁজও কেউ যেন আর রেখে উঠতে পারে নি। নারী কল্যাণী, শ্রীময়ী হবার বদলে যেন সর্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে সব কিছু গ্রাস করে একাই আগ্রাসী দৃষ্টিতে বিচরণ করছে।

অপর গল্পটি পাচ্ছি **'স্বাধীনতার সুখ'** (১৩৫৮ বঙ্গাব্দ), যেখানে নারী একান্নবর্তী পরিবারের গণ্ডী ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পেরেছে। এই গল্পটি আমাদের সামনে নতুন এক জগতের উন্মোচন ঘটায়। ভাঙন ধরে শক্তপোক্ত ভিতে, নড়ে ওঠে প্রাঙ্গণ, টুকরো হয়ে যায় সংসার। এই ভাঙনে যে ইন্ধন যোগায় সেও কোন না কোন এক নারী বটে। তাপস, স্ত্রী চঞ্চলা, তাদের সন্তানেরা ও বাড়ির অন্যান্যরা — মা, দাদারা, বৌদিরা সকলে মিলে বেশ সুখের সংসার। সকলে ছোটবৌমা বলতে অজ্ঞান। কিন্তু চঞ্চলার দিদি যিনি নিজেও একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে আজ একান্তে সংসার পেতেছেন, তিনি ছোটবোনের সংসারে ভগ্নদূতের মতো এসে হাজির হয়েছেন। আর স্বহস্তে এবং নিজ দায়িত্বে এই ভার স্কন্ধে তুলে নিয়েছেন। প্রথম দিকে ইস্কুল মাস্টার তার মোটা মাইনের সরকারি চাকুরে বড় শ্যালিকাকে সম্মান করলেও পরে যেন তাকে অপছন্দই করতেন, কারণ স্পষ্টই ধরা পড়ছে সংসারের মধ্যে একটা গণ্ডীবদ্ধ রেখা টানতে তিনি উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছেন। বোনকে স্বাধীনতার স্বাদ আস্বাদনে রুচিশীল করে তুলতে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছেন।

শেষ অবধি চঞ্চলার আলাদা বাড়ি হোল। তার ধীরে ধীরে মনে হতে লাগলো কেউ কোনরকম কটুকথা না বললেও তার স্বচ্ছন্দ চলাফেরায় কোথায় যেন ছন্দ পতন ঘটছে। পুরুষ-নারী মিলিয়ে সংসারে পাঁচ-ছ'জন ব্যক্তি মাথার ওপরে অভিভাবকের স্থান দখল করে রয়েছেন, সুতরাং একান্নবর্তী পরিবারে স্বচ্ছন্দ পদচারণা তার কোনদিনই সম্ভব নয়।

"মাথার ওপর তিনজন কর্তা, পাঁচজন গিন্নী!... এই হিমালয় পর্বত ভেদ করে স্বাধীনতার সূর্যরশ্মি কখনো কি দেখা দেবে চঞ্চলার অন্ধকার জীবনে?" *(পৃ. ৩০৫, গল্প সমগ্র, ৩য় খণ্ড)* অবশেষে তারা একটা ভাড়া বাড়ি দেখে উঠে যায়। নিজের ইচ্ছেমতো রান্নাবাড়া, সংসার ধর্ম করা, সিনেমা-থিয়েটার

দেখতে যাওয়া — সবকিছুতেই যেন আনন্দের বন্যা বয়ে যাবার জোগাড়। কিন্তু এর যে অসুবিধেও আছে, তা আর এতকাল ভাবেনি, শুধু ক্ষীরের মতো স্বাধীনতাটাকেই আস্বাদ করতে পারবে বলে উৎসাহ বোধ করেছে। দু'খানা টিকিট এনে স্বামী-স্ত্রীতে সিনেমা দেখতে চেয়েছে কিন্তু মেয়েদেরকে রেখে যাওয়ার জায়গার অভাব এবং চিন্তা যেন বিকট রূপ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। মেয়েদের দিদির কাছে রেখে গেলেও দিদি যে বেশ অসন্তুষ্ট তা ভালভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন, অথচ এই দিদিই যত্নের সহিত ভগ্নিটিকে সকলের কক্ষচ্যুত করে আপন কক্ষপথে পরিভ্রমণ করতে শিখিয়েছেন। দিদির বাড়ি থেকে মেয়েদের নিয়ে ভাড়াবাড়িতে ফেরার পর দেখে, দু'একটা কাঁথা বালিশ ছাড়া আর সব চুরি হয়ে গেছে। অর্থাৎ একা থাকার সব সমস্যাগুলো যেন মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। জীবনচক্র ও জীবন অভিজ্ঞতার এও একটা দিক।

অন্তঃপুরিকারা অন্তঃপুর আলো করে থাকলেও তাদের আলোড়নের ঢেউ সংসারের বহির্মহলেও এসে ধাক্কা মারে, ফলে ভাই ভাইয়ের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে অচিরেই। এটাও অন্দরমহলের নারীরই একটি চিত্র। ভাঙনের স্রোত যেমন বহন করে আনে নারী, আবার নারীই কিন্তু প্রয়োজনে ভাঙন রোধ করে তার নিপুণ অভিনয়ের দ্বারা। সেই চিত্র আমরা দেখতে পাই **'অভিনেত্রী'** (১৩৫৮ বঙ্গাব্দ) গল্পে। সংসারে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য সে ব্রত গ্রহণ করেছে। কোনমতেই সংসারে শান্তির বিঘ্ন ঘটানো তার কর্ম নয়। গল্পের নায়িকা অনুপমা পতিগৃহে আছেন, সেখানে আগমন ঘটেছে তার পিতার, কন্যা সন্দর্শনের নিমিত্ত। পিতা-পুত্রীতে কথা হচ্ছে খাবার জায়গায় বসে। শ্বশুরের গৃহে নিজের বাবা-ভাই যে বিশেষ অতিথি, তাদের যে যথেষ্ট যত্ন-আত্তি করতে হয়, সে বিষয় অনুপমার জানা; এতেই বোঝা যায় সংসারের রীতিনীতি সম্পর্কে সে যথেষ্ট অভিজ্ঞ। তিনজনের খাবার ভুলিয়ে ভালিয়ে একজনকে খাওয়ানোর কাজও অত্যন্ত সুচারুরূপে সম্পন্ন করার মধ্যে গৃহিণীপনা যথেষ্ট থাকে বৈকি। সেই অনুপমা যে কতটা অভিনয় নিপুণা তার কিছুটা পরিচয় নেওয়া যাক্ —

"আমাকে নিয়ে যাবার কথা বলবে তো বাবা?" *(পৃ. ৩২৩, গল্প সমগ্র, ৩য় খণ্ড)*। পিতার সঙ্গে খাবার পর চলতে গিয়ে অস্ফুটস্বরে আড়িপাতা কারো নজর এড়িয়ে বলার মধ্যে পিতৃগৃহে যাবার আকুলতা ফুটে উঠেছে। আবার শ্বশুরকে খেতে দেবার পর শ্বশুর পুত্রবধূর যে বাক্যালাপ চলছে তা যেন আমাদেরকে আর এক অনুপমার সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দেয় — "তোমার বাবা যে নিয়ে যেতে চাইছেন তোমাকে।... আমি তাই তো তোমার বাবাকে কথা দিলাম।" — শ্বশুরের কথার উত্তরে এখন অনুপমা বলে — "সে কি বাবা! কথা দিলেন কি! মার এই শরীর খারাপ, দুদিন বাদে ঠাকুরঝি আসবেন! বামুন ঠাকুর 'দেশে যাবো' বলছে —" *(পৃ. ৩২৫, ঐ)*। সংসারের জন্য চিন্তায় মুষড়ে পড়া অনুপমাকে দেখে বোঝার উপায় নেই যে, সে কিছুক্ষণ আগে বাবাকে ধরে পড়েছিল,

তাকে বাড়ি নিয়ে যাবার জন্য, পরদিন সকাল অব্দি অপেক্ষা করবার তরটুকও তার সইছিল না।

সে সময় থেকে প্রায় পঁচিশ বছর পরে একই স্থানে একই পাত্র-পাত্রীতে ঘটনা ঘটছে, তবে তা একটু আলাদা রকম। অনুপমা গৃহিণী, গৃহকর্তা তারানাথ, আর তাদের সঙ্গে রয়েছে বেকার পুত্র ও প্রায় বিবাহযোগ্যা কন্যা। এখানেও চলছে সেই অভিনয় পর্ব। স্বামীকে সুখী রাখতে তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা এবং পুত্রকে ভালো রাখতে আবার তার সঙ্গে কথা বলাও সেই রকমভাবে যাতে সেখানেও সে ভালো একজন মা হয়ে থাকতে পারে। উচিত-অনুচিত বোধ তারও আছে, অনেক প্রশ্নের উত্তরও যথাযথভাবে সময়মতোই তার জিভে চলে আসে। কিন্তু সেগুলোকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে সব ভুলে আবার হেসে ওঠে, আবার সবকিছু সুন্দরভাবে সাজিয়ে নিয়ে সকলকে একসূত্রে গ্রথিত করে। এ থেকে বোঝা যায়, নারীমাত্রেই অভিনেত্রী এবং এই মূলধন যার যত বেশি সে তত সুপ্রতিষ্ঠিত্ হতে পারে সংসারে। নারী যদি নদীর মতো সত্যিই আপন বেগে চলতে চায়, তবে তাকেও পার হতে হবে অজস্র বাধা-বিঘ্ন; প্রয়োজনে চলার গতিপথকেও করতে হতে পারে পরিবর্তন। নদীর মতো এক কূল ভেঙ্গে আর এক কূলকে গড়ে তুললে নারীর চলে না, তাকে সংসারও রক্ষা করতে হয় সুচারুরূপে, আবার নিজের দাঁড়াবার স্থানও শক্তপোক্তভাবে ঠিক রাখতে হয়। এই ক্ষেত্রটিতে নারী স্বয়ংসম্পূর্ণ নিজের মধ্যে। একাধারে জায়া ও অপরদিকে জননী এই দুটি ধারাকে নিজের মনের মতো করে পরিচালনা করতে পারে। কারণ পুরুষ জাতি কর্মজগতে পরিপূর্ণরূপে স্বয়ং বিরাজিত হলেও সংসার জীবনে কিন্তু তাকে নারীর পক্ষপুটে এসে আশ্রয় নিতে হয়। সমাজে একটা শ্রেণির নারীরা, যেমন — আশ্রিতা, বিধবা — এরা ছাড়া অন্যান্য নারীরা অনাদর, অবহেলাকে বড্ড ভয় পায়। তাই তারা সুন্দরভাবে অভিনয়ের দ্বারা সংসারকে মধুময় করে তোলে। আবার একথাও সত্যি যে, নারীর এই বিশাল পক্ষপুটের আশ্রয় না পেলে পুরুষ জাতি স্নেহ-মায়া-মমতা লেশহীন উন্মাদের মতো উন্মুক্ত এক পৃথিবীতে লাগামছাড়া হয়ে বাস করতে পারতেন না। তাই নারীকে হয়তো যে ছলনার আশ্রয় নিতে হয় তা এক প্রকার করুণারই নামান্তর মাত্র। লেখিকা আশাপূর্ণা দেবী এই সত্যি কথাটি সুন্দরভাবে বলেছেন — "ছলনাটা তার ছলনা নয়, করুণা!... এই করুণার আওতা ছাড়িয়ে ছলনা লেশহীন উন্মুক্ত পৃথিবীতে বে-পরোয়া শিশু ভোলানাথের দলকে যদি মুখোমুখি দাঁড়াতে হ'ত — ক'দিন লাগতো পৃথিবীটা ধ্বংস হতে?" *(পৃ. ৩৩২, ঐ)* অর্থাৎ নারীর এই ছলনা-করুণাই সংসারকে লাবণ্যে পরিপূর্ণ করে তোলে।

'নীলকণ্ঠ' (১৩৫৮ সন) গল্পে আমরা সেই শ্রেণির এক নারীকে পাই যারা অত্যন্ত সহজলভ্য এবং যাদের কথা কেউ কখনো ভাবে না। এক, আশ্রিতা ও আর এক বিধবা — এদের জীবনে দুঃখ-কষ্ট-সাধ-আহ্লাদের কথা কখনো কারো ভাবনার রাজ্যে ঠাঁই পায় না। বিমলা হচ্ছে সেরকমই একটি মেয়ে যে ছোটবেলাতেই বাবা-মা উভয়কে হারিয়ে কাকার সংসারে মানুষ। যাকে মানুষ হয়ে ওঠা

বলা চলে না। বলতে হয় বেঁচে থাকা। এই বেঁচে থাকার জন্য উদয়াস্ত তিনটা কাজের লোকের কাজ একা হাতে করতে হয়। বিনিময়ে পায় শুধু সারা বছরে তিনখানি কাপড় ও দুবেলা দু'মুঠো ভাত। শুধু যে কাকা-কাকীমা তাকে অবহেলা-অবজ্ঞার চোখে দেখতেন তাই নয় পাড়া প্রতিবেশীরা পর্যন্ত তাকে নিতান্ত অবহেলার বস্তু বলে ভাবতেন, তাকে সযত্নে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করতেন। যে সমস্ত মেয়েরা বিমলার কোলে চড়ে বেরিয়েছে, তারা পর্যন্ত শ্বশুরবাড়ি চলে গেলেও বিমলার ভাগ্যে তা হয়ে ওঠেনি।

বিমলার অত্যন্ত সহজ-স্বাভাবিক কথাবার্তাগুলোও প্রায় সকলের অপছন্দ হয়। কিন্তু তার নারী হৃদয় স্বাভাবিক জীবন পাবার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে — সে চায় একটি সংসার, স্বামী, সন্তান। চিরন্তনী নারীর মতো নিজেকে সেখানে সার্থক করে তুলবে। সে দিকটি ফলপ্রসু হয়ে উঠছে না দেখেই হয়তো পুরুষ জাতির নিকট নিজেকে আকর্ষণীয় করে তুলতে নানা চেষ্টা চালায়। বিমলার কাকীমা সুবর্ণলতার সখী-স্থানীয়া হলেন দোতলার পারুল। তারা নীচতলায় ভাড়া থাকে। আর পারুলের দেওর হল নীরেন, যিনি কলেজে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত। তিনিই বিমলার অবস্থা দেখে তাকে বিবাহ করেন অবশেষে। কারণ একটি অসহায়া মেয়েকে দিয়ে ঝিয়ের কাজ করানো, তাকে নিয়ে নিন্দাচর্চা ও সমালোচনায় মুখরিত করে তুলে আশেপাশের অন্যান্য নারীরা যে কি নিষ্ঠুর আনন্দলাভ করতেন, তাই নীরেনকে নাড়া দিয়েছিল। নারীদের অসহায়তাকে যে নারীরাই ব্যবহার করে, মানুষের দুর্বল জায়গার সুযোগ পেলে যে নারীরাই বেশি আঘাত করতে ভালোবাসে, এটা তার আর একটা প্রমাণ। কিন্তু মুখরা বিমলা তার জীবনের পরিণতিতে একেবারে থমকে গিয়েছে। জীবনে যে কোন প্রকার আমোদ-আহ্লাদ, শখ আকাঙ্ক্ষা বলে কিছু জানে না, জীবনের নন্দনকাননে তার প্রবেশাধিকার কখনো হতে পারে বলে যে কখনো ভাবেনি সে অকস্মাৎ এত প্রাপ্তির আনন্দে যেন মূক ও বধির হয়ে গিয়েছে। অত্যাচারিতা, লাঞ্ছিতা, মেয়েরা এভাবে সুপথে সহজে পা বাড়াতে পারে না, যেমন হারিয়ে গিয়েছিল 'সর্পশিশু' গল্পের ফেলি। এরাও যে মানুষ, সামান্যতম ভালো দিকগুলোকে ভোগ করার যে ইচ্ছা বা প্রয়োজন এদেরও হতে পারে তাদের কথা বিশেষতঃ আমাদের নারীসমাজ, যারা তাদের খাটায়, সেই অন্দরমহল একবারও ভাবে ন। লেখিকা এই দিকটাই আমাদের দেখিয়েছেন। নীরেন যদি না ভালোবাসত তবে বিমলাও হয়তো ফেলির মতো একদিন হারিয়ে যেত।

নারীচিত্তের জাগরণের চিত্র দেখা যায় **'ইস্পাতের পাত'** (১৩৫৯ বঙ্গাব্দ) ও **'একটি ফুটো পয়সার জের'** (১৩৫৯ বঙ্গাব্দ) গল্পে। নারীকে পুরুষ চিরকালই নিজস্ব সম্পত্তি ভেবে এসেছে। সেই ভাবনা এখনো বজায় থাকলেও তাতে এসেছে কিছুটা শিথিলতা; আর এই শিথিল ভাব অবশ্য নারী নিজে লড়াই করে অর্জন করেছে। আর যখনই নারী নিজেকে নিজে তিল তিল করে গড়ে তুলছে তখনই ক্রমশঃ তৈরি হচ্ছে নিজস্ব সত্তার অবয়বও। সেই সত্তাই শিখিয়েছে প্রতিবাদ করতে, নিজেকে

মেলে ধরতে এবং প্রতিষ্ঠিত করতে। এই আত্মজাগরণের চিত্রই দেখা যায় উপরোক্ত দুটি গল্পে। দুখানি গল্পই পুরুষের তথা স্বামীর দিক থেকে আঘাত পেয়ে গড়ে ওঠা।

'ইস্পাতের পাত' গল্পে বেচুলালের স্ত্রী সুখীর দিকে নজর পড়েছিল তাদের বস্তির সামনে তিনতলা বাড়িখানার মালিকের। অজানা থাকায় সেই ভদ্রলোক বেচুলালকেই বলে সুখীকে পাইয়ে দেবার জন্য। এই নোংরা ইঙ্গিতে প্রথমে স্বামীর ভেতরে একটা আক্রোশ হিস্ হিস্ করে উঠলেও পর মুহূর্তেই তা যেন উল্টো দিকে মোড় নেয়। বেচুলালের মনে হল — "কী মুখ্যু, আমি কি মুখ্যু! ঘরে ধানের গোলা থাকতে আমি পেটে খিল মেরে পড়ে আছি! ছি! ছি!" *(পৃ. ৩৩৫, গল্প সমগ্র, ৩য় খণ্ড)* আর এই মানসিকতার বলি হতে হল সুখীকে। বেচুলাল তার স্ত্রী সুখীকে ভয় দেখিয়ে, ভালোবেসে, নানাভাবে ঐ প্রস্তাবে রাজি করাতে হাজারো রকমের চেষ্টা করল। কিন্তু সুখী চিরাচরিত নিয়মে বাঁধা একটি নারী, যে একমাত্র স্বামীরই শয্যাসঙ্গিণী হয়ে থাকবে অন্য কোন পুরুষকে সঙ্গদান ভাবতেই পারে না। তাই সে বলে ওঠে স্বামীকে — "তুমি আমার ধর্মসাক্ষী স্বামী, তুমি আমায় দিয়ে এতবড় অধর্ম করাবে?"

— "ও তোমার সব ছলের কথা, রূপসী পরিবারকে দিয়ে রোজগার করাতে ইচ্ছে তাই বল। ... আমি পারবো না, আমি পারবো না।" *(পৃ. ৩৩৪, ঐ)*। কিন্তু এই মনোভাবাপন্ন সুখীও সহসা বদলে গেল। তার সহজ সরল মনের গতিও পাল্টে গেল। যে মেয়ে স্বামী বৈ কিছু জানতো না, কিছু জানতে চাইতো না, সে মনোভাব বদলে ফেলে এই স্বামীরই কথা শুনে। তার স্বামী যখন বলে — "এই যে আমি? তোর মতন ধর্মসাক্ষীর পরিবার ছেড়ে যাই না ইদিক উদিক? পয়সা থাকলে আরো যেতাম। রোজ এক তরকারী ভাল লাগে? রোজ একই মাছ?" *(পৃ. ৩৩৪, ঐ)*। সুখী যখন জানতে পারলো তার স্বামীও তাকে ছেড়ে এই যুক্তির দ্বারস্থ হয়ে আরো নানা স্থানে যায় এবং তাকেও সেই পথে যেতে প্ররোচিত করছে, পয়সার বিনিময়ে নিজের স্ত্রীকে অপর পুরুষের হাতে তুলে দিতে যে স্বামী উন্মুখ এবং উদাহরণ হিসেবে যে নিজেকেই দাঁড় করায় তার বিরুদ্ধেই প্রতিশোধ নেবার জন্য হঠাৎই সুখী মত বদলায়। স্বামীকে উদ্দেশ্য করে বলে — " বেশ তোমার যা ইচ্ছে।" *(পৃ. ৩৩৪, ঐ)*।

সুখীকে ধীরে ধীরে বেচুলাল তিনতলা, নীচের তলা, মাঝতলা সব এক এক করে চেনাতে থাকে, আর নিজে ছুতোরের হাতুড়ি তুরপুন ছেড়ে দিয়ে বাজারে গিয়ে দেখেশুনে মাছ-মাংস কিনে এনে স্ত্রীকে খাওয়াতে লাগল। একজন সনাতনী ভাবধারার নারী হিসেবে সুখী নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে করতে এগিয়ে চলছে। তার এই এগিয়ে চলা তাকে বহির্জগত সম্পর্কে অভিজ্ঞ করে তুলছে, নানা ধরনের লোক দেখছে, পোষাকের বৈচিত্র্যকে জানছে এবং সর্বোপরি টাকা পয়সা তার হাতে আসছে। সুখী ধীরে ধীরে হিসেব শিখছে, যত দিন যাচ্ছে সে তার স্বামীকে গুণে গুণে পয়সা দিচ্ছে। বেচুলালের বোধ হচ্ছে যে, সুখী ক্রমশঃ তার আওতার বাইরে চলে যাচ্ছে। সেটার চূড়ান্ত প্রকাশ

ঘটল যেদিন সত্যিকারের ইস্পাতের পাত দেখাবার সাহস সুখী পেল। বাবুর সঙ্গে গাড়ীতে চড়ে হাওয়া খেতে যাবার সময় সুখী বেচুলালই যে তার স্বামী এই পরিচয় দিয়ে ফেলে, যাকে তারা এজেন্ট বলে জানতো। আর এই সত্য প্রকাশে সে অপমানিত বোধ করে সমস্ত আক্রোশ নিয়ে ফেলে সুখীর ওপর। সুখীর কাছে সব টাকা পয়সার হিসেব চেয়ে বেচুলাল স্বামীর অধিকার আরোপ করতে চায়, প্রভুত্ব ফলাতে চায়, স্ত্রীকে হাতের মুঠোয় আনবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠে। প্রয়োজনে আবার আগের মতো ছোরার ভয় দেখায় — "এটাকে ভুলে গেছিস বুঝি?" সুখী এতে ভয় তো পায়ই না, বরং উল্টে শাসায় — "ভুলব কেন? ও জিনিস কি ভোলা যায়, স্মরণে আছে। বরং পাছে ভুলে যাই তাই ওর একটা যমজ ভাইকে গড়িয়ে রেখেছি যে —" *(পৃ. ৩৩৭, ঐ)*

যে সুখী স্বামী-সন্তান নিয়ে সুখী থাকতে চেয়েছে, নিভৃত একটি গৃহকোণে অভ্যস্ত যে নারী, সে আজ ছোরা উচিয়ে শোষিত পুরুষের সমকক্ষ হয়ে উঠেছে। প্রতিশোধ নেবার জন্য নিজেকেও একটি ইস্পাতের ফলা করে তুলেছে। এখন সুখী শুধু ভয় পাওয়ার জন্য কোন কাজ করে না, ভয় পাওয়াতেও শিখেছে। সে না চাইলেও তার রোজগারেরই আজ একটা মূল্য রয়েছে, কেননা সেটাতেই সংসারের রথচক্র ঘুরছে।

প্রায় সমগোত্রীয় গল্প হচ্ছে **'একটি ফুটো পয়সার জের'**। এখানেও যৎসামান্য কারণে নারীকে একটু অন্য সুরে পুরুষের কথা বলা অন্য একটি মাত্রা এনে দিয়েছে। যা নাকি বর্তমান সময়েও প্রায় একইভাবে জাল বিস্তার করে রয়েছে। অর্থাৎ পুরুষদের এ ধরনের কথা বলা আজও বন্ধ হয়নি বলা চলে।

প্রভাত ও মুকুলের দাম্পত্য জীবন বেশ সুখের ছিল। মুকুলের ঘর ঝাড়পোছ করার ভারী অভ্যাস, একদিন এসব করতে করতেই আঁচলের গিট খুলে কিছু পয়সা পড়ে গেল ছড়িয়ে, সব পাওয়া গেলেও একটি ফুটো পয়সা পাওয়া যাচ্ছে না। তা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে মুকুল নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়তে চাইলো, কিন্তু ফুটো পয়সার প্রতি অবহেলা কর্তা প্রভাতের সহ্য হল না। কথার সুরে চরম গাম্ভীর্য এনে প্রভাত বলে উঠল — "একটা ফুটো পয়সা বলে অগ্রাহ্য করা হচ্ছে কেন? ফুটো পয়সা, পয়সা নয়?" উত্তরে মুকুল জানাল — "যাই বলো, আমার কিন্তু ঐ ফুটো পয়সাকে কোনদিন পয়সা বলে মনেই হয় না।" স্ত্রীর কথায় প্রভাতের উক্তি — "শুধু ফুটো পয়সা কেন? কোন পয়সাকেই তো 'পয়সা' বলে মনে হয় না তোমার।" *(পৃ. ৩৩৯, গল্প সমগ্র, ৩য় খণ্ড)*। এই কথার জের চললো গল্পের পরিণতি পর্যন্ত। মুকুলের মনে হল যেহেতু সে নিজে অর্থ রোজগার করছে না, সুতরাং পয়সাকড়ির প্রতি তার কোন মায়ামমতা নেই বলেই প্রভাত ভেবে নিচ্ছে। সংসারে যতই শ্রম দিক্ না কেন অর্থ রোজগার না করতে পারলে মেয়েদের কোন না কোনভাবে হেনস্থা করাটা পুরুষদের আক্রমণের একটা নিজস্ব বাণ হয়ে উঠছে যেন। আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন কোন নারী এসব

ইঙ্গিতবাহী কথার দ্বারা নিজেকে অসম্মানিত বোধ করবে এটাই অত্যন্ত স্বাভাবিক কথা। তাই মুকুলও নিজেকে শক্ত খোলের মধ্যে গুটিয়ে নিয়ে সংসারের কাজকর্ম করে এবং 'কর্মখালি' অংশ দেখে কাজ খুঁজে বেড়ায়। অবশেষে একটা পেয়েও যায় যেমন-তেমন গোছের একটা চাকরী। একজন বিধবা নারীকে দেখাশোনা করা, তার ছেলেমেয়েরা স্কুলে গেলে সেই সময়ে তিনচার ঘণ্টার জন্যে তার সাথে সাথে থাকা। যে সময়টা মুকুলেরও সংসারে কোন কাজ থাকে না। ফুটো পয়সা হারানোর জেরে সেদিন প্রভাত মুকুলকে শুনিয়েছিল — "চেয়ে ভিক্ষে করা ছাড়া একটা ফুটো পয়সাই কি আনতে পারো?" স্বামীর এই তাচ্ছিল্যভরা উক্তিতে মুকুল আর্থিক স্বনির্ভর না হওয়ায় অসহায়তা থেকে বলেছে — "এতোদিন তো চেষ্টা করে দেখিনি। এবার থেকে দেখবো।" *(পৃ. ৩৪১, ঐ)* এই আর্থিক স্বাধীনতা লাভের জেদ থেকেই মুকুল তার যোগ্যতা অনুযায়ী এক বিধবা নারীর দেখভালের দায়িত্ব নিয়ে দিনে তিন চার টাকা রোজগার করছে। এ অর্থ অনেক শান্তির; অন্ততঃ স্বামীর কাছে হাত পেতে ভিক্ষা চাইতে হয় না, বা, তার জন্য শ্লেষপূর্ণ কথাও শুনতে হয় না। প্রভাত কোনমতেই আর মুকুলকে এ সিদ্ধান্ত থেকে সরাতে পারল না। নারীর জেদের কাছে হেরে গিয়ে এবার পুরুষ ভাবছে একবার বাইরে বেরিয়ে রোজগারের স্বাদ পেলে নারীকে আর ঠেকানো যাবে না। একের পর এক কাজ ঠিকই খুঁজে বের করবে। এই সাহচর্যদানের চাকরি হয়তো বিধবা থেকে বিপত্নীকে গিয়েও দাঁড়াতে পারে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সবই যে বদলাচ্ছে তা অন্যদের মতো প্রভাতও অনুভব করছে। তাই হয়তো তার মনে হচ্ছে— "বাঘিনী একবার রক্তের স্বাদ পেলে আর তাকে ঠেকানো যায় কি না সন্দেহ। সেকালে — বুদ্ধিমান পুরুষ জাতি সে তথ্য জেনে ফেলেছিল বলেই না এ যাবৎকাল 'ঘর ঘর বাঘিনী পুষে' আসতে পেরেছে। চিড়িয়াখানায় বাঘিনীদের মতো বুঝে সুঝে মাপা খাদ্য খাইয়ে রেখে এসেছে, রক্তের স্বাদ পেতে দেয়নি কিছুতেই।" *(পৃ. ৩৪৫, ঐ)*।

এই যে আয়ত্তাধীন রাখা নারীদের, এতেই পুরুষ জাতি অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। পুরুষরা প্রয়োজন বুঝে অন্ন, বস্ত্র, শখের উপাদান এনে দেবে আর নারীরা তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে — এই ছিল রীতি। নারীকে প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে নানা কথার মাধ্যমে খোঁটা দেবে আর তারা সেটা নীরবে হজম করে যাবে, এটাই পুরুষ দেখতে চাইতো বা এই ব্যাপারটাকে বোধের মধ্যেই আনত না। কিন্তু ভেতরে ভেতরে নারীদেরও যে আত্মসচেতনতাবোধ, আমিত্ব, ব্যক্তিত্ববোধ গড়ে উঠছে তারাও যে নিজস্ব পরিচয়ে জগতে পরিচিত হতে চায়, কটুকথায় অপমানিত হতে পারে মুকুলের এই আর্থিক উপার্জনে নেমে পড়ার ঘটনা প্রভাতকে যেন সজোরে একটা ধাক্কা মারে। আর তখনই খাঁচার বন্দী বাঘিনী আর অরণ্যচারী বাঘিনীর কথা মনে আসে। সুখীর সাথে মুকুলের এখানেই একটা মিল পাওয়া যায়, উভয়েই নিজেকে আবিষ্কার করে স্ব-প্রতিষ্ঠিত হতে চায় এবং স্বামীদের তাচ্ছিল্য ভরা উক্তির জন্যই তাদের আজ গৃহকোণ ছেড়ে বাইরের জগতে পদার্পণ।

নারীর ওপর পুরুষের অধিকারবোধ যেন একটা চিরন্তন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুরুষরা অধিকার কায়েম করে খুশী হয় আর নারীরা সে অধিকারে বাঁধা পড়ে সুখী হতে চায়। কিন্তু তা মাত্রা ছাড়ায় তখনি, যখন সে অধিকারবোধ নারীর ন্যূনতম স্বাধীনতাকে খর্ব করে ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথকে কণ্টকাকীর্ণ করে তোলে। **'যা নয় তাই'** (১৩৬২ বঙ্গাব্দ) গল্পে গায়ত্রীকে তার স্বামী শ্রীপতি সর্বদাই সন্দেহের চোখে দেখে, প্রতিনিয়তই তার মনে হতে থাকে স্ত্রীকে অন্য কোন পুরুষের হয়তো ভালো লেগে গেল, হয়তো তাদের মধ্যে কোন অবৈধ সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেল। তাই স্ত্রীকে তিনি সবসময় চোখে চোখে রাখতে চান, আত্মীয় পরিজন, বন্ধু-বান্ধব-প্রতিবেশী কাউকেই তিনি বিশ্বাস করে স্ত্রীর সামনে একা ছাড়তে চান না। গুরুত্বপূর্ণ কাজ পড়ে থাকে, সৌজন্যবোধ প্রয়োজনে হারিয়ে যায়, তবু চোখের মণিটিকে চোখের সামনেই রাখা চাই। কিন্তু স্বামীর এহেন আচরণের কথা কোন নারীর পক্ষে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কারণ তাতে নিজেরই সম্মানহানি হতে পারে, এ ভয় গায়ত্রীরও আছে। আর এসব সত্যকে চাপা দিতে গেলে তখনই প্রয়োজন হয়ে পড়ে অভিনয়ের, গায়ত্রী তাই অভিনয় করে।

গায়ত্রীর পরিচিত রেখাদি, তার নিজের স্বামী, তিন সন্তান ও সংসার আছে। তাদের রেখে পাড়ার ছেলেদের 'দুর্গত কল্যাণকামী সঙ্ঘ' নাম দিয়ে 'ভুখা মানবের ভুখ' মেটাবার সাধু ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতে বিচিত্রানুষ্ঠান করার উৎসাহকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। একদা স্কুল জীবনের নৃত্য গীত পটীয়সী গায়ত্রীকেও এই অনুষ্ঠানে টানতে চান বলেই তাকে নিতে আসেন। কিন্তু গায়ত্রীকে মোটা টাকার টিকিট বিক্রি করতে তার স্বামীর আপত্তি ছিল না, যত আপত্তি তাকে অনুষ্ঠান করতে নিয়ে যাওয়ায়। শেষ পর্যন্ত গায়ত্রী যেতে বাধ্য হয়; কিন্তু তার স্বামী শ্রীপতি সেদিনের জন্য ক্ষমা করে ও নানা অজুহাত শিখিয়েও দেয় যাতে আর ছেলে ছোকরাদের সঙ্গে না যেতে হয়। —"কাল এলে এক কথায় জবাব দিয়ে দেবে। বলবে—আমার স্বামী এসব পছন্দ করেন না।" *(পৃ. ১৮১, গল্প সমগ্র ৪র্থ খণ্ড)*। — এই যে নারীকে নিজের বশে রাখবার চেষ্টা, নারীর নিজস্ব মতামত, চিন্তা-ভাবনা-শিল্পকলার অপমৃত্যু ঘটানোর চেষ্টা জোর করে — এটাই লেখিকা আশাপূর্ণা দেবী আমাদের দেখাতে চেয়েছেন। কিন্তু গায়ত্রী পারে নি, নিজের স্বামীর এই হীন প্রবৃত্তি, নীচ মনের কথা লোকসমক্ষে তুলে ধরতেপারে নি। দাম্পত্য জীবনের বিবর্ণ, কদর্য দিকটাকে নিজেদের মধ্যেই আবদ্ধ রাখতে চাওয়া, এর মধ্যেও গায়ত্রীর নিজের স্বার্থই যে জড়িত। সমাজে প্রতিষ্ঠা, নিরাপত্তা পাওয়ার ক্ষেত্রে স্বামীই তো সব, এ বোধটুকু গায়ত্রীর আছে বলেই সত্যস্বরূপকে প্রকাশ না করে নানা রঙের রঙীন প্রলেপ লাগিয়ে সর্বসমক্ষে তুলে ধরে।— "বাড়ী ফিরে দেখি — গিন্নীর অদর্শনে কর্তার কী রাগ! 'চা খাবো না', 'খাবার খাবো না', 'চাই না — দরকার নেই' ... এইসব দস্যিপনা! আজ বোধহয় আমার অদৃষ্টে মার খাওয়া আছে! নিদেনপক্ষে — নাকের ওপর দরজা বন্ধ! ... হেসে কুটি

কুটি হয় গায়ত্রী" *(পৃ. ১৮৩, ঐ)*।— এই বলার ভঙ্গিমাতে রয়েছে মধুর শাসনের আভাস, কিন্তু পুরোটাই কোমলতার প্রলেপে কঠোর সত্যতায় পরিপূর্ণ। এই অভিনয় প্রচেষ্টার কারণ — "নিজের স্বামীকে যে মেয়ে আঁচলে বাঁধতে পারে নি, পাঁচজনে তাকে করুণা করতে পারে, সমীহ করে না।" *(পৃ. ১৮৪, ঐ)*। করুণার আর্দ্রতায় যাতে তাকে সিক্ত হতে না হয়, তাই নিজের মর্ম-যন্ত্রণাকে চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দী করে বহির্জগতে নিজেদের অন্তরের মাধুর্য্য পরিপূর্ণ প্রেমকে বিকশিত করে তুলতে চায়। স্বামীর নিপীড়ন নারী মুখ বুজে সইবে, কিন্তু অপর কারো কাছে সেজন্যে ছোট হতে নারী সমাজ কখনোই রাজী নয়, গায়ত্রী আবার তা প্রমাণ করে দিল।

শুধুমাত্র পরিপূর্ণ নারী চরিত্র নয়, নিতান্ত বালিকা হৃদয়ের মধ্যেও আশাপূর্ণা দেবী বোধশক্তিসম্পন্ন একটি মানবীর সন্ধান দিয়েছেন। **'পত্রাবরণ'** (১৩২৬ বঙ্গাব্দ) গল্পে পিতু, তার মা এবং ঠাকুমা গ্রামের বাড়িতে থাকে, আর তার বাবা চাকুরি সূত্রে থাকে কোলকাতায়। সপ্তাহান্তে যখন বাবা বাড়ি আসে তখন পিতুদের বাড়িতে রান্না-বান্না, আনন্দের ধূম পড়ে যায়। পিতু সাত-আট বছর বয়সী বালিকা হলেও তার বাবাকে কেন্দ্র করে মা-ঠাকুমার যে আনন্দ তাতে সে বড্ড আনন্দিত হয়। অথচ তাদের তিনজনের সংসার চলে একজনের খরচে, নিতান্ত দীনহীনের মতো তাদের সংসার চালাতে হয়। সারা সপ্তাহব্যাপী তারা সমস্ত কষ্ট সহ্য করে বাইরে থেকে কাজ করে সপ্তাহান্তে ঘরে ফেরা পুরুষটিকে বিন্দুমাত্র কষ্টের আভাস বুঝতে না দিয়ে প্রাণখোলা আনন্দে সকলে ভরিয়ে তুলতে চায়। বাবার বাড়ি ফিরে এসে ভালো মন্দ খাওয়া নিয়ে 'পাতাল প্রবেশ' নামে আর একটি গল্প ছিল, কিন্তু তাতে মেয়ের প্রচণ্ড আক্রোশ ঝরে পড়েছিল বাবার অকর্মণ্যতা, দায়িত্ববোধহীনতার বিরুদ্ধে। কিন্তু এখানে বাবার যে সামান্য রোজগার সেটা মেয়ে বুঝতে পারত, মা-ঠাকুমা যে বাবাকে কিছু জানতে বুঝতে না দিয়ে নানাভাবে অভিনয় করে সেটা ঢেকে রাখতে চাইত পিতু নিজেও সেই অভিনয়ে সামিল হয়ে সেটাকে বাস্তবায়িত করে তুলতো। একটু অভিনয় প্রচেষ্টা, একটু সামান্য খাবার-দাবারের আয়োজনে লুকোচুরি মেশানো যে আন্তরিকতা — তাতে সংসারের সুখের আবেশটা যে বজায় থাকতো এবং চলার ক্ষেত্রে রসসঞ্চার করতো তা পিতু বুঝতে পারতো। মা-বাবা যখন গল্প গাছা করে তখন পিতুর মনে হয় — "এদের এই সাধারণ কথাগুলো যেন সাধারণ নয়। হাসিটা তো নয়ই। এই কৌতুক ভরা মুখের রেখায় রেখায় প্রচ্ছন্ন রয়েছে আরো অন্য কিছু — যা পিতুর বুদ্ধির বাইরে।" *(পৃ. ১২০, গল্প সমগ্র, ৪র্থ খণ্ড)*। পিতুর চেয়ে অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে লাবণ্য যার ডাক নাম লাবি সে পিতুর বাবাকে গরীব বলায় তার মনে ব্যথার সঞ্চার হয়েছে। কিন্তু মা-বাবার শান্তিতে তৃপ্ত মুখগুলো দেখে তার মনে হয়েছে — "এখন যদি লাবিকে ডেকে এনে দেখাতে পারত! এখন দেখলে পিতুর মা'র গায়ে গয়না নেই ব'লে ঠাট্টা করবার সাধ্য হ'ত লাবির? গয়না আছে কিনা, মনে পড়ত?" *(পৃ. ঐ)*।

একটি নিতান্ত বালিকা মেয়েও যে সংসারের শান্তি পরিতৃপ্তির রূপ সম্পর্কে কতটা সচেতন, শান্তির নীড় রচনা করতে গেলে অর্থের প্রয়োজন হলেও তা যে গৌণ, মুখ্য যে আন্তরিক প্রীতির আকর্ষণ — এটা সে বুঝেছে। স্বল্পে সন্তুষ্ট, শ্রীময়ী কল্যাণী নারীর এই চিত্রটিই সংসারে কল্যাণকামী চরিত্র এবং একটি বালিকা চরিত্রও যে এই পর্যায়ভুক্ত হতে পারে এটাই লেখিকার প্রতিপাদ্য বিষয়।

জীবনের বেশিরভাগ সময় ধরে লালন করে চলা স্বপ্ন, সাধ সহসা কখনো মানুষের জীবনে বাস্তবায়িত হয়, আবার কখনো ভেঙ্গে যায়। এইরকমই একটি স্বপ্নভঙ্গের কথা রয়েছে **'আর একদিন'** (১৩৬২ বঙ্গাব্দ) গল্পে। বাল্যকালের প্রেম, অলকা আর অশোকের। অলকা প্রচুর বই পড়তে ভালোবাসত। যেহেতু স্কুল, কলেজ যাবার রেওয়াজ ছিল না, তাই কিছুটা পড়াশোনার পর গল্প-উপন্যাস পড়েই দিন কাটত তার। আর সেসব বই যোগান দিয়ে যেত অশোক। সর্বসমক্ষেই উভয়ের সামান্য উপহার প্রদান অর্থাৎ অলকাকে একখানি বই প্রেজেন্ট করা, অশোককে দুখানা রুমাল সেলাই করে দেওয়া চলত। ধীরে ধীরে তা প্রেমানুভূতির দিকে বাঁক নিয়েছিল কিন্তু নায়ক-নায়িকা কারো পক্ষেই তা প্রকাশ করা হয়ে ওঠে নি। অলকার বাড়ীর ছাদে একদিন দুজনের দেখা হয়েছিল মুখোমুখি, অলকা রবীন্দ্রনাথের চয়নিকাখানি পড়ছিল, তা ধরা পড়ে যায় এবং অশোক কথায় কথায় পাতা উল্টে দুখানি কবিতার লাইন পড়েছিল —

"তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি
শতরূপে শতবার"

— এই ভাবখানি ধারণ করে আর আশোকের সামনে চৌদ্দ বছরের নায়িকা দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি, দৌড়ে ছিটকে নীচে পালিয়ে গিয়েছিল। এরপর থেকে তারা বিচ্ছিন্ন, আর দেখা হয়নি দুজনের। দু'বাড়ির বাড়িওয়ালারা বাড়ির উন্নতির জন্য ট্রাস্টকে বাড়ি দিয়ে দেওয়ায় দুটো পরিবার শহরের দুই প্রান্তে চলে যায়। পরে যোগাযোগ হলেও অলকার বিয়েতে সকলে এলেও বি. এ. এগজামিন সামনে থাকায় অশোক আর এল না। সেই থেকে আর একটিবার দেখা হওয়ার সাধ অলকা ত্যাগ করতে পারে নি, এমনকি ভালোমানুষ মনে মনে যে তৃষ্ণা লালন করে এসেছে তা তার ধৈর্য্য এবং মাধুর্য্য পরিপূর্ণ প্রেমের পরিচয় দেয়। তার স্বামী নানা রসিকতা করে থাকতো সবসময়, কিন্তু সমস্ত কিছু ভেস্তে গেল একদিন। সেদিন অলকা ও তার স্বামী চন্দননগরে মামার বাড়ী যাচ্ছিল, ট্রেনে অকস্মাৎ অশোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল এবং সামান্য পরিচিতের মতো দু'একটা কথার শেষে নেমে গেল। অলকার সমস্ত স্বপ্ন, প্রতীক্ষা, কল্পনার অবসান ঘটে গেল, সুর ও তালের ঘটল ছন্দপতন। জীবনের মধুর একটি সুর যা রঙীন স্বপ্নের জাল ছড়িয়ে রেখেছিল, যাকে কেন্দ্র করে অলকা অতীতে ফিরে যেত, হৃদয়ে এক সংগীত মূর্চ্ছনা তৈরি করত, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে রসসঞ্চার ঘটত — সেই সমস্ত কিছুর অকস্মাৎ সমাধি ঘটে গেল। শুধু অলকা নয়, অনেক নারীই, যেমন তারা ভুলতেও পারে, তেমনি

আবার মনে মনে ধ্যান করে জীবনভ'র পূজা করেও যেতে পারে সামান্যতম সময়ের প্রেমের দেবতাকে এবং তা যদি প্রথম প্রেম হয়। কিন্তু অশোক সেই দিনগুলোকে জীবন জীবিকার অন্তরালে হারিয়ে ফেলেছে। তার চেহারার মধ্যে যেমন স্থূলতার ছাপ চোখে পড়ে, তেমনি বোধটিও স্থূলতার আবরণে আবৃত হয়ে গিয়েছে। সেজন্যে অলকার এই প্রথম প্রেম-কুসুমের কথা অশোক একবারও ভাবেনি; তাকে ঘিরে আজও একটি হৃদয় যে লাজনম্রভাবে শিহরিত হয়ে ওঠে তা ঘুণাক্ষরেও মনে পড়ে না। হয়তো বা সরল হৃদয়ের প্রেমিকা বলেই অলকা তা পেরেছে।

হৃদয় রহস্য অধিকাংশ মানুষের কাছেই থাকে অজানা। বাহ্যিক আচরণের সাহায্যে কখনো মনের গোপন কথা জানা সহজ নয়, আবার কখনো হয় দুর্জ্ঞেয়। এমনটাই হয়েছিল 'ক্ষণজাত?' (১৩৬২ বঙ্গাব্দ) গল্পের শুভেন্দুর। শুভেন্দু আর অলকারা একই পাড়ায় দু'তিনটে বাড়ীর ব্যবধানে বাস করত। শুভেন্দু অলকাদের বাড়ি প্রায় নিয়মিত যাতায়াত করলেও কোন সম্পর্কের বাঁধনে বাঁধা পড়ে নি; কিন্তু অলকা পাড়ার প্রায় সকলের বাড়িতেই ঘুরে বেড়াত সংসারের কাজের ফাঁকে। কিন্তু এই সাধারণ ব্যাপারের মধ্যেও অসাধারণের ছোঁওয়া খুঁজে পায় শুভেন্দুর (মন্টুর) নববিবাহিতা স্ত্রী সাহানা, যে বি. এস. সি. পাশ করে রীতিমত ভদ্রমহিলা গোছের হয়েছে। নতুন বৌ দেখে অলকা যখন শুভেন্দুর ছোটবোন চামেলীকে বলে—"বৌ দেখে বাঁচলাম বাবা চামেলীদি, মন্টুদার প্রতিজ্ঞাটা রইল তাহলে?" চামেলী সন্দিগ্ধভাবে বলে—কিসের প্রতিজ্ঞা? —ওই যে গো, বরাবর আমাকে শোনাত — "বৌ যা আনব দেখে তাক লেগে যাবে তোদের, তুই তার পাশে দাঁড়ালে মনে হবে যেন চাঁদের পাশে জোনাকি!" — *(পৃ. ২০৮, গল্প সমগ্র, ৪র্থ খণ্ড)*। এই একটি কথাতেই শুভেন্দুর স্ত্রী সাহানা যেন কিছু বুঝতে চাইলেন। আর এই সূত্র ধরেই শুরু হল সম্পর্কের মধ্যে শীতলতা। সাহানা নিজে একখানা ভালো পরিবারের সুশিক্ষিতা, সুন্দরী মেয়ে; আর তার স্বামী কিনা অলকার মত ক্লাস এইট অবধি পড়া, কালো, রোগা একটা মেয়ের সঙ্গে তার ভাবী স্ত্রী সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করত? সাহানার সঙ্গে অলকার তুলনা করার মতো মানসিকতা যে পোষণ করে জোনাকির সঙ্গে তুলনীয় হলেও তার কিছু না কিছু প্রভাব শুভেন্দুতে আছে বলে মনে করে সাহানা। আর তাই স্বামীর সঙ্গে সহজ সম্পর্ক তৈরিতে সে আর আগ্রহী নয়। স্ত্রী হিসেবে সাহানার ধারণা হয়ে গেল, শুভেন্দু আর অলকা গোপনে কোন সম্পর্কে জড়িত ছিল। অলকা প্রায়শই এ বাড়িতে আসে, সেটাও তার অপছন্দের ছিল। ঘটনার সত্যতা যাচাইয়ে শুভেন্দু অলকাদের বাড়ি যায় এবং প্রমাণও পায়, কিন্তু যাতায়াত বন্ধ হয় না বরং বাড়ে। পূর্বে কোন ঘনিষ্ঠ বা জটিল যাই হোক, কোন সম্পর্কে না জড়ালেও শুভেন্দু বা অলকার মন্টুদা এবারে যেন আর দূরে নয় অলকার পাশাপাশি এসে পড়ে। সাহানার ধারণা যে কিঞ্চিৎ হলেও সত্য তার প্রমাণ পাওয়া যায় অলকার কথায়। যখন ঘনঘন যাতায়াত বাড়ে শুভেন্দুর, একদিন অলকা বলে ফেলে বারংবার আসার কথাটা। কথায় কথায়

শুভেন্দু অলকার হাতটা ধরে অলকাকে আয়ত্বে নিয়ে আসে ও আত্মপ্রসাদ অনুভব করে যেন। বলপ্রয়োগে হাত ছাড়াতে গিয়ে তখনই অলকা বলে — "আঃ, ছেড়ে দাও বলছি, খেলার পুতুল পেয়েছ নাকি — বলেই ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে।" *(পৃ. ২১৩, ঐ)*। একথা থেকেই বোঝা যায় অলকার হৃদয় দৌবর্ল্য আগেও ছিল এবং সেই ভাবখানাকে গোপন করতে গিয়েই হয়তো তাকে নতুন বৌয়ের সামনে এত বক বক করতে হয়েছে। বিবাহিত জীবনের শুরুতেই অবিশ্বাস নিয়ে, আর স্বামীর প্রতি নীরস শীতল অবহেলিত সম্পর্কের জেরে সাহানা সুখের ঘর বাঁধতে যে আর রাজি নয়, তাই পোস্ট গ্রাজুয়েট পড়ার অছিলায় শ্বশুরবাড়ি ত্যাগ করে। শুভেন্দু আর অলকার মায়ের মধ্যে একদিন সামান্য কারণে বচসা হয়ে পাড়া ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় এবং শ্বশুরবাড়ির তৎপরতায় পুনরায় গম্ভীর বদনে সাহানা স্বামীর ঘর করতে আসে।

ঘটনা কিন্তু এখানেই থেমে থাকে না। এই ঘটনারও কিছুদিন পরে পশ্চিমের অখ্যাত কোন স্টেশনের ওয়েটিংরুমে অ-সম (শ্রীযুক্ত এবং শ্রীহীন) দুটি নারী পুরুষকে চা খেতে দেখা যায়। তাদের কথোপকথনে বোধগম্য হয় জটিল কোন আবর্ত থেকে বেরিয়ে সরল গতিপথে এসে পড়েছে। সাহানার আচার আচরণে এবং তার ধারণাটির সত্যতা নিরূপণের চেষ্টায় শুভেন্দু ও সাহানার সম্পর্ক আর দাম্পত্যে পৌঁছায়নি, সে স্থান ধীরে ধীরে দখল করে নিল অলকা। অর্থাৎ শুভেন্দু এবং অলকা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে নতুন সংসার পাতার সদিচ্ছা নিয়ে। জীবনের দিকে ফিরে তাকাতে গিয়ে পুরুষ চরিত্রটির আত্মগতভাবে বলে ওঠা — "মাঝখানের ব্যাপারটা যদি না ঘটত!" *(পৃ. ২১৩, ঐ)*। নারী চরিত্রের পক্ষেই ধরা সম্ভব যে, মাঝের ঘটনাটা অর্থাৎ শুভেন্দু সাহানার বিয়েটা না ঘটলে এ ব্যাপারটাই হয়তো ঘটত না। অলকার বিশ্লেষণ সম্পর্কে লেখিকা আশাপূর্ণা দেবীর নারীজাতি প্রসঙ্গে যে মন্তব্য তা প্রণিধানযোগ্য — "সহজাত বুদ্ধিতে বুঝে ফেলে অনেক কিছু।" — *(পৃ. ২১৪, ঐ)*। কারণ সাহানা যে ঘটনার বিন্দুটা আবিষ্কার করেছে তার সত্যতা নিরূপণ করছে পরবর্তী ঘটনাটা। আবার পরবর্তী ঘটনায় অলকার মন্তব্য প্রমাণ করছে মাঝের ঘটনাখানি না ঘটলে উভয়ের প্রতি উভয়ের যে অমোঘ আকর্ষণ তা হয়তো অনুভব করতো না। ফলে এদের মধ্যে একত্রিত হবার মনোভাবখানাও প্রবল আকার ধারণ করতো না। তবে সাহানাও সত্যিটাই বুঝতে পেরেছিল কিনা তাও যথেষ্ট সংশয়ের — "কে জানে — সহজাত নারী প্রকৃতির বশে ছাই চাপা আগুনটাকেই আবিষ্কার করে বসেছিল সাহানা, না অবিশ্বাস আর অবহেলার অরণিকাষ্ঠে নিজেই সে আগুনকে সৃষ্টি করল।" *(পৃ. ২১৪, ঐ)*। অর্থাৎ শুভেন্দু হয়তো স্ত্রী ব্যতীত অন্য কিছু ভাবে নি, কিন্তু বিদূষী সাহানার এই সূত্রটুকু ধরেই অনবরত স্বামীকে উত্যক্ত করা ও অবহেলায় দূরে ঠেলে দেওয়াই হয়তো অলকার প্রতি শুভেন্দুকে মনোযোগী করেছে। যে প্রেম স্ত্রীর জন্য সঞ্চিত ছিল তা অর্পণের সুযোগ না পেয়ে ওখানেই বিলিয়ে দিয়েছে। হয়তো বা স্ত্রীর দেওয়া অশান্তিতে বিষাক্ত মনটা অলকার সান্নিধ্যেই

দু'দণ্ড শান্তি লাভ করেছে। লেখিকার প্রতিপাদ্য হয়তো এই যে, নারী জাতির চিত্ত সংশয় যে পরিবেশ সৃষ্টি করে তা হয়তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ভয়ংকর রূপ ধারণ করে। তা সংসার ভেঙ্গে দিতে পারে। সবক্ষেত্রেই অলকাদের নিয়ে পথে বেরোবার অবস্থা নাও থাকতে পারে শুভেন্দুদের। আবার কোন অশিক্ষিতা এবং দরিদ্র গৃহের রমণীর ক্ষেত্রে হয়তো এধরনের মন্তব্য তার মনে প্রীতিরই সঞ্চার করতো, যা একটি শিক্ষিতা, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নারীকে রহস্যের উৎস মুখ প্রদর্শন করিয়েছে।

'ভবিষ্যৎবাণী' (১৩৬২ বঙ্গাব্দ) গল্পের প্রথম লাইনটিতেই আশাপূর্ণা দেবী নিজের পরিবারের কথাটি যেন তুলে ধরেছেন বলে মনে হয় — "আমার জ্যেঠামশাই মেয়েদের বেশী বুদ্ধি থাকাটা মোটেই ভালো চক্ষে দেখতেন না। চালাক-চতুর মেয়ে দেখলে ভারী চটে যেতেন। বলতেন — 'মেয়ে জ্যাঠা'।" *(পৃ. ২৫৮, গল্প সমগ্র ৪র্থ খণ্ড)*। সুতরাং এহেন মনোভাব যাদের তারা মেয়েদের কবিত্বশক্তির তারিফ না করে যে অধিক মাত্রায় প্রতিবন্ধকরূপে কাজ করবে তাই স্বাভাবিক। মেয়েদের কি করতে হয় আর কি নয় — সে সম্পর্কে এক বিরাট অনুচ্ছেদ সেই বাড়ীর মেয়েদের মনে রাখতে হতো, যে বাড়িতে কোন একটি মেয়ে সাহিত্য চর্চা শুরু করে।

মনে করা যাক চরিত্রটি লেখিকা, গল্পে নাম নেই, 'আমি'র ব্যবহার। বাড়িতে সমস্ত কাজ করানোর চর্চা থাকলেও পড়াশোনার মত একটি শক্ত কাজ করার জন্য মেয়েদের প্রয়োজন পড়ত না। তবুও বারো বছর বয়সে লেখিকা ভয়ংকর একটি কাজ করে বসল — লিখে ফেললো একটি প্রেমের কবিতা। আর পিঠোপিঠি দিদির দৌলতে সেখানা পরিবারের সকলের সম্মুখে প্রকাশিত হয়ে পড়ল। এরপর সেই পরিবারের পুরুষ-নারী সকলের মধ্যে যে চিত্র ফুটে উঠেছিল তা ঊনবিংশ শতাব্দীর কথা মনে করিয়ে দেয়। প্রচলিত অন্দরমহলের প্রথায় যারা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল, এটাকেই জীবন বলে মেনে নিয়েছিল, তাদের কোন সমস্যা কোন সময়েই হবার কথা নয়। কিন্তু যারা কিছু জানতে চায়, কিছু জানাতে, শোনাতে চায় — লড়াইয়ে তাদেরই নামতে হয়। একরত্তি মেয়ে একখানি প্রেমের কবিতা লিখে ফেলেছে, সুতরাং তার যে অপরাধ, তা তো পর্বতপ্রমাণ। কোনমতেই যেন সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করা সম্ভব নয়, মহাপাতকের কাজ করে বংশ-গৌরব একেবারে ধূল্যবলুণ্ঠিত। নানা পরতে পরতে তার শাসন চলছে, অথচ স্বয়ং মেয়েটি স্বীকার করলো কিনা যে এরকম কবিতা সে আরো একখানি লিখেছে। অর্থাৎ শাসিত হতে হতে তার মনোভাব এতটাই দৃঢ় হয়ে গিয়েছিল যে অন্তরের অনুভূতিপূর্ণ লেখা যেন স্বতোৎসারিত হতে চাইছে। এ ধরনের লড়াই শুধু গল্পের লেখিকা মেয়েটিই করেনি, সত্যিকারের লেখিকার জীবনের কথা যেন। প্রতিভার স্ফূরণ ঘটানোর জন্য যে মনোবল প্রয়োজন, সেটা আয়ত্ত করার জন্য চাই তেজ, সৎসাহস — যা মেয়েটির ছিল। নারী বলে শুধু ঘরে বসে মুখ বুজে থাকবে, তা মেনে নেবার কথা যেন ভাবতে পারে না।

এই মেয়েটি যখন এককালে প্রতিষ্ঠিতা, স্বনামধন্যা লেখিকা হয়ে উঠলেন তখন যে নতুন কাকা

মাছ ভাজার মতো এপিঠ-ওপিঠ করে তাকে ভেজেছিল, তিনিই পরম আদরে বংশের গৌরব শিখরটিকে কাছে বসিয়ে বলেছিলেন — "হবে না? লেখিকা হবে না? আমার ভবিষ্যৎ বাণী বিফলে যাবে? বলিনি সেদিন? যেদিন ঘাঘরাপরা একফোঁটা মেয়ে কবিতা লিখে বাড়িসুদ্ধ লোককে তাক্ লাগিয়ে দিয়েছিল, সেদিন বলিনি? — এ মেয়ে ভবিষ্যতে জিনিয়াস্ হবে।" *(পৃ. ২৬৩, ঐ)*। অথচ সত্যকার বক্তব্যে তিনি বলেছিলেন — "একবাক্যে বলে দিচ্ছি, এ মেয়েকে সাবধানে না রাখলে ভবিষ্যতে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে 'ভাব' করবে!" *(পৃ. ঐ, ঐ)* অর্থাৎ বড়দের কোন বাক্যই কোনভাবে অতি উৎসাহী মেয়েটিকে অবদমিত করতে পারেনি, সত্য প্রকাশে সে যেন আরো অধিক উৎসাহী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু নতুন কাকা নামের পুরুষ চরিত্রটি নিজেকে অনেক বদলে নিয়ে যে একটি আশীর্বাদক অভিভাবকের পর্যায়ে নিয়ে চলে গিয়েছে — এটা যেন কিছু পুরুষ চরিত্রের প্রতীক হিসেবে কাজ করছে।

'কাঠামো' (১৩৬৩ বঙ্গাব্দ) গল্পেও দেখা যায় তেমনি এক নারীকে। যে মামা-মামীর গৃহে অবহেলায় খেয়ে পরে বড় হয়ে রাঘব রায়ের মতো এক প্রৌঢ় ব্যক্তির দ্বিতীয় স্ত্রী হয়ে এসে সংসারে নিজের প্রভাব বিস্তার করে তুলেছে। রাঘব রায়ের পুত্র কেশবের চেয়ে তার সৎমা কদম বয়সে পনের-ষোল বছরের ছোট, তবুও সম্পর্কে পুত্র বলে তাকে নাম ধরে ডাকত। বাড়ির ঝি চাকরদের কাছ থেকে বাড়ির মৃতা গৃহকর্ত্রীর সম্ভ্রম আদায় করে নেবার চেষ্টা করত। সহ্য করতে না পেরে কেশবের স্ত্রী একদিন বলেই ফেলেছিল — "অতবড় মানুষটাকে নাম ধরে ধরে কথা কও, তোমার লজ্জা করে না?" কদম এর উত্তরে যথেষ্ট মেজাজের সঙ্গে শুনিয়েছিল —"লজ্জা আবার কিসের? অতবড় মানুষটার বাপকে কানে ধরে ওঠাচ্ছি বসাচ্ছি, আর তার ছেলের নামটুকু করতে লজ্জা?" *(পৃ. ২৯৫, ঐ)*। এই যে অধিকার কায়েম করার মোহ, চির আকাঙ্ক্ষিত, অনাস্বাদিত স্বাদকে উপভোগ করার ইচ্ছা — এ তো নারীচিত্তের চিরন্তন ইচ্ছা। এই ইচ্ছাপূরণের মাধ্যম হচ্ছে বিবাহ, যার জন্যে কদম অপেক্ষা করেছিল। তার কাছে প্রেম, ভালোবাসা, প্রেমিক পুরুষের চেয়েও বড় হয়ে উঠেছে সংসারে প্রধানা হয়ে কর্তৃত্ব করার ইচ্ছা; সংসারের স্বপ্ন অবাস্তব হলেও দুঃখের মধ্যে থেকে সুখের তীব্রতাটাকে উপভোগ করার বাসনাটাই বড় হয়ে দেখা দেয় কদমের মধ্যে, — এটাও সংসারে এক ধরনের সত্য দিক। যে সত্য প্রেমকে চায় না, প্রেমাস্পদের আবেশ বিহ্বলতা নারীকে আকর্ষণ করে না, সংসারে সকলের ওপরে প্রভাব বিস্তারকারী প্রধানার ভূমিকাই তার নিকট শ্রেয়।

নারীরা পুরুষের অন্নে প্রতিপালিত, নারীরা পুরুষের ওপর নির্ভরশীল। পুরুষদের অর্থ, প্রাচুর্য্য, সম্মানেই নারীরা সম্মানিতা; কিন্তু বিপরীতটা ততটা প্রাধান্য পায় না ঠিক যতটা নারী দিয়ে থাকে। যেমন একটি নারীর হস্তক্ষেপ ভিন্ন কোন পুরুষ সংসার রথকে পরিচালনা করে নিয়ে যেতে পারে না। সমস্ত দিক গুছিয়ে একটি সংসারকে লাবণ্যমণ্ডিত করে তোলা, শ্রীময়ী করে তোলা একমাত্র

কোন না কোন কল্যাণী নারীর পক্ষেই সম্ভব। তথাপি দোষের ভাগটা বেশ কিছুটা রয়ে যায়, কারণ নারীরা কখনো কখনো রুক্ষ, ঈর্ষাকাতর ও স্বার্থপরও হয়ে ওঠে। আর তখনই তাদের সমস্ত গুণাবলীগুলো চাপা পড়ে যায়। 'অন্তরালে' (১৩৬৩ বঙ্গাব্দ) গল্পে আমরা জয়ন্তীকে সেভাবেই দেখি। রোজগেরে শ্বশুরের মৃত্যুর পর শাশুড়ীহীন সংসারে শুধু স্বামী, দেওর আর একমাত্র শিশু কন্যাকে নিয়ে বেশ অনটনেই পড়েন জয়ন্তীরা। তাই ওপরতলায় একটা ভাড়াটে বসানো হয়েছিল। উভয় পরিবারের মধ্যে বেশ সদ্ভাবও গড়ে ওঠে। কিন্তু পরে এমন একটা সময় আসে যখন সদ্ভাবটা পুরুষদের মধ্যে বজায় থাকলেও মহিলা মহলে কিছুটা চিড় ধরেছিল। কারণ যে অর্থের প্রয়োজনে নিজেরা নীচে নেমে এসে সমাদরে ওপরতলায় ভাড়াটে বসানো হয়েছিল, তাদের সেই অর্থের আজ আনুকূল্য ঘটেছে। ছোটভাইয়ের চাকুরি এবং দাদার চাকুরির কারণে শ্রীবৃদ্ধির দৌলতে জয়ন্তীরা এখন আগের চেয়ে সম্পন্ন। আরো চারটি পুত্রকন্যার জন্মদান এবং দেওরের বিবাহ দান প্রসঙ্গেই বারংবার দোতলার ঘর দু'খানার প্রয়োজন ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই প্রয়োজনে এবং অর্থানুকূল্যে দুই পরিবারের মধ্যে সম্পর্ক জৌলুষ হারিয়েছে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কও মাঝে মাঝে তিক্ত হয়ে ওঠে, কারণ বিমান জয়ন্তীর কথামতো ভাড়াটের উঠে যাবার নোটিশ দেয় না বলে।

জয়ন্তী অনেকদিন পরে সাজিয়ে গুছিয়ে ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাপের বাড়ি বহরমপুর গেল ভাইয়ের বিয়ে উপলক্ষে। বিয়েতে যেতে না পারলেও পরে একসময় বিমান তাদের আনতে গেল। সকলে মিলে বাড়ি ফিরে বাড়ির নিশ্চুপ চিত্র দেখে জয়ন্তী কারণ জানতে চাওয়ায় অনেক হেঁয়ালীর মাধ্যমে বিমান জানায় ওপরতলার সমরবাবু মারা গিয়েছেন। আর তার দিন চারেক পরে তাঁর স্ত্রী মাধুরী সংসারের চাটিবাটি গুছিয়ে বাপের বাড়ি চলে যান। একথা শুনে জয়ন্তীর চুপ করে থাকা, এই প্রথম প্রতিবাদ না করে স্বামীর মুখপানে তাকিয়ে থাকা দেখে বিমানও যেন সুযোগ পেয়ে বলতে ছাড়ে না— "যাক্ ভগবান কিন্তু তোমার প্রার্থনাটা কান পেতে শুনেছিলেন, কি বলো?' *(পৃ. ৩২৩, গল্প সমগ্র, ৪র্থ খণ্ড)*।এই উক্তি থেকে বোঝা যায় যে, জয়ন্তীর প্রতি বিমানের মনের গহনে কোথাও যেন ঘৃণা মিশ্রিত একটা অবজ্ঞা লুকানো ছিল। "চিরদিনই কি নারীর প্রতি আসক্তি আর সোহাগ প্রাচুর্য্যের অন্তরালে পুরুষের চিত্তে আত্মগোপন করে থাকে এমনি ঘৃণা আর অবজ্ঞা?" — *(পৃ. ঐ, ঐ)*। পুরুষরা নারীদের কবে দু'হাত ভরে সুযোগ দিয়ে বিকশিত করে তুলেছে যে, নারীরা ত্যাগ সর্বস্বা হয়ে উদার হবার সুযোগ পাবে? পুরুষেরা বাইরের লোকেদের সঙ্গে সম্পর্কহানির ভয়ে বা সংসারের আরো নানা অনর্থের ক্ষেত্রে নারীদের দায়ী করে নিজেরা স্বস্তি পায়। নারীর মতো নিজের মূল ছেড়ে এসে অন্য একটি সংসারের সকলকে আপন করে নিয়ে পথচলা — এটা কি সত্যিই কোন পুরুষের পক্ষে সম্ভব? সংসারের দায়িত্বে, কর্তব্যে পরাকাষ্ঠা হয়ে নারী নিজের সুখ বিলিয়ে দিয়ে শান্তি বজায় রাখছে, চারদেওয়ালে আবদ্ধ থেকে সংসার আবর্তেই ঘুরপাক খাচ্ছে। সুতরাং তাদের

কাছে এর চেয়ে বেশি চাওয়াটাও হয়তো যুক্তিসঙ্গত নয়। কর্তব্য কর্মে অনুযোগ ধরা পড়লে তো আবার তাদের অন্তরে অনুশোচনার জন্মও হচ্ছে। তবে সত্যিই কি নারী পুরুষের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে উঠে আসা ঘৃণা পাবার পাত্রী শুধু? তাদের আত্মত্যাগ, প্রেম-ভালোবাসা কি যৎসামান্য চাওয়া-পাওয়ার নিরিখে এত সহজেই মূল্যহীন হয়ে পড়ে?

'বয়ঃসন্ধি' (১৩৬৩ বঙ্গাব্দ) গল্পে বিধবা মা মন্দিরা আর বারো বছরের মেয়ে মিষ্টির মধ্যে রয়েছে সহজ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। বাবা না থাকায় মা ও মেয়ে পরস্পর পরস্পরের ওপর নির্ভরশীলতা ছিল আত্মিকভাবে অনেক বেশী। কিশোরী বালিকা ছিল চাপল্যে পরিপূর্ণ আর মা ছিল স্বামীর মৃত্যুতে শোকাতুরা এক নিস্তব্ধ রমণী। তাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হলেন এক পুরুষ, যিনি এককালে ছিলেন মন্দিরার প্রেমিক। সহসা মেয়ে মিষ্টির সঙ্গে পরিচয় হয়ে যায় এবং তাদের বাড়িতে যাতায়াত বাড়ে। মিষ্টিও সুকান্তমামা করে অস্থির হয়ে যায়। মা এবং সুকান্তমামার মধ্যে যে পরিচয় ছিল সেটা জানলেও মেয়ে মায়ের নিকটবর্তী হতে খুব কম দেয় তাকে; নিজেই সদাসর্বদা সুকান্তকে ঘিরে থাকে। এদিকে মন্দিরাও ওপর তলায় নিমেষ গুণে যায় সুকান্তর আশায়। এভাবে চলতে চলতে একসময় মেয়ের প্রতি মায়ের একটা ঈর্ষাবোধ তৈরি হয়। সারাক্ষণ অপেক্ষা করেও সুকান্তকে কাছে না পাবার যে ক্ষোভ — তা থেকে এই ঈর্ষার জন্ম। আর এর ফলেই মেয়েকে নিরস্ত করতে মা মন্দিরা নিজের জীবনের সঙ্গে সুকান্তর পরিচয়ের কথাটা বলে মেয়েকে — "সুকান্তমামাও এমন কিছু ভালো লোক নয়।... ছেলেবেলায় ওর সঙ্গে আমার বিয়ের কথা উঠেছিল, বাজে মার্কা ছেলে বলে আমার বাবা দেন নি বিয়ে।" *(পৃ. ৩৪৫, গল্প সমগ্র, ৪র্থ খণ্ড)*। প্রাক্তন প্রেমিককে কাছে না পাওয়া, সোনালী দিনগুলোর স্মৃতিচারণা করে বর্তমানের নিঃসঙ্গতাকে পরিহার করার সুযোগ না পাওয়ার ফলে নিজের সন্তানের কাছে নিজেকে বড় করে তোলার জন্য এই প্রচেষ্টা নারীমনের ঈর্ষাকাতরতাকেই প্রমাণ করে।

মিষ্টি কিন্তু তার সুকান্তমামাকে ঘিরে একটা বৃত্ত ততদিনে রচনা করে ফেলেছে। কিশোরী মনের চপলতাকে কেন্দ্র করে প্রথম প্রেমের কুসুম বিকশিত হতে শুরু করে এই পুরুষটিকে ঘিরে। সে জীবনে এই প্রথম এতোটা নিকটে সম্পূর্ণভাবে একজন পুরুষকে পেয়েছে। কিন্তু মায়ের উক্তি তাকে দিক্‌ভ্রান্ত করে তোলে। দোলাচলতাময় মানসিকতা নিয়ে, অপরিণত বুদ্ধি নিয়ে মিষ্টি তার সুকান্তমামার নামে মায়ের নিকট নালিশ করে এবং পরিণামে সুকান্তবাবুকে যথেচ্ছ অপমান করে মন্দিরা তাড়িয়ে দেয়। কিন্তু বেশীক্ষণ থাকতে না পেরে একসময় মিষ্টি দোষ স্বীকার করে যে, মিথ্যে নালিশ সে মায়ের কাছে করেছে। কারণ হিসেবে মিষ্টি যা বলে তা মন্দিরাকে যেন মূক ও বধির করে দেয়, "— ও কেন, তোমার দিকে অমন বিচ্ছিরি করে তাকায়? ও কেন তোমাকে 'বৃষ্টি' বলে ডাকে? — ও কেন —?" *(পৃ. ৩৪৮, ঐ)*। মায়ের কোলে মুখ ঘষে ঘষে ক্রন্দনরতা মেয়েকে দেখে মা হতভম্ব হয়ে

যান। তবে তার নিজের ধারণার সত্যতা নেই, সুকান্ত মন্দিরার কিশোরী বয়সের ছবির ধ্যান করলেও মেয়ের কিশোরী বয়সকে নয়, তার টানেই এ বাড়িতে আসত। কিন্তু তার নিজের সন্তান, সেই তো বরং উল্টে সুকান্তর প্রেমে পড়ে গিয়ে যন্ত্রণায় এখন ছটফট করছে। মায়ের প্রতি ভালোবাসায় সুকান্তকে নিয়ে মাকে নানা কথা বললেও এখনকার যে অন্তর্দহন তা মিষ্টির নিকট অধিক কষ্টদায়ক। একটি পুরুষকে ঘিরে মাতা ও পুত্রীর এই যে প্রেমময় আবর্তন অসম্ভব হলেও কতটা সত্যি হতে পারে তাই লেখিকা দেখিয়েছেন।

'ঘটনাটা সত্যি' গল্পে এক লেখক গল্প লিখতে গিয়ে সহসা আবিষ্কার করেন তার লেখার টেবিলের পাশে পশ্চিমের জানালার বাইরে তাসের আড্ডার ধারে চিৎকার চেঁচামেচি। এই কাজ চলছে দুজন নারী-পুরুষের মধ্যে। পচার মা তার পুরুষ সঙ্গীটিকে এই আড্ডায় এসে পাকড়াও করেছে। পুরুষ সঙ্গীটির সঙ্গে তার হয়তো বিবাহ হয়নি, তাই বলছে — "তুই কি আমার গাঁট ছড়ার পরিবার যে গিঁঠি খুলতে পারবো না, ..." *(পৃ. ১৭৮, ৫ম খণ্ড)*। কিন্তু একসঙ্গে বসবাস করছে তারা বারো বছর ধরে। এই ঝগড়া-ঝাঁটি, গালমন্দ, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মধ্য দিয়ে বসবাস করলেও বিশ বছর আগে ফেলে আসা পাঁচ বছরের ভাইয়ের জন্য মানত, উপোস ও আবেগ এবং পচার বাপের অসংখ্য অত্যাচার মাথা পেতে নিয়েও ভেতরে ভেতরে নারী ধর্মকে কত কোমল করে বাঁচিয়ে রেখেছে তার প্রমাণ মেলে। পচার বাপের সমস্ত দায়-দায়িত্ব নিজে বহন করে, অসহ্য হয়ে হয়তো বা মাঝে মাঝে মেজাজ বিগড়ে যায়, কিন্তু সংসার যখন ভাঙনের মুখে আসে, তখন নিজেই সমস্ত কিছু মেনে নিয়ে সেই ভাঙন প্রতিরোধ করে। অন্ত্যজ শ্রেণির নারী হলেও তার মধ্যে একটি কোমল, চিরন্তন, শাশ্বত নারীমূর্তির অবয়বই পরিলক্ষিত হয়। "তুই চুরি করবি, জুচ্চুরি করবি, আমি মুখে তালা দিয়ে থাকবো তাই ভালো!... অত্যাচারে অত্যাচারে যে দিন দিন ঘাটের মড়ার মতো চ্যাহারা হয়ে যাচ্ছে দেখতে পাস না? বারণ কি অমনি করি?" *(পৃ. ১৭৯, ৫ম খণ্ড)*।এই উক্তিগুলো প্রমাণ করে বাইরের ঝড়-ঝাপটাওয়ালা কথার ভেতরে ভালোবাসার চোরাস্রোত কিভাবে বিরাজমান। বহিরঙ্গে স্থূলতা চোখে পড়লেও অন্তরঙ্গে রয়েছে বয়নের সমস্ত সুলুকের সন্ধান চিরন্তনী নারীর মতো; তাই তো সংসার গ্রন্থনের জন্য সূক্ষ্ম গ্রন্থিগুলো সময়মতো সংযুক্ত করার কাজটি পচার মা নিপুণভাবেই করতে সচেষ্ট হয়।

'মনোনয়ন' গল্প আমাদের একটি আত্মসচেতন, ব্যক্তিত্বপূর্ণ মানবীর সন্ধান দিচ্ছে। যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি নিজের জন্য পাত্র নির্বাচনে স্বমত পোষণ করছে। কলেজের ছাত্রী ইন্দ্রাণীর দুজন পুরুষ বন্ধু বা বলা চলে তার পাণিপ্রার্থী। একজন কলেজের বাংলার অধ্যাপক, গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবী পরা কৌশিক দত্ত ও অপর জন পুনাতে ভালো চাকরি করা অনিরুদ্ধ। এদের দুজনেই ভাবছে ইন্দ্রাণী তাদের ভালোবাসে এবং বিয়ে করতে চায়। কিন্তু ইন্দ্রাণী যখন একজনের

কাছে আসে, অন্যজনের জন্য তখন তার মন কেমন করে। অর্থাৎ তার মধ্যে এক দোলাচলতা কাজ করে চলছে। কখনো মনে হচ্ছে এরা অত্যন্ত সহজ, ভীষণ পরিচিত এবং কেমন বোকা-বোকা। অনিরুদ্ধ ও কৌশিক একে অপরকে হিংসা করে যাচ্ছে ইন্দ্রাণীকে ঘিরে, আর ইন্দ্রাণী তাদের নিয়ে মজাও করছে; আবার ভেবেও যাচ্ছে যে, বিয়ে করা উচিত হবে কি না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুজনের কাছেই জবাব গেল আলাদাভাবে চিঠির মাধ্যমে যে, বিয়ে করা সম্ভব নয়।

ইন্দ্রাণী তার বান্ধবী অনুভার কাছে তার মনোগত অভিপ্রায়টি খুলে বলল। জানাল, "বড্ড বেশি পরিচিত, বড্ড বেশি আটপৌরে হয়ে গেছে ও।" *(পৃ. ১৮৬, ঐ)*। একজন তাকালেই অপরজন বুঝতে পারে কি বলতে চায়, এই গণ্ডী থেকে বেরিয়ে একেবারে নতুন রহস্যে ঘেরা রোমাঞ্চিত এক জীবনে যেতে চায় সে। "জগতের সমস্ত কাব্যরসই ত এই নিষিদ্ধ ফলের রস।" *(পৃ. ১৮৭, ঐ)*। লেখিকার এখানেই বিরাট অগ্রগতি। আজকের নারীরা শুধুমাত্র পতিদেবতার কথা না ভেবে কিভাবে এগোচ্ছে মানসিকভাবে, কতদূর স্বাধীন হচ্ছে তাদের চিন্তা ভাবনা তাই এখানে ইন্দ্রাণীর নানা মন্তব্যে আমরা দেখতে পাই। "স্বামীটি ছাড়া আর আমার কোন অনুরক্ত ভক্ত নেই, এ ভাবতে নিজেকে ভারি বেচারী বেচারী লাগে না কি? আমি বলি ঘর সংসার করতে যেমন একটি স্নেহবান, হৃদয়বান এবং অর্থবান মজবুত স্বামীর দরকার, তেমনি ঘর সংসারের উর্দ্ধে অবস্থিত মনটাকে বাঁচিয়ে রাখতে প্রেমপত্তর লেখবার মত দু-একটা ভক্ত থাকাও নিশ্চয় দরকার।" *(পৃ. ১৮৭, ঐ)*। ইন্দ্রাণীর যুক্তিকে ধারালো করতে আরো দু'একটা বক্তব্য জুড়ে দেওয়া গেল — "দেখিস তা হলে ওরাও কোনদিন বুড়িয়ে যাবে না, আর আমিও।... পুরুষের আসক্তি দিয়েই তো মেয়েদের মূল্যের পরিমাপ।" *(পৃ. ঐ, ঐ)*। অন্দরমহলের নারীদের মানসিক চিন্তার স্রোত বহির্জগতের আলোয় কোথা দিয়ে ভেসে যাচ্ছে, এ যেন তার বহিঃপ্রকাশ। নারীরা যেখানে স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষে আসক্ত হতে পারে, একথা নারী পুরুষ নির্বিশেষে কেউ ভাবতে পারতো না, সেখানে আধুনিকা শিক্ষিতা একজন নারী নিজের মূল্যের পরিমাপ করছে পুরুষের চোখে নিজেকে আকর্ষণীয় করে রেখে। নারীরা নিজের চিত্তের অবাধ স্বাধীন ক্রমবিকাশ চাইছে। তারা ভাবতে শিখেছে, মেয়েদের সব স্বাধীনতার পাশাপাশি ভালোবাসবার স্বাধীনতারও প্রয়োজন আছে। আর সেই প্রয়োজনেই এই ইন্দ্রাণী চরিত্রের সৃষ্টি। এতদিন যেভাবে অভ্যস্ত ছিল আমাদের সমাজ ও আমাদের পুরুষ জাতি, তারা যেন নতুন করে ভাবতে শুরু করল। অনিরুদ্ধর মুখে সাধারণতঃ সেই ধরনের কথাই শোনা গেল — "চিরদিনই শুনে এসেছে, মেয়েরাই পুরুষের হাতের খেলার পুতুল, অলক্ষ্যে কখন সে পালা বদলাল?" *(পৃ. ১৮০, ঐ)*। এখানেই চিরাচরিত ধারনা ধাক্কা খেয়েছে গভীরভাবে। পুরুষের সমকক্ষ হয়ে উঠেছে নারীরা, পুরুষদের মতো তারাও ইচ্ছানুযায়ী ভালোবাসবে, ভালো লাগাবে, চাইবে এবং পাবে — এতেও যে তাদের সমানাধিকার আছে, তাই যেন বোঝাতে চায়। অন্তঃপুরের নারীরাও যে বাইরের জগতের মানবী —

এ গল্প যেন সে কথাই বলে।

'নারীপ্রকৃতি' গল্পে নারী চিত্তের এ পিঠ আর ও পিঠের কথা বলা হচ্ছে। শচীনবাবুর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী প্রতিভা। তাদের ফ্ল্যাটে একদিন চোর ঢুকেছিল। সত্য সে বেচারা চোর কিনা তা নিরূপণ না করেই চোরকে আশেপাশের ফ্ল্যাটের লোকেরা সকলে মিলে বেশ উত্তম মধ্যম দিলেন। চোর বেশ অসুস্থ হয়ে পড়ায়, নড়বার ক্ষমতা রহিত হওয়ায় এবং পুলিশের কথা উত্থাপিত হওয়ায় তাকে রেখে সকলেই সরে পড়ল। কিন্তু শচীনবাবু এবং তার বিধবা বোন সুনীলা তা পারল না, বরং শুশ্রূষা করতে লেগে গেল। সুনীলার সমবয়সী শচীনবাবুর প্রথম পক্ষ তার প্রাণের বন্ধু হলেও কিন্তু প্রতিভা তার চক্ষুঃশূল। সব ঘরের মহিলারা উঁকিঝুকি মারলেও প্রতিভা ঘরে বসে বসে উপন্যাস ধ্বংস করছে, এতে যে সে প্রচণ্ড নিষ্ঠুর প্রাণের পরিচয় দিচ্ছে — একথাই সুনীলার বক্তব্য। এই চোরের সেবায় শচীনবাবু নিজেও নিয়োজিত এবং স্ত্রীকেও তিনি টেনে আনতে চাইছেন।

এই চোর আসলে প্রতিভার প্রেমাষ্পদ, যার সঙ্গে সেই রাতেই তার গৃহত্যাগী হবার কথা ছিল। মাঝরাত অবধি এই চললেও শেষরাত নাগাদ তারা পালাতে পারতেন, কিন্তু তা করলেন না। কারণ, তাতে শেষপর্যন্ত কথা হতে পারে — "ছি ছি চোরটার সঙ্গে — সে আমি সইতে পারবো না।" প্রতিভার কথার উত্তরে ব্যক্তিটি বলল — "লোকের কথা তো তুমি শুনতে আসবে না প্রতিভা?" — প্রেমাষ্পদের এই প্রশ্নের উত্তরে বলে, "তা হোক, মানসম্ভ্রম বলে একটা জিনিস নেই?" *(পৃ. ১৯৩, ঐ)*। অর্থাৎ সম্ভ্রম খোঁজা? আবার চোরকে না চেনার জন্য অপূর্ব অভিনয় করে যাওয়া, যা কিনা স্বামী এবং ননদ কারো পক্ষে বোঝার কোন উপায় নেই। ওপরে ওপরে যে এত ভালো, সে সমস্ত ভিত খুঁড়ে ফাঁকা করে দিচ্ছে — এত বড় অভিনয় — সম্ভব? তবে কি এটা অসমবয়সী বিবাহের প্রতিবাদের ভাষা? আবার পালাতে গিয়েও না যাওয়া কি নিশ্চিত আশ্রয়কে হারাতে না চাওয়ার ফল?

'বৃদ্ধস্য তরুণীভার্যা' — তখনকার সময়ে প্রতিনিয়তই ঘটত, কিন্তু প্রতিভা প্রেমাষ্পদর সঙ্গে সম্পর্ককে বজায় রেখে, অনিচ্ছাকৃত সংসারবৃত্তের বাইরে গিয়ে সুখের গৃহকোণের সন্ধান করে সুখী হতে চায়। এ যেন গৃহ-অভিভাবক-সমাজ-সংসার সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে নিজের স্বাধীন ইচ্ছাকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা। আবার বাস্তব সত্যকে উপলব্ধি করতে পারার মতো মানসিক পরিক্রমণ তার ঘটেছে বলেই হয়তো স্বামীর নিশ্চিন্ত আশ্রয় পরিত্যাগ করতে নিরুৎসাহী হয়ে পড়ছে।

'মেরুদণ্ড' গল্পে অন্নপূর্ণা সমস্ত সংসারের হাল একা হাতেই ধরে আছে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সংসারের যিনি কর্তা ব্যক্তি তার ভূমিকা অন্নপূর্ণার ব্যস্ততার মধ্যে অনেক কম। কারণ, চক্ষুলজ্জা; অথচ এই নিয়েই যত বিপত্তি এবং এই নিয়েই গল্প। অসুস্থ সারদাশংকর সর্বদাই আশা করেন তার

পাশটিতে তার অনুগতা হয়ে স্ত্রী অন্নপূর্ণা তার সেবা করবে এবং সঙ্গ দেবে। তা না করে সর্বদাই সংসারের ব্যস্ততায়, রান্নায়, ভাঁড়ারে সবখানে নিজেকে নিয়োজিত রাখে। জীবনের শেষ কটা দিন স্ত্রীর সান্নিধ্যে ও সেবায় কাটিয়ে দিতে চান, অথচ একান্নবর্তী পরিবারে দুই জা দুই পুত্রবধূ, বিবাহিতা ও অবিবাহিতা কন্যাদের জন্য একান্ত ইচ্ছা থাকলেও যে সেটা সম্ভবপর করে তুলতে পারেন না, তা অন্নপূর্ণার নিকটও নিদারুণ কষ্টদায়ক। ঠাকুর চাকর পরিবেষ্টিত সংসারে মূল ভূমিকায় তার অবস্থান; তিনি না দেখলে ভাঁড়ার অগোছালো হয়, রান্না পুড়ে যায় ইত্যাদি নানাবিধ অসুবিধা দেখা দেয়। কিন্তু এই অন্নপূর্ণাই অবাক হয়ে যান, যখন দেখেন যে, সংসারে তাকে ছাড়া একবেলাও চলেনি অথচ সারদাশংকরের শ্রাদ্ধের বিশাল যজ্ঞি রান্না তাকে ছাড়া কেমন অনায়াসে চলে যাচ্ছে। এটা কি করে সম্ভব?

সারদা শংকরের সবচেয়ে পছন্দের খাবার ছিল মাংস। কর্তা সারদাশংকর ছুটির দিন হলেই মাংস খাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। তিনি লিভারের রোগে অসুস্থ বলে অনেকদিন পর সেদিন বাড়িতে মাংস হচ্ছে বড় বৌমার ভাইকে নেমন্তন্ন করা হয়েছে বলে। ছেলেদের জন্য পথ্যের বাইরে অন্যান্য খাবার দিতে না পারলেও আজ স্বামীকে একটু মাংসের ঝোল এবং একটু আলু দেবেনই ঠিক করে রেখেছিলেন। আসলে মানুষ যেভাবে মনে মনে ভাবে কার্যতঃ তা তেমনভাবে আর করে ওঠা হয় না। তাই অন্নপূর্ণার দরদী মনের প্রকাশটা দেখা দিল বৈপরীত্যে — "তোমার খাবার উপায় নেই বলে কি বাড়িসুদ্ধ সবাই বঞ্চিত হয়ে থাকবে?" *(পৃ. ১৯৯, ঐ)*। স্ত্রীর এই কথার জন্যই সারদাশংকর বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যেতে চাইলেন, এবং অসুস্থ শরীরে উত্তেজিত অবস্থায় বাড়িতে পড়েই মারা যান। তারপর থেকে সব কাজ চলছে, কিন্তু প্রয়োজন পড়ছে না অন্নপূর্ণাকে একবারও।

আমাদের সমাজে গৃহকর্ত্রীদের ভূমিকা এবং পাশাপাশি বিধবা মেয়েদের ভূমিকাও এখানে দেখতে পাই। যে স্বামী একটু স্ত্রীর সান্নিধ্যের জন্য লালায়িত ছিলেন, শুধু সংসার সংসার করে তিনি সে আশায় স্বামীকে বঞ্চিত করেছেন এবং সংসারের অন্যান্য সদস্যরাও একজন অসুস্থ রোগীর এই চাওয়াকে নিয়ে মজা উপভোগ করতেন, বুঝতে চাইতেন না এতটুকুও। ফলে কেউ সংসারের দায় নিতে অগ্রসর হতেন না এবং সবচেয়ে বড় কথা অন্নপূর্ণা নিজেও সমস্ত নিজের করে আগলে রাখতে চাইতেন। আর বিধবাদের অবস্থার চিত্র পাই ঠিক পরবর্তী অবস্থাটিতে, যেখানে সেই মানুষটিও নেই আর সঙ্গে সঙ্গে সংসারের সমস্ত দায়ভার যেন স্বাভাবিকভাবেই সকলে নিয়ে নিয়েছেন। অর্থাৎ শয্যাশায়ী হলেও স্বামীই ছিল অন্নপূর্ণার মেরুদণ্ড, তার বিহনে তাই আজ — "আসছে না একবিন্দু চক্ষুলজ্জা।... 'কাজ' বলে কোন বস্তু জগতে আছে, মনেই পড়ছে না!... কর্ত্রীর মর্যাদা আর কর্ত্রীর দায়িত্ব? বিনা চেষ্টায় আপনিই তো ছেড়ে গেল, অথচ সারদাশংকর থাকতে কিছুতেই কেন সেটা ত্যাগ করতে পারেন নি?" *(পৃ. ২০১-২০২, ঐ)*। এ হচ্ছে নারী মনের চিরন্তন শাশ্বত সত্তা; যা নাকি

ভাবে, আমি ছাড়া সমস্ত অচল। আবার স্বামীর অস্তিত্ব বিহনে সমস্ত পৃথিবী আঁধার। তারই চিরন্তনী মূর্তিময়ী প্রতিমা অন্নপূর্ণা।

'মণিকোঠা' গল্পে দেখা যায় সুনন্দা আর বাচ্চুকে নিয়ে সীতেশের সংসার, কিন্তু সেখানে অভাব হচ্ছে স্বাচ্ছন্দ্যের। সংসারে উপরি খরচ হল মা-মরা ভাগ্নে জীতু। সুনন্দারই পরামর্শে তার স্বামী সামান্য বেতনের চাকরীর সঙ্গে একখানি টিউশনিও নিয়েছে। আসল কোন্দলটা বাঁধল সেই টিউশনির পাওয়া টাকাটা নিয়েই। যা দিয়ে জীতুর জন্য একখানা সবুজ ফুলপাড় ধুতি এল। "নিজের স্ত্রী পুত্রকেই ভালো করে খেতে পরতে দেবার ক্ষমতা যার নেই, তার আবার এতো মনুষ্যত্ব দেখাবার শখ কেন?" *(পৃ. ২১১, ৫ম খণ্ড)*। এই সমস্ত চিরাচরিত প্রথায় যেসব কথাবার্তা চলছে তা জীতুকে কেন্দ্র করেই। অভাবের সংসারে একটা মানুষের সমস্ত খরচ চালাতে হলে পরিস্থিতি যা হয় এখানে তাই হয়েছে। "যে বলতে জানে না, সে তো বুঝতে জানে না নন্দা ছেঁড়া পরায় কতো লজ্জা! কিন্তু যে জানে তার যন্ত্রণা কতো গভীর বলো তো?" *(পৃ. ২১২, ঐ)*। এতটাই দুর্বিষহ অবস্থা যে জীতুকে চারভাঁজ করে পরণের কাপড় শুকোতে দিতে হয়, যাতে মামা মামীর চোখে না পড়ে। আর সুনন্দা চায় নিজের একমাত্র ছেলেকে অতি যত্নে মনের মতো করে সাজাতে।

সুনন্দা তার দিদিমার দেওয়া আশীর্বাদী সোনার চেনটা বিক্রি করে দেয় সীতেশের প্রতি রাগ করে।হার বিক্রির বাষট্টি টাকায় ছেলের জন্যে বুশকোট, জামা-প্যান্ট, বিস্কুট, খেলনা প্রভৃতি নানাবিধ জিনিস নিয়ে আসে, আর সঙ্গে আসে তার নিজের জন্যে একখানা চাঁপা রঙের ওপরে কালো ফুল পাড়ের শাড়ী। এসব সদ্যকেনা জিনিসগুলো নিয়ে যখন ঝড়ঝড়ে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে যায় তখনই দেখতে পায় জীতুকে। এই জীতুকেই কি এতদিন ধরে দেখছে সুনন্দা? তা তো নয়। এই হাঁটু দুমড়ে অনেকক্ষণ ধরে রেলিং ধরে ধরে শীর্ণ পায়ের গোছ নিয়ে ওঠা জীতু, পিঠ ছেঁড়া, বিবর্ণ একখানা সার্ট পরা রোগা জীতু — আজ যেন তাকে নতুন করে দেখছে সুনন্দা। এতকাণ্ড করার পরও কিন্তু সে আজ আর জীতুর সামনে যেতে পারে নি। সুনন্দার ভেতরে যেন চিরাচরিত একটা কোমল মাতৃমূর্তি ডুকরে কেঁদে ওঠে। নিজেকেই সবচেয়ে নিষ্ঠুর বলে মনে হয় তার আজ। নিজের সন্তানের জন্য শখ আর সাধ মেটাতে গিয়ে নিতান্ত ন্যূনতম প্রয়োজনটুকুর কথাও যে মুখ ফুটে বলে না, সেই অনাথ, অসহায় ছেলেটিকে অকস্মাৎ দেখে তার বিবেকের দরজা খুলে গেল। যেন জিতুর চেহারার, কষ্টের দর্পণে নিজেকে দেখতে পেল। মুখরা সুনন্দার ভেতরে দেখতে পেলাম সেই নারীকে যে এই অসহায় ছেলেটির মুখে একটু হাসি ফোটানোর জন্য আস্তে করে আলগোছে নিজের শাড়ীর প্যাকেট আর ক্যাশমেমোটা নিয়ে চলে গেল দোকানের দিকে। নিজের শখটা কোথায় হারিয়ে গেল নিজেই ভাবতে চাইল না। মনুষ্যত্ববোধের উন্নয়ন ঘটল সুনন্দার মধ্য দিয়ে। নিজের সন্তানকে প্রতিটি মা স্বভাবতই বেশি ভালোবাসবে — কিন্তু মুখে বললেও কোমল মাতৃত্ব যে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে

যায় নি, সুনন্দার চিত্ত উদঘাটনের মধ্য দিয়ে লেখিকা তাই বোঝাতে চেয়েছেন।

চন্দ্রাবলী ও দীপঙ্কর স্বামী-স্ত্রী। তাদের মাঝখানে একটি স্বচ্ছ প্রাচীর হিসেবে উঠে এল আরতি। সে হচ্ছে দীপঙ্করের বিবাহপূর্ব জীবনের প্রেমিকা। যা নিয়ে উভয়ের মধ্যে জীবনের প্রথম রাত্রি থেকেই শুরু হল সম্পর্কের শীতলতা। **'কাঁচের দেওয়াল'** গল্পে আমরা তাই দেখতে পাচ্ছি। যে সম্পর্ক শুরুই হল না স্বাভাবিকভাবে, তাকে টানতে না চেয়ে দীপঙ্কর নবোঢ়া পত্নীকে বাড়িতে রেখেই নিজের কর্মস্থলের পথে যেতে চাইছে। কিন্তু নারী হিসেবে পরিণত মানসিকতার অধিকারী চন্দ্রা অপরের করুণার প্রার্থী হয়ে থাকতে চায় না। তাই "ভেতরের জীবনটা চলুক আপনার ইচ্ছে অনুযায়ী, বাইরেটায় চলবে না।" *(পৃ. ২১৭, গল্প সমগ্র, ৫ম খণ্ড)* অর্থাৎ বাইরে সম্পর্কের স্বাভাবিকতা বজায় রেখে সবার কাছে সুস্থতা প্রদর্শন করাটাই চন্দ্রাবলীর উদ্দেশ্য।

বিলাসপুরে চন্দ্রাবলী আর দীপঙ্করের অতিথি হয়ে এল দীপঙ্করের প্রাক্তন প্রেমিকা আরতি। স্বামী-স্ত্রীর অভিনয়টা যেন সুন্দরভাবে ধরা পড়ে আরতির কাছে, স্ত্রীর কাছে দীপঙ্করের এটা যেন একটা অনুরোধ — "ইচ্ছে হচ্ছে না যে, ও এসে আমাদের সম্পর্কের মধ্যে কোন অস্বাভাবিকতা দেখুক।" *(পৃ. ২২০, ঐ)* অর্থাৎ সম্পর্কের মধ্যে দৈন্যের সূত্র ধরে আরতি তাকে কোন করুণা না করে — এই ছিল তার অভিপ্রায়। সে কথা চন্দ্রা রেখেছে, সে এমন অভিনয় করে গেল যেন, এক গণ্ডুষ জলের প্রয়োজনের জায়গায় বন্যা বইয়ে দিচ্ছে। এমনকি রাত্রে শোবার ব্যবস্থাও হল নিজের কাছে, আর আরতির আপত্তির কাছে বলে বসল, "ওতো চিরদিনের, তুমি হলে দুদিনের।" *(পৃ. ২২১, ঐ)* । "আরতি এল আর তুমি সেই রামলালের ওপর ভরসা করে বসে আছ? নিজে একটু বাজারে টাজারে যাবে তো?" *(পৃ. ২২২, ঐ)* এই সমস্ত অভিনয়গুলো যেন চন্দ্রাকে নেশা ধরিয়ে দিল। একের পর এক চিত্রশিল্প সে প্রতিস্থাপন করে যাচ্ছে, যার ফলে নাকি আরতি যাবার সময় তার ভালোবাসার পাত্রটিকে বলে গেল — "তুমি সুখে আছ স্বচ্ছন্দে আছ, এটা ভাবতে ভাল লাগবে।" *(পৃ. ২২২, ঐ)* নারী মনের এই যে রূপান্তর, যে অভিনয় সত্যতা এসব জিনিস তো আমাদের চোখের সামনেই ঘটছে, একটু অন্তদৃষ্টি দিয়ে দেখতে হয়। সংসারে সুখ এবং সুস্থতা বজায় রাখতে অনেক অভিনয় নানা সময় নারীকে করতে হয়। তার পাশাপাশি আরো দেখলাম নারীর উন্নয়নের চিত্র, যা হল ব্যক্তিত্ববোধের জাগরণ। যখনই শুনল স্বামী প্রেমিকাতে আসক্ত, তখনই নিজেকে সম্পূর্ণরূপে তার হাতে সমর্পণ করা থেকে বিরত থাকল; অথচ লোকসমাজে এই অভিনয় দ্বারা বাহ্যিক জীবনযাত্রাকে স্বাভাবিক রাখার মতো বুদ্ধি ও মনের জোর বজায় রাখল। যদিও আরতিকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসার পথে উভয়ে উভয়কে পরিপূর্ণভাবে সত্যকার স্বামী স্ত্রীর মধ্যে খুঁজে পেতে চাইল। যেটাকে পাথরের প্রাচীর ভেবে এসেছে তা আজ যেন কাঁচের দেওয়াল বলে মনে হল, যা নাকি খুব সহজেই অনায়াসে ভেঙ্গে যেতে পারে। যে সত্তাকে অবলম্বন করে চন্দ্রা নিজের বাহ্যিক

সম্ভ্রম বজায় রেখেছে, স্বামীর সঙ্গে অভিনয় করে নিজেকে শক্ত করে ধরে রেখেছে, তাকেই দু'হাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়ে নিজেকে চিরন্তনী রূপের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়েছে।

'অবোধ্য পৃথিবী' গল্পে সাধারণ গৃহস্থ জীবনের সাধারণ চিত্র রূপায়িত। আমাদের সামনে একটি চিরাচরিত ধারণা রয়েছে — অবাধ্য, নেশাগ্রস্ত ও নানাবিধ কু-কাজে লিপ্ত ছেলেদের সুন্দরী ও গুণবতী মেয়েদের সঙ্গে বিবাহ দিলে তারা গৃহকোণকে ভালোবাসতে শেখে এবং সংসারী হয়। এমনই এক মদ্যাসক্ত যুবককে তার স্ত্রী আরাধনা সুপথে ফিরিয়ে আনতে পেরেছিল। বীরেশ্বর অনেক যুক্তি দেখিয়ে মদ্যপান করতে চাইলেও তার স্ত্রীর নারী-মনোভাব জনোচিত কিছু পদ্ধতি জিতিয়ে দিল, এবং বীরেশ্বর স্ত্রীর বাধ্য হয়ে সুগৃহিণীর কর্তা হয়ে সংসার করতে লাগল।

প্রৌঢ় বয়সে, ঘরে যখন বড় বড় ছেলে মেয়ে রয়েছে তখন এই বীরেশ্বরের আবার মতিভ্রম দেখা দিল বলে তার স্ত্রীর মনে হল। আপিস থেকে বেরিয়ে এসে রোজ বিকেলে কোথায় যেন যাচ্ছে এবং যথেষ্ট রাত করে ফিরছে। পুরানো রোগের আক্রমণ ভেবে আরাধনা আবার পুরানো ঔষধ প্রয়োগ করতে শুরু করল। কিন্তু কাজ হলো না দেখে বাধ্য হয়ে তিনি ছেলে কাবুলকে নিয়ে স্বামীর পিছু ধাওয়া করল। স্বামীর লুকোচুরি উদ্ধার করতে বদ্ধপরিকর আরাধনা যেন এক মহা বিস্ময়ের সামনে উপনীত হল — যে মানুষ মদ্যপানের মতো অন্যায়কে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে উৎসাহী ছিলেন, তিনি আজ অনাথ দুঃস্থদের পাঠদানের মতো মহৎ কাজে নিবিষ্ট হয়ে কেন যে সত্য চাপা দিতে চাইছেন তা আরাধনা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলো না। কিন্তু তার স্বামী যে এত মহৎ কাজে লিপ্ত হতে পারে এ বোধ যেন আরাধনার কোনদিনই ছিল না। ছেঁড়া মাদুর, কাঁচভাঙ্গা লণ্ঠন, নড়বড়ে জলচৌকি, খালি পা, খালি গা, কালো রোগা, শুধুমাত্র হাফ প্যান্ট পরা শিশুগুলোর মাস্টারমশাইকে দেখে আকস্মিক এক লজ্জায় যেন পাষাণ-প্রতিমা হয়ে গেছেন তিনি। নিজের মধ্যে নিজেকে আবিষ্কার করল আরাধনা — লজ্জা কাটিয়ে অবাক বিস্ময়ে বিস্ফারিত নেত্র তিনি। ছায়াছন্ন মনোলোকের অনেক অজানা তথ্য, অজানা পথ আজ তাকে ভাবাচ্ছে — স্বামীকে নতুনভাবে আবিষ্কার করার পর। অতি সাধারণ আটপৌরে ধরনের নারী হলেও স্বামীর নিকট আরাধনার নিজেকে বেশ নীচু মনের বলে বোধ হতে লাগল। স্বামীর কর্মে বাধা না হয়ে তার প্রেরণা হওয়া উচিত ছিল বলে মনে হতে লাগল।

'রৌদ্রালোক' গল্পে পাওয়া যায় আর এক নারী, যিনি স্বেচ্ছায় নিজের ঘাড়ে সমস্ত অন্যায় দোষ চাপিয়ে নিজের আত্ম-মর্যাদাবোধের পরিচয় দিয়েছিলেন। অভীক আর চিত্রা নব বিবাহিত দম্পতি, তারা মধুচন্দ্রিমা যাপনের উদ্দেশ্যে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে এসে অভীকের মাসীমা মহাশ্বেতাকে দেখতে এলেন। তিনি পুরনো একটা প্রায় পোড়ো বাড়িতে ঝি-চাকরদের নিয়ে বসবাস করেন। ভাগ্নেকে পেয়ে খুশী হলেন অসুস্থা এই বৃদ্ধা। ভাগ্নে বউকে দিলেন চন্দন কাঠের বাক্সে রাখা হাতীর দাঁতের

কাজ করা একটা মালা আর ভাগ্নেকে দিলেন নিজের লেখা শখের গল্পের একটা ডায়েরী।

জমিদারের ছেলে জমিদার, বাবা মারা যাবার পর নতুন গদি লাভ এবং তা থেকে ক্ষমতা লাভের ব্যবহার ও অপব্যবহার। অপব্যবহার সেদিনই দেখা গেল যেদিন স্নান করতে গিয়ে হীরের আংটিখানা চন্দ্রনারায়ণ হারালেন। কোপ পড়ল সেই দুর্বলের ওপর যে তার শীর্ণ হাতে বাবুকে ডলে ডলে তেল মাখায়। দর্পনারায়ণের পৌত্র, প্রভুনারায়ণের পুত্র, যার প্রতিটি শিরায় শিরায় দর্প এবং ঔদ্ধত্য জ্বলজ্বল ও টগবগ করছে। অহমিকার সচেতনতায় চাকরকে দিলেন নির্দেশ — "হারামজাদাকো বোলাও। লাগাও জুতি।" — বেধড়ক মার দেবার পরও সুরাহা হল না দেখে তিনি নিজেই রাগের মাথায় ছোঁড়াটার হাঁপরের মতো পেটটায় মারলেন লাথি। যার ফলস্বরূপ ছেলেটি মারা গেল। সদর দরজা বন্ধ করলেও খিড়কির অজস্র দ্বার দিয়ে এই খবর ছড়িয়ে পড়ল এবং যথারীতি পুলিশও এল। পুলিশকে কাজ থামিয়ে দেবার পথ ধরে এগিয়ে জমিদারবাবুর তো কোন লাভ হলই না, বরং খুন ও উৎকোচ দেবার ডবল দায়ে তিনি আবদ্ধ হলেন।

এক বছর যাবৎ বহু প্রচেষ্টার পর অবশেষে সেই সমস্যার সমাধান করার জন্য ডাক পড়ল চন্দ্র নারায়ণের স্ত্রীর। যাকে কিনা বলতে হবে, "লোকটা আমাকে আক্রমণ করতে আসে, আমি ভয়ে চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে পড়ি। ..." *(পৃ. ২৫১, ঐ)*। আর বাড়ির কুলবধূদের সম্মান রক্ষার্থে মুখুজ্জে বাড়িতেই এজলাস বসবে। আর এসবের বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ হচ্ছে চন্দ্রনারায়ণের স্ত্রীর। যে স্বামী অন্যায় করা সত্ত্বেও মামলা চালাতে একটা রাজার রাজত্ব উড়িয়ে দিল এবং তার নিজের সমস্ত গহনাগুলো পর্যন্ত শেষ করে ফেলল তাকে বাঁচিয়ে রাখার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা যে অত্যন্ত ঘৃণ্য প্রচেষ্টা, তবুও সম্পত্তি নষ্ট হলেও স্বামীকে উদ্ধার করার মতো নৈতিক কর্তব্য করতে তিনি পিছপা হননি। কুলবতীর সম্ভ্রম রক্ষার্থে এই পরিবারের আদালত ঘরে উঠিয়ে আনতে আপত্তি নেই, কিন্তু কুলবধূর প্রতি একটা পরপুরুষ লালসার হাত বাড়িয়েছে এবং লালসার শিকার হয়েছে একথাটা তাকেই সর্বজনসমক্ষে বলতে হবে — এই মানসিকতার বিরুদ্ধেই রানীর প্রতিবাদ। কিন্তু তিনি আদালতেই গেলেন এবং অকম্পিত স্বরে ব্যারিস্টার সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে বললেন — "সম্পূর্ণ সত্য নয়।" *(পৃ. ২৫১, ঐ)*। সবাইকে স্তব্ধ ও পাথরের মতো নিথর করে দিয়ে আদালতে তার প্রতিবাদী সত্তা থেকে বললেন — "যে লোক নিহত হয়েছে, সে আমাকে আক্রমণ করতে এসেছিল, এটা ঠিক নয়, আমিই তার প্রতি আসক্ত ছিলাম। ঈর্ষা পরবশ হয়ে আমার স্বামী" *(পৃ. ২৫২, ঐ)*।

চন্দ্রনারায়ণ এবং অন্যান্য সকলে ধিক্কারে ধিক্কারে তাকে নীলবর্ণ করে তুলেছে। অবশেষে তা থামল রানীর নিজের কথাতে — "কি বললাম আর কিনা বললাম তাতে কি এসে যাচ্ছে? প্রাণ বাঁচা নিয়ে কথা, সেটা তো বেঁচেছে? ঈর্ষায় পড়ে খুন করলে ফাঁসি হয় না, এটাই শোনা ছিল আমার।" *(পৃ. ২৫২, ঐ)* অতএব চলল অভিনন্দন। এই ভালো মন্দের জোয়ারে ভাসতে আর রাজী নয় তিনি,

তাই স্বামীর কাছে চাইলেন মুখুজ্জে বাড়ির 'বৌগিরি' থেকে মুক্তি। স্বামী তাকে সতী বলে সাবিত্রীর সঙ্গে তুলনা করতে চাইলেও তিনি নিজে চাইলেন প্রায়শ্চিত্ত করতে। "একটা ইতরের সংস্পর্শে দেহে আর মনে যে অশুচি, যে অপবিত্রতা সঞ্চিত হয়েছে, দেখি তা থেকে মুক্ত হওয়া যায় কিনা?" *(পৃ. ২৫৩, ঐ)*। অর্থাৎ যে স্বামী নিজের স্ত্রীর সতীত্ব ও ভালোবাসাকে পণ্য করে বেঁচে থাকবার জন্য উৎসাহী সেই স্বামীর প্রতি করুণা ব্যতীত ভালোবাসা কখনোই স্থান লাভ করতে পারে না। ফলতঃ তার গৃহে ও তার সান্নিধ্যে কোন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বময়ী নারী বসবাস করতে পারে না। যেমন রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তি' গল্পে চন্দরা স্বামীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল, এও যেন ঠিক তারই প্রতিফলন।

'স্থিরচিত্র' গল্পে আমরা দেখেছি পুত্রের মৃত্যুশোক উদ্‌ভ্রান্ত বাবা-মা কিভাবে নিঃশব্দে ভুলে গিয়ে চিরকালের সাধ একটি বাড়ি তৈরি করা সেটি তৈরিতে উৎসাহী হয়ে উঠেছে। স্বপ্নের সৌধ রচনার সমাপ্তির পথে অথর্ব পুত্রের ফিরে আসাতে মৃত পুত্রকে নিয়ে এতদিনের গড়ে ওঠা স্বপ্ন ভঙ্গ হওয়ায় সেই পুত্রকে যেন কিছুতেই মন থেকে মেনে নিতে চাইছে না। তেমনি **'খবর নম্বর এক দুই তিন'** গল্পেও দেখা যায় সেই চিত্রেরই প্রতিফলন। নেবুবাগান বস্তির দেবলা, লতিকা, চাঁপা ও সরস্বতীরা চার-পাঁচটা বাড়িতে কাজ করে এবং তাদের স্বামীরা 'হাওড়া প্যারামাউন্ট স্টীম কোম্পানি লিমিটেড' এ শ্রমিকের কাজ করে। বহু সন্তান-সন্ততি নিয়ে তাদের বসবাস। একসময় কোম্পানির কোন দুর্ঘটনায় তিনজন লোক প্রাণে মারা যায় আর একজন 'জরদ্‌গবো' হয়ে ঘরে ফিরে আসে। স্বামীর মৃতপ্রায় অবস্থায় প্রত্যাবর্তনে স্ত্রী চাঁপা অপরাধীর মতো মুখ করে থাকতে বাধ্য হয়; কারণ — "সর্বস্ব ঘুচে যাওয়া মেয়ে মানুষ তিনটের তিনজোড়া চোখের মধ্যে যে ঈর্ষার জ্বালা ফুটে উঠেছে, তার থেকে নিজের সর্বস্বটিকে বাঁচাবো কি করে?" ... *(পৃ. - ৯, নির্বাচিত আশাপূর্ণা, প্রথম প্রকাশ : স্বাধীনতা দিবস,* ১৯৯৩)। অন্যরা যেখানে স্বামীহারা হয়ে শোকাতুরা বিধবা, সেখানে চাঁপা চলৎশক্তিবিহীন হয়েও জীবিত থাকায় সধবার চিহ্ন নিয়ে বিরাজমান।

কিন্তু কোম্পানী থেকে যখনই বলা হয় মৃতদের পরিবারকে হাজার পনেরো টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে তখনই চাঁপার স্বামীর প্রতি ভক্তিমত্তার যথার্থ স্বরূপ প্রকাশিত হয়ে পড়ে দাঁত নখ বার করে। দেবলা, লতিকা, সরস্বতীরা যেমন স্বামীহারা হয়েছে তেমনি এক কাঁড়ি করে টাকাও পাচ্ছে, কিন্তু যে স্বামীর গরবে এতদিন চাঁপা গরবিনী হয়ে সকলের ঊর্দ্ধে অবস্থান করেছে আজ সে নিজেই নিজেকে প্রচণ্ড দুর্ভাগা বলে ভাবতে শুরু করেছে। — "সাত জন্ম ধরে খাওয়া আর চৌপর নি তোমায় নিয়ে বসে থাকতে হলে, রসদের জোগানটি আসবে কোথা থেকে? অ্যাঁ।" *(পৃ. ১৩, নির্বাচিত আশাপূর্ণা)*। চাঁপা স্বামীর প্রতি এহেন উক্তি করেই নিরস্ত হয় না, তিনজনের প্রতি তার রীতিমত ঈর্ষার উদ্রেক হয়েছে। চাঁপার ছয় বছরের ছেলে পর্যন্ত একদিন যখন বলল — "আমাদের

বাবাটা যদি সেদিনকে 'ভোম্বল'টা হয়ে ঘরে ফিরে না এসে মেসোদের মতন মরে কাঠ হয়ে যেতো আমরাও কেষ্ট গদাই তপনদের মতন এতো গাদা টাকা পেতুম? অ্যাঁ সত্যি? ইস্!" *(পৃ. ১৪, ঐ)*। এই অপ্রিয় সত্যটা বলাতে চাঁপা উত্তেজিত হয়ে মনের সাধে নিজপুত্রকে অজস্র গালাগালি করে, আদপে এটা নিজের মুখোশ খুলে নিয়ে মনের কোণে কুণ্ডলীকৃত কথাগুলোকেই বিবৃত করা। প্রভাকর নস্কর আজ পঙ্গু গৃহবন্দী হয়ে আছে, যে চাঁপার সংসারে বোঝা বই আর কিছু নয়। প্রথমদিকে তার প্রতি অনেক মায়া-মমতা কাজ করলেও ধীরে ধীরে তা যেন একটি অসহ্য বিষাক্ত সাপের মতো কুণ্ডলীকৃত হয়ে গৃহকোণে খাপটি মেরে বসেছিল। পুত্রের মুখ নিঃসৃত 'ইস্' শব্দটি হিস্ করে সাপের বিষাক্ত নিঃশ্বাসের ন্যায় প্রতিফলিত হতে লাগল চাঁপার গালিগালাজের মধ্য দিয়ে। বর্তমানে আধুনিক স্বাধীনতার প্রভাবের একাংশের বলি হচ্ছে শিশুরা। নারীর স্বাধীন হবার শ্রেষ্ঠ সোপান অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, আর সেজন্যে তাকে বহির্জগতে কর্মযজ্ঞে যোগদান করতে হয়। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই যখন বাইরে বেড়িয়ে যান সেই সময়টা শিশুদের পক্ষে অত্যন্ত দুঃসহ হয়ে ওঠে। অণু পরিবার বলে তাদের স্নেহ আবদার মেটাবারও কেউ থাকে না এই দীর্ঘ সময়টাতে। সংসারে স্বাচ্ছন্দ্য আনতে, নিজের শিক্ষা-দীক্ষাকে কাজে লাগাতে, নিজেকে কর্মজগতের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রতিটি শিক্ষিতা নারীই চায়। একান্নবর্তী পরিবারের নানা অসুবিধার ফলে অণু পরিবারের নির্ঝঞ্ঝাট পরিবেশও অধিকাংশ মানুষের অভিপ্রেত, কিন্তু মাইনে করা আয়ার সান্নিধ্যে একটি শিশুমনের বিকশিত হয়ে ওঠাটাই সবচেয়ে বেশি বিপজ্জনক। আশাপূর্ণা দেবীর স্বনির্বাচিত গল্পগুলোর মধ্যে 'সবদিক বজায় রেখে' গল্পটি এই চিত্রটিকেই সুপরিস্ফুট করছে।

অলক ও তণিমা দুজনেই ছোট মেয়ে বুতানকে বাড়িতে কাজের লোক বনাম আয়ার কাছে রেখে চাকরি সূত্রে বাইরে বেরিয়ে যায়। সারা সপ্তাহ একটানা কাজকর্ম করার পর মাঝেমধ্যে তো ওদের ইচ্ছেও করে একটু সিনেমা থিয়েটার দেখতে। সেটাও সাবধানে ব্যবস্থা করতে হয়, যাতে মেয়ে এবং ঝি কারোরই বোধগম্য না হয়। বাইরেই দুজনে সাক্ষাৎ করে এ জাতীয় কাজগুলো সেরে বাড়ি ফেরে অথবা ছলনার আশ্রয় নিয়ে বাইরে বেরিয়ে যায়। আর সেই শিশু কন্যাটি একাধারে রাধুনী ও আয়ার নিকট স্নেহ-আবদার-আশ্রয়ের সন্ধানে তার পাশে পাশে ঘুরঘুর করতে থাকে। কাজে বাধার সৃষ্টি করায় বকুনি খেয়ে অভিমানে-অপমানে চোখ ফেটে জল আসে, আবার লোডশেডিং এ একা ঘরে থাকতেও শিশুমনে ভীতির উদ্রেক হয় — "শেলেট-পেন্সিলটা নিয়েই বসে আবার! কিন্তু কিছু আঁকা আসে না কেন? আলোটা এমন কেঁপে উঠছে কেন? ... মা এখনো ডাক্তারখানায় বসে আছে কেন? বাবা এখনো আসছে না কেন? ... সবচেয়ে স্বস্তির শব্দ শুধু রান্নাঘর থেকে আসা খুন্তির শব্দ। কড়ার ওপর চাটুর ওপর।" *(পৃ. ৭, আশাপূর্ণা দেবীর ছোটগল্প সংকলন)*। শিশু চিত্তের এই ভয়মিশ্রিত অসহায়তা লেখিকা সুন্দরভাবে প্রস্ফুটিত করেছেন। অথচ বুতানের নিজের একটি ঠাকুমা

রয়েছেন, যিনি এই পরিবেশে একটি নিরাপদ, নিশ্চিন্ত ও পরম আদরের আশ্রয় হতে পারতেন। তাই হয়তো কাজের লোককে তোয়াজ করতে দেখলে অলক মনে মনে চেঁচিয়ে ওঠে — "অথচ সত্যিকার পূজনীয়'কে 'পূজ্যি' করে চলতে তোমার মানে বাধে! অথচ যাতে সব সমস্যার সমাধান আছে।" *(পৃ. ১১, ঐ)*। শ্বশুরের ভিটে আগলাতে শাশুড়ীর দেশের বাড়ি চলে যাওয়াতে তনিমার স্বাধীনভাবে জীবনযাপন, শিক্ষিতা মেয়ের চাকুরি করা, একমাত্র সন্তানকে যেমনই হোক বাড়িতে রেখে যাবার জন্য লোকের ব্যবস্থা, মেয়েকে মিথ্যা কথা বলে হলেও বাড়িতে রেখে সিনেমা-থিয়েটার দেখতে পাওয়া অবসর সময়ে এবং সবচেয়ে বড় কথা স্বামী-স্ত্রী দুজনে একত্রে গেলেও একমাত্র তারই বুদ্ধিতে আলাদা সময়ে বাড়িতে প্রবেশ করায় বুতানের নিকট ধরা পড়ার ভয় থেকে যে মুক্তি এগুলো তনিমাকে অভিনেত্রী, আপাতদৃষ্টিতে সুখী করে তুলেছে বলে মনে হয়। 'সব দিক বজায় রেখে ম্যানেজ করে ফেলার কৃতিত্বে পুলকিত হয়ে' ওঠাটা যার যত বেশি হবে সেই তত কৃতী নারী হিসেবে যেন বিবেচিত হয়। সমাজের, সম্পর্কের মূল উপড়ে ফেলে আধুনিক শিক্ষিতা, প্রতিষ্ঠিত নারীদের এই যে 'একলা চলো' নীতিই পরিবারের ঐতিহ্যকে আভিজাত্যকে ভিত্তিহীন করে দিয়ে, শিশুদের একমুখাপেক্ষা করে তাদের মধ্যেও ধীরে ধীরে অভিনয়, নির্মমতার বীজ বপন করে দিচ্ছে। পুরুষরাও তাদের প্রতিবাদের ভাষা হারিয়ে ফেলেছে। অর্থাৎ বর্তমান সমাজ যেন কিছুটা হলেও অতীতে অত্যাচারীত নারীদের হয়ে নির্মম প্রতিশোধ নিচ্ছে।

দুটি নারীর আত্মসম্মানকে অপমানিত করে দু'খানি গল্প রচিত হয়েছে। প্রথমটি **'না'** (১৩৫২ সাল) ও দ্বিতীয়টি **'অপমান'**। **'না'** গল্পের নায়িকা রাজ্যশ্রী একমাত্র পুত্র পাঁচ বছরের বাবলুকে নিয়ে বাংলার বাইরে একটা অখ্যাত মফঃস্বল শহরে স্কুল শিক্ষিকার চাকরি নিয়ে বসবাস করে। সন্তান পৃথিবীর আলো দেখবার পূর্বেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে যায়। প্রতিষ্ঠিত ঘরের রূপসী, গুণী মেয়ে ছিল সে; তথাপি ঘটনাচক্রে তাকে অনেক ঝড়-ঝাপটা সহ্য করে অবশেষে এখানে আসতে হয়েছে। পাঁচ বছরের শিশুপুত্র তার নিজের মেয়ে স্কুলেই আরো দু'বছর পড়তে পারবে। কিন্তু একদিন স্কুল ছেড়ে বেরোবার মুখে হাত ফস্‌কে ছেলে একা একা এগিয়ে গেল লাল সুরকির পথ ধরে; আর প্রায় সেই মুহূর্তে অকস্মাৎ বাইক থামিয়ে সেখানে দাঁড়াল সুজিত, রাজ্যশ্রীর স্বামী। হঠাৎ দেখা ও সামান্য কথাবার্তার পর্বেই ছেলে বাবলু এমনভাবে এগিয়ে গেল, অদৃশ্য ছেলেকেই উন্মাদের মতো খুঁজতে শুরু করল রাজ্যশ্রী। পরিস্থিতি জটিল হলে একসময় সুজিতই বাবলুকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে, কিন্তু রাজ্যশ্রী ছেলেকে স্বামীর কোল থেকে নিয়ে গেলেও স্বামীকে কোনরকম আতিথ্য, আপ্যায়ন কিছুই না করে বিদায় করে দেয়। মা পুত্রের যথাযথ পরিচয় দিতে না চাইলেও বাবা নিজের সন্তানকে ঠিক চিনে নেয়। আর তাই হয়তো পুত্রের বাইকে চড়ার বায়নার কথা মনে পড়তেই সকালেই সেই বাড়ির সামনে চলে আসে।

যে মানুষ একদা স্ত্রীকে যথেচ্ছভাবে অপমান করেছে, নানাভাবে স্ত্রীকে নির্যাতিত করেছে এবং প্রায় বাধ্যই করেছে তাকে ছেড়ে চলে যেতে। সত্যিই যখন সে তাকে ছেড়ে চলে এসেছে এবং আলাদা পথে চলার জন্য লড়াই শুরু করে একটা কূলে এসে ভিড়েছে তখনই অপর প্রান্তে শুরু হয়েছে বিবেকের দংশন, আত্মবিশ্লেষণ, ভুল সংশোধন করার প্রচেষ্টা। মন যখন দগ্ধ, বিধ্বস্ত তখনই সে স্ত্রীর রাজ্যে প্রবেশ করতে পেয়েছে। এই ছোট্ট সংসারের একজন হয়ে ওঠার বাসনায় বলে উঠেছে— "কি ক্ষতি হয় শ্রী, যদি এতদিন পরে দুজনে ঘর বাঁধি? সেইটাই তো ঠিক ছিল গোড়া থেকে? একটু অসহিষ্ণুতা একফোঁটা অসাবধানে চিরদিনের জন্যে নষ্ট হয়ে যাবে সেই ঘর?" পুত্রের সম্পর্কে বলে — "দাবী! পাগল হয়েছ শ্রী। দাবী করব কোন মুখে? চাইছি দয়া, চাইছি ভিক্ষে," *(পৃ. ৩৯১, প্রথম খণ্ড)*।

কিন্তু একদা অপমানে জর্জরিতা যে অসহায় মেয়ে একা একটি শিশুকে নিয়ে লড়াই করে বেঁচে আছে যে জেদের বশে, সে তো কিছুতেই তাকে ক্ষমা করতে চাইলো না। কারণ তার মনে হচ্ছে ক্ষমা করে আবার একত্রিত হয়ে গেলে এই লড়াই মূল্যহীন হয়ে পড়বে। ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাইলে তাকে সুযোগ দেওয়া উচিত — কোথাও রাজ্যশ্রী মানতে নারাজ। তাই হয়ত সুজিতের কোনকথাই তাকে টলাতে পারে না। সুজিত রাজ্যশ্রীর এই অনমনীয়তায় বলে ওঠে — "তোমরা — মেয়েরা, বড় বেশি স্বার্থপর তাই নিজেদের লাভ ক্ষতি ছাড়া কিছুই চোখে পড়ে না তোমাদের।" *(পৃ. ৩৮৫, ঐ)*। কিন্তু যে দুঃসময় রাজ্যশ্রী পেরিয়ে এসেছে সেটাকে মনে রেখে কিছুতেই আর স্বামীর সঙ্গে নতুন করে ঘর বাঁধার আনন্দে মাততে চায় না সে। তবে আজ রাজ্যশ্রী তাকে 'না' করে দিয়েও আবার বোধ করে অপরিসীম শূন্যতা। যার ওপর রাগ, জেদ বজায় রেখে তার এ লড়াই তাকে নির্মমভাবে ফিরিয়ে দিয়ে অপমানের প্রতিশোধ নিলেও নতুন করে লড়াই করার শক্তি যেন নিঃশেষ হয়ে গেল।

নিবেদিতা নিম্নবিত্ত ঘরের মেয়ে। তাকে সংসার পরিচালনা করার জন্য অর্থের যোগান দিতে হয়। অর্থের প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব অনুযায়ী যে চাকরী সে গ্রহণ করে তাতে নানা শর্ত থাকলেও সেদিকে দৃষ্টি আরোপ করা সম্ভবপর ছিল না। সুসজ্জিত বিরাট বাড়িতে গৃহকর্তা সুজিত মল্লিকের 'মহিলা টাইপিস্ট আবশ্যক' বিজ্ঞাপনের ভিত্তিতে তার চাকরীর সন্ধানে আসা এবং গেট খুলেই সামনে পেয়ে যায় পূর্বে স্বল্প সময়ের জন্য পরিচিত অনিরুদ্ধকে। ক্রমশঃ চাকুরী লাভ এবং উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক সম্প্রীতির দিকে গড়িয়ে যাওয়া — এগুলো যেন স্বাভাবিকভাবেই ঘটতে থাকে। অবশ্য দুটি নারী-পুরুষের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠার কারণ হল — অনিরুদ্ধ তার ভাই হয়েও নিজেকে এত বিরাট বাড়ির প্রায় আশ্রিত হিসেবে পরিচয় দেওয়া এবং অ্যাটর্নি হয়েও সেকথা না বলে নিজেকে বেকার বলা। নিবেদিতা এই ব্যক্তিটিকে নিজের সমগোত্রীয় ভেবে আন্তরিকভাবে মিশেছে এবং অকপটে নিজের সংসারের, জীবনের কথাগুলোকে বলতে পেরেছে।

অনিরুদ্ধ হয়ত নিবেদিতার মধ্যে মানসী প্রতিমাকে খুঁজে পেয়েছিল। তাই তাকে সত্যকথাটি বলে হারাতে চায়নি। কিন্তু যে মেয়ে ভালোবেসে, বিশ্বাস করে আন্তরিকভাবে অন্তরঙ্গ হতে পেরেছে শুধু তারই মত আর্থিক অবস্থার শিকার বলে; দুজনে একই পথের পথিক বলেই না একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। কিন্তু অতি সাধারণ একজন মানুষের স্বরূপ যখন একজন বিত্তবান হিসেবে ধরা পড়ে তখন প্রেমিকা হিসেবে কোন আত্মসম্মান বোধসম্পন্ন নারীর পক্ষে তা হয় চরম অবমাননাকর। যার অধিকাংশ কারণই একটি অসহায় মেয়েকে করুণা করার জন্য ব্যবহৃত হয় তা আর যাইহোক প্রেমের পর্যায়ভুক্ত আর থাকে না। অনিরুদ্ধ নিবেদিতাকে সত্যি ভালোবেসে বারবার কাছে টানলেও তার মনোভাবের কোন পরিবর্তন হয় না — "দয়া করে একেবারে ভুলে যেও না, গরীবেরও কিছু আত্মসম্মানবোধ থাকে।" *(পৃ. ৩৮৭, ৫ম খণ্ড)*।

সর্বোপরি সবশেষে লেখিকা বলতে চেয়েছেন — "অভিমানে আচ্ছন্ন দৃষ্টি নিয়ে সে কেবলই পুরুষের কাজের মধ্যে অভিসন্ধি আবিষ্কার করে ফেলে জ্বলে মরে।" (পৃ. ৩৮৮ — ঐ) পুরুষদের অন্তরের মধ্যে যে সৎ উদ্দেশ্যের সত্তাটি বিরাজমান তাকে নারীরা আত্মসচেতনতা বা আত্মঅহমিকার বশে মাড়িয়ে চলে যায়, যা হয়তো উচিত নয়। কারণ তাদের অন্তরেও অন্যের উপকারে আসতে পেরে ভালো লাগা অনুভূতিটা বিরাজিত থাকতেই পারে, এভাবে প্রেমের জন্মও হতে পারে। নারীদেরও উচিত কখনো সেই প্রেমের মূল্য দেওয়া।

আশাপূর্ণা দেবীর ছোটগল্পে নারী চরিত্রদের তুলনায় পুরুষ চরিত্রদের গুরুত্ব অনেক কম। সমাজে নারী ও পুরুষদের যে বৈষম্য ছিল সেটাই তাঁকে বেশি করে নাড়া দিয়েছিল। তাই নানারূপে অন্দরমহল কি বহির্মহল সর্বক্ষেত্রেই নারীর যে ভূমিকা সে দিকটিকেই নানাভাবে চিত্রিত করলেও পুরুষেরা সম্পূর্ণভাবে অবহেলিত হয়ে পড়েনি, তারও নিদর্শনস্বরূপ বেশ কয়েকটি গল্প রয়েছে।

'অভিশপ্ত' (১৩৫৩ সন) গল্পটি হচ্ছে একজন পুরুষের পৌরুষ দৃপ্ত সতেজতার কথা, যিনি বিখ্যাত চৌধুরী পরিবারের বিশাল বংশের শেষ বংশদণ্ড, পিনাকপানি চৌধুরী। সাংসারিক নানা বিপর্যয়, শোক, বার্ধক্য কোন কিছুই এই মানুষটিকে গ্রাস করতে পারে নি। সমস্ত দুঃখ-কষ্টবোধকে মনের গহনে চেপে বাইরে শক্ত সমর্থ প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বটি নিয়েই ঘুরে বেড়াতেন। এগারোটি সন্তানই ধীরে ধীরে তার কাছ থেকে চিরবিদায় নিয়েছে। শেষ পুত্র কমলপানির দাহকার্য সমাধা করেই তিনি বাড়ি ফিরেছেন। বাড়িখানায় এখন কমলের স্ত্রী সদ্য বিধবা ঊর্মিলা ও ঝি নিস্তারিণী। পিনাকপাণি তার অন্তরের আভিজাত্য নিয়েই সকলের নিকট হতে দূরত্ব বজায় রেখে চলেন এবং তাকেও এই কারণেই সকলে সমীহ করে চলে। সর্বশেষ পুত্রের মৃত্যুতেও যে নির্বিকার, নির্লিপ্ত, প্রলংকরী ঝড়েও চূর্ণ করতে পারে না, যেন গাম্ভীর্য আর আভিজাত্যের মোড়কে নির্মিত বাঁধ। ভাগ্নে শশাঙ্ক, যে কমলের বন্ধু স্থানীয় ছিল, সে পিনাকপাণির সঙ্গে বাড়িতে এলো এবং ঊর্মিলার প্রসঙ্গ

উত্থাপিত করল। কিন্তু ঔদাসীন্যে ঘেরা পিনাকপাণি ঈষৎ হেসে বললেন — "কাউকে শোকে মারা পড়তে দেখেছ কখনো? চেঁচাবে, আছড়াবে, চুল ছিঁড়বে, বুক চাপড়াবে — আবার একসময় স্থির হয়ে যাবে।" *(পৃ. ১৬৪, দ্বিতীয় খণ্ড)*। শ্বশুরের এই আবেষ্টনকে ভয় পেয়েই অনাগত সন্তানের কথা ঊর্মিলা বলতে পারে নি, তার ফল ছিল সর্বনাশের শেষ সোপান। অন্তঃসত্ত্বা পুত্রবধূকে নিয়ে শশাঙ্ক আর ঊর্মিলার মধ্যে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে মনে করে পিনাকপাণি তৎক্ষণাৎ ভাগ্নে শশাঙ্কর গলা টিপে হত্যা করেন এবং একই কক্ষে মৃতদেহ আর ঊর্মিলাকে আবদ্ধ করে রেখে তালা ঝুলিয়ে দেন। একটি ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি একাজ করেন, কোন জিজ্ঞাসাবাদ সত্যের অনুসন্ধানের প্রয়োজন মনে করেন নি। দয়া-মায়া-স্নেহ-ভালোবাসা সমস্ত কিছু নিতান্তই গৌণ বলে বিবেচিত হয় বংশমর্যাদার কাছে এবং এই ভাবনা যে সমস্ত মানুষকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় তাদেরই একজন এই দাম্ভিক, অন্তঃসারশূন্য, চাকচিক্যের স্থূলতায় মোহান্ধ পিনাকপাণি শুধুই স্বমত পোষণ করে গিয়েছেন চিরকাল।

'পৌরুষ' গল্পে পাওয়া যায় এমন একটি পুরুষ চরিত্র যাকে প্রথমতঃ কোন মানুষ সহজে পুরুষ বলে স্বীকারই করতে উৎসাহী হয় না। 'রোগা একটুখানি খাটো-ক্ষয়া বামনাকৃতি গড়ন' — ব্রাহ্মণ পুত্রের অকস্মাৎ জীবিকার সন্ধান শুরু হল। মামার সংসারে দীর্ঘদিন যাবৎ প্রতিপালিত হচ্ছে, কিন্তু মামাও দরিদ্র হওয়ায় তার নিজের ভার লাঘব করতে নিতাই কোলকাতা শহরে এক পরিচিত বাড়িতে আসে একটা সামান্য চাকরির আশায়। নেহাৎই চাকর-বাকরের কাজ করতেও সে উৎসাহী। কোলকাতা শহরে এক পরিচিত বাড়িতে এসে মাসখানেক বসবাস করতেই তাদের চেষ্টায় চাকরের কাজও একটি জুটে গেল। ব্রাহ্মণত্বের সমস্ত গৌরব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে শুধু স্বনির্ভর হবার আশায় মহোৎসাহে সমস্ত কাজকর্ম স্বহস্তে করতে শুরু করল।

গল্পের গতিপথ বদলে গিয়েছে অন্যত্র, যেখানে তার চেহারা হয়ে দাঁড়িয়েছে মুখ্য বস্তু। নিতাই পঁচিশ বছর বয়সের একজন যুবক একথা শুনলে আর তার চেহারায় তার প্রতিফলন দেখলে সকলের মনে শুধু হাসিই উদ্রিক্ত হয়। আর তার মনিব এবং মনিবাণীও সেটা গ্রাহ্য করতে চায় না বলেই স্বামী-স্ত্রীর অবাধ মেলামেশায় কোনরূপ আড়াল-আবডাল রাখবার কথা যেন ভাবতেই পারে না। কিন্তু যেদিন সে চাকরি ছেড়ে দিয়ে সেই পুরনো পরিচিত বাড়িতেই ফিরে এল এবং অনেকবার শুধানোর পর যখন কারণ বর্ণনা করল তখন কিন্তু নিতাইয়ের মুখপানে তাকাবার আর মুখ থাকে না। "ওঁরা ভাল, খুব ভাল, কিন্তু ওঁরা আমায় মানুষ বলে গণ্য করেন না। হতে পারি আমি গরীব হতভাগা মুখ্যু, তবু শিশু তো নই, জোয়ান বয়সের একটা বেটা ছেলে তো বটে? ওনাদের স্বামী-স্ত্রীর সব দৃশ্য আমার সামনে —" *(পৃ. ১৫৪, স্বনির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্প)*। এই যে দৃপ্ত ভঙ্গিমায় পৌরুষের জাগরণ এটাই আশাপূর্ণা দেবী দেখাতে চেয়েছেন। যে যুবক ব্রাহ্মণের উপবীত পর্যন্ত

পরিত্যাগ করেছে, অন্যের এঁটো-কাঁটা পরিষ্কার করা, জুতো ঝাড়া থেকে যে কোন কাজ করতে পিছপা হয় না, সে আজ নিজের পৌরুষত্বের প্রতি অবমাননায় বেশ মর্মাহত হয়ে পুনরায় নিজের কষ্টের জায়গায় ফিরে এসেছে। দরিদ্র, মূর্খ, খর্বাকৃতি হলেও তার ভেতরে যে চারিত্রিক দৃঢ়তার ও বলিষ্ঠ পৌরুষের উজ্জ্বল আভা দেদীপ্যমান, তাই তাকে এই অবর্ণনীয় আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে প্রেরণা যুগিয়েছে। অবহেলিত নিতাই যে একটি ব্যক্তিত্বের উন্মেষ ঘটিয়েছে নিজের মধ্যে তাও স্পষ্টতই ধরা পড়ে। হয়তো সেজন্যেই যিনি কাজটা দিয়েছিলেন সেই কাকীমা নিতাইয়ের 'আহত পৌরুষ' এর দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারলেন না। যতটা তুচ্ছতায় সে অভিষিক্ত ছিল, ততটা হয়তো নয় বলেই এই পরিবর্তন।

যে যুব সম্প্রদায় অধঃপতনের শেষ সোপানে নেমে গিয়েছে বলে সকলে মনে করে সে সমাজেরই একাংশের মানসিক উৎকর্ষ সাধনের গল্প হচ্ছে **'বাড়ির নাম শুভদৃষ্টি'**। গল্পের নায়িকা সম্ভ্রান্ত ঘরের একটি অপরূপা সুন্দরী মেয়ে; তার চলন-বলন ছিল মদগর্ব, রাজেন্দ্রানীর মত। আর রয়েছে পাড়ারই কিছু অধঃপাতে যাওয়া যুবক, যাদের মধ্যে শিক্ষা-দীক্ষা, ভদ্রতার লেশমাত্র নেই, দোকানে বসে আড্ডা দেওয়া এবং রাতের আঁধারে লরি থামিয়ে মাল সরানো এদের জীবিকার্জনের মধ্যে পড়ে। এইসব বীরপুরুষদের চোখেই প্রথম ধরা পড়ে রাজহংসীর মতো মেয়েটিকে, যে ওদের সামনে দিয়ে হেঁটে হেঁটে কলেজ যেত। শুধু রূপের নয়, অদৃশ্য এক আভিজাত্যের অহংকার যেন তাকে আবৃত করে রাখত, আর তার বরাবরের হিমশীতল দৃষ্টি ছেলেদের যেন আরো হিংস্র করে তুলেছিল। "নাঃ! ওই উঁচুনাক খেদিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত শান্তি নেই মাইরি। গুরু একবার হুকুম দে, শালীকে একদিন তুলে আনি।" *(পৃ. ৬৪, আশাপূর্ণা দেবীর ছোটগল্প সংকলন)*।

একদিন তাদের শ্রুতিগোচর হল সেই বিত্তশালী অহংকারী মেয়েটি জাপানে চাকুরিরত কোন এক সম্ভ্রান্ত যুবকের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চলেছে। এরপরই চলে তাদের পরিকল্পনার জাল বোনা, কিভাবে বিবাহের দিনে 'শুভদৃষ্টি' বাড়িটি থেকে কনেকে উঠিয়ে নিয়ে এসে নিজেদের জিম্মায় ফেলা যায়। অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে যত সতর্কভাবে সম্ভব যুবকবৃন্দ তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে উৎসুক হল। বর আসার মুহূর্তে সকলে যখন কনেকে রেখে বর দেখতে ছুটে বেরিয়ে যাবে তখনই হবে তাদের সুবর্ণ সুযোগ। কিন্তু মোক্ষম সময়ে দলনেতা সিদ্ধান্ত বদল করে নিলেন। রূপবহ্নি ওই কনেকে দেখে তার হৃদয়কন্দরে যে শুভ ও অশুভের মন্থন চলল তাতে শুভবোধেরই জয় হল। সে বুঝতে পারল এই নন্দনকানন থেকে রাজেন্দ্রানীকে উঠিয়ে নিয়ে বস্তির ঘরে নিয়ে যাওয়া হবে অত্যন্ত নীচু প্রবৃত্তির কাজ। তখন সে দলের অন্যান্য সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে বলতে থাকে—

"ও রাস্তার কল থেকে জল ধরে আনতো, খোলা রাস্তায় বসে চান করতো, সাবান কাচতো, মশলা পিসতো, বাসন মাজতো। এজমালির দাওয়ার ধারে বসে উনুন জ্বালিয়ে রান্না করতো কেমন? কি

রাঁধতো, অ্যাঁ? আমরা এই পাঁচ-পাঁচটা শুয়োর মিলে কি এনে দিতুম তাকে? বল বলছি? আর ওর? ওর একটা দড়ি জুটতো না? দু'বোতল কেরোসিন? ভেবে দেখেছিস সে কথা? আমরা মানুষ না জানোয়ার?" *(পৃ. ৬৯, আশাপূর্ণা দেবীর ছোটগল্প সংকলন)*। অশুভবোধকে গলা টিপে হত্যা করে শুভবোধে পদার্পণ, কুসংসর্গলিপ্ত যুবকবৃন্দের মানবিকতাবোধের জাগরণ, মানসিকতার উৎকর্ষতা — সমাজের পক্ষে, তথা দেশের পক্ষে শুভ ইঙ্গিত প্রদায়ী। মানুষের এই যে নিজের অবস্থান নির্ণয় করে নিজেকে শোধরাবার প্রচেষ্টা, স্বকর্ম সম্পর্কে অবহিত হবার প্রচেষ্টা, এগুলোই তো মানুষকে আত্মবিশ্লেষণের মুখোমুখি দাঁড় করায়। এই শুভবোধের যত জাগরণ ঘটবে ততই আমাদের সমাজব্যবস্থা রোগমুক্ত হবে — এ কথাই লেখিকা আশাপূর্ণা দেবী বলতে চেয়েছেন।

আমাদের সমাজে অবিবাহিতা, বিধবা, আশ্রিতা নারীরা বরাবরই অপাংক্তেয়। প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় তাদের প্রতিপালনের নিমিত্ত যে খরচটা হয়। নারীদের এই ব্যাপারটা প্রায় সকলেরই বোধগম্য হলেও পুরুষদের ক্ষেত্রেও যে এ ধরনের কিছু একটা ঘটতে পারে, সে কথাটাই অনেকে ভাবেন না হয়তো। আশাপূর্ণা দেবী 'জয়' গল্পে এমন একজন পুরুষের কথা বলেছেন যিনি সংসারে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আসনে উপবিষ্ট এবং অর্থোপার্জনেও অন্যান্য ভ্রাতাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী। সুতরাং সেই হিসেবে মুরলীধরকে সংসারে জ্যেষ্ঠর শ্রেষ্ঠভাগটি পেতে হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে তার বিপরীত চিত্র বিরাজিত। ভ্রাতৃবধূরা নিজের স্বামী সন্তানকে যত্ন করতে ব্যস্ত, ভাইপো-ভাইঝিরা জ্যেঠুর নির্দেশকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য জ্ঞান করে থাকে, ঠাকুর চাকরেরা একবাক্যে তার আদেশ পালন করতে চায় না — অথচ তিনিই সংসারে সিংহভাগ খরচটি বহন করে থাকেন। এই মুরলীধরকেও সময়মতো বিবাহ দিতে বাবা-মা-বোনেরা সকলেই বদ্ধপরিকর ছিলেন, কিন্তু পাত্রটি এতটাই নারাজ ছিলেন যে কোনপ্রকারেই আর উক্ত কার্যটি সমাধা করা যায় নি। বন্ধুরাও যথারীতি বিবাহাদি সম্পন্ন করে ফেলেছিলেন। সংসার চক্রে পাক খেতে গিয়ে তারা মুরলীধরকে বলতেন — "না ভাই, তুমিই বুদ্ধিমানের মতো কাজ করেছো। ভদ্রলোকে বিয়ে করে? আমরা এখন হাড়ে হাড়ে পস্তাচ্ছি। সব ছেড়ে-ছুড়ে পালাতে ইচ্ছে করে।" *(পৃ. ১২১, নির্বাচিত আশাপূর্ণা)* — একথাগুলো শুনে মুরলীধর যথেষ্ট গর্বিত বোধ করত নিজে অবিবাহিত থাকবার জন্য।

সংসারে যে কখনো দারা-পুত্র-পরিবারহীন ব্যক্তিরা দয়া-করুণার পাত্র অথবা কারো বিরক্তি উৎপাদনের পাত্র বলে বিবেচিত হতে পারে এ বোধটাই শুধু মুরলীধরের মধ্যে ছিল অনুপস্থিত। বন্ধুপত্নী দেবেশ-জায়ার গোপন কথাগুলো তাকে সেই বাস্তবের মাটিতে এনে দাঁড় করাল — "নাও চা-টুকু খেয়ে নাও দিকি? একখুনিতো তোমার বন্ধুরত্নটি এসে হাজির হবেন! যা শুরু করেছেন। একদিন আর নিজেরা নিজেরা একটু শান্তি করে চা খাবার জো থাকছে না!... বিয়ে না করলে কি লোকে এতো ভোঁতাও হয়ে যায় গো?... এতোই যদি প্রাণমন খাঁ খাঁ করে, পরের সংসারে নাক

গলিয়ে লাভ কি? কর না বাবু একটা বিয়ে! এখনো সময় আছে। খুঁজলে আজকাল তিরিশ চল্লিশ বছরের কনেও পাওয়া যায়!" *(পৃ. ১৩০, ঐ)*। দেবেশ হচ্ছে মুরলীধরের বন্ধু, বাড়ি থেকে বেরিয়ে একদিন ঘুরতে ঘুরতে তার বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং বন্ধুপত্নীর নিকট যথেষ্ট আপ্যায়িত ও সমাদৃত হয়েছিলেন। অতঃপর সেটাই যখন নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়, এ হচ্ছে তখনকার উক্তি। অন্যান্য দিনের মতোই হাতে করে কিছু না কিছু খাবারের প্যাকেট নিয়ে ঢোকার মুখে এই উক্তি শুনে যেন তিনি আবিষ্কার করতে পারলেন, কেন সকলের সংসারেই আজ মুরলীধর অপাংক্তেয় বলে পরিগণিত হন। অথচ তিনিই সংসারের জন্য অনেক কাজ করেন, ভাইদের মন রাখতে আরো যতটা উপকার করতে পারা যায় করতে উৎসাহী হন। এমনকি বাড়িতে প্রত্যেকের নিকট এহেন ব্যবহার পাবার পরও মেজভাইয়ের কম রোজগার এবং তার তিনটি মেয়ে — এই চিন্তা মুরলীধরকে গ্রাস করেছে। তিনি নিজে অর্থের বিনিময়ে ভাইয়ের কষ্টলাঘব করবেন — এই সদিচ্ছা মনে মনে পোষণ করে রয়েছেন। সকলেই থাকা সত্ত্বেও রোজগারপাতি ভালো হওয়া সত্ত্বেও আশ্রিতা, বিধবা রমণীদের মতো অবস্থায় এই ধরনের পুরুষদেরও পড়তে হয় এটাই লেখিকা প্রতিপাদন করতে চেয়েছেন।

মনতোষ এবং প্রাণতোষ দুই ভাই; অগ্রজ বিবাহিত। কিন্তু অনুজ বিবাহিত নয়, কারণ বিবাহ করার পূর্বে টালির ছাদের তিনতলার ঘরটুকু সে ছাড়বে; নতুন করে একখানি প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্মাণ করে তবে বিবাহ, অর্থাৎ — "আগে রাজ্যপাট, তবে রাণী।" একখানি ঘর, জীবনযাত্রা অতিবাহিত করার সামান্যতম উপকরণ সংগৃহীত করার ক্ষমতা অর্জন করলেই বিবাহ করে নেওয়ার তীব্র বিরোধী ছিলেন প্রাণতোষ। তার মতে জীবনযাত্রায় শুধু স্বাচ্ছন্দ্য হলেই চলবে না, তাতে থাকতে হবে রাজকীয় ভাবের সমারোহ। এই বোধ নিয়েই তিনি একদিন কর্মযজ্ঞে ঝাঁপ দিলেন এবং ক্রমশঃ স্বপ্নের পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। গাঙ্গুলী কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর প্রাণতোষ গাঙ্গুলীর বাড়ি-গাড়ি সমস্ত রাজ্যপাট হয়ে যাবার পর তার স্বহস্তে তৈরি সেই রাজ্যে রাণীকে প্রতিষ্ঠিত করানোর প্রয়োজন অনুভব করলেন। তারই চতুর্দিকে সন্ধান শুরু হয়ে গেল, কোথায় পাওয়া যায় সেই রাণীকে, কিন্তু যতই অনুসন্ধান বৃদ্ধি পেতে শুরু করল ততই উৎসাহ স্তিমিত হয়ে এলো। কারণ প্রাণতোষ গাঙ্গুলী পত্রিকার বিজ্ঞাপনে যখনই 'বয়স্থা' কথাটি লিখেছিলেন তখনই চালুনির নীচে ঝড়তি পড়তি মেয়েগুলোর খোঁজ খবরই শুধু আসতে শুরু করেছিল।

প্রাণতোষ নিজেকে চিনে নেবার দর্পণ পেলেন ভাইপোর বিয়ের আমন্ত্রণ পেয়ে বৌমাকে বৌভাতের দিনে আশীর্বাদ করতে গিয়ে। দেখেন দাদা মনতোষ এবং বৌদি শিবানী ছেলের জন্য একদা তার ব্যবহৃত টালি ছাওয়া ঘরটিকেই মেরামত করে দিয়েছেন। কিন্তু প্রাণতোষের অবাক হবার পালা হল বধূ দর্শনের কালে। কারণ তিনি নানাভাবে খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে গিয়েও এমন একখানা

মেয়ে জোগাড় করতে পারেন নি।

— "এই তো সেই মুখ — লাবণ্যে ঢল-ঢল, স্বাস্থ্যে জুল-জুল!

এই তো সেই চোখ। মদির স্বপ্নময়!

এই তো কনে!

এমনি একখানি কনেরই তো ধ্যান করে এসেছে প্রাণতোষ, সমস্ত বয়সটা ধরে! শিবানী এ 'কনে' কোথায় পেল?" *(পৃ. ৩৭, পঞ্চম খণ্ড)*। তিনি বিস্মিত বোধ করলেন 'কনে' দেখামাত্র। দাদা-বৌদির জীবনযাত্রার ধরণকে এতকাল ধরে শুধু ব্যঙ্গ আর অবহেলা করে এসেছেন। নিজের সাধ পূরণের মাধ্যমে তিনি তাদের শেখাতে চেয়েছিলেন যে, জীবনকে ভোগ করতে কিভাবে জানতে হয়। কিন্তু সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পাশাপাশি যে সময়েরও একটা বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে তা যেন প্রাণতোষ গাঙ্গুলীর ভাবনাতেই আসেনি। আশাপূর্ণা দেবীর প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে পুরুষদের কর্মঠ, সাহসী হওয়া অবশ্যই উচিত কিন্তু পাশাপাশি বাস্তব সম্মত জ্ঞান সম্পর্কেও সচেতনতা প্রয়োজন। মানুষকে তুচ্ছাতিতুচ্ছ জ্ঞান করা বা করুণা করার মনোভাব থাকলে বিত্তশালী হলেও উদার ও মহৎ মনের অধিকারী হওয়া যায় না। **'পুরুষসিংহ'** গল্পে লেখিকা এই দিকটি দেখিয়েছেন।

আর এক ধরনের পুরুষ চরিত্র অঙ্কিত হয়েছে **'এক যে রাজা'** গল্পে। যিনি অত্যন্ত সুমিষ্ট, কোমল স্বভাবের মানুষ। অভিভাবকদের প্রতি যিনি কর্তব্যপরায়ণ, স্ত্রীদের জন্য প্রেমময় স্বামী, সন্তানের জন্য সহৃদয় পিতা। কোলকাতা শহরে চাকুরি করার জন্য গ্রামের পিতৃপুরুষের ভিটেতেই একমাত্র অভিভাবিকা পিসি আর স্ত্রী গৌরীকে রেখে কমলেশ মেসেই বসবাস করে। কিন্তু বাংলা বিভাগের ফলে পূর্ববঙ্গ থেকে আসা দরিদ্র দুঃস্থ এক ব্যক্তির মৃত্যুকালে তার ভাগ্নী বিদিশাকে বিবাহ করেন। পরিস্থিতির নিদারুণ কষ্ট তাকে এতটাই ব্যথাতুর করে ফেলেছিল যে বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি পুনরায় পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হলেন। কিন্তু সাহসে ভর করে পিসিমাকে এবং স্ত্রীকে সেকথা জানানো হয়ে ওঠে না। দ্বিতীয়বার বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই পরিচিত বন্ধু বান্ধব পরিত্যাগ করার প্রয়োজনে চাকরি এবং মেসবাড়ি দুটোই ছেড়ে দেন। তৎপরতার সঙ্গে আর একটি উৎকৃষ্ট চাকরির সন্ধান করে নেন।

দ্বিতীয়া স্ত্রী বিদিশাকে নিয়ে চারতলা বাড়ির নীচতলায় সুখের সংসার পাতেন। গৌরী সন্তানহীনা হলেও বিদিশা এক পুত্রের জননীও হয়। কিন্তু অনেক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তিনি কোন স্ত্রীকেই সত্য ঘটনা প্রকাশ করে উঠতে পারেন নি। স্বামীর কর্তব্যের প্রতি গৌরী এবং বিদিশা উভয়েই এতটাই বিশ্বস্ত এবং সুখী ছিল যে তার এসব কথাকে উভয়েই মজার পর্যায়ে নিয়ে যেত। প্রতি সপ্তাহান্তে শনি-রবিবার গ্রামের বাড়িতে পিসিমাকে উপলক্ষ করে ছুটে যাওয়া, এই যাওয়া; নিয়ে বিদিশার অনেক মান-অভিমান চোখের জলও তাকে নিরস্ত করতে পারেনি। — "শুধুই কি আর

পিসিমার টানে এমন করে ছুটে যাই গো? অন্য কারণ আছে। সেখানে আমার প্রথম পক্ষের পরিণীতা পত্নী আছে।" *(পৃ. ৩৯৯, পঞ্চম খণ্ড)*। আবার পাড়ার কোন এক তুতো ঠাকুরপো এসে গৌরীকে কমলেশের দ্বিতীয়বার পাণিগ্রহণের ব্যাপারটি জানালে গৌরী তা হেসে উড়িয়ে দেয় এবং সেকথা স্বামীর গোচরীভূতও করে। কমলেশ কিন্তু চেষ্টা করে সত্য বলে — "অনিল যা বলেছে ঠিকই বলেছে।" — কিন্তু লাভ হয় না। তাই কমলেশ ভাবে পিসিমা যতদিন আছে ততদিন চললেও তারপরের পরিণতি কি হবে? সত্য জানতে পারলে দুজনেরই প্রাণান্তকর অবস্থা হবে তা বুঝতে পারেন তথাপি এভাবেই চলছে, এর পরিণতি কমলেশ নিজেই জানে না। আসলে কমলেশ ভীরু নয়, তা হলে প্রত্যেকের প্রতি নিপুণভাবে দায়িত্ব পালন করতে বদ্ধপরিকর হয়তো থাকতো না। লেখিকা তার মধ্য দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন, কোমল স্বভাবের পুরুষ মানুষের পক্ষে অভিনয়ের দ্বারা হোক, নিজের অন্তরে কষ্ট পেয়ে হোক, সমস্যার সৃষ্টি না করে যতটা সম্ভব সুচারুরূপে, নিষ্ঠার সঙ্গে কর্তব্যে আন্তরিক ও অবিচল থেকে পথ চলাই হচ্ছে শ্রেয়। যা ঘটে গিয়েছে তাকে মেনে নেওয়াই প্রকৃত ভালো মানুষের ধর্ম।

স্বামী হিসেবে কমলেশ স্ত্রীদের প্রতি যতটা যত্নবান, একইসঙ্গে দুই স্ত্রীর প্রতিই যেভাবে কর্তব্য-ভালোবাসা অটল রেখেছেন; ঠিক তারই সঙ্গে বৈপরীত্য সাধন করতে যে চরিত্রটি রয়েছে তিনি অনাদিবাবু। **'লালশাড়ী'** (১৩৫২ সন) গল্পের পুরুষ চরিত্র। গল্পের ঘটনাটি যাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত তা হচ্ছে অনাদিবাবুর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর মৃত্যু, তা আবার স্বামীর চাকুরি সূত্রে বিদেশ সফরকালীন। ছোট-দুটো ছেলে-মেয়ের কান্না এবং ঝিয়ের চিৎকার-চেঁচামেচিতে প্রতিবেশীরা রাতদুপুরে নিজের প্রচেষ্টায় এবং খরচে মৃতদেহটির সৎকার করে আসে। গল্পের কথক তারক, যিনি নিকটতম প্রতিবেশী। তিনি খোকা-খুকু দুটোকে বাবার অবর্তমানে নিজের বাড়িতে নিয়ে রাখেন। পাড়ার নারায়ণবাবু অফিসের ঠিকানা জোগাড় করে তার করে দেওয়ায় তিনদিন পরে অনাদিবাবু বাড়ি ফিরে আসেন। উনি বাড়ি ফিরে আসার পরই সত্যকার চিত্র প্রতিকায়িত হয়ে ওঠে।

তারকবাবুর বাড়ি থেকে অচিরেই পুত্র-কন্যা দুটিকে নিয়ে গেলেনই, রাত্রে এসে খোদ তারকবাবুর ওপরে দোষারোপ করতে শুরু করলেন। উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে যদি কৃতঘ্নতা প্রদর্শিত হয় তবে তা অত্যাশ্চর্য ঘটনাই হয় বটে। আসল রহস্য উদ্‌ঘাটন হল অনাদিবাবুর এই কথায় —

"আবার বাস্‌কো ভেঙে চেলির কাপড় বার ক'রে নিয়ে বাহার দেওয়া হয়েছে!" *(পৃ. ৬১ - দ্বিতীয় খণ্ড)*। শবদেহের সঙ্গে একখানা লাল বেনারসী শাড়ী পুড়িয়ে ফেলায় আসলে তার ক্ষোভ সঞ্চিত হয়েছে এবং তার প্রকাশ হয়েছে এভাবে —" কোন সাহসে দুশো টাকার কাপড়খানা নষ্ট ক'রে এলেন? ... ঝি আপনাকে বারণ করে নি? সোজা দাম ওসব কাপড়ের আজকাল?"

— "তা, দামীই হোক আর যাই হোক, আপনি তো আর লাল বেনারসীখানা পরতেন না? যাঁর জিনিস তিনিই" —

"যাঁর জিনিস! মেয়ে মানুষের আবার জিনিসের স্বত্ত্ব কিসের?... বলি, আসছে বারেরটাকে ওইটে দিয়েই গায়ে হলুদের তত্ত্ব সারা যেত না? বলতে গেলে 'আনটাচ্‌ড্' ছিল একেবারে!" *(পৃ. ৬১, ঐ)*। যে স্বামীর প্রথম পক্ষের স্ত্রী গলায় দড়ি দিয়ে মৃত্যুবরণ করে, দ্বিতীয় পক্ষ বিষপানে আত্মহত্যা করে সে আবার কিছুদিন পরেই তৃতীয় পক্ষও ঘরে প্রবেশ করায়। যৎসামান্য মানবতা বোধটুকুও অনাদিবাবুর মধ্যে নেই। তিনি এককথায় হচ্ছেন অত্যাচারী, অর্থলোলুপ পিশাচ এবং হত্যাকারীও বটে। নারীদের প্রতি সুচারুরূপে কিভাবে অত্যাচার চালাতে হয় সেটা তিনি নিপুণভাবে আয়ত্ত করেছেন। নারীদের ওপর অত্যাচার করতে শুধু যে নারীরাই দক্ষ তাই নয়, স্বামী হিসেবে একজন পুরুষও যে একাজে পারদর্শী এবং শুধু তাই নয়, বাংলাদেশে অসহায় মেয়েদের অবস্থাও সুস্পষ্টরূপে চিত্রিত এখানে। নির্যাতন চালিয়ে যাবার জন্য শিকারও তারা অতি সহজেই পেয়ে যান। এভাবেই আশাপূর্ণা দেবী সমাজে নানা ধরনের মানুষের জীবনকে নানা দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করে সাহিত্য জগতে বিচরণ করে গেছেন আজীবন।

চতুর্থ অধ্যায়

আশাপূর্ণা দেবীর ছোটগল্পের শিল্পরূপ

চতুর্থ অধ্যায়
আশাপূর্ণা দেবীর ছোটগল্পের শিল্পরূপ

আশাপূর্ণা দেবী তাঁর রচনায় যে রচনারীতি ও শিল্পরূপ ব্যবহার করেছেন, তাতে নানা বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। যেমন — প্রথমেই প্লট গঠনের ক্ষেত্রে তাঁর একটা সহজ-সরল দৃষ্টিভঙ্গিই সাধারণত গোচরীভূত হয়। প্লট হচ্ছে একধরনের শিল্পকৌশল। কার্যকারণ সূত্রে যখন কোন গল্প গ্রথিত হয় তখনই হয় প্লটের জন্ম। আশাপূর্ণা দেবী তাঁর গল্পে যেসব প্লটের কথা বলেন তা প্রায়শই পরিপূর্ণভাবে নিখুঁত এবং সুদৃঢ় নয়। কারণ তিনি যে গল্পগুলো লেখেন তাতে যেন কোথায় এক কথক ঠাকুরের আবির্ভাব ঘটে। আবার কখনো মনে হয় আমাদের ঘরের কথাগুলো যেন গল্পের ছলে কেউ আমাদের শুনিয়ে যাচ্ছে। তার গল্পের গ্রন্থন যে সর্বত্র নিপুণতা অর্জন করেছে তা নয়, কখনো তা শিথিল অবস্থায়ও রয়েছে। অর্থাৎ প্লটের যে গঠন এবং গ্রন্থন রয়েছে তা বেশিরভাগ সময়েই সরল ও সহজ ভাবে বর্ণিত। কারণ কি লিখছেন সেটাই বড় কথা, কিভাবে লিখছেন তা নয়।

সমাজে যে ভাঙন বা অবক্ষয় শুরু হয়েছে তার মূলে দেখা দিচ্ছে আত্মসুখের প্রবণতা। বিশেষতঃ নারীদের ক্ষেত্রে। একান্নবর্তী পরিবারগুলোতে সুখ এবং শান্তি প্রায় পাশাপাশি অবস্থান করলেও বহির্জগতে তখন পরিবর্তনের হাওয়া প্রবাহিত হতে শুরু করেছে। সেই তরঙ্গিত সমীরণের আঘাতে মধ্যবিত্ত সংসারও দুলতে শুরু করেছে। তখনই বহু অভিভাবকের শাসন দ্বারা পরিবৃত সংসারে বসবাস করা থেকে নিজেকে বিরত করে স্বাধীন, ছোট্ট, সুখী সংসারের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে নারীরা। এই আত্মসুখই অতীতের আভিজাত্য-বোধকে ভেঙ্গে দিচ্ছে, জন্ম নিচ্ছে স্বজনহীন ছোট ছোট পরিবার। এই বিষয়ভাবনাগুলোকেই আশাপূর্ণা দেবী 'প্লট' হিসেবে নিয়েছেন। আর সে কারণেই লেখিকার রচনায় সামাজিক প্রেক্ষাপটের ঘটনার ঘনঘটায় মুখ্য হয়ে উঠেছে।

সমাজে বসবাসকারী মানুষকে সর্বপ্রথম যা মেনে চলতে হয় তা হচ্ছে সমাজের নিয়মকানুন, প্রথা, সংস্কার, এই নীতিতেই আশাপূর্ণা দেবী স্বয়ং বিশ্বাসী ছিলেন। এছাড়া আরো একটা বিশ্বাস তাঁর ছিল যে, সহজ কথা সহজ করে বলতে পারা। যে কারণে আধুনিক ছোটগল্পকাররা আঙ্গিক নিয়ে বিশেষভাবে সচেতন হওয়া সত্ত্বেও তিনি এগুলো নিয়ে একেবারেই বিচলিত ছিলেন না। কারণ তিনি তাঁর চোখের সম্মুখে ঘটে যাওয়া ঘটনাকে সহজ-সরল-হৃদয়স্পর্শী করে বিকশিত করতে চাইছেন বলে সেখানে সংলাপটাই প্লটের চাইতে মুখ্য হয়ে উঠেছে। আর সে কারণেই তাঁর গল্পে প্লটের সুদৃঢ়

ভিত্তি তাঁকে ভাবাত না। তিনি চাইতেন অতি পরিচিত বিষয়বস্তুকে গল্প বলার ভঙ্গিমায় পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপিত করতে, কারণ গল্প শোনার প্রবণতা মানুষের চিরকালের। এই সহজ সরল প্রচেষ্টার আঙ্গিকই তাঁর বহু সার্থক ছোটগল্পের সাফল্যের মূলে অবস্থান করছে।

প্লটের ব্যাপারে আশাপূর্ণা দেবী নিজেই বলেছেন — "শিল্পী মাত্রেই নিজস্ব মনোভঙ্গীর অনুকূলে তার শিল্পের উপকরণ বেছে নেয়। আমার বেছে নেওয়া উপকরণ হচ্ছে — সাধারণ সমাজবদ্ধ ঘরোয়া মানুষ। নিতান্তই সাধারণ, যে সাধারণেরা শুধু প্রাণপাত করে দিনের ঋণ শোধ করে চলে।" *(পৃ. ১৯, আশাপূর্ণা দেবী রচিত "আর এক আশাপূর্ণা")*। আরও বলেছেন — "এদের জীবনে রোগ শোক দারিদ্র্য আর আকস্মিক দুর্ঘটনা ছাড়া কোন নাটকীয় ঘটনা বড় একটা ঘটে না, তাই তাদের আত্মার ক্রন্দনধ্বনি কখনই উত্তাল হয়ে বাজে না। শুধু কান পাতলে শোনা যায়। সেই অস্ফুট ধ্বনিটুকুকে পৌঁছে দেওয়াই আমার সাহিত্য"। *(পৃ. ২০, ঐ)*। কান পেতেই তিনি অফুরন্ত চলমান জীবনের ধ্বনি শুনতেন, সেজন্যেই তাঁর রচনায় কোনদিন প্লটেরও অভাব হয়নি এবং তার বৈচিত্র্যেরও অভাব হয়নি। কারণ, তিনি নির্মমভাবে শিল্পী হস্তে সত্যকে উন্মোচন করতেন। চিরন্তন স্নেহের সম্পর্কের মধ্যেও সত্যকে সন্ধান করে নিষ্ঠুরকে উদ্ধার করেছেন, যেমন 'ছিন্নমস্তা' গল্পে মা জয়াবতী, 'আয়োজন' গল্পে ঠাকুর্দা লোকনাথ — প্রভৃতি চরিত্র।

প্লট সরল, জটিল, বৃত্তাকার, শিথিল প্লট প্রভৃতি নানা প্রকারের হলেও আশাপূর্ণা দেবীর ছোটগল্পে কিন্তু সরল প্লটের প্রাধান্যই আমরা বেশি দেখতে পাই। ছোটগল্পের প্লটে থাকে কালচেতনা, স্থান এবং পাত্রের উপস্থিতি। 'ছিন্নমস্তা'তে শুরুতেই যেমন দেখতে পাই সময় সন্ধ্যা, পাত্র জয়াবতী ও স্থান বাড়ি। সাধারণভাবে স্নেহ বৎসলা মাতৃমূর্তি, নবপুত্রবধূর আগমনে আনন্দিতা জয়াবতী ও তার সংসারজীবন নিয়ে শুরু হয়েছে গল্পের বয়ন। সামান্য ডাঁটা চচ্চড়ি খেতে ভালোলাগা একদিকে, আর অপরদিকে সংসারের অন্যান্য কিছু চরিত্রগুলোর স্বাভাবিক পরিণামের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাওয়াতেই চলে গল্পের বুনন। এই পরিবেশই জয়াবতীকে ব্যঙ্গ ও যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে এক ক্রূর পরিস্থিতিতে নিয়ে গেল।

জয়াবতীর পুত্রবধূ প্রতিভা বিধবা শাশুড়ীর অন্তর্যন্ত্রণাকে উপলব্ধি করতে না চেয়ে বরং আরো ব্যঙ্গের কশাঘাতে তীব্র করে তুলেছে। বাৎসল্য প্রেম থাকা সত্ত্বেও জয়াবতী তীব্র অপমানে জর্জরিতা হয়ে নিজের সন্তানের রুধির পানে অন্তরের অন্তঃস্থলে তৃপ্তি বোধ করেছেন — এই চিত্র ফুটিয়ে তোলাতেই আশাপূর্ণা দেবীর দক্ষতা। প্রতিভা ব্যঙ্গের প্রত্যাঘাত পেয়েছে, কিন্তু শোধরাবার তার আর উপায় নেই। কিন্তু জয়াবতী 'ছিন্নমস্তা'র মতো নিজের রক্তপান করলেও আঘাতকে ফিরিয়ে দিতে পেরেছে। গল্প শুরু আর শেষের জয়াবতীর মনঃপ্রকৃতি ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। গল্প যেখান থেকে শুরু হয়েছে ক্রমাগত তা পরিণতির দিকেই এগিয়ে গিয়েছে।

অর্থাৎ আশাপূর্ণা দেবীর রচিত গল্পের প্রায় প্রতিটিতেই এই সরল প্লটের প্রাধান্যই চোখে পড়ে। আশাপূর্ণা ছিলেন বহির্জীবনের অন্তরালেও যে জীবনের স্রোত বয়ে চলে তার কারবারী, যেখানে মানুষ আপন চিত্তবৃত্তির কাছেও অসহায়, যেখানে নিজেকে ঘিরে জালিকাবৃত্ত রচনা করে নিজেই পুনরায় সেখানে আবদ্ধ হয়ে পড়ছে।

আশাপূর্ণা দেবীর ছোটগল্পগুলোর মধ্যে শিল্পরূপের দিকগুলো প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে তার মধ্যে রীতি হল একটি বিশেষ দিক। যেমন তিনি সাধারণত কোন গল্পই আত্মকথনরীতিতে রচনা করেন নি। এই রীতিতে কোন গল্প বা উপন্যাসের চরিত্র নিজের মধ্যে নিজেকে প্রত্যক্ষ করতে পারে। নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য, চাহিদা ও একান্ত আপনার একটা স্বরূপকে আবিষ্কার করতে চায়। কোন মানব বা মানবীর মধ্যে যখন সমস্যা বা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় এবং তা ঘনীভূত হয়ে কোন আবর্ত সৃষ্টি করতে থাকে তখন সেই চরিত্রের মধ্যে শুরু হয় টানাপোড়েন, আবির্ভাব হয় পক্ষে-বিপক্ষের যুক্তি নিয়ে নানা দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতির। তখনই সেই চরিত্রটি নিজের অন্তর্নিহিত সত্তার অস্তিত্ব, তার উৎস, অস্তিত্বের গভীর তলদেশে ডুব দিয়ে নিজের মনের রত্নগুলোর সন্ধান করে থাকে। একের পর এক আবরণ যত ধীরে ধীরে উন্মোচিত হতে থাকে ততই স্বতন্ত্র একটা রূপ চরিত্রের নিকটবর্তী হতে থাকে আর তাকে বিশ্লেষণের জন্য একান্ত নিজস্ব অনুভূতির কথা নিজেই যেন বলে যেতে শুরু করে — এভাবে আত্মকথন রীতির তাগিদ চরিত্ররা অনুভব করে। কিন্তু আশাপূর্ণা দেবীর চরিত্ররা এই কাজটি সাধারণত করেন না। কারণ তাঁর সৃষ্ট চরিত্ররা এই ধরনের দ্বন্দ্ব আর দোলাচলতায় খুব বেশি পড়েন নি।

আশাপূর্ণা দেবী সমাজকে তাঁর গল্পে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। মানুষ কোন না কোন সমাজের অধীনে বসবাস করে। সেখানে তিনি প্রায়শই মধ্যবিত্ত সমাজকে দেখিয়েছেন, কখনো বা উচ্চবিত্ত, আবার কখনো বা নিম্নবিত্ত ও বস্তীবাসীদেরও দেখিয়েছেন, তবে তাদের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। সমাজ অভ্যন্তরস্থ মানুষের সামাজিক জীবনকেই তিনি মুখ্য করে নিয়েছেন, তাই তাঁর গল্পে বিকশিত হয়ে উঠেছে সামাজিকতা, লৌকিকতা। এখানে নিজস্ব স্বরূপ ব্যক্ততার কোন আকুলতা নেই। সমাজ প্রেক্ষিতে পারিবারিক ঐতিহ্যকে, প্রথাকে এবং রীতি নীতিকেই আলোকিত করতে চেয়েছেন। সমাজে বসবাসকারী মানুষেরা, যারা আমাদের চোখের সামনে নিয়তই রয়েছে। যাদের নিয়ে কোন গল্প হতে পারে বলে সচরাচর কোন মানুষ ভেবে উঠতে পারে না, তাদেরই তিনি উপাদান হিসেবে বেছে নিয়েছেন। সেক্ষেত্রে নারীরাই পেয়েছে প্রাধান্য। কারণ সংসারে নারীদের ভূমিকাটাই আশাপূর্ণা দেবীকে আজীবন ভাবাত। পুরুষরাই যে একমাত্র সবকিছু নয়, নারীরাও যে জীবনের পূর্ণতার জন্য অর্দ্ধেক গৌরব দাবী করতে পারে সেটাকেই বারংবার উপলব্ধি করেছেন। আরঃনারীরা তখনও ব্যক্তি পরিচয়ে পরিচিত হতে শুরু করে নি, তাই নারীদের পরিচয়ের প্রধান বাহক হয়ে উঠেছে পারিবারিক

ঐতিহ্যগুলোই। সমাজ ছাড়া কোন মানুষের অস্তিত্ব তিনি দেখতে চাননি, দেখাতেও চাননি। পরিবারগুলোকে নিয়ে তৈরি হচ্ছে সমাজ এবং পরিবরের ভাঙাগড়ার ফলে যে নতুন ধারার সংযোজন ঘটছে তার মধ্য দিয়েই পরিবর্তন ঘটছে সমাজের। সেই সমাজ এবং সমাজবদ্ধ মানুষকেই তিনি তার রচনায় ধরতে চেয়েছেন। আর এসব কারণেই আশাপূর্ণা দেবীর রচিত ছোটগল্পগুলোতে আত্মবিশ্লেষণ প্রাধান্য পায় নি।

আশাপূর্ণা দেবী রচিত ছোটগল্পে সাধারণত অতীত স্মৃতিচারণাও নেই। স্মৃতির প্রবাহ ধরে সন্তরণ করতে করতে ভেসে চলাকে তিনি ব্যবহার করেন নি, তিনি চোখের সম্মুখে যা দেখেছেন, সমসাময়িককালে, তাকেই প্রকাশ করেছেন। ঘটনার যেকোন একটি কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে সমস্ত জীবন ও ঘটনাকে বিশ্লেষণ করা অনেক সাহিত্যিকের সাহিত্য কর্মেই রয়েছে কিন্তু আশাপূর্ণা দেবী যেমন চলমান জীবন থেকে চরিত্রকেও নিয়েছেন তেমনি গ্রন্থনার ক্ষেত্রেও গল্প বলার ভঙ্গিমাটিকেই গ্রহণ করেছেন। তিনি একেবারে সহজ সরলভাবে, যেন স্বচক্ষে দেখেছেন এভাবে ঘটনার বর্ণনা করে গেছেন; যেন দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়েছে পর্যায়ক্রমে সে সব ঘটনাগুলো। কিন্তু তিনি একবারও ঘটনাগুলোর পরিণতি কি হওয়া উচিত সে সম্পর্কে কোন কথা বলেন নি। তাই তিনি বলেছেন — "যা দেখি তাই লিখি। আর পরে ভাবতে চেষ্টা করি কেন এমন হয়? আমি কখনও 'এইটা হওয়া উচিত' একথা মনে করে কিছু লিখিনি। জানি কি হয় সেটাই বলবার। কি উচিত বলবার আমি কে?" — *(পৃ. ১৭, 'আর এক আশাপূর্ণা')*।

স্মৃতিচারণা করতে গেলেই নিজের মনের অন্তর্গহনে ডুব দিতে হয়। একটা মানুষের জীবনে অজস্র ঘটনা ঘটে থাকে, সেগুলোর মধ্য থেকে স্মৃতির সূত্র অনুযায়ী খণ্ড খণ্ড ঘটনাকে সাজিয়ে নিয়ে একটি অখণ্ড রূপ দেওয়ার জন্য চাই চরিত্রের গাম্ভীর্য। যা নাকি আশাপূর্ণা দেবীর গল্প রচনায় অত্যন্ত কম সংখ্যক রয়েছে। আর যারা রয়েছে তারা এই রীতির নিকটবর্তী হন নি। গল্প বলা এবং গল্প শোনার প্রতি যে একটা ভালোলাগা তা মানুষের মধ্যে চিরকালই বিরাজিত, তাই এই রীতিটিই যেন সকলের প্রাণ স্পর্শ করে যায়। লেখিকা তাই সাধারণ মানুষের কথাগুলোও অত্যন্ত সাধারণভাবেই বলতে চেয়েছেন। যে সমস্ত চরিত্র নিজের চারিত্রিক দৃঢ়তার গুণে ব্যক্তিত্বময়ী হয়ে উঠেছে তারাও নিজেকে প্রকাশ করবার সময় সহজ পদ্ধতিকেই অবলম্বন করেছে কিন্তু এর মধ্য দিয়েই একটা নিজস্ব পরিমণ্ডল যেন গড়ে তুলতে পেরেছেন।

ছোটগল্পের উপাদান জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে এবং পদক্ষেপেই রয়েছে। যে কোন কিছুই ছোটগল্পের উপাদান হয়ে উঠতে পারে বলে আন্তন চেকভ মনে করতেন। কিন্তু সে যাই হোক না কেন তার সঙ্গে যেন জীবনের একটা গভীর সংযোগ থাকে সেদিকে নজর রাখতে হবে। আর তাকে সুচারুরূপে বিকশিত করার জন্য প্রয়োজন হয় 'প্রতীক'-এর (symbol)। যার ব্যবহার নাকি

নাট্যকার শেক্সপীয়ারের সময় থেকে চলে আসছে বর্তমানকাল পর্যন্ত। লেখক তার ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী সামাজিক পরিবেশের প্রকৃতি অনুযায়ী এবং সর্বোপরি লেখকের নিজস্ব যে একটা শিল্প সম্পর্কিত বোধ, তার প্রকৃতি অনুসারে প্রতীকের ব্যবহার করে থাকেন। প্রতীকই ছোটগল্পের crisis point কে দৃঢ় করে তুলতে সহায়তা করে। তাই গল্পকার তার সৃষ্টিকে সুস্পষ্টরূপ দেবার জন্য চলমান জীবন থেকেই নিজস্ব অভিজ্ঞতা সঞ্জাত প্রতীক ব্যবহার করে থাকেন। কারণ এই প্রতীকই গল্পের সঙ্গে পাঠকের আন্তরিক যোগসূত্র স্থাপন করবে এবং গল্পের ব্যঞ্জনাবহ প্রাণোচ্ছল গতির জন্য একটি পথ নির্মাণ করে দেবে। তাই প্রতীক হবে নিখাদ, যা গল্পের আত্মাকে করে তুলবে নিজস্ব বলে বলীয়ান। আর সুদক্ষ শিল্পীমাত্রেই এই ব্যাপারে সাধারণ জিনিসকেও ব্যবহার করে সার্থক ছোটগল্প রচনা করতে পারেন। আশাপূর্ণা দেবীও তাঁদেরই একজন ছিলেন।

আশাপূর্ণা দেবী তাঁর প্রায় সমস্ত ছোটগল্পেই যে প্রতীকের ব্যবহার করেছেন, তা হল অট্টালিকা। প্রায় অধিকাংশ গল্পেই রয়েছে অট্টালিকার ব্যবহার। প্রায়শই তিনতলা রয়েছে, কখনো বা দোতলা, ন্যূনতম হলেও একতলা তো বটেই। শুধু তাই নয়, গ্রামের যে সমস্ত বাড়িঘরের বর্ণনা আছে তাদেরও বেশিরভাগটাই পাকা ও দোতলা বাড়িও আছে। শ্রী-যুক্ত অট্টালিকা বনেদীয়ানার প্রতীক আর শ্রী-হীন অট্টালিকা হচ্ছে ভাঙনের প্রতীক। কুঁড়েঘরের সংখ্যা প্রায় নেই বললেই চলে। কারণ তিনি মধ্যবিত্ত সমাজকে বেছে নিয়েছিলেন যেহেতু, তাই সেরকম ভিত্তিটাই রয়েছে। মানুষে চারিত্রিক দিক বদলায়, মূল্যবোধ, সাংসারিক চালচিত্রে ঘটে পরিবর্তন কিন্তু স্থাপত্যের নিদর্শন যে অট্টালিকা — তার তো কোন পরিবর্তন ঘটা সম্ভব নয়। আর তাই বাড়িঘরই প্রমাণ করে দিচ্ছে কোন কালের এই পরিবারটির বনেদীয়ানার ঐতিহ্যকে। একান্নবর্তী পরিবারের বহুজনের মধ্যে থাকার যে মূল্যবোধ আদর্শবোধ ছিল তা ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হচ্ছে। যে সময়টাতে একান্নবর্তী পরিবারগুলো একটি সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে, সে সময়টাকে লেখিকা স্বচক্ষে পর্যবেক্ষণ করেছেন। পরিবারগুলোর কর্তা-গিন্নীরা তাদের ভ্রাতা, ভগ্নী, আত্মীয়-পরিজন, আশ্রিত, আশ্রিতাদের নিয়ে বসবাস করতেন। পরিবারের সকল সদস্যরা তাদের প্রাচীন বংশগৌরবকে আঁকড়ে থাকতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ব্যয় অনুযায়ী আয়ের পথ ততটা সুগম ছিল না, ফলে ভেতরে দেখা দিচ্ছিল ভাঙন। অনেক বাড়িতে ঠাকুর চাকর ছিল প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই কম এবং অনেক বাড়িতে তা আবার ছিলও না। এভাবে পরিবারগুলোকে একসূত্রে বেঁধে রাখবার দুরূহ প্রচেষ্টা চলত কিন্তু তথাপি একান্নবর্তী ভাবনার ধারাটি অবক্ষয়ের দিকে যাচ্ছিল। আর সেই সূত্রে সমাজেও অবক্ষয় ত্বরান্বিত হচ্ছিল। এই অবস্থাটার প্রতীক হিসেবে অট্টালিকাগুলো ভগ্ন, কুৎসিত চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। বাড়িগুলোতে রং তো দূরঅস্ত, পলেস্তারা নেই বললেই চলে। বৈদ্যুতিক সংযোগও সব বাড়িতে ঠিকমতো না থাকায় গুমোট অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। লোকসংখ্যার ক্রমবর্ধমান পরিণতি ঘরগুলোতে অকুলান

হয়ে উঠছিল। গৃহগত পরিবেশটি আলো বাতাসযুক্ত, উদার উন্মুক্ত না হওয়ায় মানুষগুলোও যেন ঠাসা গুমোট ও অস্পষ্ট হয়ে উঠছিল। খোলা ছাদের মুক্ত বায়ুতে শ্বাস-প্রশ্বাস নেবার জন্য অনেকেই ওপরে উঠে আসতো। বাইরের জগতের মুক্তি তাদের আকর্ষণ করত, আলোয় ফিরতে চাইত। যাদের সামর্থ্যে কুলিয়ে উঠত তারা এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে আলাদা বসবাস করার কথা ভাবলেও কেউ কিন্তু ঐতিহ্যকে রক্ষা করার জন্য প্রাচীন অট্টালিকাকে নতুন করে সুসজ্জিত করে তোলার কথা ভাবত না। এই যে খণ্ড খণ্ড রূপ অখণ্ডতাকে ভেঙ্গে দিচ্ছে এভাবেই যেন বাড়িগুলো আরো প্রাচীন হয়ে ক্রমাগত একটা ভগ্নস্তুপ বা ধ্বংসাবশেষে পরিণত হচ্ছে। একদা যে বহুতল বাড়িগুলো নির্মাণ করার আর্থিক ক্ষমতা এই বাড়িগুলোর কর্তা-ব্যক্তিদের ছিল এবং বাড়ির মত শক্ত ভিত কর্তাদের শাসনেও ছিল তা বোধগম্য হয়। কিন্তু জীর্ণ বাড়ির মতো পরিবারের কর্তৃত্বও যে জীর্ণ হয়ে গেছে তার চিত্রকে সুপরিস্ফুট করে তোলার জন্যই লেখিকা এই প্রতীকটিকে গ্রহণ করেছেন। অট্টালিকার ভগ্নদশা আসতো পারিবারিক একতার ভাঙনের চিত্র। একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙনে, নূতন বাতায়ন তৈরি হয়েছে, যেখান থেকে আর পুরোনো ব্যবস্থায় ফিরে যাওয়া যাবে না। তাই ভগ্নদশার নবীকরণ অর্থাৎ শ্রী-যুক্ত করার চিহ্ন নেই। ঐতিহ্য-আদর্শ-মূল্যবোধ নষ্ট হচ্ছে। এগুলো আর নূতন বাতাবরণে ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। বর্তমান সমাজে এই পরিবারকেন্দ্রিকতা, জোটবদ্ধ সংসারজীবন যেমন বিরলদৃশ্য, তেমনি এই প্রাচীন অট্টালিকাগুলোও আজ অদৃশ্য। ঘরের ভেতরের গুমোট চিত্র যেন অন্দরমহলের নারীদের ভেতরে বদ্ধ অবস্থায় যে ক্রোধ, আক্রোশ, হিংসা চাপা থাকত তারই প্রতীককে তুলে ধরে।

'আমায় ক্ষমা করো', 'অঙ্গার', 'অভিশপ্ত', 'অনুপমার ঘর উদ্বাস্তু', 'বেহুঁশ', 'তাসের ঘর', 'নেশা', 'একটি ভাঙাচোরা গল্প', 'স্বাধীনতার সুখ', 'নীলকণ্ঠ', 'অভিনেত্রী' ইত্যাদি গল্পে অট্টালিকার প্রতীক লক্ষ করা যাবে। 'আমায় ক্ষমা করো' গল্পে যেমন মজুমদার বংশের অতীত মহিমার মূক সাক্ষী হিসেবে রয়ে গেছে বাড়ির পুরানো প্রাসাদ-শ্রেণি। "প্রায় আধখানা গ্রাম জুড়িয়া যে ধ্বংসপ্রায় প্রাসাদ-শ্রেণি" 'একদিন নাকি ইঁহাদের "রাজা" বলিয়া খ্যাতি ছিল' — প্রভৃতি বাক্যগুলো প্রমাণ করে বর্তমান মজুমদার বংশের অতীত গৌরবের কথা। বাড়ির মহলগুলোর বর্ণনায় আরো ইতিহাস — 'বারমহল', 'অন্দরমহল', 'কাছারিঘর', 'নাটমন্দির', 'দূর্গাদালান', 'ভোগমণ্ডপ', 'রান্নাবাড়ী'। এই শব্দগুলোর ব্যবহার থেকে সহজেই অনুমেয় সেই বাড়িটির শ্রী ও সৌন্দর্য এবং ঐশ্বর্যশালী, জমিদারী কাঠামোর রূপ। এ প্রসঙ্গে আশাপূর্ণা দেবী আরো বলেছেন — "তাহার (বাড়ীটির) সামনে মাথাটা আপনিই কেমন নত হইয়া আসে, আর আসে একটা 'হায় হায়' ভাব... কেমন ছিল সেই বিচিত্র সমারোহের কোলাহলময় দিনগুলি... কেমনই বা ছিল ইহাদের অধিবাসীরা..." — *(পৃ. ৭০ গল্পসমগ্র ২য় খণ্ড)* পূর্ব্বে বনেদীয়ানাকে শ্রী হীনভাবে পড়ে থাকা অট্টালিকার মধ্য দিয়ে স্মরণ করা ছাড়া আর

কোনভাবেই তাকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয় বলেই নূতন করে শ্রী যুক্ত করার প্রয়াস নেই।

গল্প যে সময়ে গড়ে উঠছে সে সময়টা কিন্তু এই বিরাট প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ। "অন্দরমহলের মধ্যে যে ঘরগুলো এখনো কোন প্রকারে টিকিয়া আছে তাহারই একখানিতে থাকেন "নতুনগিন্নী"। নবদ্বীপ মজুমদারের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী। সত্তরের কাছাকাছি বয়স, মাজাভাঙা খুনখুনে বুড়ি, চোখের চাহনি নিষ্প্রভ, শুধু গলার জোর আছে সমান।" একদিন যেমন বিশাল প্রাসাদ শ্রেণি গ্রামের ঐতিহ্যকে বিশালতা দান করেছিল, পরিবারের বংশগৌরব বৃদ্ধি করেছিল — তা যেমন আজ বিলুপ্তির পথে তেমনি পরিবারের সদস্যদের সংখ্যাও বিলুপ্তির পথে। এক রয়েছেন ধ্বংসপ্রাপ্ত শেষ পুরুষের পূর্বপুরুষ 'নতুন গিন্নী' — যার অস্তিত্বও প্রায় ধ্বংসের পথে হলেও কণ্ঠস্বরের দ্বারা পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টির ওপর অভিসম্পাত করতে করতে বেঁচে আছে। অর্থাৎ কিন্তু ভগ্নাবশেষ অট্টালিকার মতোই তারও অবস্থা। আর রয়েছেন বংশের শেষ পুরুষ সমুদ্র নারায়ণের সুলক্ষণা, গুণবতী স্ত্রী হৈমন্তী। যে নিজেও আজ প্রায় অস্তমিত, যে কোন কারণে স্বামী নিরুদ্দেশ, আর সে যেন স্বামীর আরাধনায় এবং বংশগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখতে একখানি নির্মল, শুচিস্নিগ্ধ জীবন অতিবাহিত করছে।

'অঙ্গার' গল্পে একসময়ের জমিদার বাড়ীর জীর্ণ, শীর্ণ চেহারা ধরা পড়েছে লেখিকার লেখনীতে। "বেশী রাত্রে সুকান্ত বাড়ী ফিরে দেখল দোতলার একটা ঘর যথাসম্ভব পরিষ্কার করে তার বিছানাটা রয়েছে পাতা।" — *(পৃ. ১১১, ঐ)*। সুকান্ত কোলকাতায় চাকরিসূত্রে বসবাস করছে, কিন্তু বাড়ি মেরামত করতে এসে দেখে এই দোতলা বাড়িরই আর এক অংশীদারের ঘরের দুর্গতি। যেখানে খাওয়ার মুখ আছে অনেক কিন্তু রোজগারের লোক কেউ নেই। গ্রামের ঐতিহ্যপূর্ণ বাড়ির বৌ হয়েও চুরি ছ্যাচড়ামি অর্থাৎ এককথায় যাকে বলে 'হাতটান' এর কাজ করে সংসারটাকে ধরে রেখেছে অতিশয় কষ্টে। তাই যখন সুকান্ত বলে — "আচ্ছা, ভাঙাবাড়ি মেরামত করবার কি এত দরকার সুকান্ত, এ যাত্রায় না হলেই বা ক্ষতি কি?... আরো চৌদ্দ বছরের ঝড়-বৃষ্টি-ভূমিকম্পে ধসে পড়ে যাক না ফাট ধরা নোনা লাগা পচা দেওয়ালগুলো" — *(পৃ. ১১৩, — ঐ)*। পরিবারটির পারিবারিক ঐতিহ্য যেমন পথের ধূলায় এসে মিশেছে তেমনি বিরাট বাড়ির ভগ্নদশাগ্রস্ত অট্টালিকাও পথের ধুলোয় নিজেকে লীন করে দিতে চাইছে যেন।

হৃত বংশগৌরব নিয়ে 'অভিশপ্ত' গল্পেও বিরাট প্রাসাদ-শ্রেণি তার কৌলিন্য হারিয়ে ভগ্নদেহে দাঁড়িয়ে রয়েছে। যেমন — "দক্ষিণের দোতলাটা সমস্ত ধ্বসে গিয়ে একতলার ছাদে জন্মেছে আগাছার জঙ্গল, আর নাটমন্দিরের জয়গায় খানিকটা জমাট অন্ধকার। দিনেরবেলা দেখা যায়, দু'শতাব্দী আগের ছোট ছোট পাতলা ইঁট, গোল চৌকো অদ্ভুত সব আকারের —" *(পৃ. ১৬৩, ঐ)*।

"দেউড়ির খিলানটার একটা স্তম্ভ কবে খসে পড়েছে — আর একটা স্তম্ভ অবিকৃত দাঁড়িয়ে আছে তার অসংখ্য কারুকার্য আর সিংহের থাবা নিয়ে।" "আমলা কর্মচারীদের ছোট ছোট ঘরওয়ালা

একতলা মহলটা এদিক ওদিক খোলা হাঁ হাঁ করছে,... 'তোষাখানা' 'মালখানা' 'নজর-ঘর' ইত্যাদি অসংখ্য মহল, বালির আস্তর ঘুচিয়ে কপাট হারিয়ে, ছাদ ভেঙ্গে পড়ে আছে অনেক ঝড়-বৃষ্টি শীত-গ্রীষ্মের চিহ্ন বুকে নিয়ে মহাকালের নীরব সাক্ষীর মত।" *(পৃ. ১৬৩ ঐ)*। যৌবনে যে অট্টালিকাটি দৃপ্ত চেহারা নিয়ে বিরাজ করত এবং বসবাসকারীরাও যে ধনে মানে কুলগৌরবে ছিল সমুজ্জ্বল তা এই ভগ্নদশাগ্রস্ত অতিবৃদ্ধ আবাসটি দেখলেই বোধগম্য হয়। আত্মীয়-পরিজন ভৃত্য ও পরিবারের লোকজনদের নিয়ে এই অট্টালিকা একসময় সহস্রদলের মতো শোভা পেত, কিন্তু বর্তমানে তা দলমণ্ডলহীন অবস্থায় একটি মৃণালের ওপর যে নিঃস্ব অবয়ব নিয়ে দণ্ডায়মান তাই যেন প্রতিকায়িত হয়ে উঠেছে। সমস্ত কিছু ভগ্নদশাগ্রস্ত হলেও অন্দরমহলের দু'একটা ঘর যেমন শুধুমাত্র ব্যবহারযোগ্য রয়ে গেছে তেমনি রয়ে গেছে গৃহকর্তা পিনাকপাণির অন্তরের নীল রক্তের আভিজাত্য বোধে।

পরিবারের অর্থকৌলিন্য লুপ্তপ্রায়, কিন্তু অতীতের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে দোতলা বাড়িখানা। 'বহুরূপী' গল্পে পাওয়া যায় এ চিত্র, যেখানে দৈন্যাবস্থা দিনের পর দিন পরিবারটিকে গ্রাস করলেও বাড়ির ছোট ছেলের সিনেমায় নেমে কিছু রোজগারকে পরিবারের পক্ষে অত্যন্ত অপমানের বলে মনে করে। নিজেদের আভিজাত্যের গৌরব ধরে রাখতে দাদারা এই বাড়িখানি থেকে ভাইকে গলাধাক্কা দিয়ে বহিষ্কার করে দেয়।

অজ পাড়াগাঁয়ে পাকা বাড়ি, ধানের গোলাবাড়ির ধ্বংসাবশেষ নিয়ে আর ভগ্ন পরিবারের শেষাংশ নিয়ে 'ছেঁড়া তার' গল্পে বসবাস করছে বিনয় মল্লিক। এখনো গরমকালে ছাদে উঠে হাওয়া লাগিয়ে শরীর শীতল করে। কাকার মেয়ের বিয়ের আগের দিন "আটচালার নীচে গ্যাসের আলো জ্বালিয়া ময়রারা ভিয়ান বসাইয়াছিল আর বাতাসে আসা ঘিয়ের গন্ধ কি অরুচিকরই লাগিতেছিল।" — আষাঢ়ের গুমোট গরমে একথা বিনয় মল্লিকের আজো মনে পড়ে। পরিবারের সমৃদ্ধির স্মৃতি রোমন্থন করেই দিনগুলো ক্রমশঃ এগোতে থাকে।

একান্নবর্তী সংসারে প্রচুর লোকজনের মাঝে তিনতলা বাড়িও একসময় অকুলান হয়ে ওঠে। 'একরাত্রি' গল্পে দেখা যায় সেই চিত্র — "একতলা আর দোতলা মিলিয়ে যে সংসার জগদ্দল পাথরের মতো জেঁকে বসেছে মানুষের বুকে..."

"ছোট্ট ঘরের লাগোয়া মস্ত ছাদটার এককোণে ইজিচেয়ার পেতে..." "তিনতলায় আজ উঠিসনে তুই, ঘুন্টি শোবে ওঘরে।" *(পৃ. ৩৩৪, ২য় খণ্ড)*। বিশালাকায় একখানি বাড়িতেও বাড়ির যুবক একখানা নিজস্ব ঘর পায় না, প্রয়োজনেই তাকে সেটা ছেড়ে দিয়ে অন্য কারো ঘরে 'ওড়ের নাগরি' বাসা হয়ে রাত কাটাতে হয়। পরিবারের অর্থকৌলিন্যে ঘর আর না বাড়লেও বংশ কৌলিন্যে মনুষ্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে এই সমস্যা আরো জটিলাকার ধারণ করবে।

'উদ্বাস্তু' ও 'সিঁড়ি' গল্পে পূর্বপুরুষদের তৈরি করে যাওয়া বাড়ির উল্লেখ রয়েছে। সংসারের

স্বচ্ছলতা আনার জন্যে দোতলায় নিজেরা থেকে নীচের তলা ভাড়া দিতে চায়। — "বসত বাড়ীর আধখানাই ভাড়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলাম বটে, করিয়াছিলাম — সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক কারণেই।... বড়লোক নই, দু'পাঁচখানা বাড়ীও নাই সত্যি, কিন্তু বাড়ীটা বেশ বড়ই।" — *(পৃ. ২৭, ৩য় খণ্ড)*।

'সিঁড়ি' গল্পেও কথকের মুখে শোনা যায় — "বাড়ীটা নিজস্ব বটে — কিন্তু ওই বৃহৎ বাড়ীখানায় থাকা তো সম্ভব নয়?" *(পৃ. ৮৪, — ঐ)*। এখানেও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ক্রমশঃ স্তিমিত হয়ে যাচ্ছে বৃহৎ বাড়িটার মতো করেই। এই বাড়িতে জনঅরণ্য নেই কিন্তু যে অট্টালিকা পরিবারের সুসময়ে নির্মিত হয়েছিল, সে সময়টা কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে।

'পদাতিক' গল্পেও জীর্ণ-শীর্ণ-বর্ণহীন একখানি দ্বিতল অট্টালিকা রয়েছে, যা দেখলে পরিবারের ঐতিহ্য কোন পথে অগ্রসর হচ্ছে তা সহজেই অনুমেয়। বিজনবাবু ও তার বড় মেয়ে জয়ন্তী অনেক খেটেখুটে সংসারে অর্থের জোগান দেয় কিন্তু বহুসন্তান পরিবেষ্টিত সংসারে আয়ের তুলনায় ব্যয় অত্যধিক হওয়ায় ঘরবাড়ির সংস্কারের কথা আসতেই পারে না যেন। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে অথর্ব হয়ে যাওয়া গিন্নী — " আর — পায়ে হেঁটে নিচের তলায় নামবেন না।" *(পৃ. ১৫৩, ঐ)* — প্রমাণ করে এই সংসার হয়তো বাড়িটার মতোই ধীরে ধীরে অবক্ষয়ের দিকে অগ্রসর হবে। পিতৃপুরুষের ভিটের রহস্য সন্ধানে এসেছেন 'একটি ভাঙাচোরা গল্প'র লেখক। তিনি তার মা-বাবা, ঠাকুরদা-ঠাকুমা কাউকেই দেখেন নি কিন্তু আজন্ম সঞ্চিত রয়েছে সেই ভিটে দেখবার ইচ্ছা। কথক যেমন কোন আপনজনকেই দেখতে পাননি তেমনি দেখতে পাননি সেই বিশাল বাড়ির পূর্ণাবয়ব। পুনরুদ্ধারের জন্যে নয়, শুধু দেখবার জন্য যাওয়া যেমন নিজের আত্মার আত্মীয় কেউ নেই, যাকে পুনরুদ্ধার করে আনা যায়।

— "যদি জানা যাইত কেমন দেখিতেছিল এই বিরাট অট্টালিকাখানা, কেমন তরো ছিল ইহার বাসিন্দারা।" ...

— "আগাছার ফাঁকে ফাঁকে কোথাও খাড়া হইয়া আছে — একটা দালানের আধখানা খিলান, কোথাও মাথা জাগাইয়া আছে চওড়া চওড়া কয়েকটা সিঁড়ির ধাপ, কোনখানে বা ঘরের সামান্যতম ভগ্নাংশ।"

— "এতবড়ো দোতলাখানা ধুলিসাৎ হইয়া গিয়াছে, অথচ একতলার রান্নাঘরখানা দিব্যি দাঁড়াইয়া আছে প্রায় অবিকৃত অবস্থায় কেবলমাত্র মাথাটা হারাইয়া। দেয়ালের গায়ে এখনো স্পষ্ট ফুটিয়া আছে ধোঁয়ার কালিঝুলি, কুলুঙ্গির উপর মাকড়সার জালের পিছন হইতে উঁকি মারিতেছে একখানা মাটির মালসা, মেজেয় সারি সারি কয়েকটা উনুনের আদরা।..."

পাড়ার কবিরাজ মশাই — "আন্দাজে আন্দাজে পরিচয় করাইয়া দেন কোথায় ছিল ঠাকুর দালান, কোথায় বৈঠকখানা, কোন্‌খানে বা অন্তঃপুরের সীমানা।" *(পৃ. ২৭৩, — ঐ)*। ধ্বংসপ্রাপ্ত

অট্টালিকাই সংকেত দিচ্ছে ধ্বংসোন্মুখ পরিবারটিও খণ্ডিত অবস্থায় কোনক্রমে অস্তিত্ব বজায় রেখে চলছে।

'কসাই' গল্পে রয়েছে একান্নবর্তী পরিবার, যেখানে পরিবারের প্রত্যেককে ধারণ করে রয়েছে 'তিনতলা' বাড়িটি। ভাইয়েরা প্রত্যেকে কোনরকমে চাকরি বাকরি করে এবং বৌ-ঝি-বিধবা বোন এরা সকলে সম্মিলিতভাবে গৃহকর্মাদি পরিচালনা করে দিনাতিপাত করছে। ঠাকুর, চাকর আজ আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। — "বিধবা ননদ সেইমাত্র ঠাকুরঘর থেকে নেমে আসেন।" — "মরীয়া হয়ে ক্রন্দনরত ছেলেটাকে টানতে টানতে উঠে যায় কমলা তিনতলার ছাদে।" *(পৃ. ৮৩, পঞ্চম খণ্ড)*।

"ভর সন্ধ্যেবেলা ছেলের চিৎকারে পুজোপাঠ মাথায় উঠলো গা? কি ছেলেই জন্মেছে! অমন ছেলেকে নুন খাইয়ে মারতে হয়।" *(পৃ. ৮৩, ঐ)*। পরিবারের মধ্যে যে ভাঙন ধরেছে তা এই ধরনের আরো সব উক্তি থেকেই বোঝা যায়। অর্থনৈতিক অবস্থা, পারস্পরিক সম্পর্কের হৃদ্যতা ও আন্তরিকতা যেমন অবক্ষয়ের দিকে এগিয়ে চলেছে তেমনি বংশ গৌরব বৃদ্ধিকারী তিনতলা বাড়িটিও ক্রমাগত ধ্বংসের মুখে নিজেকে সমর্পণ করছে। বাড়ি এবং পরিবার দুটোই যেন ভেঙ্গে পড়ার পূর্বে কোনরকমে আঁকড়ে বেঁচে থাকতে চাইছে।

'মণিকোঠা' গল্পে সুনন্দা ও সীতেশের একটিমাত্র সন্তানকে দুটো ভালো শার্ট পর্যন্ত পরাতে পারে না অথচ তারা বসবাস করে একটি দ্বিতল বাড়িতে। কিন্তু বাড়িখানার চেহারাও তেমনি — "সরু ইঁটপাতা সিঁড়ি! ভাঙাভাঙা এবড়ো খেবড়ো।"

— "যেমন ভাঙা ঝরঝরে ... তাও যা দাদাশ্বশুরের আমলের একটু আস্তানা ছিলো, তাই — রাস্তায় দাঁড়াতে হচ্ছে না। নীচের ঘরখানা ভাড়া দিয়েও দু'পাঁচ টাকা আসছে।" যারা নিজের একমাত্র সন্তানকে বেঁচে থাকবার ন্যূনতম অন্ন বস্ত্র ব্যতীত কিছু দিতে পারেন না তাদের পক্ষে তো বাড়িকে নতুনভাবে সাজিয়ে তোলা সম্ভবপর নয়। তাই পরিবারের সদস্য সংখ্যা নিতান্ত কম হলেও তারা যেমন অর্থনৈতিক দুর্দশাগ্রস্ততার ভারে নিমজ্জিত তেমনি তাদের এককালের আনন্দ নিকেতন এই বাসভবনটিও দীনহীন অবস্থায় জর্জরিত। যে কোন সময়েই মুখ থুবড়ে পড়ে যেতে পারে হুড়মুড় করে।

অখণ্ড পরিবারগুলো খণ্ড খণ্ড হয়ে নানাদিকে ছড়িয়ে পড়ে নতুন করে ভিত্তির সন্ধান করতে চাইছে। এর মূলে রয়েছে আত্মসুখের প্রবণতা। এই স্থূল বোধগুলোই অতীতের আভিজাত্যবোধকে ভেঙ্গে দিচ্ছে। তারই নিদর্শন মেলে 'স্বাধীনতার সুখ' গল্পে।

— "এখন উজ্জ্বলা স্বাধীন হয়েছে। সাবেক বাড়ি থেকে চলে এসে এ পাড়ায় বাড়ি কিনে বাস করছে আর সেই অবধি যেন হাতে চাঁদ পেয়েছে চঞ্চলা।" *(পৃ. ৩০২, ৩য় খণ্ড)*। প্রাচীনের মধ্যে যে পারিবারিক ঐতিহ্য, প্রথা, রীতি-নীতি রয়েছে তাকে পরিত্যাগ করে আত্মসুখ চরিতার্থতার যে

বিলাস — তাকে প্রাধান্য দিতেই সাবেকি বাড়ি, একান্নবর্তী পরিবার গৌণ হয়ে উঠেছিল। শুধু উজ্জ্বলাই গণ্ডী ছেড়ে বেরিয়ে আসেনি, ছোটবোন চঞ্চলাকেও ইন্ধন যোগোচ্ছে যাতে করে নিজের স্বাধীন জীবনের সন্ধানে অচিরেই এই বিরাট বাড়ি আর বিরাট পরিবার পরিত্যাগ করে যায়।

"এই তো দেখলাম — সেদিন, খালি গায়ে নীচের দালানে ঠাণ্ডায় বসে তোর জায়ের মেজো ছেলের সঙ্গে রুটি খাচ্ছে! মাগো! অমন দুঃখচেটে করে ছেলেপিলে মানুষ করে শত জন্মে দেখতে পারিনে। আমার বুকু বিজ্জ অতো বড়ো ছেলে এখনো রুটি কি জিনিস তা জানে না। যা' করে ওই লুচি সন্দেশ!" *(পৃ. ৩০৫, ঐ)*। মনের দুর্বল স্থানে আঘাত দিয়ে দিয়ে অখণ্ডতার বিনষ্টি ঘটিয়ে তাকে খণ্ড খণ্ড করে ছড়িয়ে ফেলার মধ্যেই যেন সুখ লুক্কায়িত রয়েছে। আর তাই নিজস্ব সম্পদকে, নিজের বাড়িকে আবার নতুন করে সাজিয়ে তুলে পরিবারের ঐতিহ্যকে রক্ষা করার পরিবর্তে তাকে পরিত্যাগ করে চলে যাওয়ার প্রতীক হিসেবেই যেন আশাপূর্ণা দেবী অধিকাংশ গল্পেই ভগ্নদশা অট্টালিকাগুলোর ক্রমাবনতিকে তুলে ধরেছেন।

"দালানের মাঝখানে গালচের আসন পেতে গোটা আষ্টেক দশ বাটি আর অভব্য রকমের বড় একখানা থালা সাজিয়ে আহারের আয়োজন করা হয়েছে। জামাইয়ের নয়, বেহাইয়ের।" *(পৃ. ৩২৩ — ঐ)*।

'অভিনেত্রী' গল্পে যখন বিশাল বনেদী বাড়ির জাঁকজমকপূর্ণ অবস্থা ছিল তখনকার এই চিত্র। আর তার থেকে পঁচিশ বছর পরেই প্রস্ফুটিত হয় পূর্বের চিত্রের ক্রমাবনতি। "কালের পরিবর্তন হয়েছে বটে — স্থানটা ঠিক আছে। 'পাত্র'টাও বলা চলে। সেই দালানে — ঠিক সেই জায়গাতেই সেই ভঙ্গীতে বসে আছেন গৃহিণী অনুপমা, ... আসনটা আর বাসনগুলো বাপের আমলের, তবে আহার আয়োজনটা নয়। তা'তে এ যুগের শীর্ণ ছাপ! অনুরোধ-উপরোধের কাজটা ফুরিয়েছে গৃহিণীদের। ... সংসারের এই নবাবীচাল চেলে আর কতদিন চালাতে পারবেন তারকনাথ?" *(পৃ. ৩২৬, — ঐ)*।

'রাহু' গল্পেও দেখা যায় যথেষ্ট বড় অট্টালিকা রয়েছে। বাড়িতে প্রয়োজনের তুলনায় ভৃত্যের সংখ্যাও অতি নগণ্য। সংসারের রথচক্র স্বাভাবিকভাবে ঘূর্ণায়মান হলেও সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে কর্তারা সংসারের পরিচালনাতেই ব্যস্ত, ঘরবাড়ির দিকে নজর দেবার ঔৎসুক্য যেন নেই। "কই রে রতন, বড় সুটকেস্‌টা কি করলি? দোতলায় তুলে দিয়েছিস্?" *(পৃ. ১১৫, গল্প সমগ্র ২য় খণ্ড)*। "এ বাড়ির বড়বৌ কল্পনাই শুধু ছুটে আসে নি ব্যস্ত হয়ে, ছাদে বসে বড়ি দিচ্ছিল নাকি কে জানে।" *(পৃ. ১১৬, ঐ)*। "নীচের গোলমাল তার কানে এসেছে, আলসে থেকে ঝুঁকে ব্যাপারটা বুঝে নেওয়ার পর আর নীচে নামবার গা নেই তার।" *(পৃ. ঐ — ঐ)*। এ ধরনের আরো নানা উক্তিতে রয়েছে বহুতল বাড়ির প্রমাণ।

'পদ্মলতার স্বপ্ন' গল্পেও দেখা যায় দ্বিতল অট্টালিকাখানা। "যদু লাহিড়ীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির 'বোলবোলাও' ঘুচিয়াছিল।' *(পৃ. ১২৩ — গল্প সমগ্র দ্বিতীয় খণ্ড)*। "প্রদীপের লোভ দেখাইয়া এক আধদিন মেয়েকে বিছানায় শোয়াইয়া আসিলেই দোতলার জানলা হইতে লাহিড়ী গিন্নীর ভাঙাভাঙা বিরক্ত কণ্ঠের আওয়াজ আসে।" *(পৃ. ১২৫ — ঐ)* এবং "তাছাড়া পৃথিবীর সমস্ত ভূত-প্রেত দৈত্য-দানব কি দল বাঁধিয়া জমাট হইয়া নাই — সেই বালির আস্তরণ খসা হাড়পাঁজরা বার করা ঘরখানার ছম্‌ছমে কোণে কোণে?" *(পৃ. ১২৪ — ঐ)*। বাড়িটি দোতলা হলেও তার ভেতরের চেহারাটা ধরা পড়ে উপরোক্ত উক্তিতে। অনেক কাল পূর্বের অট্টালিকাটাই শুধু রয়ে গিয়েছে ভেতরটা একেবারে অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়েছে।

'ছিন্নমস্তা' গল্পে মূল চরিত্রে রয়েছে বিধবা শাশুড়ি জয়াবতী, পুত্রবধূ প্রতিভা এবং পুত্র বিমলেন্দু। বিমলেন্দু ভালো ছাত্র এবং চাকরিও করে, কিন্তু পিতৃপুরুষের ভিটেতে যে বসত বাড়ি রয়েছে তার প্রতি কোন যত্ন নিতে বা অভিনবত্ব আনবার নিমিত্ত কোন ভাবনাচিন্তাও করতে দেখা যায় না। অর্থাৎ পূর্ব নির্মিত অবস্থাতেই রয়ে গিয়েছে। "রাত্রি দশটায় জয়াবতী যখন বিরক্তি তিক্ত কণ্ঠে আহারের জন্য ডাক দেন, তখন নামিয়া আসে বিমলেন্দু, চুপ করিয়া খাইয়া উঠিয়া যায়।" — *(পৃ. ১৬৫, আশাপূর্ণা দেবীর ছোটগল্প সঙ্কলন)*। "শাশুড়ি চরিত আলোচনান্তে পড়ন্ত বেলায় উঠিয়া চুল বাঁধে, গা ধোয়, পরিপাটি করিয়া সাজিয়া ছাদে গিয়া বসে, নয় তো বরকে চিঠি লেখো।" *(পৃ. ১৬৭, ঐ)*। "আর এ তো শানবাঁধানো উঠান" — "দালান ঝাঁট দিতে দিতে কথাটা কানে গেল জয়াবতীর।" সংসারে শেষ পর্যন্ত বিধবা শাশুড়ি ও বিধবা পুত্রবধূ থেকে গেল, বিমলেন্দু অ্যাকসিডেন্টে মারা গেলে আয়ের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। সুতরাং নতুন করে বাড়ির দিকে নজর দেবার কোন অবকাশই নেই। সংসারের তিনটি সদস্যের মধ্যেও যে ভাঙন দেখা দিয়েছিল, শাশুড়ি পুত্রবধূ এক সংসারে তৃপ্ত নন। শুধু একান্নবর্তী পরিবার নয়, ছোট পরিবারেও মানিয়ে নেবার যে প্রবণতা তা নিঃশেষ হয়ে আসছিল, যেমন নিঃশেষের পথে অগ্রসর হচ্ছিল বয়সের দিনে এগিয়ে চলা অট্টালিকাগুলো।

'একরাত্রি' (১৩৫৪) গল্পেও তিনতলার একটি বাড়ির বর্ণনা রয়েছে। যেখানে অট্টালিকার অবস্থান থাকলেও নীচের তলায় গুড়ের নাগ্‌রির মতো ঠাসাঠাসি করে শুতে হয়, যদি বাড়িতে কোন আত্মীয় বেড়াতে আসে। "ছোট্ট ঘরের লাগোয়া মস্ত ছাদটার এক কোণে ইজি চেয়ার পেতে শুয়ে তারা ভরা আকাশের ..." *(পৃ. ৩৩৪, গল্প সমগ্র ২য় খণ্ড)*। — উক্তিটি থেকে বোধগম্য হয় মস্ত ছাদওয়ালা বাড়িটিও বেশ মস্তই। তথাপি এ বাড়িতে ঘরে অকুলান হয়ে থাকে — "একতলা আর দোতলা মিলিয়ে যে সংসার জগদ্দল পাথরের মতো জেঁকে বসেছে মানুষের বুকে, ..." *(পৃ. ৩৩৪, ঐ)*। একমাত্র তিনতলাতেই একটা বেওয়ারিশ ঘর মেলে, যেটায় বাড়িরই এক যুবক সদস্য অশোক

থাকে। আত্মীয়দের মধ্যে কোন দম্পতি এলে তাদের ওই ঘরেই রাত্রিবাস করতে দেওয়া হয় বোঝা যায় বাড়ির গৃহকর্ত্রীর উক্তিতে —'' তিনতলায় আজ উঠিস্‌নে তুই, 'ঘুন্টি' শোবে ও ঘরে।'' *(পৃ. ৩৩৪, ঐ)*। যে সংসার জগদ্দল পাথরের মতো অবস্থায় রয়েছে সেখানে অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান ঘটিয়ে আর বাড়ির নতুন করে সংস্কার সাধন করা হয়তো হয়ে উঠবে না। প্রতিটি দম্পতির গৃহে যেখানে রাশিকৃত সন্তান-সন্ততি রয়েছে, তাদের সংসারে ঠাঁই অকুলান হওয়াই স্বাভাবিক এবং সংসারে ভাঙ্গনও প্রায় অবশ্যম্ভাবী। বাড়িটি তিনতলা হলেও বাড়ির পরিবেশ পরিস্থিতিতে কোন আভিজাত্যের বালাই যেন নেই।

'বহুরূপী' (১৩৫৪) গল্পেও সেই অট্টালিকার অবনতির চূড়ান্ত রূপ ধরা পড়েছে। পুত্র-পুত্রবধূ নাতি-নাতনীদের নিয়ে গিরীন্দ্রমোহনের পরিপূর্ণ সংসার। যেখানে যথেষ্ট পরিমাণে জন থাকলেও ধন প্রায় নেই বললেই চলে। রোজগেরে হতে এবং পরিবারের মধ্যে শ্রী ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করছে ছোট ছেলে নিখিল, কিন্তু তার পেশা হচ্ছে অভিনয় করা। রক্ষণশীল পরিবার এই ব্যাপারটাই মেনে নিতে না পারায় পরিবারের ঐতিহ্যকে অনুভব করে নিখিল বাড়িটির দিকে ভালোভাবে তাকিয়ে। ''গিরীন্দ্রমোহনের অন্ধকার দেখার ফাঁকে চোখ তুলে একবার বাড়িখানার আপাদমস্তক দেখে নেয় নিখিল। বাড়িখানা প্রকাণ্ড সন্দেহ নেই, জমি আছে বিস্তর, কিন্তু জীর্ণতার শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছে।''

''ঠাকুর্দ্দার আমলের পর থেকে মিস্ত্রীর হাত পড়েনি।... প্রাচীন দেহে অতীত মর্যাদার কিছুটা জীর্ণ সাক্ষ্য নিয়ে মৌন মুখে দাঁড়িয়ে আছে। এতো অবহেলার প্রতিশোধ নিতে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে না যে একদিন, তাই আশ্চর্য!'' (পৃ. ২৫৫ গল্প সমগ্র ২য় খণ্ড)। অর্থাৎ ঠাকুর্দা পর্যন্ত মিস্ত্রী লাগিয়েছেন কিন্তু তারপর থেকে আয়ের পথ এতই দুর্গম হয়ে গিয়েছে যে প্রয়োজনীয় অংশ সারাইও হয় নি। শেষ পর্যন্ত বাড়ি মর্টগেজ রেখে ভাড়া দিয়ে থাকতে একদা পরিবারেও ভাঙন ধরে। আশাপূর্ণা দেবী এই দিকটাকে নানা গল্পে প্রতিকায়িত করেছেন।

আশাপূর্ণা দেবীর রচনায় শিল্পরূপের আর একটি দিক হলো **প্রবাদ প্রবচনের** ব্যবহার। তিনি নিজে একজন নারী এবং সম্পূর্ণভাবে নারীর মন নিয়েই চরিত্রগুলোকে পর্যবেক্ষণ করতেন। তাই তাঁর রচনায় স্বভাবতই পুরুষদের চেয়ে নারীরাই বেশি সপ্রতিভ। সামাজিক প্রতিবেশ অনুযায়ী নারীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, ব্যক্তিত্ব ও মানসিকতা সুপরিস্ফুট হয়ে ওঠে বাচনভঙ্গীর মধ্য দিয়ে। মনোভাব প্রকাশের মাধ্যম হল ভাষা। আশাপূর্ণা দেবীর রচনায় মধ্যবিত্ত সমাজের নারীদের কথা বেশি থাকায় ভাষার ব্যবহারও সে ধরনেরই হোত। তাঁর গল্পের নারীরা প্রায় সকলেই ছিলেন প্রথাগত শিক্ষা-দীক্ষা বর্জিত, আর তাদের বিচরণক্ষেত্র ছিল শুধুই সংসার জীবনের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ। সে কারণেই সমাজে প্রচলিত ও বহুল ব্যবহৃত ভাষাকেই তিনি চরিত্রদের ভাব প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার

করেছেন। আর যেখানে আবশ্যকভাবেই মাঝে মাঝে প্রবাদ প্রবচন রীতির ব্যবহার হোত সুযোগ্যভাবে। সংগৃহীত বাক্যগুলো যথাসম্ভব নিম্নে উল্লেখ করা হল।

প্রবাদ বাক্য	পৃষ্ঠা	গ্রন্থ	গল্প
"চোরের মন বোঁচকার দিকে"	পৃ. ১১	গল্প সমগ্র (১ম খণ্ড)	'রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা' (১৩৪৪)
"যত হাসি তত কান্না"	পৃ. ১১	"	"
"উচ্চহাসি সর্বনাশী"	পৃ. ২৭	"	'রাজুর মা' (১৩৪৪)
"কিসের সঙ্গে কি পান্তা ভাতে ঘি"	পৃ. ৪৬	"	'মেকী টাকা'
"ভগবানের মার দুনিয়ার বার"	পৃ. ৯৩	"	'জল আর আগুন' (১৩৪৪)
"জন্ম গেল ছেলে খেয়ে / আজ বলছে ডান"	পৃ. ১২৫	"	'ব্যবধান' (১৩৪৪-৪৭)
"সোনার অঙ্গে দিলে সোনা তবেই সোনা অতুলনা"	পৃ. ১৯৮	"	'বিড়ম্বনা' (১৩৪৪-৪৭)
"সর্বস্ব খুইয়ে পাকা ঢেঁকশাল"	পৃ. ২১৮	"	'মনের গহনে' (১৩৪৪-৪৭)
"বিধি যখন মাপান উপরো উপরি চাপান"	পৃ. ৩৭২	"	'কপালে নাইকো ঘি' (১৩৫০)
"কাঙালের বাড়া বেহায়া নেই"	পৃ. ৩৯১	"	'না' (১৩৫২)
"যে এল চষে সে রইল বসে"	পৃ. ৩১	গল্প সমগ্র (২য় খণ্ড)	'গলায় দড়ি' (১৩৫২)
"পদ্মফুলে ভোমরা ভোলে / খোঁপায় ভোলে বর"	পৃ. ৯৬	"	'সত্যাসত্য' (১৩৫৩)
"ধনবানে কেনে বই জ্ঞানবানে পড়ে"	পৃ. ১১৮	"	'রাহু' (১৩৫৩)
"বামুনের ভাতে আছি, বালামের দর জানি না"	পৃ. ১২৫	"	'পদ্মলতার স্বপ্ন'

প্রবাদ বাক্য	পৃষ্ঠা	গ্রন্থ	গল্প
"মরার বাড়া গাল নেই"	পৃ. ১৫৮	গল্প সমগ্র (২য় খণ্ড)	'স্বপ্নভঙ্গ' (১৩৫৩)
"আত্মা রেখে ধর্ম্ম তবে অন্য কর্ম্ম"	পৃ. ১৯১	"	'একাঙ্কিকা' (১৩৫৩)
"ষাড়ের শত্রু বাঘে মারে"	পৃ. ১৯১	"	'একাঙ্কিকা' (১৩৫৩)
"ঘরে ঘটি ঝক্‌মক্ করে, আলনায় কাপড় ঝলমল করে, গোয়ালে গরু মাইয়ে ধান, মনে সুখ মুখে পান।" (মেয়েলি ব্রতকথার কথা)	পৃ. ২০৩	"	'যথাপূর্ব্বং' (১৩৫৩)
"কার শ্রাদ্ধ কে করে / খোলা কেটে বামুন মরে"	পৃ. ৫৯	"	'লালশাড়ি' (১৩৫২)
"বাড়া ভাত বেড়ালে ডিঙাতে পারে না"	পৃ. ১৯৯	"	'আফিং' (১৩৫৩)
"কাঙালের হয়েছে ঘটি জল খেয়ে মলো বেটি।"	পৃ. ২০৮	"	'আফিং' (১৩৫৩)
"গাছে না উঠতেই এক কাঁদি"	পৃ. ৩৩৮	"	'একরাত্রি' (১৩৫৪)
"বেহায়ার নাহি লাজ নাহি অপমান, সুজনের এককথা মরণ সমান।"	পৃ. ৩৪৯	"	'বাজে খরচ' (১৩৫৪)
"এককান কাটা পথের ধার ঘেষিয়া চলিলেও দুইকান কাটা মাঝখান দিয়াই চলে"	পৃ. ৩৫০	"	'বাজে খরচ' (১৩৫৪)
"ঝাড় ঝাড় উচ্ছের ঝাড় ফল পাতা একই তার।"	পৃ. ২২৮	গল্প সমগ্র (৩য় খণ্ড)	'পাকাঘর' (১৩৫৮)
"জন্মে দিলে না ভাত-কাপড় মরলে করবে দানসাগর"	পৃ. ২৩৮	"	'স্থালন' (১৩৫৮)

প্রবাদ বাক্য	পৃষ্ঠা	গ্রন্থ	গল্প
"কলাপাতে না এগোতে গ্রন্থ লেখা সাধ"	পৃ. ৩১৩	গল্প সমগ্র (৩য় খণ্ড)	'নীলকণ্ঠ' (১৩৫৮)
"মরদকা বাত হাতীকা দাঁত"	পৃ. ৩২৫	"	'অভিনেত্রী' (১৩৫৮)
"কালের বাড়া চিকিৎসক নাই"	পৃ. ৩৬৪	"	'ভয়' (১৩৫১)
"পড়লো কথা সভার মাঝে, / যার কথা তার গায়ে বাজে!"	পৃ. ৩৪	গল্প সমগ্র (৪র্থ খণ্ড)	'পাখীর বাসা' (১৩৫৯)
"শুনলো সাড়া কি নিলো পাড়া"	পৃ. ৭০	"	'ভগবান আছেন' (১৩৬১)
"হাতি ঘোড়া গেলো তল, ব্যাঙ বলে কত জল!"	পৃ. ১৭৭	"	'যা নয় তাই' (১৩৬২)
"যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যা হয়।"	পৃ. ১৭৯	"	"
"চাঁদের ওপর চূড়ো!"	পৃ. ১৭৯	"	"
"মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা"	পৃ. ৩১২	"	'নির্ভেজাল' (১৩৬৩)
"ঘর থাকতে বাবুই ভিজে?"	পৃ. ৩১৯	"	'অন্তরালে' (১৩৬৩)
"ভাইয়ের ভাত ভাজের হাত"	পৃ. ৩৫৪	"	'ঐশ্বর্য' (১৩৫৯)
"বলা মুখ আর চলা পা"	পৃ. ২২	গল্প সমগ্র (৫ম খণ্ড)	'আগুন নিয়ে'
"যেমন দান তেমন দক্ষিণা। যেমন বিয়ে, তার তেমনি আলতা।"	পৃ. ৩৭	"	'পুরুষ সিংহ'
"ধান হলাম না আগরা হলাম কুলোর আগায় নেচে মলাম"	পৃ. ৬৯	"	'স্বপ্নশর্বরী'
"যার নাম চালভাজা তার নামই মুড়ি।"	পৃ. ১৩৪	"	'মন্টি'

প্রবাদ বাক্য	পৃষ্ঠা	গ্রন্থ	গল্প
"কটা মেজাজ চটা"	পৃ. ২০৮	গল্প সমগ্র (৫ম খণ্ড)	'নিঃসম্বল'
"আমড়া গাছে কি আর ন্যাঙড়া ফলবে?"	পৃ. ২০৬	"	'নিঃসম্বল'
"যে-ই রক্ষক সে-ই ভক্ষক"	পৃ. ২৭৬	"	'মোড়'
"স্ত্রী ভাগ্যে ধন"	পৃ. ৩৯১	"	'এক যে রাজা'
"অতি ঘরন্তি না পায় ঘর"	পৃ. ৬১	নির্বাচিত আশাপূর্ণা	'নদীর চরে'
"হাতী যখন হাবড়ে পড়ে ব্যাঙে ধরে লাথি মারে।"	পৃ. ৯৭	"	'অসতর্ক সবাই'
"চোরের সাতদিন সাধুর একদিন।"	পৃ. ৩৭	স্বনির্বাচিত শ্রেষ্ঠগল্প	'নিরাশ্রয়'
"ছেলে হাঁকে এপারে মা কাঁদে ওপারে।"	পৃ. ৮২	"	'পত্রাবরণ'
"ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো"	পৃ. ৮৭	"	'যা হয় তাই'

সমাজে সমস্ত স্তরের মানুষের মধ্যেই ভালো-মন্দের সংমিশ্রণ দৃষ্টিগোচর হয়। প্রবাদ প্রবচনের ব্যবহার সাধারণতঃ মানুষের ত্রুটি-বিচ্যুতি গুলোকেই তুলে ধরতে চায়। প্রবাদ ব্যবহারের সময় ভ্রান্তিগুলো তুলে ধরার অভিপ্রায়ে ব্যবহৃত হলেও ভ্রম সংশোধিত করে সঠিক স্থানে ফিরিয়ে আনাই আসল উদ্দেশ্য থাকে। উপরোক্ত প্রবাদগুলো ব্যবহারের সময়ও লেখিকা একই উদ্দেশ্য বজায় রেখেছেন। প্রবাদ প্রবচনের মধ্যেও যথেষ্ট পরিমাণে বৈচিত্র্য রয়েছে। যেমন-ঈশ্বরের অস্তিত্বের ওপর বিশ্বাসের ফলে নিয়তির প্রতি বা কর্মফলের প্রতি যে আস্থা জন্মায় তার কথাই বলা হয়েছে 'ভগবানের মার / দুনিয়ার বার' প্রবাদটিতে। অর্থাৎ মানুষের যুক্তি-প্রচেষ্টা যেখানে পরাভূত হয়। আবার নারীদিগের সৌন্দর্য চেতনা, রূপচর্চার সঙ্গে নিবিড় সখ্যতার নিদর্শন মেলে — 'পদ্মফুলে ভোমরা ভোলে / খোঁপায় ভোলে বর।' — যে খোঁপা আজ ব্যস্ততার যুগে সৌন্দর্যের জগত থেকে নির্বাসিত তাই-ই স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্য ব্যবহৃত হোত। কারণ তখনকার নারীদের জগত বলতেই তো ছিল অন্দরমহলের পরিধি, অভ্যস্ত জীবনের প্রবাহ আর সম্পন্ন গৃহস্থ ঘরের নারীদের প্রসাধনী সামগ্রীর দ্বারা চর্চিত করে নিজেকে পটেশ্বরী করে সজ্জিত করে রাখা। আবার সৌন্দর্য্য চেতনার

পরিমিতি বোধ থেকে জন্মায় অলংকার ব্যবহারের নৈপুণ্য। যিনি ভূষণের দ্বারা বিভূষিতা হবেন, তিনি যদি যথার্থ অর্থেই রূপবতী হন তবে তো এধরনের প্রবাদই ব্যবহৃত হতে পারে — "সোনার অঙ্গে দিলে সোনা / তবেই সোনা অতুলনা।' এ প্রবাদটি আশাপূর্ণা দেবী একটি পুরুষ চরিত্রের মুখে ব্যবহার করেছেন যিনি পেশায় স্বর্ণালঙ্কার নির্মাতা। তার মধ্যে রয়েছে সৌন্দর্য্যবোধ, যিনি জানেন সোনার হাতেই সোনার কাঁকন শোভা পায়। 'অতি ঘরনি না পায় ঘর' — অধিকমাত্রায় সংসার সম্পর্কে সচেতন যে নারী, সংসার পরিচালনায় অসম্ভব দক্ষতা যার রয়েছে হয়তো সেই বাল্যকালে বিধবা হয়ে অন্যের সংসারে আশ্রিতা হয়ে দিনাতিপাত করছে। 'নদীর চরে' গল্পের সুনীলা বালবিধবা হয়ে পিতৃগৃহেই অবস্থান করছে, তবে একাকী। আত্মীয় পরিজনের মধ্যে যখনই যার বিপদে প্রয়োজন পড়ে তখনই এই একাকিনী আত্মীয়া সুনীলার কথা মনে পড়ে। সুনীলাও জীবনে সংসারের স্বাদ পায়নি, কিন্তু সাধারণ নারীদের মতোই সংসারের সাধ মনে পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত। যখনই যে সংসারে যায়, তাকে আপন ভেবে বুকে তুলে নেয়। কিন্তু সবচেয়ে সাধ মিটিয়ে করেছে উক্ত গল্পের নীলেন্দু সুজাতার সংসার, যেখানে সুজাতা কঠিন রোগশয্যায় শায়িতা। সুনীলা যেন এই সংসারে এসে হাতে স্বর্গ পেল। সমস্ত ভার তার হাতে, কর্ত্রীর আসনে পূর্ণমাত্রায় অধিষ্ঠিতা হয়ে এতটাই নৈপুণ্যের সঙ্গে একা হাতে সব সামলাচ্ছেন দেখে সুজাতার সেবাকারিণী নার্স একথা বলেছিল।

'যে এলো চষে / সে রইল বসে' — প্রবাদটিতে সুন্দরভাবে বিবৃত করা হয়েছে তার কথা — যে পরিশ্রম করে পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত অবস্থায় গৃহে ফিরে তাকেও বসে থাকতে হয়। তার উপস্থিতি তার সমস্যাটা অন্যান্যদের দৃষ্টির অগোচরে চলে যায়। 'গলায় দড়ি' গল্পে সত্যজিৎ তিরিশ বছরে বিবাহ করেছে, সে দিল্লীতে থাকে। তার নব পরিণীতা কতদিন পিতৃগৃহে থাকবে আর কতদিন শ্বশুর গৃহে থাকবে তা নিয়ে সকলেই আলোচনায় মত্ত কিন্তু যে বিবাহ করেছে, যে স্বামী তার নিকট কখন যাবে সে বিষয়ে কোন বক্তব্য কারো না থাকায় সত্যজিতের পিসি একথা বলেছিল। 'কাঙালের হয়েছে ঘটি / জল খেয়ে ম'লো বেটি' — মানুষের জীবনে অর্থনৈতিক দুরবস্থার আঁধার কেটে যখন সুখের সূর্য উদিত হয় তখন নতুন করে সুখের বিলাস ব্যসনে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে গিয়ে অনেকেই দিক্‌ভ্রান্ত হন। সেই অবস্থা থেকেই এ ধরনের প্রবাদটির জন্ম 'কলাপাতে না এগোতে / গ্রন্থ লেখা সাধ' — লেখা শিক্ষাকালেই যদি কারো গ্রন্থ রচনা করতে উৎসাহ জাগে — সে ধরনের ব্যক্তির কথাই বলা হচ্ছে। অর্থাৎ লেখা সম্পর্কে শিক্ষালাভ আর গ্রন্থরচনা — দুটোর মধ্যে যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে, এই বোধহীনতা থেকেই প্রবাদটির জন্ম।

'নীলকণ্ঠ' গল্পে যখন কাকাকে বলেছিল মাংস, মশলা, আদা, আলু কিনে রেখে যেতে সে রান্না করবে যত্ন সহকারে। তখন তার কাকা অত্যন্ত ব্যঙ্গ মিশ্রিত সুরে ভাত সেদ্ধ করতে না পারার অভিযোগ উত্থাপন করে উপরোক্ত প্রবাদটি ব্যবহার করেছিল। 'মরদকা বাত / হাতিকা দাঁত' —

হাতির দাঁত যেমন দামী তেমনি সত্যকার ভদ্র ব্যক্তি যিনি তার কথাও তেমনই দামী, একথার তাৎপর্য বোঝাতেই উক্ত প্রবাদটি গঠিত। এভাবে আরো অনেক প্রবাদকে আশাপূর্ণা দেবী তাঁর গল্পগুলোতে সুপ্রযুক্তভাবে ব্যবহার করতে পেরেছেন। চরিত্রগুলো সপ্রতিভ এবং সুস্পষ্ট হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে এই প্রবচন রীতির সংযোজন বেশ সহায়ক হয়ে উঠেছে।

চরিত্র ঃ

সাহিত্যাঙ্গনের যে কোন শাখাতেই অর্থাৎ গল্প, উপন্যাস, নাটক প্রভৃতিতে চরিত্র একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। কারণ ঘটনা যাই হোক না কেন তা প্রকাশিত হরে চরিত্রেরই সাহায্যে; আবার ভাষা ও সংলাপের সার্থকতাও নির্ভর করে চরিত্রের বিকাশের ওপর। সুতরাং কাহিনির গঠন, রীতি, ঘাত-প্রতিঘাত, সংলাপ, ভাষা — সমস্ত কিছুকেই চরিত্র তার নিজস্ব ছন্দের তালে বহন করে নিয়ে চলে। চরিত্র মানবিক উপাদানের প্রয়োজন হিসেবেই কাহিনিতে উপবিষ্ট হয়। ছোটগল্পের পরিসর থাকে ছোট, তার মধ্যে চরিত্রের সমস্ত দিকগুলো দেখানো সম্ভব হয়ে ওঠে না। ছোটগল্পের কাহিনি একটি বৃহৎ জীবনের খণ্ডচিত্র, সেই সঙ্গে সাজুয্য রেখে চরিত্রের বিকাশ বা রূপান্তর ঘটে। লেখক বা লেখিকা তাঁর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে যে আদর্শ সঞ্চারিত করতে চান তার ধারকই হচ্ছে চরিত্র। তাই সেই আদর্শবোধ এবং চরিত্র একে অপরের সঙ্গে মিশে গিয়ে এক বিশেষ শিল্প নৈপুণ্যের বিকাশ ঘটায়।

আশাপূর্ণা দেবী যেহেতু মনেপ্রাণে অত্যন্ত ঘরোয়া এবং সামাজিক, তাই তাঁর রচনায় সমাজ একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। তিনি সমাজে গৃহের অভ্যন্তরে অন্দরমহলে যা দেখতেন তাকে মর্মে মর্মে অনুভব করতেন। আর সেই বহু দৃশ্যমান জীবনের ঘটনাগুলো থেকেই তার মনে একটা আদর্শ জন্মলাভ করে। এই দৃশ্যমান জগত থেকেই চরিত্রগুলোও স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিকাশ লাভ করে। এভাবেই চরিত্রগুলো সমাজের সঙ্গে একাঙ্গী হয়ে সজীব হয়ে উঠতো। সমাজের প্রতিটি অনুশাসনের মধ্যে চরিত্ররা ছিল বিরাজিত, আর তাই সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান একটা সুস্পষ্ট রূপ পেত। আশাপূর্ণা দেবীর ছোটগল্পে চরিত্রদের অন্তর্বয়ন দেখা যায় না। কারণ অন্তরের গভীর মর্মস্থলে ডুব দিয়ে হৃদয়ের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তন্ত্রীগুলো সন্ধান করার মতো জটিলতা বা দ্বন্দ্ব চরিত্রগুলোর মধ্যে প্রকট হয়ে ওঠে নি। নিজের অস্তিত্বকে জানবার ইচ্ছা, নিজের মনের গতিবিধি সম্পর্কে সজাগ হয়ে তার প্রতিটি কার্যকলাপ অবহিত হবার জন্য যে ব্যক্তিত্ববোধের প্রয়োজন, সে ধরনের চরিত্র লেখিকা সৃষ্টি করেন নি। তিনি নারী-পুরুষ উভয় চরিত্রের মধ্যে (বিশেষতঃ নারী) সচেতনতাবোধকে জাগ্রত করলেও তাদের সেই অনুভূতি সমাজজীবনের নানা ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত কর্মেই আবদ্ধ রয়েছে। সমাজ ব্যতিরেকে নিজেকে নিয়ে চিন্তা ভাবনার জাল বিস্তার করার কথা কোন চরিত্র কখনো ভাবে নি। তাই আশাপূর্ণা দেবীর ছোটগল্পে চরিত্রগুলো একাত্ম, অন্তর্মুখী হয়ে উঠতে পারে নি। সমাজের বৈষম্য ও

অনাচারের বিরুদ্ধে তিনি বরাবরই জেহাদ ঘোষণা করে গিয়েছেন গল্পের চরিত্রগুলোর মাধ্যমে। সেই থেকে তৈরি হয়েছে বেশ কিছু বিদ্রোহী চরিত্র। এই ধরনের প্রতিবাদে নারীরাই অগ্রবর্তিনী। এতে বোঝা যায় নারীরাও যে ন্যায়-অন্যায় অধিকারবোধ — সবকিছু সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছে। যেমন — 'শাস্তি' গল্পে 'মহামায়া', 'অনাচার' গল্পে 'সুভাষ কাকীমা', 'পৃথিবী-চিরন্তনী' গল্পে 'পান্টি', 'তাসের ঘর' গল্পে 'মমতা', 'না' গল্পে 'রাজ্যশ্রী', 'সর্পশিশু' গল্পে 'ফেলী', 'বহ্নাস্ত্র' গল্পে 'অসীমা' 'আহতফণা' গল্পে 'পাখী', 'ইজ্জত' গল্পে 'জয়ী', 'অভিনেত্রী' গল্পে 'অনুপমা', 'অঙ্গার' গল্পে 'নতুন বৌদি' প্রভৃতি আরো অনেক নারী চরিত্র। আবার কল্যাণী নারীমূর্তি যে মাতৃত্বের কোমলতায় সিক্ত, তার মধ্যেও তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে বাস্তব সত্যের কঠোর অভিঘাত সজোরে আঘাত করে তাকে কোমলে কঠোরে আত্মসম্মানবোধে এক ব্যক্তিত্বময়ী নারী চরিত্রে রূপান্তরিত করে তুলেছে। তার জ্বলন্ত নিদর্শন পাওয়া যায় 'ছিন্নমস্তা' গল্পে 'জয়াবতী' চরিত্রে। এছাড়া 'ভগবান আছেন' গল্পে 'নিভাননী' 'ঐশ্বর্য' গল্পে 'অপর্ণা' — প্রভৃতি নারীরা আশাপূর্ণার লেখনী প্রসূত এবং সকলেরই উদ্ভব সমাজ থেকেই। উচ্চ-মধ্য-নিম্নবিত্ত সমাজের সর্বত্র তিনি তাঁর লেখনীকে স্পর্শ করালেও তাঁর নিজের ব্যক্তি জীবনের প্রতিবিম্বের প্রতিফলন যে সমাজে দেখেছেন, সেই মধ্যবিত্ত সমাজের চরিত্ররাই তাঁর রচনার প্রায় সর্বাংশ বিস্তার করে রয়েছে। তিনি কিছু কিছু পুরুষ চরিত্রকেও গুরুত্ব দিয়ে রচনা করেছেন। যেমন — 'অভিশপ্ত' গল্পের 'পিণাক পানি চৌধুরী', 'পৌরুষ' গল্পে 'নিতাই', 'আয়োজন' গল্পে 'লোকনাথ', 'কসাই' গল্পে 'সমরেশ' — প্রভৃতি পুরুষ চরিত্ররাও আশাপূর্ণা দেবীর গল্পে নানাভাবে নিজেদের বিকশিত করে তুলেছে। সমাজের বুকে ঘটে যাওয়া সাধারণ ঘটনাগুলোকে তিনি অত্যন্ত সাধারণভাবে নিপাট গল্প বলার ভঙ্গীতে বলে গিয়েছেন যেসব চরিত্রগুলোর মাধ্যমে তারাও অত্যন্ত সহজ সরলভাবে বিকশিত হয়ে যেন জীবন্ত প্রতীকে মূর্ত হয়ে উঠে উঠেছে। এই চরিত্রগুলোই আশাপূর্ণা দেবীর গল্পের সার্থকতার একটি বিরাট দিক।

ভাষা ঃ

ছোটগল্পের প্রতি পাঠককুলের যে আগ্রহ রয়েছে, তার মূল আকর্ষণ শক্তি হল ভাষা। উপন্যাসে যেমন পূর্বপক্ষ উত্তরপক্ষ রয়েছে এবং রয়েছে জীবনের নানা সংঘাতময় চিত্র, ছোটগল্পে শুধুমাত্র জীবনের স্রোতের মধ্যে থেকে এক টুকরো ঘটনাই প্রধান হয়ে ওঠে। তাই এর ভাষাও হয় অনেক সুনির্বাচিত। স্বল্প পরিসরে দ্বন্দ্ব আঘাত দেখাতে হয় বলে যে কোন শব্দ দিয়েই কাজ সেরে নেওয়া যায় না। অর্থাৎ ভাষার সহজবোধ্যতা, সরলতা, মাধুর্যের স্নিগ্ধতা ও গতিবেগের মধ্যে নিহিত ছন্দ পাঠককে পাঠ্যারম্ভ থেকে পাঠের শেষ পর্যন্ত যে শ্রুতিসুখকর একটা আবেশে জড়িয়ে রাখে তাতেই ভাষা সার্থকতা লাভ করে। এক এক পরিবারের মধ্যে দেশ, কালের যে ছাপ রয়েছে তা ভাষার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। তাকেই সুস্পষ্টরূপে প্রতিকায়িত করতে কখনো কখনো আঞ্চলিক ভাষাও ব্যবহৃত

হয়। আশাপূর্ণা দেবী তাঁর রচিত গল্প গ্রন্থে সেই সহজ, সরল ভাষাগুলোই ব্যবহার করেছেন। তাঁর রচনার ভাষা আটপৌরে ভাষা। অনেকটাই মেয়েলী ভাষা। তাঁর লেখনীতে মেয়েদের কথাই মুখ্য হয়ে উঠেছে। তাদের জীবন যাপন, চলাফেরা, কথনরীতি সবটাই ভাষাভঙ্গী বা বাচনভঙ্গীর মধ্য দিয়ে ধরা পড়েছে। আশাপূর্ণা দেবীর ভাষার গতিতে যে সাবলীলতা রয়েছে তা পরিপূর্ণভাবে ঘরোয়া ছবির ক্ষেত্রে সুপ্রযুক্ত। গতিশীল স্রোতময় ভাষা অতি সহজেই মনকে গল্পের অন্তিমে প্রবাহিত করে নিয়ে যায়। আশাপূর্ণা দেবীর ভাষা অলংকৃত নয়। অন্দরমহলের নারীর ভাষাকে যে তিনি কীভাবে আয়ত্ত করে নিতে পেরেছিলেন অজস্র গল্পের নারী চরিত্রের বাচনভঙ্গীতে তা ধরা পড়েছে। যেমন, কিছু নমুনা নিম্নে উল্লিখিত হলো —

আশাপূর্ণার গল্প সমগ্রের প্রথম খণ্ডে 'যে নদী মরুপথে' গল্পে মেজগিন্নী চরিত্রের এক নারী তার 'তুতো' সম্পর্কের দেবরকে বলছে — "এ তোমার অন্যায় আশা ঠাকুরপো — কাটা ডাল কি গাছে জোড়া লাগে? মরে গেলে তো পোড়াতেও আসবে না আমাকে, নিজের অসময় পড়েছে তাই মেজবৌদির খোঁজ। মেজবৌদি ম'ল কি বাঁচলো — খায় কি উপোস দেয় — একখানা পোষ্টকার্ড ফেলে খবর নিয়েছ কখনো? যাক্ তা'র জন্যে আফশোস আমার নেই — তবে বৌ ছেলের রান্না করতে লোকের অভাব হয়েছে বলে তু'করে ডাকলেই ছুটে যাবো — এ কি আর হয়?" *(পৃ. ১৭৪)*।

"ঢের হয়েছে ছোড়দা, শাক দিয়ে আর মাছ ঢেকো না তুমি, এতখানি বয়েস হ'ল, সোনা পেতল চিনি না? ঘাস তো খাই না!" *(পৃ. ১৯৬, বিড়ম্বনা গল্প সমগ্র, প্রথম খণ্ড)*।

"আঃ মর্ মাগী চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করছে' — বামুন ঠাকুরের হেন্‌সেলে দিয়ে আসবি অত বুঝতে পারবে কেন? কেমন যে সব লম্বা নজর, ছেলে-পুলেকে আর খাইয়ে আশ মেটে না — বুঝলি খোকার মা, এ বাড়িতে মুড়ি মিছরির একদর। নে ন্যাজাখানা আরো ছোট কর দিকিন্ — " *(পৃ. ২০১, 'নিগড়' প্রথম খণ্ড)*।

"তোমার সেই বুনঝিকে বোলো ছোট মা; এ একেবারে অব্যর্থ। একটি মাস পেরুতে দেবে না — বললে না পেত্যয় করবে ছোটমা এমনি গুণ; এই শেকড়ের টুকরো নাল সুতো দে গাছের গায়ে বেঁধে দিলে জন্ম বাঁজা গাছে ফল ধরে — তা 'মনিষ্যি কোন ছার।" *(পৃ. ২২২, 'মনের গহনে' প্রথম খণ্ড)*।

"কিগো বাছা আবার ডাক পাড়ছো কেন? ছিষ্টি সংসার সেরে যাব মাত্তর ওপরে উঠেছি — কি রাজকার্যে দরকার পড়লো শুনি?" *(পৃ. ২৫৫, ঘরও পৌষমাস, ঐ)*।

'আমায় ক্ষমা করো' গল্পে নবদ্বীপ মজুমদারের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী 'নতুন গিন্নী' গ্রীষ্মকালের রৌদ্র অসহ্য বোধ করে যে উক্তি করেন তা হলো — "মরছ আগুন জ্বেলে? পুড়িয়ে মারছো পৃথিবীকে? তোমার মরণ হয় না অনামুখো? ভর দুপুরে শাপ দিই তোমায় — জ্বলে পুড়ে মরো,

জ্বলে পুড়ে মরো।" — *(পৃ. ৭০, দ্বিতীয় খণ্ড, গল্প সমগ্র)*। বর্ষার দিনে একঘেয়ে বৃষ্টির শব্দে বলতেন — "ঝাঁটা খেকো দেবতা, কেঁদে মরছেন, কোন্ যমে ধরেছে তোমায়?" *(পৃ. ৭০, ঐ)*। পুত্রবধূর নিন্দাচর্চা করার ক্ষেত্রে নারীদের ভাষার আটপৌরে ভাবটা বেশ সজীব — "মরণ যে তোমার কেন হয় না মা, এও এক মস্ত আশ্চর্য!... কানু দেখলি তো বাবা? ও পাপিষ্ঠির নরকেও ঠাঁই হবে তুই ভাবিস?... কিসের তেজে এত মটমট কর্ছেন তাই ভাবি।... রূপ তো ওই ... গুণেরও সীমে নেই। ... যেদিন থেকে ঢুকেছে — সেদিন থেকেই যেন সব উড়েপুড়ে যাচ্ছে। মা লক্ষ্মী কোন পথ দিয়ে উধাও হয়ে গেলেন দেখতে দিলে না। নইলে এ সংসারের আজ এই দুর্দশা! উনি আজ পাঁচ বছর পক্ষাঘাতে পঙ্গু, টাটকা ছেলেটার এই অবস্থা, গোয়াল ভর্তি গরুগুলো সুদ্ধু পট্‌পট্ করে মরে গেল!" *(পৃ. ১০৯, অঙ্গার দ্বিতীয় খণ্ড)*। 'বেহুঁশ' গল্পে দুটি নারী চরিত্রের মধ্যে কথোপকথন চলছে — "আচ্ছা দিদি তোমার শ্বশুর বাড়িতে কেউ নেই বুঝি?" — "নেই কি লা? বালাই ষাট! সোনার বিন্দাবন, চাঁদের হাটবাজার। আমার শ্বশুরের ছয় ব্যাটা। শুধু আমার পোড়াকপালের আগুনে একটি খসেছে।" *(পৃ. ১০০, গল্প সমগ্র দ্বিতীয় খণ্ড)*। একেবারে আটপৌরে ভাষার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। 'পাকা ঘর' গল্পেও সেই অন্দরমহলের গভীরের চিত্রখানি উজ্জ্বল — "সেই যে বলে না — চোর দায়ে ধরা পড়া — আমার এ হয়েছে তাই। খাটতে খাটতে আপনার জান্ নিক্‌লে গেল — ভাত কাপড় দিয়ে গুরুকন্যে পোষা হচ্ছে! চোখের চামড়াকে বলিহারি দিই, খাবো আর শোবো — এ কি পিরবিত্তি বুঝিনে বাবা! পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খেতে এতো মিষ্টি লাগে? আশ্চয্যি! *(পৃ. ২৩২, গল্প সমগ্র ৩য় খণ্ড)*।

'অনাচার' গল্পে সুভাষ কাকীমা সম্পর্কে পাড়ার মহিলাদের, বিশেষ করে যিনি কথক তার নিজেরই পিসি-কাকীমা-মায়ের উক্তিতে নারীদের নিরলঙ্কৃত ভাষাটা সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়। "ওগো কার ভেতরে কি থাকে, সে শুধু সময় এলেই ধরা পড়ে! সুভাষ ছোঁড়া যখন ছিলো, তখন মনে হ'তো বুঝি এমন ভালোবাসাবাসি আর জগতে নেই। তারপর — ছোঁড়া হঠাৎ চলেই বা গেলো কেন তাই বা কে বলবে? আমার মন নিচ্ছে বৌয়ের ভেতরের অন্য গুণ টের পেয়েই সুভাষ মনের ঘেন্নায় চলে গেছলো! *(পৃ. ৩৪৭, গল্প সমগ্র ৩য় খণ্ড)*— এটি সুভাষ কাকীমার প্রতি পিসিমার উক্তি।

"শোন কথা! ভারি তো পদার্থ জিনিস, দুখানা তেলেভাজা কচুরি! তার আবার না খেলো না, হ্যানো হ'ল না — আমি কি খাচ্ছি না? বৌমা আমার যখন তখনই তো খাবার করছে।" *(পৃ. ১১৬, গল্প সমগ্র ৪র্থ খণ্ড)*। 'পত্রাবরণ' গল্পের অন্যতম নারী চরিত্র পঙ্কজের মা মহামায়ার উক্তি এটি। অভাবের তাড়না যখন নগ্ন আকার নিয়ে বেরিয়ে পড়ে তখন মাতা-পিতা-সন্তানের মধ্যেও গ্লানিকর দিকটিই বেশি প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। আর তাই 'পাতাল প্রবেশ' গল্পে আত্মসম্ভ্রমযুক্ত মেয়েকে মা গালি দেয় এই বলে — "কী বললি লক্ষ্মীছাড়ি? মেয়ে হয়ে তুই বাপের মরণবাক্যি মুখে আনিস? পয়সা

আনতে পারে না বলে সে বাপই নয় কেমন? সময়-অসময়ে আপনার লোকের কাছে হাত কে না পাতে? তাতেই তোমার মাথাকাটা যায়?" *(পৃ. ১৫৯, ৪র্থ খণ্ড)*। রাগে-দুঃখে অভিমানে মা মেয়েকে কেমন আটপৌরে ভাষায় শাসন করতে পারেন তারই সুচিত্র এখানে ফুটে উঠেছে।

"ঢের হয়েছে বাবা! আর নয়, বোনপোর বাড়ি এসে খুব সুখ করে গেলাম। চেরকাল মনে থাকবে। মরণদশা না হলে কেউ বৈমাত্র বোনের বেটা বোয়ের কাছে শরীর সারতে আসে না — মরণদশা ধরেছিল আমার তাই এসেছিলাম — তা' খুব শিক্ষে হলো। এখন দয়া করে আমাকে ছেড়ে দাও বাবা, বিদেয় হলে বাঁচি।" *(পৃ. ১৯০, গল্প সমগ্র চতুর্থ খণ্ড)*। আশ্রিতা সতাতো বিধবা মাসির (মায়ের সৎ বোন) উক্তি বোনপোর প্রতি। একেবারে মনের কথাটি সহজ-সরল ভাষায় বলে ওঠা যেন। এভাবে বলে ওঠার মধ্যে কোন শিক্ষা-দীক্ষার প্রয়োজন হয় না। নিতান্তই ঘরোয়া কথাকে আটপৌরে ভাবে বর্ণনা করা। আবার '—সচিবর' গল্পে দেখা যায় সংসারের নিয়মকানুন সম্পর্কে অবহিত করে দেবার মধ্যে লেখিকার সংস্কার চেতনার দিকটি — "না ভাই, ও কাপড়ে ছেলেপুলের ঘরে ঢুকতে নেই।... বাণী, অবাণী, চট করে তোর কাকার একখানা ধুতি নিয়ে আয় দিকিন?" *(পৃ. ২৩২ ঐ)*।

শিশুদের আলোচনা প্রসঙ্গে তাদের মুখে শিশুর উপযোগী ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে — "তুমি থাই বিথ্থিরি পতা" — (তুমি ছাই বিচ্ছিরি পচা)। 'বদ্ধ পাগল' গল্পে *(পৃ. ২৭১, ঐ)*। এভাবে শিশুদেরও ভাবার মাধ্যমে জীবন্ত করে তোলা হয়েছে। 'শিশু' গল্পেও একটি শিশুর উক্তি হল — "দুষ্টু পাজী লাক্কোস দূর যা"—। (দুষ্টু পাজী রাক্ষস দূরে যা)। "দুত্তু পাজি বাঁদোল লাক্কোস"— (দুষ্ট পাজী বাঁদর রাক্ষস) *(পৃ. ৭৭, গল্প সমগ্র প্রথম পর্ব)*। শিশু সুলভ চপলতা বোঝাবার জন্যে শিশুদের মুখে ব্যাঙ্গাত্মক ছড়ারও ব্যবহার করেছেন — 'ফেল হয়ে বাড়ি যায়, / ব্যাঙ্ পুড়িয়ে ভাত খায়।' *(পৃ. ৬১, গল্প সমগ্র ৪র্থ খণ্ড)*।

বস্তিবাসীদের মধ্যে যে কলহ হয়ে থাকে সেই অবস্থায় নারী পুরুষ নির্বিশেষে যে ভাষা তাদের মুখে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, সেটাও আশাপূর্ণা দেবী সুন্দরভাবে প্রস্ফুটিত করেছেন। নারীকণ্ঠ ঃ "বলছি টাকা শুধবি কি যম এসে যখন গলায় গামছা বেঁধে নে যাবে তখন?" পুরুষ কণ্ঠ ঃ "মুখ সামলে কথা বলবি বলছি। খবরদার ওসব যম-ক্ষম বলবি না।" নারী কণ্ঠ ঃ — "কেন! মরণে এতো ভয়? চেরকাল বসুমতীর মাটি আগলে টিকে থাকবি না কি? একশোবার যম বলবো, হাজার বার যম বলবো। যম তোকে নেয়নি কেন তাই ভাবি।" — *(পৃ. ১৭৬, গল্প সমগ্র পঞ্চম খণ্ড)*। 'খবর নম্বর এক, দুই, তিন' গল্পেও রয়েছে বস্তিবাসী মায়ের মুখে পুত্রের উদ্দেশ্যে গালিগালাজ — "বলি তোর কেন মরণ হয় না রে পোড়ার মুখো? মর মর, অক্ষুণি মর! তোকে বাদামতলার ঘাটে জলসই করে এসে হরির লুঠ দিই আমি।" *(পৃ. ১৪, নির্বাচিত আশাপূর্ণা)*। মেয়েদের ক্ষেত্রে আটপৌরে অন্দরমহলের

ভাষা ব্যবহার করলেও গৃহভৃত্যদের মুখে যে ভাষা সুপ্রযুক্ত তাকেও আশাপূর্ণা দেবী অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। যেমন — নিরুপমা (১৩৫৩) গল্পে চাকর মাধোর মুখের সংলাপ — "ওই তো মাঠান তুমি পেত্যয় করছো না? এস্‌টেশন যে আসছে — কোট পেন্টুল দেখে আমি তো ভয়ে ভয়ে ছুট দেবার মতলব করছি, আমাদের বড়দাবাবু আমাকে ডাক দে বললো — 'কি রে মাধো, ভালো আছিস তো?"

"আমি বলনু — বড়দাবাবু তুমি পেলিয়ে গেলে — মাধান কেঁদে কেঁদে পড়লো। আর বলনু তোমার পোষাকটার যে কি বাহার —" *(পৃ. ১৩৪ ও ১৩৫, গল্প সমগ্র ২য় খণ্ড)*।

'অনাচার', গল্পে পঞ্চা কলুর ছোটমেয়ের মুখের বাচনভঙ্গী "হ্যাঁ দাদাবাবু, মা পেইঠে দেলো। বললে — "বুড়ো তো ম'লো, বামুন দিদি একা থাকবে? নন্দী, তুই যা আত্তিরটুকু থাকগে!" — "দাদাবাবু এবার ঘরে যাও। গাঁ ঘরের লোক তো ভালো নয়! কোথায় আনাচ কানাচ দে দেখবে, আর কুচ্ছো রটাবে। 'আত' হয়েছে তো!" — *(পৃ. ৩৫১ ও ৩৫২, গল্প সমগ্র ৩য় খণ্ড)*। 'হোমশিখা' গল্পেও রয়েছে গৃহভৃত্যদের উক্তি প্রত্যুক্তি — "মা, মিত্তিরদের বাড়ি, ডাক্তারবাবুর বাড়ি, সক্কল বাড়ি খুঁজে এলাম, কোথাও নেই দিদিমণি দাদাবাবুরা। সবাই বলছে কোথায় নাকি যতো ছেলেমেয়ে মিটিং করতে গেছে — তেনারাও গেছে হয়তো। ..." *(পৃ. ৬৪ — গল্প সমগ্র ২য় খণ্ড)*। 'যে নদী মরুপথে' গল্পে নিম্ন শ্রেণির এক নারী কণ্ঠের (ফেরিওয়ালী) উক্তি — "তা, বলি এতসব রাঁধবা কখন? দুটি বেলার তো মামলা, কাল সেঁঝের গাড়ীতে "যাত্তারা" তো — একজন মনিষ্যি খাবেই বা ক'ডা পেট নিয়ে?" *(পৃ. ১৭১, গল্প সমগ্র প্রথম খণ্ড)*। দেশ-কাল সম্পর্কে আশাপূর্ণা দেবীর যে সচেতনতাটুকু ছিল তাও ভাষার দ্বারা প্রকাশ পেয়েছে। যেমন 'উদ্বাস্তু' (১৩৫৫) গল্পে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত রিফিউজীদের মুখে সেখানকারই ভাষা বসিয়েছেন — "হালার পুত হালা ঘর ভাড়া দেওনের সাদ অইচ! দেড়শ' টাহা ভারা লওনের সাদ! মস্করা পাইচ হালা!... দেখুম কোন বিয়াকুব ভাড়া দেয়? নারায়ণ গঞ্জের ছাওয়ালরে চেন নাই বটে! হালার বাড়ি ছাড়ুম ... ভিটায় ঘুঘু চরাইয়া ছাড়ুম।" — *(পৃ. ৩১, গল্প সমগ্র ৩য় খণ্ড)*।

'দ্বন্দ্ব' (১৩৫৪) গল্পে একটি সাঁওতাল ভাষাভাষির নারী চরিত্র রয়েছে, যার মুখে ভাষার ব্যবহার অতি অল্পই দেখা যায়। কিন্তু যেটুকু রয়েছে তা সেই ভাষাতেই — 'ই-ইয়ে ... মাইজী, ... বাবু মরগেই' ... *(পৃ. ৩৭৭, গল্প সমগ্র ২য় খণ্ড)*।

আশাপূর্ণা দেবীর রচনারাজির দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখা গেল তিনি যেমন অত্যন্ত সাধারণ মানের জীবনযাত্রায় বিশ্বাসী ছিলেন, তেমনি সাধারণ মানুষের কথাই তাঁর রচনাতে তুলে ধরতেন। কারণ তিনি যে সময়ে লিখতে শুরু করেছেন তখন সমাজের মানুষেরা গৃহাভ্যন্তরের নারীদের অত্যন্ত সাধারণ মানের মানুষ ছাড়া কিছু ভাবতো না। আবার নারীরাও এই পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে

চলতে চলতে নিজেদের পৃথক কোন সত্তার অধিকারী বলে মনে করতো না। তাই যেসব নারীরা যখন কথাবার্তা বলতেন তখন তাদের মুখে একেবারে নিপাট আটপৌরে, মেয়েলী ভাষাটাই উঠে আসতো। এসব ভাষা তাদের চরিত্রকে সজীব করে তুলত এবং লেখিকাও যে কতটা আন্তরিকভাবে তাদের উপলব্ধি করতেন তা সপরিস্ফুট হয়ে উঠত। শুধু ভাষা অর্থাৎ বাক্য ও সংলাপ ব্যবহার নয়, রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ ব্যবহার রয়েছে শব্দচয়ন। আশাপূর্ণা দেবী নিজে ছিলেন অন্তঃপুরের মেয়ে, গৃহবধূ। অন্দরমহলের বাইরে কোলাহল মুখর, জনবহুল অঞ্চলের মধ্যে তাঁর পদচারণা ছিল না। তিনি যখন খ্যাতির মধ্যগগনের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন তখন বহির্জগতে তার পদক্ষেপন শুরু। সুতরাং তাঁর লেখার বিষয়বস্তু যেমন বেশিরভাগটাই অন্দরমহলের, শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও কতকটা তাই হয়েছে। সেই শব্দগুলোর নিদর্শনই এখানে তুলে ধরা হোল যতটা সম্ভব। যেমন - 'চূড়োমণি যোগ', 'এ্যালমিলিয়ামের', 'সংসারের গর্তে', 'ঠ্যাকরি', 'রাই ধরো ধরো', 'পেন্নাম', 'আস্তাকুড় ধাঙড়' (গালি) 'সোমত্ত মেয়ে', 'হরঘড়ি' (শীঘ্র), 'খুড়ো শউর', 'সংসার কন্না', 'বাইগ্রেস্থ', 'আবাণে', 'শেতল', 'সুবন্নপুরী', 'যাত্তারা', 'মনিষ্যি', 'দুয়োর', 'পব্বত', 'গিরিস্যকাল', 'কারে' পড়া' (বিপদ), 'থরহরিকম্প', 'থুপুস', 'মুখদেখানি', 'কেলাশ', 'ফেরেনড়', 'বুনঝি', 'নাথসুতো', 'ঘটকিনী', 'কড়কে', 'দারিদ্দির দশা', 'সুয্যি', 'পেরজা', 'ন্যাবণচুষ', 'দুগ্‌গো পিতিমে', 'পেসাদী', 'থল-কূল', 'হিরোন', 'ছুটিং', 'ছুডিও', 'হাচোট-পাচোট', 'কোট পেন্টুল', 'পয়লট্ট', 'অখাদ্য, অবাদ্য', 'নড়েভোলা', 'চাল বাড়ন্ত', 'পিত্যেশ', 'একগঙ্গা (প্রচুর অর্থে)', 'কাঁসি', 'বোলবোলাও', 'পেত্যয়', 'এস্‌টেশন', 'এনু', 'ছিষ্টি', 'মাঠান', 'এসিস্‌টেন্ট', 'হাওয়া গাড়ী', 'চিপটেন', 'পুঁয়ে পাওয়া', 'ছেরাদ্দ', 'ধাষ্টামো', 'মন-মজানি', 'পেইঠে', 'আত্তির', 'ফরাসড্যাঙা', 'দাঁত খিচিয়ে', 'নৈবিদ্যি', 'মুখিয়ে থাকে', 'তুক তাক্', 'গুণবশীকরণ', 'ন্যাঙড়া', 'মনটা করকর করছিল', 'নবাবী কেত্তন', 'নিষ্ঠা কাষ্ঠা', ' কেসত্তা', 'দোনা', 'খোট', 'এস্‌টোভ', 'ধাবধারা গোবিন্দপুর', 'ব্যাখ্যানা', 'একাল ষেঁড়েপনা', 'ক্ষেত্তর', 'আতান্তর', 'অবিশ্যি', 'বদ্যিবাটী', 'কেকঁড়ি', 'আড়ায়', 'ভেন্ন' 'ভাবন', 'আসপদ্‌দা', 'আদুল', 'একটিনি', 'খাল', 'পোকল্প', জরদ্‌গবো', 'নিয্যস', 'ক্ষেতি', 'মানাস (মানুষ)', 'নোভ) (লোভ)', 'হতমান্যি',

এ সমস্ত শব্দের ব্যবহার চরিত্রগুলোকে বিশেষতঃ নারী চরিত্রগুলোকে যেন চোখের সম্মুখে মূর্তিমান করে তুলেছিল। আশাপূর্ণা দেবী মনের নিভৃতে সঞ্চিত যে অসীম দরদ তার ধারায় স্নাত করিয়ে চরিত্রগুলোকে বিকশিত করে তুলতে চেয়েছেন পরিপূর্ণভাবে। তাঁর রচনারাজির সার্থকতার এটাও একটা বিশেষ দিক।

আশাপূর্ণা দেবীর মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে কাব্য চেতনা রয়েছে। তিনি নিজেও অনেক কবিতা লিখেছিলেন। অনেক গল্পে দেখা যায় নানা চরিত্রদের মুখে পরিবেশ অনুযায়ী নানা কবিতা ও সংগীতের দু'এক ছত্র দিয়েছেন। যেমন — ''প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে'' — *(নব কথামালা, পৃ.*

৩৩৩, *গল্প সমগ্র ১ম খণ্ড*)। "আমায় বাঁশীতে ডেকেছে কে, ওগো ললিতে" *(রাহু, পৃ. ১১৮, ২য় খণ্ড)*। "পবিত্র তুমি, নির্ম্মল তুমি, তুমি দেবী তুমি সতী; কুৎসিত দীন অধম পামর পঙ্কিল আমি অতি।" *(পৃ. ১১৯ ঐ)*। "ধরণীর ধূলি ধুয়ে — দেখি তারে থুয়ে থুয়ে" (সাগর শুকায়ে যায়, পৃ. ২৯০, ২য় খণ্ড) "আপনা বিস্মৃত প্রেমে বিলাইছ আপানারে / কি মধুর সুখে। / শুধু স্নেহ, শুধু সেবা, শুধু প্রাণভরা প্রীতি / ভরা আছে বুকে।" — *(পৃ. ২৯২, ঐ)*। "বৈকুণ্ঠের কণ্ঠ হ'তে হেথা কি পড়েছে খসে — / পারিজাত ফুল? / অথবা এ মর্ত্তলোকে অমৃতের নির্ঝরিণী — / বিধাতার ভুল।" — *(পৃ. ২৯৪, ঐ)*। "মাধবী রাতে এ - এ মম মন বিতানে — / মল্লিকা মঞ্জরী গুঞ্জরে — হা-য়।" *(পৃ. ৩১২, মুস্কিল আসান, ২য় খণ্ড)*। 'আমার খোকা করে গো যদি মনে — এখনি পারে উড়ে যেতে সে পারিজাতের বনে' — *(পৃ. ৩, বন্দিনী, গল্প সমগ্র ৩য় খণ্ড)*। 'তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি / শতরূপে শতবার / যুগে যুগে অনিবার। / চিরকাল ধরে —" *(পৃ. ১৬৭, আর একদিন ৪র্থ খণ্ড)*। 'কেন তুমি মূর্ত্তি হয়ে এলে, রহিলে না ধ্যান ধারণায়' *(পৃ. ২৮০, ছিন্নমস্তা, ২য় খণ্ড)*। "সদ্য এই জীবনের দলগুলি' দুহাত ভরে দিলাম হে নাথ তোমার পায়ে অঞ্জলি ..." *(পৃ. ৩৩২, একরাত্রি ২য় খণ্ড)*। "লক্ষণ হানিল বাণ মারে ঠাকুর লক্ষণ।/ বৈষ্ণব বাণেতে বীর করে নিবারণ।" *(পৃ. ২১৩, ২য় খণ্ড লড়াই)*।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রতি আশাপূর্ণা দেবীর ছিল অসীম শ্রদ্ধা। তিনি নিজে ছিলেন তাঁর অন্ধভক্ত এবং তাঁর রচনাগুলোতেও তিনি কবিগুরুর কবিতা বা সংগীতের পংক্তি নানা চরিত্রদের মুখে ব্যবহার করেছেন। এগুলো ব্যবহারের ফলে সে সমস্ত চরিত্রের মধ্যে একটা কাব্যিক ও সংগীত প্রীতির দিক ফুটে উঠেছে যা চরিত্র তথা গল্পটিকেই সার্থক প্রতিপন্ন করে তুলেছে।

আশাপূর্ণা দেবী চরিত্রোপযোগী ভাষা, শব্দ যেমন ব্যবহার করেছেন গল্পগুলোতে তেমনি তাদের মুখে পরিস্থিতি পরিবেশ অনুযায়ী কবিতা ও সংগীত ব্যবহার করে কাব্যপ্রীতিরও পরিচয় দিয়েছেন। আবার উপমা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও তিনি যথেষ্ট নিপুণতা ও সৌন্দর্য্য চেতনার পরিচয় দিয়েছেন। উপমাগুলো ব্যবহারে বেশ অভিনবত্বও রয়েছে। নিম্নে তার কিছু উদ্ধৃত করা হোল —

১। "হাসি তো নয়, জলতরঙ্গ বাজনা — নিজের কানেই যেন ঝন্ ঝন্ করিয়া বাজিয়া ওঠে।" — *(পৃ. ১৬৭, 'যে নদী মরুপথে' ১ম খণ্ড)*।

২। "ওপারে ঠিক সামনেই আকাশের মাঝখানে মাথা খাড়া করে দাঁড়িয়ে আছে একটা বাজপড়া তালগাছ বিধাতার অবিচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদের মতন।" *(পৃ. ১৬২, অভিশপ্ত, ২য় খণ্ড)*।

৩। "আজ ছায়ার ব্যবধান ঘুচে প্রখর সূর্যের নীচে এসে দাঁড়াতে হল ঊর্মিলাকে" ছায়া অর্থে স্বামী আর 'প্রখর সূর্য' অর্থে শ্বশুর) *(পৃ. ১৬৫, ঐ)*।

৪।"ওদের মোটরগাড়ির আলো পিছলানো মসৃণ দেহে পালিশের যে গাম্ভীর্য, সেই গাম্ভীর্যের পালিশ

ওদের চেহারায়।" *(পৃ. ২৬৩, সংক্রামক, গল্প সমগ্র ৪র্থ খণ্ড)*।

৫। "মৌমাছি পরিবেষ্টিত মধুচক্রের মতো, শ্যালিকা পরিবেষ্টিত বাসরের বরের মতো, বালক পরিবেষ্টিত ঘুগনিওলার মতো, আমি বিরাজ করিতেছি তাঁহাদের মাঝখানে।" *(পৃ. ২৬৭, সংক্রামক, ঐ)*।

৬। "সিমেন্টের দেওয়ালের ফাটলে অশ্বত্থ চারার উঁকি দেওয়ার মতো আমি একটা মারাত্মক কাজ করে বসলাম।" *(পৃ. ২৫৯, ভবিষ্যৎবাণী, ঐ)*।

"ওদের ওই দাম্পত্য জীবনের মধ্যে অশোকেরও একটা স্থান আছে। বিশিষ্টও নয়, অপরিহার্যও নয়, তবু আছে—"

৭। "ভাতের সঙ্গে থালার আগায় নুনের মতো, পানের সঙ্গে ডিবের কানায় চুনের মতো।" *(পৃ. ১৬৯, আর একদিন, ঐ)*।

৮। "সংসারের অনন্ত মালিন্যের ঊর্দ্ধে ফুটে থাকা শতদলের মতই অনির্বচনীয় সরমা।" *(পৃ. ৭৪, প্রলাপ, গল্প সমগ্র ৫ম খণ্ড)*।

৯। "নিটোল একটি ডাঁসা ফলের মত লাবণ্য পিছলে পড়া মুখটি" — *(পৃ. ৩৯৭, এক যে রাজা, ঐ)*।

১০। "কথা তো নয়; যেন গানের ঢেউ।" *(পৃ. ৩৯২, ঐ)*।

আশাপূর্ণা দেবী তাঁর গল্পগুলোতে সমাজের অভ্যন্তরের চিত্রগুলো এত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, যার দ্বারা কল্যাণী, অহংকারী, স্বার্থলিপ্সু, অসহায়া, সাহসী — সমস্ত রকমের নারী চরিত্র জীবন্ত রূপ নিয়ে বিকশিত হয়ে উঠেছিল। তেমনিভাবে সমাজে বিধবাদের কিভাবে দেখা হোত তাও তিনি দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। যেমন বিখ্যাত গল্প 'ছিন্নমস্তা' তে তিনি দেখিয়েছেন বিধবা জয়াবতীকে সামান্য ডাঁটা চচ্চড়ি খাওয়া নিয়ে তারই পুত্রবধূ প্রতিভা খোঁটা দিচ্ছে — "তা বলে বিধবা মাগীদের মতন গাদাগাদা চচ্চড়ি খাবার এতো সখ নেই আমার। নামিয়ে দিয়ে নষ্ট করলেন কেন, রাখলেই পারতেন নিজের জন্যে! আপনার লোভের জিনিস" — *(পৃ. ১৬৮, আশাপূর্ণা দেবীর ছোটগল্প সংকলন)*। জয়াবতীও পুত্রবধূ বিধবা হবার পর বলেন — "ভালো জিনিস খাওয়ার বরাত তো ঘুচিয়েছেন ভগবান, পোড়া বিধবার গুচ্ছির শাক-পাতা ডাল চচ্চড়ি না খেয়ে উপায় কি?"

"বিধবার পরমায়ু মাকর্ণ্ডেয় পরমায়ু, না খেলে চলবে কেন? কচু, ঘেচু শাক পাতাই খেতে হবে গুচ্ছির।" *(পৃ. ১৭০, ঐ)*। বিধবাদের খাওয়া দাওয়ার আয়োজনে থাকতে পারবে না কোন আড়ম্বর। তাদের এই আহার পর্বটাও যেন দৃশ্যমান কোন একটা দর্শনীয় জিনিস, পাড়া প্রতিবেশীর দল তা দেখতে ছুটে আসেন। "মহিলা সমাজের চিত্ত জগতে প্রতিবেশীর ঘরের সদ্য বিধবার আহার-বিহারটা তার চাইতে কিছু কম নয়, হয়তো বা বেশি ... কাজেই — প্রায়ই ঠিক আন্দাজমতো সময়ে জয়াবতীর বাড়িতে আবির্ভূতা হন কনকলতা, লাহিড়ী গিন্নী, মন্টির মা। ... " *(পৃ. ১৭১, ঐ)*।

লেখিকার সুচারুরূপে বর্ণনা আমাদের সম্মুখে যেন একেবারে ছবির মত দৃশ্যপট সহ প্রকাশিত হয়।

'সবদিক বজায় রেখে' গল্পেও বিধবাদের উদ্দেশ্যে অবহেলাকর উক্তি করা হয়েছে — "কেন? আমি কি একটা আলতু ফালতু বিধবা? যে সব সময়ে পরের নেজুড় হয়ে কোথাও যেতে হবে?" অর্থাৎ বিধবাদের অসহায়তা, পর নির্ভরশীলতার সঙ্গে স্বামী সোহাগিনী সৌভাগ্যবতীরা নিজেদের বৈসাদৃশ্য বর্ণনা করেন। আর এ থেকেই বোঝা যায় যে, বিধবারা সংসারে ভীষণভাবে গুরুত্বহীন অবাঞ্চিত। 'বেহুঁশ' গল্পেও রয়েছে বিধবাদের আচার আচরণের প্রতি কটাক্ষপাত। "অসভ্যর মতো হাসছে দেখো। বিধবা মানুষের অতো হাসি কেন? দেখলে গা জ্বলে যায়।" *(পৃ. ৯৮, গল্প সমগ্র তৃতীয় খণ্ড)*। "সত্যিই তো বিধবা মানুষের পক্ষে এরকম বাচালতা বে-আইনি বৈকি!" *(পৃ. ৯৯, ঐ)*। 'পাকা ঘর' গল্পেও রয়েছে একই প্রতিচ্ছবি — "একলা মানুষ বিধবা, তার যে আস্ত একখানা ঘরের কি দরকার বুঝিও না। এইতো — আমার শ্বশুরবাড়িতে পিসশাশুড়ি সামনেই ভাঁড়ার ঘরে থাকেন।" *(পৃ. ২৩২, তৃতীয় খণ্ড)*। বাড়ির মেয়ে চন্দনা নিজের জ্যেঠাইমাকে এবং পিসি শাশুড়িকে বিধবাদের বিলাসহীন জীবনচর্যার কথা বলেন। সংসারের ঘূর্ণচক্রে সেই চন্দনার মাকেও একদিন বিধবা বলেই জঞ্জালের মতো ভাঁড়ার ঘরে এসে আশ্রয় নিতে হয় — "চাঁপাও তো একলা বিধবা মানুষ, আস্ত একখানা ঘরে দরকার কি তার?" *(পৃ. ২৩৬, ঐ)*। "অ হাবা মেয়ে, বামনের ঘরের 'বিধবা' — তামাসার ছলেও অমন কথা মুখে আনতে নেই বাছা! মহাপাপ, মহাপাপ, কত জন্মের পাতকের ফলে এ জন্মের এই দুগ্‌গতি, আর পাপ বাড়াস্‌নে বাছা!" *(পৃ. ২১, গল্প সমগ্র প্রথম খণ্ড)*। 'রাজুর মা' গল্পের উক্ত উক্তিটি বিধবাদের জীবনযাত্রার নিয়মাবলীর দিকটাই নির্দেশ করে।

দেশাত্মবোধ ঃ

আশাপূর্ণা দেবী চিরকাল গৃহাভ্যন্তরে বসবাস করলেও এবং মধ্যবিত্তের জীবনযাত্রাকে তাঁর রচনার উপাদান হিসেবে ব্যবহার করলেও দেশ-কাল সম্পর্কে যে একেবারে অবহিত ছিলেন না তা নয়। তাঁর রচনার প্রথমার্ধের অনেকটা জুড়ে (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ; ১৯৩৯-১৯৪৫) যুদ্ধের আবহাওয়া বিরাজিত ছিল, আর সেই প্রভাবটা তাঁর গল্প সমূহে সামান্য হলেও পড়েছে। যুদ্ধ বোমা সংক্রান্ত বিষয়ের কিছু কিছু উল্লেখ রয়েছে, ঠিক যতটা মধ্যবিত্ত সমাজের অন্দরমহলে বিরাজিত চরিত্রদের মধ্যে থাকা সম্ভব। এতে অবশ্য তাদের জীবনযাত্রার খুব একটা কিছু পরিবর্তন হয়নি। কিছু উক্তির সাহায্যে এই দিকটা দেখানো হল —

"যে দুরন্ত বোমাতঙ্কে ভারত যুদ্ধ লোক জলাতঙ্ক রোগীর মত ক্ষেপিয়া ছুটাছুটি করিতেছে, সেই অনাগত বোমায় অসঙ্গত বিলম্বই সরসীবালার অসন্তোষের কারণ।" *(পৃ. ২৫৫, গল্প সমগ্র ১ম খণ্ড)* 'কারও পৌষমাস' (১৩৪৮ সন)। "পোড়ার মুখো জাপানী আমার মাথায় একটা বোমা কবে ফেলবে রে" — *(পৃ. ঐ — ঐ — ঐ)*। "সবাই বলছে — 'চলে যাও চলে যাও — পালাও পালাও'

— আরে বাবু ছেলেরা পড়ে থাকবে বোমার মুখে — কর্তার নড়বার জো নেই — সরকারের চাকর, তিনি থাকবেন। আমার প্রাণটাই বড় হ'ল?" *(পৃ. ২৪৯ — ঐ — ঐ)*। "তোমার গুজব আফিসের খবর বল। টোকিও রেডিও কি বলছে? 'আজাদ' স্টেশন কি বলছে?" (পৃ. ৩৬৭ ১ম খণ্ড — গল্প — 'ছুটির একবেলা' (১৩৫০ সন)। "পৃথিবীতে বাধলো লড়াই, বাজারে লাগলো আগুন, সেও বোধকরি আমার অপরাধ।" (পৃ. ১১৩, গল্প সমগ্র ২য় খণ্ড, গল্প 'অঙ্গার' (১৩৫৩ সন)। "রোসো মা, যুদ্ধের হাওয়ায় তুমিও মিলিটারী হয়ে উঠো না।" (পৃ. ৪৭ ২য় খণ্ড, কার্য-কারণ (১৩৫২ সন)। "সন্দেহ করিবারও কিছু নাই, এটা যে যুদ্ধের বাজার! এ যুগের অভিধানে অসম্ভব বলিয়া কোন শব্দ নাই, সবই সম্ভব।... এ যুদ্ধের ঝোড়ো হাওয়ায় অনেকের কপালেরই পাতার আবরণটুকু উড়িয়া গিয়াছে যে!" (পৃ. ১২৩ — ঐ — পদ্মলতার স্বপ্ন (১৩৫৩ সন)। "বোমাকেও আপনি হজুগ বলে উড়িয়ে দিতে চান? যে বোমায় এক মিনিটে একটা দেশ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে!" (পৃ. ২৮ গল্প সমগ্র ৩য় খণ্ড, উদ্বাস্তু ১৯৪৯ সন) "অথচ আমাদের এদিকে — বোমার গন্ধও ছিল না। এইতো আমরা রইলাম — কি হল?" *(পৃ. ঐ — ঐ — ঐ)*। "দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রলয় মেঘ তখন পৃথিবীর কোন ঈশানকোণে সঞ্চিত হইতেছিল কে জানে, আমরা তার ছন্দাংশও জানিতাম না। পরম শান্তিতেই ছিলাম।" (পৃ. ৮২ ঐ সিঁড়ি ১৩৫৫ সন)। "বোমাতঙ্কহীন নিরাপদ একটি আশ্রয়ের সন্ধানে যখন জলাতঙ্ক রোগীর মত ছুটোছুটি করিতেছি ...।" *(পৃ. ৮৪ ঐ, ঐ)*। "সে যাক্ যুদ্ধের হুজুগে দেশটার কপাল ফিরল দেখছি। সুশীল সেনের বাড়ির কথা বলছিলাম না সেদিন? আজ দেখি উপেন রায়ের বাড়িও মিস্ত্রি লেগেছে আজকালের মধ্যে আসবে মেয়েরা।" (পৃ. ২৩৭, গল্প সমগ্র ১ম খণ্ড, ধুলি ধূসর)। "রাঁচী নয় — করাচী তা'হলে।... খুব নাকি বিপদের জায়গা, বোমা পড়ে তো — ওখানেই আগে পড়বে।" *(পৃ. ঐ, ঐ, ঐ)*।

আশাপূর্ণা দেবীর ছিল ভীষণ কোলকাতা প্রীতি। তিনি এই শহরকে মনেপ্রাণে ভালোবাসতেন। যেখানেই যেতেন না কেন এখানেই ফিরে আসার জন্য বড্ড আন্তরিক টান অনুভব করতেন, এই মনোভাবের ছাপ পড়েছে তাঁর রচিত গল্পেও। যেমন — "সোনার শহর কলিকাতা — আজব শহর কলিকাতা, ইন্দ্রভূষণ কলিকাতা, মর্তে অমরাবতী কলিকাতা — তাহার আজ কি হাল! কলিকাতাবাসী আজ সব থাকিয়াও সর্বহারা।" *(পৃ. ২৬৩, গল্প সমগ্র ১ম খণ্ড, 'কারও পৌষমাস')* — কোলকাতার প্রতি এই প্রীতি থেকেই তিনি নগরকেন্দ্রিক সাহিত্য রচনা করেছেন। তাঁর রচনায় গ্রামগঞ্জের বাড়িঘর পরিবারের কথা থাকলেও গ্রামের পরিবেশ বর্ণনার কথা বলা নেই। তিনি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নগর সভ্যতার পটভূমিকায় কাহিনি গ্রথিত করেছেন। পরিবেশের বর্ণনার চাইতে চরিত্র এবং কাহিনিই মুখ্য হয়ে উঠেছে।

আশাপূর্ণা দেবী সাহিত্য সৃষ্টি করতে গিয়ে শিল্পরূপের জন্য কখনোই ভাবিত ছিলেন না।

কখনোই তাঁর মনে হয়নি, যা বলতে চেয়েছেন নিজের মতো করে তা না বলে আঙ্গিক, গঠন কৌশলের দিকে আগে দৃক্‌পাত করা প্রয়োজন। যেমন মনে হয় নি বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনা করতে গিয়ে বিদেশি সাহিত্য পাঠের আবশ্যকতা রয়েছে। তিনি মনে করতেন জীবনে যা ঘটে জীবনধর্মী সাহিত্যে তার সবটাই আসতে পারে। আর এ বোধটাকেই ঠাঁই দিয়েছেন প্লটে। তিনি ভাষার ক্ষেত্রে শালীনতাকে পছন্দ করতেন। সুচিন্তিত, সুনির্বাচিত, প্রয়োজনানুযায়ী শব্দচয়নও তিনি তাঁর রচনায় করে গিয়েছেন। চরিত্রের ক্ষেত্রে তিনি তো বলেই থাকেন যে, ঘটনা প্রধান নয়, আবেগ প্রধান নয়, চরিত্র প্রধান গল্পই তিনি প্রকৃতপক্ষে লিখে থাকেন। সমাজের প্রতিই তাঁর দৃষ্টি সমগ্রটাই নিবদ্ধ ছিল বলে সমাজে সংসারে অবহেলিত নারীদের নানান সমস্যা, নারীত্ব-ব্যক্তিত্ব-মর্যাদাবোধে জাগ্রত নারীর কথা, আবার সংসার-যূপকাষ্ঠে বলি দেওয়া নারীর কথা সবই স্বচ্ছ সাবলীল প্রাঞ্জল ভাষায় তুলে ধরেছেন। কাহিনি তৈরিতে কোন জটিল প্লট নির্মাণ নয়, সরল একমুখী ঘটনা বিন্যাসেই বাস্তব সত্যকে, যা নিজ চোখে দেখা, তাই গল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন।

পঞ্চম অধ্যায়

সমকালীন ছোটগল্পকার ও আশাপূর্ণা দেবীর স্বাতন্ত্র্য

পঞ্চম অধ্যায়

সমকালীন ছোটগল্পকার ও আশাপূর্ণা দেবীর স্বাতন্ত্র্য

আশাপূর্ণা দেবীর দীর্ঘকালের সাহিত্যিক জীবনে তাঁর সমকালীন লেখকবৃন্দ যাঁরা ছিলেন, তাঁরা হলেন — সুবোধ ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সন্তোষ কুমার ঘোষ, নবেন্দু ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সমরেশ বসু, বিমল কর, মহাশ্বেতা দেবী প্রমুখ। এঁরা সকলেই প্রায় একই সময়ে খ্যাতির মধ্য গগনে বিরাজ করেছিলেন। কল্লোল যুগের পরে পঞ্চাশের দশকের প্রথমাবধি ছোটগল্পের বলিষ্ঠ পদচারণা থাকলেও ধীরে ধীরে তা স্তিমিত হয়ে আসে। প্রবীণ লেখকেরা যেন এই পর্বে এসে এক মানসিক প্রশান্তি অনুভব করেছেন। লেখনীর ক্ষুরধার কমে গিয়ে আধ্যাত্মিক বাতাবরণে যেন আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। তখনই নতুন পথ জিজ্ঞাসা নিয়ে, নানা দিকের মনোবীক্ষণ নিয়ে আবির্ভূত হলেন কিছু লেখক-লেখিকাবৃন্দ। পত্র-পত্রিকার সংখ্যাধিক্যে অনেক সাহিত্যিকের লেখনী সম্প্রসারিত হবার সুযোগ পেল। স্বাধীনতার পূর্বে সমাজ ও জীবনের নানা সমস্যার জন্য দায়ী ছিল ইংরেজ সরকার কিন্তু স্বাধীনতার পরে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবার পরেও যখন সমস্যা টিকে রইল তখনই মধ্যবিত্ত মানসিকতার বিচিত্র প্রবৃত্তি সমাজ জীবনে নানাভাবে প্রতিফলিত হতে শুরু করল। জীবনযাত্রার জন্য ন্যূনতম মৌলিক চাহিদাগুলোর অভাব পূরণের জন্য সংগ্রাম শুরু হওয়ায় সৃষ্টির উন্মাদনা যেন মানুষের অন্তর থেকে অপসৃত হয়ে গেল। এই রকম পরিস্থিতিতে উপরোক্ত লেখকদের আবির্ভাব ঘটল। সমাজের নানা সমস্যাগুলো এবং তার সঙ্গে মানুষের চিত্তলোকের নানা দিকগুলোও প্রস্ফুটিত হয়ে উঠতে লাগল।

সমাজ সংসার যখন প্রচণ্ড অস্থিরতা ও যান্ত্রিক অগ্রগতি নিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল বাংলা সাহিত্যের প্রাঙ্গণে তখনই আবির্ভাব ঘটে বিচিত্র অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও ক্ষুরধার দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন এক বলিষ্ঠ লেখকের। তিনি হলেন **'সুবোধ ঘোষ'** (১৯০৯-১৯৮০)। সার্কাসের আসর, ছোটনাগপুরের বন, ওয়াজিরিস্তানের পথ পরিক্রমা, সাংবাদিকতা, প্রাইভেট টিউশনি প্রভৃতি কর্মজীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও বহুল স্থান পরিদর্শনের সুযোগ তাঁর জীবনকে সমৃদ্ধ করেছে। একথা তিনি নিজমুখেই বিবৃত করেছেন — "লেখক হবার আগে জীবনের আলো ছায়া ও অন্ধকারের অনেক রূপ ও অনেক ঘটনা দেখার অভিজ্ঞতা আমারও ছিল। শ্মশানের ভয়ানক ধোঁয়ার কুজ্ঝটিকা ও শালবনের মাথার উপর পূর্ণ চাঁদের জ্যোৎস্না বিস্তার, দুইই দেখবার অভিজ্ঞতা।" ... *('সেদিনের আলোছায়া' — সুনির্বাচিত; বাংলায়*

গল্প ও ছোটগল্প, ড: সরোজ মোহন মিত্র, পৃ. ২৪২)। লেখক মাত্রেই শিল্পী, আর শিল্পীরা অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির জগতের সার্থক উত্তরাধিকারী। সমাজের শ্রেণি দ্বন্দ্ব, মধ্যবিত্ত সমাজের অভ্যন্তরস্থ সংকটাপন্ন অবস্থা, শ্রমিক শ্রেণির শোষণের যন্ত্রণাকে সুবোধ ঘোষ সুন্দর ও সার্থকভাবে গল্পের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। তাঁর রচিত কিছু গল্পগ্রন্থ — 'ফসিল' (১৯৪০), 'গ্রামযমুনা' (১৯৪৪), 'শ্রেষ্ঠগল্প' (১৯৫৭), 'নিতসিন্দুর' (১৯৫৮), 'জতুগৃহ' (১৯৬২), 'নিকষিত হেম' (১৯৬৩), 'রূপনগর' (১৯৬৪) ইত্যাদি। সুবোধ ঘোষের বাংলা গল্প সাহিত্যের প্রাঙ্গণে প্রথম পদক্ষেপ হল 'অযান্ত্রিক' (১৯৪০) গল্পের মাধ্যমে।

সুবোধ ঘোষ তাঁর গল্পের বিষয়বস্তু নির্বাচনে অভিনবত্বের দাবী করতে পারেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে বাঙালীর সমাজ ও জীবনের মূল্যবোধ, বিশ্বাস — সমস্তই তার দৃঢ়তা হারিয়ে ফেলে; আর এখান থেকেই স্বতন্ত্র এক ধারা বের করে নিয়ে গল্পে নতুনত্বের স্রোত প্রবাহিত করে দেন মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুবোধ ঘোষ। ১৯৪০ সালে 'অযান্ত্রিক' ও 'ফসিল' গল্প এই ধারার মাধ্যমেই তাঁকে স্বতন্ত্রতা এনে দিল। অযান্ত্রিকের নায়ক একজন ট্যাক্সি চালক। বহুদিনের পুরাতন, জীর্ণ এক মোটর গাড়িকেই প্রাণপ্রিয়াতুল্য করে ভালোবাসা — মানুষ ও যানবাহনের এই কোমল সম্পর্ক অভিনব এক বাতাবরণের সৃষ্টি করল। পুরানো এই গাড়ি সম্পর্কে যাত্রী বা অন্য কারো অবহেলা, কটূক্তি, কখনোই বরদাস্ত করতে পারত না অথচ একদিন ক্ষমাহীন এক প্রচণ্ড বিরাগ থেকে প্রিয় এই যানটিকে ওজন দরে লোহার ব্যবসায়ীর কাছে সে বিক্রি করে দিয়েছে। অদ্ভুত রসের এক গল্প লেখক পাঠকবর্গকে উপহার দেন। কিন্তু তাঁর সমস্ত প্রতিভা সার্থকরূপে প্রতিভাত হয়ে ওঠে দ্বিতীয় গল্প 'ফসিল' এর মধ্য দিয়ে। শোষণতান্ত্রিক সামন্তপ্রথা ও ধনতন্ত্রের মূলমন্ত্র যে অমানবিক নিষ্পেষণ — এদের যৌথ নির্যাতনে পীড়িত শ্রমিক শ্রেণির মানুষের জীবনের এক বাস্তব দলিল হয়ে উঠেছে এই 'ফসিল' গল্পটি। মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্র এবং ধনতন্ত্রের যে বিরোধ দেখা দেয় এই গল্পে — তাতে সমাজের একটি বিশেষ শ্রেণির অভ্যন্তরীণ চিত্র নগ্নরূপে যেন প্রকাশিত হয়ে পড়ে। সামন্ততন্ত্রের প্রতিভূ হচ্ছে বাংলাদেশের নেটিভ স্টেট অঞ্জনগড়ের মহারাজা। আর ধনতন্ত্রের প্রতিনিধি হচ্ছে মাইনিং সিন্ডিকেটের সাহেবরা। ওপর স্তরে এদের বিরোধ থাকলেও অভ্যন্তরে এরাই গোপনে চক্রান্ত করে সংগ্রামী শ্রমিকদের বিরুদ্ধে। যে সমস্ত কুর্মী প্রজারা দিনের পর দিন অনাহারে-অর্দ্ধাহারে, শোষণ-পীড়ন মাথা পেতে সহ্য করে যেত, তারাই আজ লোভে পড়ে কুলিতে রূপান্তরিত হল। কিন্তু তাদের নেতা দুলাল মাহাতো যখনই আবির্ভূত হল এবং শ্রমিকদের ন্যায্য দাবী-দাওয়া নিয়ে আওয়াজ তুলল তখনই সরগরম হল খনি অঞ্চল। অঞ্জনগড়ের কৃষিক্ষেত্র ধ্বংস হয়ে যাওয়া মরুভূমিতে যে মুখার্জী সাহেব এসে শিল্পের ও অগ্রগতির জোয়ার বইয়ে দিলেন, তারই বুদ্ধিতে আবার শিল্পকে রক্ষা করার জন্য দুলাল মাহাতোকে বন্দী করা হল। এই আনন্দে সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্রের ঘটল মিলন এবং

এই গোপন সন্ধিকে রঞ্জিত করতে রক্ত দিতে হল সেই দুলাল মাহাতোকেই; যদিও সেটাও গোপনেই। সংঘাতের ফলে ফৌজদারের গুলিতে মারা গেল অনেক কুর্মী কুলি। তাদের দেহগুলো সব ক্ষুধার্ত খনির গহ্বরে প্রবিষ্ট হয়ে গেল, যা নাকি ভবিষ্যতে শুধু 'ফসিল' হয়ে ধরা পড়বে প্রত্নতাত্ত্বিকদের হাতে কিন্তু সেখানে থাকবে না আজকের কোন রক্তের দাগ। গল্পটি প্রকৃতপক্ষে লেখকের সাম্যবাদী আদর্শের উজ্জ্বল নিদর্শন। এই নামের মধ্য দিয়ে লেখক মানব সভ্যতায় এক কলঙ্কিত ইতিহাসকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। কিন্তু গল্পটির সমাপ্তিতে রয়েছে অসামান্য শিল্পনৈপুণ্য। আর ভূতত্ত্বের সম্পর্কে প্রায় স্বচ্ছ একটা ধারণা।

আমাদের সমাজে দোলাচলতাময় চিত্ত নিয়ে বসবাস করে থাকে মধ্যবিত্ত সমাজ। এই গোষ্ঠিভুক্ত মানুষেরা দোষে-গুণে-হিংসা-ঈর্ষা, জিঘাংসা, আত্মপ্রতারণা ও ভণ্ডামিতে পরিপূর্ণ। তারা প্রয়োজনে সুবিধে মত দল বদল, মত বদল, অন্যায়ের হাতে ধরে চলাতেও সায় দিয়ে থাকেন। কিন্তু সুবোধ ঘোষ এই দ্বিধাদীর্ণ মধ্যবিত্ত মানসিকতাসম্পন্ন মানুষগুলোকে তার লেখনীর আঘাতে বিদীর্ণ করে ফেলেন। 'ফসিল' ছাড়াও 'সুন্দরম', 'গোত্রান্তর' ও 'গরল অমিয় ভেল' গল্পে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

মধ্যবিত্ত চিত্তের দৃঢ়তাহীন মনোভাব ধরা পড়েছে 'গোত্রান্তর' গল্পেও। সঞ্জয় এম. এ. পাশ করে চার বছরের নিদারুণ বেকারত্বের জ্বালার অবসান ঘটাল এক সুগার মিলে ত্রিশ টাকা বেতনের ক্যাশ মুন্সীর চাকরি গ্রহণ করে। কিন্তু 'ডি-ক্লাসড' লোকেদের নিয়ে কাজ করতে করতে সে নিজেও সেই শ্রেণিভুক্ত বলে ভাবতে চাইল নিজেকে। এছাড়াও রয়েছে ভর্তৃহীনা নারীদের মনোগত বেদনার কথা নিয়ে 'পরশুরামের কুঠার' ও 'বারবধূ' গল্পগুলো। 'তিন অধ্যায়' গল্পটিও সমাজ সচেতনতার ক্ষেত্রে সার্থক নাম। 'কালাগুরু' আর 'শিবালয়' — গল্পদুটোতে তিনি সার্থক করে তুলেছেন আগস্ট আন্দোলনের মতো মহৎ সংগ্রামকে। আবার আকালের দিনে ভয়ানক লাঞ্ছনা, বঞ্চনার শিকার হয়ে অন্ন বস্ত্রের নিদারুণ সংকটের মধ্যে দিনাতিপাত করার কাহিনিকে নিয়ে গড়ে উঠেছে 'তমসাবৃতা' গল্পটি। 'তিন অধ্যায়', 'স্বর্গ হতে বিদায়', 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ', 'স্বমহিমচ্ছায়া', 'হৃদ্‌ঘনশ্যাম', 'গ্লানিহর', 'স্নানযাত্রা', 'কৌন্তেয়' প্রভৃতি গল্পেও মধ্যবিত্তের চিত্তমুকুরে যে আত্মপ্রতারণার চিত্র কিভাবে বিকশিত হয়ে উঠেছে তা সুস্পষ্টরূপে প্রতীকায়িত। আবার প্রেমের গল্পের মধ্যেও তিনি চরিত্রদের অন্তরের অলিন্দে অলিন্দে নিঃশব্দ পদচারণা করে অনেক অর্ধ কুসুমিত বা কুসুমিত গোলাপ, বুনোফুল আহরণ করে এনেছেন। যেমন 'জতুগৃহ' প্রেমের গল্প হলেও শতদল ও মাধুরীর সুমধুর দাম্পত্য সম্পর্ক নষ্ট হয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে যায়। দীর্ঘকাল পর রাজপুরের রেলজংশনের ওয়েটিং রুমে দেখা হলেও নিরুত্তাপ প্রেমই তাদের মধ্যে বজায় থাকে শুধু। 'চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ' গল্পে তিনি দেখিয়েছেন স্বাধীন ভারতবর্ষে সমান অধিকার নিয়ে স্বাধীনভাবে আজও যে আদিবাসীরা

সম্মানের সঙ্গে বাঁচতে পারে না সেই অপমানিত জীবনের চিত্রায়ণ।

সমাজের নানাদিকের নানা ক্ষতই সাংবাদিক সুবোধ ঘোষের গোচরীভূত হত। পরে তাকে নিজের অনুভূতির দ্বারা বিচিত্রভাবে উপলব্ধি করেছেন এবং সেগুলো অবলম্বন করে গল্পে রূপায়িত করেছেন। তাঁর রচনায় নায়কের ভূমিকায় তাই রয়েছে মোটরগাড়ি চালক, আদিবাসী খ্রীষ্টান কিশোর, বাহ্যিক আদর্শের আবেষ্টনে আবৃত প্রতারক মধ্যবিত্ত শিক্ষিত যুবক, ফাঁসির আসামী ও সমাজসেবক যে অন্যের সন্তান গর্ভে ধারণ করা সত্ত্বেও প্রিয়ার আসন অটুট থাকে (শুক্লাভিসার), আবার মধ্যবিত্ত নারী লোভীদের চিত্রও রয়েছে।

মধ্যবিত্ত দুর্বল চিত্তের গল্প আরো রয়েছে 'নির্বন্ধ' গল্পে বিভূতি দারোগা ও 'কাঞ্চন সংসর্গাৎ' গল্পে কান্তিকুমারের মধ্যেও। সুবোধ ঘোষের তাঁর ছোটগল্পের বিষয়বস্তুকে সমাজের আপামর জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু আশাপূর্ণা দেবী নিজেও চারদেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থাকতেন, বিষয়বস্তুকেও সেই সংসার আবর্ত থেকেই তুলে আনতেন।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী (জন্মঃ ১৯১২, মৃত্যুঃ ১৯৮২) বাংলা সাহিত্যের জগতে এক নিপুণ শিল্পী। তিনি যে সময়ে গল্প রচনা করেন সেই চল্লিশের দশকে আমাদের সমাজে নানা ঘটনার ঘনঘটা, টানাপোড়েন দেখা গিয়েছিল এবং স্বভাবতই সেসব লেখক শিল্পীমনকেও স্পর্শ করেছে। তার প্রমাণ আমরা পূর্বোক্ত লেখকদের মধ্যে দেখতে পাই। কিন্তু রাজনীতি প্রভাবিত সমাজ, শোষিত কলুষিত সমাজ সম্পর্কে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ছিলেন একেবারে উদাসীন। তিনি ছিলেন আত্মসচেতন, মনন ঋদ্ধ এক জীবনশিল্পী। বহির্জগতের নানাবিধ সমস্যা ও কার্যাবলী সাধারণতঃ সাহিত্যিকদের চিন্তা-চেতনাকে আলোড়িত করে থাকে, কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর উত্তরণ ঘটে বাস্তব জগতের এ সমস্ত বোধকে ছাড়িয়ে অন্তর্গহনে। তিনি অন্তর্লোকে নিবিষ্টচিত্ত হয়েই মানুষের জীবনের জটিল দিককে শিল্পে রূপায়িত করেছেন। তাঁর গল্পে সাধারণতঃ প্লট বলে কিছু থাকত না এবং গল্পের বক্তব্যও অনেকটাই গৌণ ছিল। কিন্তু তিনি বাস্তবজগত থেকেই গল্পের চরিত্রদের সংগ্রহ করতেন এবং নিজের নিরাসক্ত জীবনদৃষ্টির আলোয় তাদের আলোকিত করে উপস্থাপিত করতেন। তাঁর অন্তর্লোকের জীবনদৃষ্টি ছিল প্রকৃতি প্রেম।

প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসার প্রগাঢ়তা জ্যোতিরিন্দ্রর নন্দীর বাল্যকাল থেকেই দেখা গিয়েছিল। প্রকৃতির সান্নিধ্যে এসে বিমুগ্ধচিত্তে তাদের রূপসুধা পান করতেন। কৈশোরকালে পুকুরঘাটে সৌন্দর্য, আকাশের নির্মল বিশালতা গাছপালা পাখীর অপার সৌন্দর্য, প্রাণভরে উপভোগ করতেন। অন্য শিশুরা যখন খেলে বেড়াচ্ছে হৈ চৈ করে, তিনি তখন নিঃশব্দে প্রকৃতির সঙ্গে অন্তর্মগ্ন হয়ে যেতেন। তিনি বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলায় জন্মান। যেখানে নদী-নালা-খাল-বিল প্রচুর রয়েছে। তিতাস নদীর বুকে যখন ভাদ্র মাসের নৌকা দৌড় প্রতিযোগিতা হত, যখন দেবী দুর্গার ভাসান হত আশ্বিন মাসে

— তখন অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে এলেও তিনি কিন্তু আনন্দ হুল্লোড় থেকে মনকে সরিয়ে নিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের কার্যকলাপের যে মেলবন্ধন ঘটছে এবং তা থেকে যে অপরূপ রূপরাশি ফুটে উঠেছে তার অনুভবে আত্মমগ্ন হয়ে যেতেন। প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতায় তাঁকে সাহায্য করত এই অতিমাত্রায় ঘ্রাণ সচেতনতা।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী লেখার জন্য অনেক পত্র-পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। যেমন — নবশক্তি, দেশ, যুগান্তর, আনন্দবাজার, পরিচয়, পূর্বাশা, চতুরঙ্গ প্রভৃতি, এমনকি বাংলাদেশের ঢাকা থেকে প্রকাশিত সোনার বাংলা ও বাংলাবাণী পত্রিকায় তাঁর ছোটগল্পগুলো প্রকাশিত হত। তাঁর রচিত গল্পগুলো হল — 'গিরগিটি', 'নদী ও নারী', 'চোর', 'সমুদ্র', 'বনের রাজা', 'সোনার চাঁদ', 'পাশের ফ্ল্যাটের মেয়েটা', 'আলোর পাখি', 'শালি কি চড়ুই', 'বুটকি-ছুটকি', 'তারিণীর বাড়িবদল', 'ট্যাক্সিওয়ালা', 'মাছের দাম', 'ঘরণী', 'পালিশ', 'চশমখোর' প্রভৃতি।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী তাঁর প্রকৃতি প্রেমকে সৌন্দর্যবাদের মধ্য দিয়ে বিকশিত করে তুলেছেন। আর এই সৌন্দর্য চেতনার মধ্য দিয়ে অন্তর্লোকের উন্মোচন ঘটিয়েছেন। এর নিদর্শন পাওয়া যায় চোর, গিরগিটি, নদী ও নারী, সমুদ্র প্রভৃতি গল্পে। 'চোর' গল্পটি উত্তম পুরুষে বর্ণিত এবং কথক হচ্ছে মিন্টু নামের একটি কিশোর। মিন্টু একটি বাচ্চা চাকর মদন ও একটি পেঁপে গাছ— এরাই হচ্ছে মুখ্য চরিত্র। প্রকৃতির দর্পণে নিজেকেও যেন মিন্টু দেখতে পায় আর এভাবেই অন্তর্লোকের জটিলতা উন্মোচিত হয়ে পড়ে ও মিন্টুকে তার আত্মমর্যাদাবোধে উপনীত করে। মিন্টু আর কোনদিনও সুকুমারের বাড়ি যায়নি।

সৌন্দর্য পিয়াসী জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী লিখেছেন 'নদী ও নারী' গল্পটি। প্রকৃতির সঙ্গে সাদৃশ্য বজায় রেখে তিনি নারীর রূপ বর্ণনা করতেন। কুয়োতলার নির্জনতায় মায়ার স্নানের সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য প্রকৃতি যেন গাছপালা, পোকা-মাকড়, পাখীদের নিয়ে সদলবলে উপস্থিত হয় সেখানে। প্রকৃতির সৌন্দর্য চেতনা ও জীবনবোধ মিলেমিশে একীভূত হয়ে যায় এখানে।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী প্রকৃতির সঙ্গে নারীর রূপকে মিলিয়ে নিয়ে সৌন্দর্য চেতনায় উচ্ছলিত পাত্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন। আর তাই প্রকৃতিও যেমন লালসার শিকার নয়, তাঁর গল্পে নারীরাও ভোগের সামগ্রী নয়। এই চেতনার প্রকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় 'গিরগিটি' গল্পে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর এই প্রকৃতি মণ্ডিত প্রেমের স্নিগ্ধ মধুর রূপ বর্ণনা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা মনে করিয়ে দিলেও একটা জায়গায় তাদের পার্থক্য থেকেই যায়। বিভূতিভূষণের প্রকৃতি তন্ময়তায় উদার বিস্তৃত পল্লী প্রকৃতির দিগন্তজোড়া ব্যাপ্তি ছিল, কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ক্ষেত্রে তা ছিল না। সেখানে বিশালতা নিয়ে পল্লী প্রকৃতি আসে নি, আধুনিক শহরের উপকণ্ঠে অনাভিজাত জনজীবনের সান্নিধ্যে যে ঝোপ-ঝাড়, কুয়োতলা, পুকুরঘাট, বাড়িতে তৈরি বা গজিয়ে ওঠা কিছু গাছপালা, পোকা-মাকড়

— তাদের রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। আর এগুলোতেই জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর দ্রষ্টা চক্ষুর তন্ময়তা জীবন্ত হয়ে উঠত।

'সমুদ্র' গল্পও প্রকৃতির বর্ণনা দিয়েই শেষ হয়েছে। কাহিনি প্রায় নেই বললেই চলে, মামা নামে ব্যক্তিটির মধ্য দিয়ে একটা নিষ্ঠুর ভয়ংকরতার ছবি ফুটে উঠেছে। একসময় সে তার পত্নীকে সমুদ্রের জলে ঠেলে ফেলেছিল। কিন্তু কোথায়, কখন এবং কীভাবে তা জানা যায় না; কিন্তু মামার বৈশিষ্ট্য বর্ণনাতে যে একটা কৌতূহলের উদ্রেক করা হয়েছে তার আকর্ষণেই গল্পে পাঠকের আকর্ষণ বজায় থাকে। গল্পে বরং প্রাধান্য পেয়েছে সমুদ্রের অজস্র রূপের বর্ণনা। এই সৌনদর্য চেতনার মধ্য দিয়ে যে অনুভবের গভীরতায় পৌঁছে যেতেন সেখানেই তিনি অন্তদর্শনের এক অপরিমেয় শান্তি লাভ করতেন। আর এই বোধের দ্বারা পরিচালিত হয়ে পাতার পর পাতা লিখে যেতেন। অথচ সেখানে প্লট বলে কিছু নেই।

ঘ্রাণশক্তির সচেতনতা তাঁর রচনায় যে প্রভাব বিস্তার করত তার ফলস্বরূপ পাই 'বনের রাজা' গল্পটি। এই গল্পের বর্ণনায় কাহিনিতে ও চরিত্রে মিশে আছে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতার গল্প। ঠাকুরদার গায়ে তিনি পেতেন পাকা আমের গন্ধের মতো ঘনমদির কোন গন্ধ। যা তাকে ঠাকুরদার দীর্ঘায়ু লাভের ইচ্ছাকে লোলুপতা বলে মনে করাত। সেই অনুভূতি থেকে লিখলেন 'বুটকি-ছুটকি' গল্পটি। গিরগিটি গল্পেও এই ঘ্রাণচেতনা কাজ করেছে যুবতী বৌটির বর্ণনায়। হালুইকরের কড়াই থেকে উঠে আসা লুচি-মিষ্টি ভাজার ঘিয়ের গন্ধ। আবার প্রকৃতির বর্ণনায় উঠে আসে হাঁসের গায়ের গন্ধ এবং মাটির উঠোনের সোঁদা গন্ধ। গ্রামবাংলার মাঠে-ঘাটের গন্ধ নানারূপে উঠে এসেছে তাঁর রচনায়। যেমন — খাল-বিলে পাট পচানোর গন্ধ, বর্ষায় মাছের আঁশটে গন্ধ, ধানের গন্ধ, মুলো শাক সবজির গন্ধ, মাটির গন্ধ, ঘাস ফুল পাখির গন্ধকে তিনি আলাদা আলাদা করে যেন চিনে রাখতেন।

সামাজিক অবক্ষয়ের কথা তাঁর গল্পে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ না পেলেও বিচ্ছিন্নভাবে ধরা দিয়েছে নানাবিধ চরিত্রের মধ্য দিয়ে। ট্যাক্সিওয়ালা, চশমখোর, মাছের দাম, পালিশ প্রভৃতি গল্পগুলো এই প্রকৃতিতে রচিত।

সমসাময়িক লেখকদের রচনারাজিতে যে সমাজ সচেতন জীবনবোধ, জীবনযন্ত্রণা, বাস্তবতার কোমল কঠোর রূপ নিয়ে চিত্রায়িত হয়েছে, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর রচনায় তার দর্শন মেলে না। কারণ প্রকৃতপক্ষে তিনি আত্মগতভাবে একাকীত্বের নির্জন বলয়ের মধ্যেই আবর্তিত হতেন, ফলে সামগ্রিক কালচেতনা বা জীবন জটিলতা তাকে স্পর্শ করে গেলেও ভাবিত করত না। তাই সমস্ত অভিজ্ঞতা অনুভূতিকে তিনি অন্তর্মুখী করেই প্রকাশ করতেন। এর ফলেই তিনি পাঠকদের উদাসীনতার জগতেই রয়ে গেছেন। কলরব মুখরিত জীবনযাত্রায় তাঁর সৌন্দর্য চেতনার একক সঙ্গীত কোন মূর্চ্ছনার সৃষ্টি

করতে পারে নি, ফলে সাফল্যের শীর্ষে হয়ত অবস্থান করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। কিন্তু ভাষা-শৈলী-প্রকরণগত দিক; রীতির স্বতন্ত্রতা — সব মিলিয়ে যে অভিনবত্ব সৃষ্টি করে তার ফলে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী একজন অনবদ্য অভিনব শিল্পী হিসেবে বাংলা ছোটগল্পের জগতে স্থান করে নিয়েছেন। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর এসব বৈশিষ্ট্যের গুণেই তাঁর একটা স্বতন্ত্র জগত তৈরি হয়েছে, আবার আশাপূর্ণা দেবী কল্লোলিত জীবনযাত্রা ও সমাজের মধ্যেই আত্মস্থ হতেন বলে সামাজিক জীবন ও চরিত্রই তাঁকে পরিচিতি ও খ্যাতি এনে দিয়েছিল।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র (১৯১৬ জন্ম — মৃত্যু ১৩-৯-১৯৭৫)। ১৯৪৬ সালের উত্তাল ভারতে কোন একদিনে তাঁর প্রথম গল্প সংকলনটি প্রকাশিত হয়েছিল। যে সময়ে বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে, সমাজের বুকে দেখা দিয়েছে অন্নবস্ত্রের অভাব, কালোবাজারি, বিক্ষোভ, বিদ্রোহ — এককথায় সামাজিক অস্থিরতা। ভারতের বুকে এত বিদ্রোহ — যা নাকি সামরিক বাহিনীকেও কম্পিত করে তুলেছে আর তার প্রভাবে মানুষও হয়ে উঠেছে বিদ্রোহের মূর্ত প্রতীক। এমতাবস্থায় নরেন্দ্রনাথ মিত্রের আত্মপ্রকাশ। কিন্তু ব্যক্তিজীবনে তিনি শান্তরসে দীক্ষিত ছিলেন তাই মানুষে-মানুষে যে হিংসা-বিদ্বেষ ও হানাহানিতে মত্ত হত সেটা ছিল তাঁর ভীষণভাবে অপছন্দের। মানুষের চলার পথে স্খলন, পতন ও পাপকার্যের চেয়ে শান্ত ও মধুর দিকটিই ছিল নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পের উপাদান। তাঁর প্রথম গল্প হল 'মৃত্যু ও জীবন' (১৩৪৩ বঙ্গাব্দ), যা 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। নরেন্দ্রনাথ মিত্র রচিত কিছু গল্প সংকলন হল — 'অসমতল' (১৩৫২), 'হলদেবাড়ি' (১৩৫২), 'উল্টোরথ' (১৩৫৩), 'পতাকা' (১৩৫৪), 'চড়াই-উৎরাই' (১৩৫৬), 'শ্রেষ্ঠগল্প' (১৩৫৯), 'কাঠগোলাপ' (১৩৬০), 'অসবর্ণা' (১৩৬১), 'ধূপকাঠি' (১৩৬১), 'মলাটের রঙ' (১৩৬২), 'রূপালিরেখা' (১৩৬৩), 'দীপান্বিতা' (১৩৬৩), 'ওপাশের দরজা' (১৩৬৩), 'একূল ওকূল' (১৩৬৩), 'বসন্ত পঞ্চম' (১৩৬৪), 'মিশ্ররাগ' (১৩৬৪), 'উত্তরণ' (১৩৬৫), 'পূর্বতনী' (১৩৬৫), 'অঙ্গীকার' (১৩৬৬), 'দেবযানী' (১৩৬৬), 'রূপসজ্জা' (১৩৬৬), 'সভাপর্ব' (১৩৬৭), 'স্বরসন্ধি' (১৩৬৭), 'ময়ূরী' (১৩৬৮), 'বিদ্যুৎলতা' (১৩৬৮), 'পত্রবিলাস' (১৩৬৮), 'মিসেস গ্রীণ' (১৩৬৮), 'বিন্দু বিন্দু' (১৩৬৮), 'একটি ফুলকে ঘিরে' (১৩৬৯), 'বিনি সুতোর মালা', (১৩৬৯), 'রূপলাগি' (১৩৭০), 'চিলেকোঠা' (১৩৭১), 'অন্য নয়ণ' (১৩৭২), 'বিবাহ বাসর' (১৩৭৩), 'চন্দ্রমল্লিকা' (১৩৭৪), 'সন্ধ্যারাগ' (১৩৭৫), 'সেই পথটুকু' (১৩৭৬), 'অনাগত' (১৩৭৯), 'পালঙ্ক' (১৩৮২) ও উদ্যোগ পর্ব।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের জীবনের বিশেষ একটা পর্ব কেটেছে পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলায় কোন পল্লীগ্রামের অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরি ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে এবং বিভিন্ন পত্রিকায় চাকরি করার নানা অভিজ্ঞতা। আজীবন শান্ত লাজুক নরেন্দ্রনাথ শিক্ষা-সঙ্গীত এবং ঈশ্বরের সাধন ভজনের পরিবেশে বেড়ে উঠেছেন। তাই হয়তো জীবনের শান্ত-সংযত মধুর জীবনের দিকগুলোই

তাঁর রচনায় বেশি প্রতিফলিত হয়েছে। নিত্যকার জীবনে অনেক তুচ্ছ ঘটনার সমাবেশ ঘটে, তাকে কেন্দ্র করে যে গল্পের সূচনা, অনায়াসেই তা পরিণতিতে পৌঁছে যায়। আর সেখানেই আসল রহস্যের উদ্‌ঘাটন হয়, শেষ মুহূর্তের আকস্মিকতায় নতুন এক আলোর প্রকাশ ঘটে যায় তাঁর রচনায় — এটাই নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পের বিশেষত্ব। যেমন — 'রস', 'সেতার', 'চোর', 'মহাশ্বেতা', 'হেডমাস্টার', 'একপো দুধ', 'সিঁড়ি', 'সত্যাসত্য', 'চড়াই-উৎরাই', 'দাম্পত্য', 'হেডমিস্ট্রেস', 'রসাভাস' প্রভৃতি বহু গল্পে তিনি চমৎকারিত্বের নিদর্শন রেখেছেন। কল্পলোককে নয়, বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতাকে তিনি গল্পের পটভূমি করতে ভালোবাসেন বলে 'রস' গল্পে তিনি তাঁর পল্লীগ্রামের চিত্রকেই তুলে ধরেছেন। পূর্ববঙ্গের গ্রামের বাড়িতে খেজুর গাছ কাটা এবং তা থেকে নির্গত রস দিয়ে গুড় তৈরি করা — এই প্রক্রিয়াটির মধ্য দিয়ে ব্যক্তি জীবনের প্রেম জটিলতা ও দ্বন্দ্ব বিকশিত হয়ে উঠেছে 'রস' গল্পে। গল্পের নায়ক মোতালেফের হৃদয় কন্দরে যে জটিল দ্বন্দ্ব ফুলবানু এবং মাজু খাতুনকে নিয়ে, তাই হচ্ছে গল্পের মূল উপজীব্য। রূপের প্রতি অমোঘ আকর্ষণ, আর জীবনের কঠিন কাজ যে জীবিকার্জন — উভয়ের সংঘাতে মোতালেফের চরিত্রের দ্বন্দ্বের মূল দিকটি প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। এখানেই লেখকের গল্প রচনার অনবদ্যতা। লেখক গোষ্ঠী যখন সমাজ এবং সমাজ অভ্যন্তরস্থ মানুষদের নিয়ে ভাবছে তখন নরেন্দ্রনাথ তাদেরই কথা বলছেন যেখানে সমাজ জিজ্ঞাসা নয়, ব্যক্তিমনের বিশ্লেষণ, দ্বন্দ্ব এবং হৃদয় রহস্যের উদ্‌ঘাটনই বড় হয়ে দেখা দেয়। 'রস' গল্পের চরিত্র মুসলিম সমাজভুক্ত হলেও মূল বক্তব্যে কিন্তু এটি সার্বিক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। গল্পটি পড়ে পাঠক প্রেম, প্রয়োজন এবং জৈবিক তাগিদের যে সংমিশ্রণ পান, আর তা থেকে যে মানবিক জীবনরসের আবেদন ফুটে ওঠে — তার মধ্যে এক চিরকালীন সত্যকে উপলব্ধি করতে পারেন।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র মনের অলিন্দে অলিন্দে বিচরণ করতে ভালোবাসতেন। তাই মানসিক উত্তরণ, বিবেকের জাগরণ, মানসিক পরিবর্তন এবং মনের অবচেতনে অবস্থান করা আবেগকে তিনি সুন্দরভাবে বিকশিত করতে পেরেছেন নানা গল্পে। 'রসাভাস' গল্পের পটভূমিতে দেখা যায় পঞ্চাশের ভয়াবহ আকালের দিনগুলি। মানুষের বোধবুদ্ধিতে যে সুকুমার বৃত্তিগুলো অবস্থান করে সেগুলো বিনষ্ট হয়ে যায় জীবিকার তাগিদে।

'চোর' গল্পের নায়ক অমূল্য চুরি-চামারি করেই জীবিকা নির্বাহ করে এবং হাত-সাফাই করে স্ত্রীকে প্রেমের উপহারগুলো দেয়। স্বামীর এই বৃত্তি রেণু অপছন্দ করলেও একদিন সে ওপরতলার বিনোদবাবুর হাতঘড়ি চুরি করে। সেদিন যেন অমূল্য কোথায় নিঃস্ব, রিক্ত হয়ে পড়ল। স্ত্রীর সমস্ত সৌন্দর্য-মাধুর্য্য তার কাছে লোপ পেয়ে গেল, অথচ সে এমনটিই মনে মনে চেয়েছিল। কিন্তু অমূল্যর মানসিক পরিবর্তন ঘটে যায়। স্ত্রী রেণুকে নিজ কু-বৃত্তির মধ্যে চাইলেও অবচেতন মনে স্ত্রীর প্রতি তার শ্রদ্ধাই ছিল এবং সেটাকে অবলম্বন করেই মনের সংগোপনে অমূল্য শক্তি সঞ্চয় করত।

মানসিক পরিবর্তনের আর একটি গল্প হচ্ছে 'মহাশ্বেতা' ও 'দাম্পত্য'। 'মহাশ্বেতা' গল্পের নায়ক চিন্মোহন বিধবা, শুভ্রবাস পরিহিতা মহাশ্বেতাকে ভালোবাসেন। প্রেমকে সুস্থ এবং সুন্দর পরিণতি দিতে তিনি তাকে বিবাহও করেন। কিন্তু বাসর ঘরে যখন বিয়ের কনে নববধূরূপে স্বামীর সম্মুখে এলেন তখনই চিন্মোহনের নিকট প্রেমিকাকে একটি সঙ বলে মনে হতে লাগল। 'দাম্পত্য' গল্পে বীরেন এবং রমা নামে এক দম্পতি রয়েছে। যারা নিত্য কলহে মত্ত থাকত এবং তাদের দারিদ্র্য ক্লিষ্ট জীবনে একাধিক কন্যা সন্তান রয়েছে। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পর যখন রমার একটি পুত্র সন্তান জন্মায়, তখনই স্বামীর স্মৃতিতে প্রেমে ভালোবাসায় নয়ন প্লাবিত করে গণ্ডদেশ বেয়ে অবাধে অশ্রুধারা নেমে আসতে থাকে। পুত্র সন্তানের মুখ দেখেই রমার মনে স্বামীর জন্য যে অনুরাগের জন্ম হল তা পূর্ব চিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত, এভাবেই রমার মানসিক পরিবর্তন ঘটে।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র সমাজনীতি-রাজনীতির মূল্যবোধে জীবনকে না দেখে শুধুমাত্র মানুষটিকেই বারংবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতেন। সেখানে ধরা পড়ত ব্যক্তির অন্তর্গহনের জটিলতা। সে ধরনেরই একটি গল্প হচ্ছে 'সেতার'। নিম্ন-মধ্যবিত্ত বাঙালীদের আশা-আকাঙ্ক্ষা জীবনসংগ্রাম এভাবেই যে মাঝে মাঝে মুখ থুবড়ে পড়ে সেটাই বোঝাতে চেয়েছেন।

'চড়াই-উৎরাই' গল্পটিতে রয়েছে সমাজের শ্রেণিবিভাজনরীতি। গল্পটি উত্তম পুরুষে রচিত। গল্পের কথক কল্যাণ পূর্বের কথামতো এক বিত্তবান বন্ধুর বিয়েতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যায়। পেশায় লেখক কল্যাণ স্বরচিত বই ও ফুল নিয়ে গেলে বন্ধুর দ্বারা যথেষ্ট আপ্যায়িত হলেও তার বাবার কাছ থেকে বড়লোকের দম্ভপূর্ণ ব্যবহার বিভাজনের দিকটি সূচিত করে।

'এক পো দুধ' গল্পে আবার দেখা যায় নিম্নবিত্ত সংসারের সংগ্রামের মধ্যেও মানুষ মুমূর্ষু মানবতাকে কিভাবে আলিঙ্গনাবদ্ধ করেছে। একমুখী ভাবনার উজ্জ্বল প্রকাশ এই গল্পটিতে দেখা যায়। অত্যন্ত সাধারণ একটি পরিবারের সঙ্গে তার চেয়েও দরিদ্র ফটিককে সংযুক্ত করে মানুষে-মানুষে, জীবনে-জীবনে যে সুগভীর সখ্যতা তৈরি হল সেখানে রয়েছে মানবতাবোধের উষ্ণতা। যা এই স্বার্থমগ্ন সমাজজীবনে মানবতার এক জীবন্ত দলিল।

'জামা' গল্পে আবার সামাজিক সেই ব্যবধানকেই টেনে এনেছেন। নরেন্দ্রনাথ মিত্র মধ্য ও নিম্নবিত্ত এবং গরীব সমস্ত ধরনের মানুষের অন্তর্সংঘাতকে তুলে ধরতে চেয়েছেন কিন্তু সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক নয় সম্পূর্ণ মনোলোকের প্রেক্ষাপটে। তিনি মধ্যবিত্ত জীবনের স্থির শান্ত জীবনের অভ্যন্তর থেকে রহস্যের উন্মোচন করেছেন। বেশি সংখ্যক গল্পকে তিনি পারিবারিক গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখতে চেয়েছেন। কারণ সমাজের দেশের উত্তাল তরঙ্গ তাকে তরঙ্গায়িত করতে পারে নি, বরং তিনি মানবতীর্থের মহাসমুদ্রের তীরে নিরাপদ দূরত্বে বসে প্রায় প্রত্যক্ষ করা চরিত্রদের সঙ্গে নিজে গল্প কথার জাল বুনে গেছেন। সে কারণেই চিন্তনে-মননে-দর্শনে এক স্নিগ্ধ মাধুর্য্য বিস্তার

করে রয়েছে যা নাকি ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ-ঘৃণা-দর্প সবকিছুর উর্দ্ধে। গল্পের অন্তিমে তাঁর রচনায় সহসা যেন নবদিগন্তের উন্মোচন ঘটত। যেখানে মেলবন্ধন ঘটত গল্পের সমাপ্তি আর অপ্রকাশিত কথাটির নতুন অর্থের। আর এখানেই নরেন্দ্রনাথ মিত্রের স্বতন্ত্রতা। কিন্তু আশাপূর্ণা দেবীর সঙ্গে তাঁর পার্থক্য এই স্থানেই যেখানে নরেন্দ্রনাথ বেশি করে মানুষের কথা বলেছেন, সেখানে আশাপূর্ণা দেবী বেশি করে নারীদের কথা বলেছেন। আর সেসব নারীরা শান্ত-শিষ্ট হয়ে শুধু ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সংঘাত করে নি, প্রয়োজনে ব্যক্তি ছাড়িয়ে সমাজের অন্যায়-বৈষম্যের বিরুদ্ধে নিজের বক্তব্যকে জানিয়ে প্রতিবাদও করেছে, যা কিনা নরেন্দ্রনাথ মিত্র পুরুষ লেখক হয়েও করে ওঠেন নি। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের রচনায় তুলনামূলকভাবে শেষের দিকের চেয়ে প্রথম ও মধ্য পর্বের গল্পগুলো যথেষ্ট গভীরতা ও পরিণতির দাবী রাখে, কিন্তু আশাপূর্ণা দেবী যত লিখেছেন তাঁর গল্প তত বেশি পরিণত হয়ে উঠেছে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (জন্ম - ১৯১৮ সালের ফেব্রুয়ারি, মৃত্যু - ১৯৭০ সালের ৮ই নভেম্বর) বাংলা ছোটগল্পের জগতে একটি উজ্জ্বল নাম। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় যে ধরনের গল্পগুলো লিখেছেন সেগুলোর পটভূমি অধিকাংশই বাংলার পল্লীগ্রাম, অবারিত মাঠ, দিগন্ত বিস্তৃত বনানী, সবুজ ও সোনালী ধানের ক্ষেত, উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স ও তরাই অঞ্চলের সুগভীর অরণ্যানী। এছাড়াও তিনি রোমান্টিকতাকেও কোন কোন গল্পে নিয়ে এসেছেন, আবার ইতিহাসের পাতায় অতীত যেখানে চিত্রিত হয়ে আছে তাকেও তুলে এনেছেন কোন গল্পে। তাঁর সাহিত্যজীবন শুরু হয় কবিতা রচনার মধ্য দিয়েই। প্রথমে তিনি লেখেন 'মাসপয়লা' পত্রিকায় এবং পরে সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় নিয়মিত লেখেন। তাঁর প্রথম লেখা গল্পের নাম 'পাশাপাশি' কিন্তু প্রথম মুদ্রিত গল্পের নাম 'নিশীথের মায়া'। প্রথম গল্পগ্রন্থের নাম 'বীতংস'। তাঁর রচিত গল্পগ্রন্থগুলো হল — 'রূপমতী' (১৯৫৯), 'কালাবদর' (১৩৫৫), 'গন্ধরাজ' (১৯৫৭), 'ভাঙাবন্দর' (১৩৫২), 'গল্প সংগ্রহ' (১৯৫৭), শ্রেষ্ঠগল্প (১৩৫৬), চারমূর্তি (১৯৫৭), দুঃশাসন, শ্বেতকমল (১৩৬১), বীতংস, একজিবিশন (১৯৬২), উর্বশী (১৩৬৩), শিলাবতী (১৯৬৪), ভাটিয়ালী (১৩৬৪), জন্মান্তর, বনজ্যোৎস্না, ভোগবতী, শুভক্ষণ (১৩৬৭) প্রভৃতি। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় পটভূমির যে পরিবেশ রচনা করতেন তার বর্ণনা থাকত কাব্যিক ঢঙে আর গল্পের বর্ণনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রোমাঞ্চ আর রোমান্টিকতা মিলে মিশে একাকার হয়ে অদ্ভুত এক অনুভূতির জগত তৈরি করত। সমাজ চেতনা ছিল তাঁর মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে, তাই প্রত্যেক মানুষকে তিনি সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করতেন। এভাবে ব্যক্তিগত চেতনা থেকে ধীরে ধীরে এক সামগ্রিক বোধ তাঁর মধ্যে জাগ্রত হয়। আবার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মনে কালচেতনাও প্রবলভাবে ক্রিয়াশীল ছিল। স্বদেশ প্রেম, দেশের বন্দীদশা থেকে মুক্তি লাভ ও সাধারণ মানুষের স্বাধীনতার অধিকার ফিরে পাওয়া নিয়েও তিনি রচনা করেছেন।অর্থাৎ এককথায় বলা যায় তিনি স্বচক্ষে যা ঘটতে দেখেছেন সমাজের বুকে সে সমস্ত আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনাগুলোই তাঁর

রচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে।

দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা ও মৃত্যুর করালগ্রাস নিয়ে চল্লিশের দশকের যে মন্বন্তর বাংলার গ্রামের পর গ্রামগুলো শ্মশানভূমিতে পরিণত করেছিল সে সময়ের চিত্র নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর কিছু গল্পের বিষয়বস্তু করেছিলেন। যেমন — 'হাড়', 'দুঃশাসন', 'নক্রচরিত', 'পুস্করা', 'ভাঙা চশমা' প্রভৃতি গল্পে। ১৯৪২-৪৫ এর সময়ের কালোবাজারি, অন্নহীনতা, অন্নের লোভে গ্রামের মানুষদের শহরের বুকে ছুটে আসা, একটু ফ্যান ভিক্ষা করা, কুকুরদের সঙ্গে খাবার নিয়ে অংশভাগ করার মতো দৃশ্যগুলো তিনি তাঁর রচনায় লিপিবদ্ধ করেছেন।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তরাই ও ডুয়ার্সের পরিবেশ, জলা জঙ্গল খুব পছন্দ করতেন এবং সেখানকার মানুষদের মধ্যেও তিনি এক অদ্ভুত বোধ খুঁজে পেতেন। সেই সঙ্গে তিনি তার ভয়ানক রসপ্রীতি ও বীভৎসতা বোধকে কাজে লাগিয়ে সেসব ভয়াবহ গল্পগুলো রচনা করেছিলেন যেগুলো পাঠের ক্ষেত্রে পাঠক ভয়াবহ এক হিংস্র কুটিলতা মিশ্রিত সত্যের সন্ধান পায় এবং শিহরিত, রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। 'বীতংস', 'জান্তব', 'টোপ', 'বনজ্যোৎস্না', 'বনতুলসী', উস্তাদ মেহেরা খাঁ' প্রভৃতি গল্পে এই রসের প্রভাব পড়ে। এ সমস্ত গল্পে আবার কবি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কেও খুঁজে পাওয়া যায়, যিনি কোমল অনুভূতি ও সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যবোধের মধ্য দিয়ে রোমান্টিকতার অনুলেপন দিয়েছেন বীভৎস রসের গভীরে ঠিক যেন ফল্গু ধারার মত। লেখকের অন্যতম 'বীতংস'র নায়ক হল দালাল সুন্দরলাল, যে আসামের চা বাগানের জন্য কুলি সংগ্রহ করে। লেখক তাঁর ছোটগল্পে যত ভয়ানক পরিবেশই সৃষ্টি করতে চান না কেন, তাঁর মূল যে তিনটি বৈশিষ্ট্য কৌতুক, কাব্যচেতনা ও রোমান্টিকতা তাকে কোন না কোনভাবে বজায় রাখতেন।

এই রোমান্টিকতা ও কবিত্বের বিকাশ ঘটেছে 'বনতুলসী', 'বনজ্যোৎস্না', ও 'উস্তাদ মেহের খাঁ' গল্পগুলোতে। ডুয়ার্সের পরিবেশের বর্ণনা ও প্রকৃতি প্রেম যেন তাঁর মজ্জার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল। প্রকৃতির অঙ্কে লালিত পালিত হয়ে ওঠা মানুষগুলোও যেন প্রকৃতির মতো সহজ-সরল প্রাণসম্পদে পরিপূর্ণ ছিল — যা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে সর্বাধিক আকর্ষণ করত। তাই 'বনতুলসী'র বনবালিকা এবং শিউকুমারী গহন অরণ্যানীর জ্যোৎস্না পরিবেশে যেন জীবন্ত প্রকৃতি — দুহিতায় পরিণত হয়েছে। ধীরে ধীরে গল্পে পরিবেশের সঙ্গে সাজুয্য রেখে এক অদ্ভুত রস সৃজিত হয়েছে। 'উস্তাদ মেহের খাঁ' গল্পে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিয়ে তৈরি হয়েছে বীভৎস রস। মানবপ্রেমী উস্তাদজী আজীবন সুর সাধনা করে গিয়েছেন মানুষের জন্য। কিন্তু দাঙ্গা বিধ্বস্ত কোলকাতায় কিছু উগ্র মানসিকতাসম্পন্ন মানুষের হাতে মানব প্রেমী ওস্তাদজীর মৃত্যু ঘটে, ফলে শেষ পর্যায়ে করুণ মূর্চ্ছনাই গল্পের প্রধান রস হয়ে উঠেছিল।

'টোপ' গল্পেও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তরাই অঞ্চলের প্রকৃতির কোলে অদ্ভুত এক মোহময়

পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু মূল গল্পটি থেকে যে রস উদ্ভুত হয়েছে তা হচ্ছে বীভৎস রস। বাঘ শিকারের জন্য মানব শিশুকে 'টোপ' হিসেবে ব্যবহার করার মধ্য দিয়ে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রাজাবাহাদুরের মধ্যে সামন্ততান্ত্রিকতার বীভৎস রকমের অমানবিক দিকটি দেখিয়েছেন। আবার রাজকীয় বিলাসিতার সার্থকতার জন্য একটি চরম অবমূল্যায়নও দেখিয়েছেন। সামন্ততান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন অত্যাচারী রাজাবাহাদুরের প্রতি লেখকের নিক্ষিপ্ত উক্তি 'জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই কেউটের বাচ্চা' — বুর্জোয়া রাজতন্ত্রের প্রতি সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের হয়ে লেখকের মূর্ত প্রতিবাদ।

মানব মনের বিচিত্র জটিলতাকে রূপায়িত হতে দেখা যায় 'দুর্ঘটনা', 'লালঘোড়া', 'ভাঙাবন্দর', 'ফলশ্রুতি', 'তিনজন' প্রভৃতি গল্পে। সমাজে বসবাসকারী মানুষের মানসকিতার নানা প্রতিফলনের বৈচিত্র্যই তো সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়ে বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করে। যেমন 'দুর্ঘটনা' গল্পে মুখ পুড়ে যাওয়া শিক্ষিকা মিস্ ইন্দিরা চৌধুরী নিজের বিড়ম্বিত ভাগ্যের এবং বঞ্চিত জীবনের অপ্রাপ্তির স্বাদ মেটানোকে ভিত্তি করে এবং সময় অতিবাহিত করাকে গৌণ উদ্দেশ্য করে এক অবিশ্বাস্য গল্প রচনা করেন। মানবতাবাদের পূজারী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 'রেকর্ড' গল্পে অচেনা এক সুরের অন্তরালে যে মূল সত্যটি উপস্থিত করতে চেয়েছেন তা হল সর্বহারাদের মধ্যেকার বিপ্লব চেতনা। দেশে দেশান্তরে কালে কালান্তরে সমস্ত বিপ্লবী মানুষের কণ্ঠে যে একই সুর নির্গত হয় তার উপলব্ধি ঘটানো। নানা অধিকারের দাবীতে শ্রমজীবী মানুষেরা, ছাত্ররা যে মিছিল করে তার ধ্বনি যেন একীভূত হয়ে একটা সুরে এসে লীন হয়েছে। গল্পের নায়কের আত্মবীক্ষণ ও আত্মানুভবের মধ্য দিয়ে বিশ্ববীক্ষা বোধগম্য হয়েছে।

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ভাবালুতা বর্জিত যে নির্মোহ দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় প্রায় সকল লেখকের মধ্যে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁদের একজন। দাম্পত্য জীবনে শুধু রোমান্টিকতাই নয় বাস্তবতা নির্ভরশীলতা নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তাও যে সত্যরূপে দেখা দেয় লেখক এটা 'কাণ্ডারী' গল্পে সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। শুধুমাত্র আবেশ নয়, রোমান্টিক প্রেমের মুহূর্ত নয়, নিরাপত্তার সুদৃঢ়তার জন্যই লেখক নির্মমভাবে সত্যকে যেভাবে বিশ্লেষণ করেছেন তা পাঠকচিত্তকে সচকিত করে তোলে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 'শিল্পীর স্বাধীনতা'য় বিশ্বাসী ছিলেন। আর তাই তাঁর আঙ্গিক সম্পর্কে সচেতনতা ছিল প্রখর। তিনি রচনায় দেশ-কাল-সমাজ-প্রকৃতি-মানুষ প্রত্যেককেই প্লট হিসেবে রাখতে চেয়েছেন, এবং তাতে সার্থকতাও লাভ করেছেন। সংলাপ রচনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত, চরিত্রগুলো যেমনভাবে যার বিকশিত হয়ে ওঠবার কথা, সে তেমনিভাবে প্রকৃতি পরিবেশ অনুযায়ী প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। শব্দচয়নও অত্যন্ত সুচিন্তিত, সুনির্বাচিত এবং সমস্ত রসোপোযোগী। তাঁর ছোটগল্পগুলো আরম্ভ হত আকস্মিকতার আঘাতে আবার আকস্মিকভাবেই তা শেষ হত। কিন্তু যে জটিল রহস্যের জাল বিস্তৃত হত সমস্ত গল্প জুড়ে সেই রহস্য উদ্‌ঘাটন হত প্রায় শেষমুহূর্তে এসে, সেটাও সহসাই

হত। আশাপূর্ণা দেবীর সঙ্গে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের এখানেই মূল পার্থক্য যে, আশাপূর্ণা দেবী দেশ-কাল-সমাজ-প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে শুধু মানুষকেই প্লট হিসেবে গ্রহণ করেছেন। মানুষের প্রসঙ্গে সমাজ চলে এসেছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো তিনি আঙ্গিক সচেতনতায় এতটা মনোযোগী ছিলেন না।

সাহিত্য সমাজকে নিয়ে এবং সমাজও একাধারে সাহিত্যকে নিয়ে পথ পরিক্রমা করে। তাই সমাজের বুকে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো যেমন চল্লিশের দশকের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দাঙ্গা বিধ্বস্ত সমাজ, মন্বন্তর, দেশভাগ এবং এর ফলে প্রচুর উদ্বাস্তুর এদেশে চলে আসাকে কেন্দ্র করে সমাজে প্রচণ্ড অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছিল। এর প্রভাবে সমাজের অভ্যন্তরস্থ পারিবারিক জীবন, এমনকি ব্যক্তি জীবনগুলোও প্রভাবিত হয়ে পড়েছিল। আর চলমান জীবনের এই অস্থিরতাটিকে মননঋদ্ধতার সঙ্গে আত্মবীক্ষণের দৃষ্টিতে ব্যঞ্জনাময় করে অত্যন্ত সহৃদয়তার সঙ্গে সন্তোষকুমার ঘোষ সাহিত্যে রূপায়িত করেছেন। সমাজের সমস্যা নিয়ে যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল তা ব্যক্তিমনের মধ্যে গিয়ে কিভাবে অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করল এবং রহস্যময় জটিল আবর্তে নিক্ষেপ করল তা সন্তোষ কুমার ঘোষের লেখনীতে সুস্পষ্টরূপে প্রতিকায়িত হয়ে উঠেছে।

সন্তোষ কুমার ঘোষ (জন্ম ঃ ১৯২০ - মৃত্যু ঃ ১৯৮৫) নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের অন্তর্ভুক্ত যে জীবনযাত্রা তাদের সার্বিক শূন্যতাবোধের অভ্যন্তরে যে জীবন তাকে অত্যন্ত সহৃদয়তার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করে বিশ্লেষণ করেছেন। নিম্নবিত্তদের জীবন যন্ত্রণা, মানসিক বিধ্বস্ততা, দ্বন্দ্ব, ব্যথা বেদনার চড়াই-উৎরাই, অসহায়তাকে তাঁর ছোটগল্পে স্থান দিয়েছেন। তিনি প্রথম ছোটগল্পের জগতে 'শ্রেষ্ঠগল্প'-র (১৩৫১ বঙ্গাব্দ) পসরা সাজিয়ে নিয়ে উপস্থিত হন। পরবর্তীকালে — 'শুকসারী' (১৩৬০), 'পরমায়ু' (১৩৬৪), 'চীনের মাটি' (১৩৬৬), 'কড়ির ঝাঁপি' (১৩৬৬), 'চিররূপা' (১৩৬৬), 'কুসুমের মাস', মুখের রেখা' প্রভৃতি গল্পগ্রন্থগুলো প্রকাশিত হয়েছে। তীক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তিতে যেখানে সমাজচেতনা, ব্যক্তিসত্তা বিশ্লিষ্ট হয়েছে সেসব গল্পগুলো হল — 'শোক', 'কানাকড়ি', 'যাদুঘর', 'শনি', 'কস্তুরীমৃগ', 'একমেব', 'শরিক', 'দ্বিধা', 'ঘর', 'মাটির পা', 'দুটি ঘর একটি নাটক', 'পুরনো রোগ', 'ধাত্রী', 'দিনপঞ্জী', 'জীয়ন কাঠি' প্রভৃতি।

সন্তোষ কুমার ঘোষের জীবনের মূলসুর হল আত্মজৈবনিকতা বা মৃত্যু চেতনায় আবৃত। তিনি মৃত্যুর মতো বড়ো সত্যকে তাঁর আত্মচেতনায় সর্বদা উপলব্ধি করতে চাইতেন, আর সেই বিষণ্ণতার ছাপ তাঁর ছোটগল্পে প্রতিকায়িত। 'শোক' গল্পে তারই প্রভাব চোখে পড়ে। সত্তর বছর বয়সী এক বৃদ্ধা তার মৃত স্বামীর বন্ধু সিতেশ ঠাকুরপোর মৃত্যুতে আজ শোকাকুলা। বৃদ্ধার সন্তানেরাও ভাবছে শোক। কিন্তু ভাবনাটি অনেকটা সত্য হলেও সর্বাংশে সত্য নয়। মানুষ বৃদ্ধ বয়সে একটি সমে ফিরতে চায় জীবনের মূলবিন্দুকে কেন্দ্র করে। তখনই স্মৃতির পাখায় ভর করে জন্মলগ্ন থেকে পরিভ্রমণ শুরু করে শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব — সমস্ত আবর্তে পাক খেয়েই সমে ফিরে

আসে। এই বৃদ্ধাও তেমনি তার নিজের জীবনবৃত্তে পাক খাচ্ছিলেন — সিতেশ আর তিনি ছিলেন সমবয়সী, তাদের মানসিকতার একই স্তরে অবস্থানের ফলে অদ্ভুত এক সখ্যতাবোধ একটি সম্পর্কে উপনীত করেছে। মহাকালের বুকে তিনি প্রতিটি মানুষকে এক একটি পুতুল ভেবেছেন। জীবনের শুরু থেকেই মানুষ যে নিজেকে গড়তে শুরু করে, পাশাপাশি সে যেতে আরম্ভ করে এই বোধটা লেখককে খুব ভাবাত। ওপরে ওপরে যতটা প্রসারিত হয়ে শাখাপ্রশাখার বিস্তার ঘটায় ভেতরে ভেতরে ততটাই নিঃশেষ হয়ে সলতের তেল একদিন ফুরিয়ে আসে। সলতেটি তেলের সাহায্যে উজ্জ্বলাভা বিতরণ করতে করতে একদিন শূন্যতায় পর্যবসিত হয়, যা শব নামে পরিচিত। এই বোধই ছিল আত্মজৈবনিক সন্তোষ কুমার ঘোষের জীবনের মূলসুর।

মানুষের মন নিয়ে সন্তোষ কুমার ঘোষ অনেক পর্যালোচনা করেছেন। সমাজ, সংসার আধুনিকতার জটিলতার জালিকাবৃত্তে এবং মূল্যবোধের অবক্ষয়ে পড়ে মানুষের মন এখন সহজবোধ্যতাকে উত্তীর্ণ করে এক দুর্ভেদ্য দূর্গে নিক্ষিপ্ত হয়েছে যেন। বাস্তবের সঙ্গে সংঘর্ষ করে মানব প্রবৃত্তি অনেক কুটিলও হয়ে গিয়েছে। তারই নিদর্শন মেলে লেখকের 'মাটির পা' গল্পে। মাধুরী ও করবী দুই ভগ্নী। বড়জন বিধবা ও ছোটজন ধর্ষিতা। সমাজে দুজনেই চরম অবহেলার পাত্রী। কিন্তু এদের মধ্যেও দ্বন্দ্ব দেখা দিল একসময় একজন পুরুষকে ঘিরে।

'ঘর' গল্পে দেখা যায় কৃষ্ণকুন্তলা আজীবন আড়কাঠির কাজ করে এসেছে। মনে মনে জলধরকে ভালোবেসে তার সঙ্গে জীবনের সুখ দুঃখ ভাগ করে বাঁচতে চেয়েছে। কিন্তু এই চাওয়ার পথে অনেক বাধা থাকায় তা দূর করতে অনেক মেয়েকে সর্বনাশের অতলে নিয়ে গেছে।

'দ্বিধা' গল্পে দেখা যায়, ইঞ্জিনীয়ারের স্ত্রী করুণা — তার ওপর বলাৎকার করা হয়েছে। কোন রকমের কোন ঘৃণা, করুণা, সহানুভূতি সে চায় না, কোন ভয়ে সে ভীত নয়, তাই আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়ায় আসামীকে শনাক্ত করতে। হাইকোর্টে যখন আরো ভালো বিচার পাবার আশায় আপিল করা হয় তখন আসামী পক্ষের উকিলের পারিশ্রমিক গোপনে করুণাই যোগান দিত। নারীচিত্তের এই দুটি রূপ সুন্দরভাবে সন্তোষ কুমার ঘোষ দেখিয়েছেন।

আধুনিক যুগে মানব মনের জটিলতাকেও লেখক যেমন দেখিয়েছেন তেমনি আবার প্রাচীনকালের চেয়ে আধুনিক মনের মানুষ অনেক বেশি মানবিক, সংস্কারমুক্ত, প্রগতিশীল এবং সহানুভূতিসম্পন্ন বলেও তিনি মনে করতেন। আধুনিক সমাজ সর্বদাই গতিশীল, ছকবদ্ধ জীবনধারা এখানে অচল। ঠিক তেমনি সন্তোষ কুমার ঘোষের গল্পও প্লট প্রধান নয়, গল্পের মূল বক্তব্যই মুখ্য স্থান লাভ করেছে। এই বক্তব্যকে কেন্দ্র করেই একটা ছবি ফুটে ওঠে যার মধ্য দিয়ে লেখকের সূক্ষ্ম মননশীলতা প্রকাশ পায়। আর তাই ব্যক্তি চরিত্রের মধ্যে বিকশিত হয়ে ওঠা আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের সংঘর্ষ ও জীবন যন্ত্রণা যুক্ত হয়ে যে অনুভূতি ব্যক্ত করে তাই লেখকের মূলমন্ত্র। তিনিও গল্পের সমাপ্তিকে সুন্দরভাবে

রূপায়িত করার জন্য উপযুক্ত চরিত্রের সৃষ্টি করেন। নিম্নবিত্ত সংসার তাঁর রচনায় বেশি থাকার ফলে দারিদ্র্য ক্লিষ্ট নারীদের চিত্র অঙ্কন করেছেন নিপুণভাবে। এককথায় বিষয়বস্তুতে তিনি মরমী মনের পরিচয় দিয়েছেন, আঙ্গিকের ক্ষেত্রে রয়েছে অভিনবত্ব এবং ভাষাও সুনির্বাচিত, ঋজু, গতিশীল ও বুদ্ধিমত্তায় প্রখর। সমস্ত দিক থেকে সন্তোষ কুমার ঘোষ ছোটগল্পের অঙ্গনে একটি শাখাপ্রশাখা দ্বারা বিরাজিত সজীব কুসুমাকীর্ণ তরুবিশেষ। সন্তোষ কুমার ঘোষকে যেমন মৃত্যু চেতনা আবিষ্ট করে রাখত, আশাপূর্ণা দেবী আবার জীবনের কর্মমুখরতায় বিশ্বাসী ছিলেন। আশাপূর্ণার রচনায় নিম্নবিত্ত সমাজের চেয়ে অবক্ষয়িত মধ্যবিত্ত সমাজ এবং জীবনযুদ্ধে যোদ্ধা নারীদের কথা বেশি বলা হয়েছে। এখানে সন্তোষকুমার ঘোষের সঙ্গে আশাপূর্ণা দেবীর একটা বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

বাংলা ছোটগল্পে গল্পের বদলে ছবি আঁকতে শুরু করেছিলেন আর একজন ধারা বদলের রূপকার, তিনি হলেন **বিমল কর** (জন্মঃ ১৯২১) তাঁর আবির্ভাবের পর ছোটগল্প আর একটি নতুন মাত্রা যেন পায়। বিমল করের বাল্যকাল ও কৈশোর বয়স কেটেছে ধানবাদ, আসানসোল, কুলটি কখনো কখনো ঝরিয়া ও হাজারিবাগ কয়লাখনি অঞ্চলের দিকে। ফলে তাঁর প্রথম দিককার লেখাগুলোতে ঐ সময়ের অভিজ্ঞতার কথাগুলো উঠে এসেছে। বিমল করের মধ্যে এক ধরনের মানসিক দোলাচলতা কাজ করত। তিনি যেসব ছোটগল্প রচনা করেছেন তাতে সাধারণত তাঁর মানসিক দোলাচলতার মতো গল্পের মূল উপজীব্যও দুধরনের দেখা যায়। যেমন — 'আঙুরলতা', 'আত্মজা', 'পার্করোডের সেই বাড়ি', 'মানব পুত্র', 'পলাশ', 'পিঙ্গলার প্রেম', 'উদ্ভিদ', 'যযাতি', 'শূন্য' প্রভৃতি গল্পে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের বিস্তার, সমাজের প্রভাব, মানুষের মানসিক পরিস্থিতির বিচিত্র হাল জটিলতার বিচার বিশ্লেষণ প্রাধান্য পেয়েছে। এসবের পাশাপাশি নতুন নতুন ভাষা ও আঙ্গিকেরও অভিনব ব্যবহারের প্রয়াস রেখেছেন। আবার তাঁর মধ্যে যে মানসিক অস্থিরতা, ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোলাচলতা, মানুষের জীবনে ভাগ্যের প্রভাব মৃত্যুচেতনাকে ঘিরে বিষাদময়তা — সমস্ত মিলেমিশে অন্য ধরনের আর এ বিমল করকে পাওয়া যায় — 'জননী', 'সুধাময়', 'সোপান', 'অপেক্ষা', 'নিষাদ', 'গগনের অসুখ', 'উদ্বেগ' প্রভৃতি গল্পে। এই ধরনের গল্পগুলো পাঠকদের গভীরভাবে গল্পগুলোকে অনুভব করতে শেখায়।

১৯৪৪ সালে 'অম্বিকানাথের মুক্তি' নামে প্রথম গল্প লেখেন, 'প্রবর্তক' পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয়। ১৯৪৬ সাল থেকে বিমল কর যখন কোলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেন, তখন থেকেই তিনি গল্প রচনায় হাত দেন। 'পিয়ারীলাল বাঈ' এবং 'ভয়' নামে দুটি গল্প লিখেছিলেন এবং তাঁর বন্ধুদের 'দ্বন্দ্ব' নামে একটি পত্রিকা ছিল, তাতে প্রকাশিত হয়। এরপর লেখেন 'ইঁদুর', যা 'উত্তরসূরী' পত্রিকায় স্থান পায়। 'দেশ' পত্রিকায় তাঁর রচিত প্রথম গল্প 'বরফ সাহেবের মেয়ে'। 'দেশ' পত্রিকার শ্রী সাগরময় ঘোষের অনুরোধে ১৯৫২ সাল থেকে পুরো সাহিত্যজীবন তিনি এই

পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এর পাশাপাশি 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সঙ্গে লেখালেখি নিয়ে যুক্ত ছিলেন।

'নিষাদ' গল্পে বিমল কর প্রথমেই পাঠকদের ঘটনাটি সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছেন এই উক্তির মাধ্যমে — "You begin by killing a cat and you end by killing a man." "ছেলেটা মরবে; লাইনে কাটা পড়েই মরবে একদিন। হয়ত আজ ... কিংবা কাল ...।" *(পৃ. ১১৫, বিমল করের নির্বাচিত গল্প)*। "নাম ওর জলকু। বছর বারো বুঝি বয়েস। এখানকার দেহাতি ছেলেদের মতনই দেখতে। গাঢ় কালো রঙ। নরম সিমেন্টে কালি মেশানো কালচে রঙের একটি ছাঁচ যেন।" "ছেলেটা একেবারে জংলী। ... গায়ে জামা দেয় না, পায়ে জুতো নেই। আদুল গায়ে নোংরা একটা ইজের পরে সারাদিন ওই রেল লাইনের কাছে।" *(পৃ. ১১৫, ঐ)*।এই জলকুর প্রিয় একটি ছাগল ছানা ছিল, যে নাকি রেল লাইনে কাটা পড়ে মারা গেছে। সেই আক্রোশে, দুঃখে, শোকে ছেলেটি রেল লাইনের ধারে বসে বসে প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ করতে ঢিল ছুঁড়েই যাচ্ছে। গল্পের আরম্ভেই লেখক যে অমোঘ নিয়তির কথা জানিয়ে দিলেন পাঠকদের গল্পের সঙ্গে সঙ্গে তাই যেন ফলপ্রসু হতে শুরু করে। চিত্র অঙ্কনে, শব্দচয়নে ও ভাবের ব্যঞ্জনায় গল্পটি মনস্তাত্ত্বিক গল্পে পর্যবসিত হয়েছে।

'আঙুরলতা' গল্প পাঠ করতে গিয়ে পাঠকদের চক্ষু স্থির হবার উপক্রম হয়, কারণ, হাঘরে বেশ্যাকে নিয়ে এমন চিত্র অঙ্কন সত্যই বিরল। বারাঙ্গনা আঙুরলতার জীবনের পরিণাম এবং তাদের সমস্যা, দুঃখ, দুর্ভোগ কিভাবে জীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে তার জীবন্ত দলিল হচ্ছে এই গল্পটি।

'আত্মজা' গল্পটিও বিমল করের একটি বিখ্যাত গল্প। একজন পিতার নিজের কন্যা সন্তানের প্রতি স্নেহকে তার স্ত্রী ধীরে ধীরে কোন বিকৃত রূপ নিয়ে প্রকাশ করাতে চাইছে —এটাই মূল বক্তব্য। বিমল কর এই গল্পের মধ্যে যেন বলতে চেয়েছেন স্নেহ আর স্নেহ নয়, প্রেম আর প্রেম নয়, গল্পটার শেষে এক বিষাদময়তার আবেশ ছড়িয়ে রেখেছেন। তা যেন সত্য নয় অথচ কেমন সত্যের ইঙ্গিত কন্যার প্রতি পিতার স্নেহে অসুস্থা রুগ্ন মায়ের ঈর্ষা যেন মনের পরিচায়ক।

'জননী' গল্পে দেখা যায় পাঁচটি ভাইবোনে মায়ের সমাধি বেদীতে একত্রিত হয়ে বসে মাকে কি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করা যায় তার পরিকল্পনা করছে। প্রত্যেকের অন্তরের আর্তির মধ্য দিয়ে সদ্যমৃতা মায়ের উদ্দেশ্যে নিবেদিত তাদের মনোভাব গল্পের মধ্যে এক শীতল বিষাদ ঘন পরিবেশ সৃষ্টি করে রাখল। চরিত্রগুলোর মধ্য দিয়ে এখানে তাদের মানসিক জটিলতা ব্যক্তিগত অন্তর্সংঘাত, নানা দ্বন্দ্ব মিশ্রিত অনুভূতি ও প্রশ্নের মাধ্যমে তারা নিজেদের প্রকাশ করেছে।

'সুধাময়' গল্পে লেখক মনে করেন, তিনি তাঁর জীবনে যা যা লিখেছেন, তা সত্ত্বেও যে সমস্ত কথা না বলা থেকে গেছে তার অধিকাংশই যেন এই গল্পে বলা হয়েছে। অর্থাৎ বিমল কর ধারা

বদলের একজন রূপকার বলে তরুণ প্রজন্মের লেখকদের যে ধারণা রয়েছে, তার নিদর্শন স্বরূপ হচ্ছে এই গল্পটি। লেখক তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অস্পষ্টতা, ধর্মবোধ, ঈশ্বর চেতনা, শূন্যতাবোধ, বিচ্ছিন্ন মনোভাব — সমস্ত অনুভূতির মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন এখানে 'সুধাময়' চরিত্রের মধ্য দিয়ে। এছাড়া 'উপাখ্যান', 'গগনের অসুখ', 'আমরা তিন প্রেমিক ও ভুবন' গল্পেও লেখকের মনের অস্পষ্টতা ও মৃত্যুভয় কাজ করেছিল। তিনি যৌবনের কয়েকটি বছর বাদ দিয়ে প্রায় সারাজীবনই মৃত্যুভয়ে অস্বাভাবিক ভীত হয়ে থাকতেন বলেই হয়ত কোথাও কখনো শান্তি খুঁজে পাননি। এখানেই আশাপূর্ণার সঙ্গে বিমল করের স্বাতন্ত্র্য। আশাপূর্ণা দেবীর কথায় একমাত্র 'ভয়' গল্প ছাড়া মৃত্যুর কথা প্রায় নেই বললেই চলে। আর কোন চরিত্র যদিও বা মৃত্যুকে বেছে নিয়েছে, যেমন — তুষার মামী, সুশীলাবালা প্রভৃতি, তারা জীবনে আত্মসম্মানকে বজায় রাখতেই মরেছে, ভীত হয়ে নয়।

সমাজ সচেতনতার গভীর দৃষ্টি নিয়ে সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হলেন **সমরেশ বসু** (১৯২৪-১৯৮৮)। সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণির লোকজনদের জীবনযাত্রা, তাদের কৃষ্টি-সংস্কৃতি, তাদের মুখের ভাষাকে পর্যন্ত গল্পে উপস্থাপিত করেছেন। কিন্তু এসবের চাইতেও তাঁর গল্পে বেশি প্রাধান্য লাভ করেছে যৌবনমদিরতা। সমরেশ বসু জীবনের বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা ও চরিত্রের বৈচিত্র্যময়তাকে ছোটগল্পে নিপুণভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন, যা পাঠকদের অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট করেছে। তাই প্রথম দিকেই তাঁর রচনার শক্তিমত্তা প্রকাশিত হয়ে পড়ে। চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকের পাঠক সমাজ সাগ্রহে সমরেশ বসুর লেখার জন্য অপেক্ষা করে থাকত। শ্রমিক শ্রেণির মানুষের জীবনের দ্বন্দ্ব, টানাপোড়েন নিয়ে তিনি যে 'কিমলিস' গল্পটি লেখেন, তা তাঁকে অসম্ভব খ্যাতি এনে দিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর লেখায় যৌবনাবেগের প্রাবল্য চলে আসে এবং সে সঙ্গে যুক্ত হয় রাজনীতির কুটিলতা ও মস্তানদের আধিপত্য — সব মিলে মিশে কিমলিসের সমরেশ বসু অন্য এক জগতে যেন হারিয়ে গিয়েছেন। আর সব উপাদান সাহিত্যে যুক্ত হওয়াতে খ্যাতির বিড়ম্বনার পাশাপাশি বিতর্কের জালেও তিনি আবদ্ধ হয়েছেন। সমরেশ বসু রচিত উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ হল — মরসুমের একদিন, ছেঁড়া তমসুক, স্বনির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্প (১ম ও ২য় খণ্ড), শ্রেষ্ঠ গল্প, ষষ্ঠ-ঋতু, অকালবৃষ্টি, রজকিনীর প্রেম, বনলতা, ছায়াচারিণী, যৌবন, পাপপুণ্য প্রভৃতি। তাঁর গল্পগুলোকে সাধারণতঃ দুটো ভাগে ভাগ করা যায়। একটি পর্যায়ে রয়েছে সাধারণ অবহেলিত, অবজ্ঞাত গরীব মানুষের জীবনের কথা। অর্থাৎ যেখানে জীবনের সব বিপর্যয়ের শেষে জীবনের জয়ের কথাই ঘোষিত হয়। যেমন — কিমলিস, আদাব, প্রতিরোধ, ধুলিমুঠি কাপড়, পসারিণী, জলসা, তৃষ্ণা, আলোর বৃত্তে, অকাল বসন্ত, জোয়ার ভাঁটা, পাড়ি আর একটি মানুষ, সহযাত্রী, শেষ মেলায়, শানা বাউরীর কথকতা, প্রত্যাবর্তন, গুণিন প্রভৃতি এই ধরনের গল্প।

দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছে যেসব গল্প যেখানে জীবনের নির্মম সত্যকে উদ্‌ঘাটনে আত্মসন্ধানী

মানুষ তৎপর। এই সৎ প্রচেষ্টায় প্রয়োজন হয় সাহসের আবিষ্কৃত হয় জীবন যন্ত্রণা — সমরেশ বসুর ছিল এই রহস্য উন্মোচনের মত জীবনদৃষ্টি। 'ক্রীতদাস', 'নটপুত্ত', 'মাঝখানে', 'পাপ-পুণ্য', 'স্বীকারোক্তি' প্রভৃতি হচ্ছে এই ধরনের গল্প।

'কিমলিস' গল্পে দেখা যায় শ্রমিক মালিকের চিরন্তন সংঘাত, যা সমাজের বুকে আজও জ্বলন্ত সমস্যা হয়ে বিরাজিত। তেভাগা আন্দোলনে কৃষকদের বিদ্রোহের পটভূমিকায় লিখিত হয়েছে 'প্রতিরোধ' গল্পটি। দুটো গল্পেই শ্রমিক আর কৃষকদের ব্যথাতুর জীবনসংগ্রাম জীবন্ত দলিলরূপে প্রতিভাত হয়েছে।

১৯৪৬ সালের 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় সমরেশ বসুর 'আদাব' গল্পটি। এই বিখ্যাত গল্পটির মধ্যে লেখক দাঙ্গা বিধ্বস্ত ভয়াবহ পরিবেশের মধ্য দিয়েও কিভাবে মনুষ্যত্ববোধের জাগরণ ঘটেছিল তা দেখিয়েছেন। দাঙ্গায় চারদিকে যখন ভয়াবহ পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে, হিন্দুর হাতে মুসলিম এবং মুসলিমের হাতে হিন্দুর নিধন যজ্ঞ চলছে সেই পরিবেশে 'আদাব' গল্পের পটভূমিকা তৈরি হয়েছে।

সমরেশ বসুর ছেলেবেলা কেটেছে বাংলাদেশের ঢাকা শহরে। সেখানে তিনি যেভাবে বেড়ে উঠেছেন তাতে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই ভূমিকা ছিল একটা আত্মীয়তার বন্ধনের মতো। ফলে 'আদাব' গল্পের হিন্দু চরিত্র হচ্ছে নারায়ণগঞ্জের সুতা কলের শ্রমিক এবং মুসলমান চরিত্রটি বুড়িগঙ্গার এক নৌকোর মাঝি — এই চরিত্র দুটো আঁকতে গিয়ে কোন পক্ষপাতিত্ব তাঁর মধ্যে দেখা যায় নি। এদের কোন নামের বাঁধনেও লেখক বাঁধতে চাননি। তিনি চেয়েছেন এরা সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদের ঊর্দ্ধে উঠে যাক্ এবং তাই হয়েছে। এদের মুখ দিয়ে মানবতার কথা, মনুষ্যত্ববোধের জাগরণের জয়গান করিয়েছেন। ধর্মান্ধতার বিষময় পরিণতির কথা বলে লেখক জনগণের মধ্যে ধর্ম সম্পর্কে শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করতে চেয়েছেন। দাঙ্গা বিধ্বস্ত পরিবেশ তৈরির ফলে যে একটা করুণ মর্মান্তিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, এই গল্পে রচনার মধ্য দিয়ে পাঠকদের এ বিষয়ে সচেতন করে লেখক সমরেশ বসু সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছেন এবং দুটি মূল চরিত্রের মানসিক উত্তরণের মধ্য দিয়ে গল্পটিকে একটি সার্থক শিল্পে পরিণত করেছেন।

সমরেশ বসু চল্লিশের দশকের প্রায় পুরোটাই রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রেখেছিলেন। সেখানে তিনি রাজনীতির আদর্শ এবং তা থেকে ভ্রষ্ট হওয়া সমস্তই পর্যবেক্ষণ করেছেন। রাজনীতির ছায়ায় যেসব গল্প রচিত হয়েছে তা হল — স্বীকারোক্তি, সিদ্ধান্ত, বিবেক, মানুষ, প্রত্যক্ষ, পাতিহাঁস, অমনোনীত, সাফল্য যার যেমন প্রভৃতি। 'স্বীকারোক্তি' গল্পে রয়েছে রাজনীতির আদর্শ এবং আদর্শহীনতার লড়াই।

বামফ্রন্ট সরকারের একনিষ্ঠ কর্মী হয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণের সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে বিশ্বস্ত সূত্রে পাঁচ

লক্ষ টাকা অনুদান নিয়ে সে টাকা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রেখে সুদের টাকায় জীবন যাপন করার মতো অন্যায় দেখানো হয়েছে 'সাফল্য যার যেমন' গল্পে। আদর্শবান মানুষও রাজনীতির অবক্ষয়ের আবর্তে পড়ে কিভাবে চক্রান্তের শিকার হন এবং দালালে পর্যবসিত হন তা দেখা যায় 'প্রত্যক্ষ' গল্পে। 'শহীদের মা' গল্পেও দেখা যায় ঘৃণ্য রাজনীতি।

সমরেশ বসু রাজনীতিকে কাছে থেকে পর্যবেক্ষণ করে বুঝেছেন সেখানে রয়েছে সংগ্রাম, প্রতিবাদ, আদর্শ আবার তার পাশাপাশি আদর্শ ভ্রষ্টতা, হিংসা, খুন। তাই তাঁর রচনাতে রাজনীতিও একটা বিশেষ স্থান দখল করে নিয়েছে। ১৯৪৬-৭০ — এই পঁচিশ বছরে সমরেশ বসু প্রায় দুইশতর বেশি গল্প লিখেছেন। সেখানে তাঁর জীবনের নানা বৈচিত্রপূর্ণ অভিজ্ঞতা, জীবনবেদ, মানবিকতা সহানুভূতিকে এমনভাবে শিল্পীত করে তুলেছেন যে পাঠকরা তার চরিত্রগুলোর সঙ্গে যেন একাত্ম হয়ে যান এবং সমাজ, রাজনীতির ছবিগুলো চোখের সম্মুখে প্রত্যক্ষ করে থাকেন। অর্থাৎ সমরেশ বসু একজন সার্থক শিল্পী হয়ে উঠেছেন বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে। আশাপূর্ণা দেবী আর সমরেশ বসুর মধ্যে রয়েছে বিস্তর ফারাক। সমরেশ বসুর প্রিয় রাজনৈতিক জগত সম্পর্কে আশাপূর্ণা দেবী ছিলেন ভীষণভাবে উৎসাহহীন। যে যৌবনমদিরতা সমরেশ বসুর রচনার বিষয় হয়ে উঠেছিল আশাপূর্ণা দেবীর রচনায় সেই যৌবন মধুর প্রেমে অবগুণ্ঠিতা ছিল। দুজনের লেখার জগৎ ছিল একেবারে স্বতন্ত্র, সমরেশ বসু অন্তঃপুরের চারদেওয়ালে আবদ্ধ জীবনগুলোর প্রতি আশাপূর্ণার মতো দৃক্‌পাত করেন নি।

মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৬ সাল) বাংলা সাহিত্য জগতে প্রতিবাদের মূর্ত প্রতীক রূপে প্রতিভাত। তিনি নিজে বিখ্যাত কম্যুনিস্ট বাড়ির মেয়ে ছিলেন। ১৯৪২ সালে তিনি দক্ষিণ কোলকাতার কিশোর বাহিনীতে এসে যোগ দেন এবং ১৯৪৪ সালে তাঁর পিতার চাকরিতে বদলির সূত্রে রংপুর চলে যান এবং পার্টির কাজে নিযুক্ত হয়ে যান। ১৯৬৩ সালে প্রাইভেটে এম. এ. পাশ করেন এবং ১৯৬৪ সালেই বিজয়গড় কলেজে অধ্যাপনার চাকরি পেয়ে যান। ১৯৮২-৮৪ সাল, দু'বছর সাংবাদিকতার কাজেও নিযুক্ত ছিলেন এবং ৮৪ তেই চাকরিও ছেড়ে দেন। সাহিত্যচর্চায় তখন থেকে সম্পূর্ণভাবে মনোনিবেশ করেন। ষাটের দশক থেকে তাঁর চিন্তাজগৎকে আলোড়িত করতে থাকে আদিবাসীদের জীবন যন্ত্রণা। ১৯৬৫ সালে পালামৌ বেড়াতে গিয়ে তিনি আদিবাসীদের সঙ্গে পরিচিত হন, তাদের দুঃখ-দুর্দশাগুলো অনুভব করেন। এর ওপর ভিত্তি করেই লেখেন 'অরণ্যের অধিকার' যা ১৯৭৮ সালে 'বেতার জগৎ' এ প্রকাশিত হয়। এই রচনার ওপর 'আকাদেমি' পুরস্কারও পান ১৯৭৯ সালে। সেই থেকে তিনি আদিবাসীদের জনসমক্ষে তুলে ধরতে যেন ওদেরই একজন হয়ে গেলেন। ১৯৮০-৮১ সালে পুনরায় পালামৌ গিয়ে 'বন্ডেড লেবার' দের নিয়ে সংগঠন করলেন। ১৯৮৩ সালে 'ঘোড়িয়া ট্রাইব'দের নিয়ে এবং ঝাড়গ্রামে গিয়ে 'লোধা'দের নিয়ে তৈরি করলেন সংগঠন। ট্রাইব্যাল

এবং নন্-ট্রাইব্যালদের নিয়ে একটি পূর্ণ সংগঠন তৈরি করেন। আদিম জাতি ঐক্য পরিষদ নামে।

মহাশ্বেতা দেবী যে সমস্ত গল্প লিখেছেন সেগুলো হল — ভাতুয়া, বিচন, দ্রৌপদী, সাঁঝ সকালের মা, মানত, এজাহার, তীর ঃ ১৯৯ ঃ আন্তর্জাতিক আদিবাসী বর্ষে, সংরক্ষণ, বায়েন, মৃত্যুর কারণ, বান, হারুণ সালেমের মাসি, কুসুমা, পণ্য, লড়াই প্রভৃতি আরও অজস্র গল্প। সমাজের নিম্ন শ্রেণির মানুষদের বিরুদ্ধে বিত্তবান মানুষের অত্যাচারের চিত্র বারংবার মহাশ্বেতা দেবী অত্যন্ত দরদ দিয়ে তাঁর লেখনীতে তুলে ধরেছেন। এই রকমই সুদখোর মহাজন কালীবাবু, তার বিরুদ্ধে নিপীড়ণের শেষ পর্যায়ে গিয়ে ভাতুয়া পবন প্রতিবাদ করে উঠেছে 'ভাতুয়া' গল্পে। দাসপ্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের আলোতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে মহাশ্বেতা দেবীর রচিত এই গল্পটি।

'সাঁঝ সকালের মা' (১৯৫৯ সাল) মহাশ্বেতা দেবীর এক অনবদ্য সৃষ্টি। পাখমারা সম্প্রদায়ের অন্তর্গত জটিশ্বরী চরিত্রকে নিয়ে এই গল্প। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রক্তিম চরণকে পাখী ভেবে বাণ মেরে মৃত্যু ঘটিয়েছিল যে জরা নামক ব্যাধটি, এরা হলেন সেই জরা ব্যাধের বংশধর। সেই থেকে এরা সমাজচ্যুত, অন্য জাতির সঙ্গে এদের বিবাহ কার্য চলে না। সংস্কার, অভিশাপ দুই থেকেই মুক্ত করে জটিশ্বরীকে লেখিকা এক সাধারণ মানবী করে তোলেন, জটিশ্বরী জায়া, জননী ও মানবী হয়ে ওঠে।

পুরোহিত সমাজের লোভের নগ্ন চিত্রটাকেও মহাশ্বেতা দেবী এই গল্পে তুলে ধরেছেন। সমাজে পুরুষতান্ত্রিকতার চাপে পড়ে নারীর যে করুণ দুর্দশা হয় সেটাও পরিলক্ষিত হয় স্বামীহারা জটিশ্বরীর সন্তান কোলে বারংবার আশ্রয়চ্যুতির ঘটনায় এবং শেষ পর্যায়ে জটি ঠাকুরাণী হবার মধ্য দিয়ে।

'বিছন' গল্পেও আদিবাসী হরিজন চাষীদের অত্যাচারিত হবার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। রাজপুত জোতদার ও মহাজনরা কিভাবে এই অসহায় আদিবাসীদের ওপর অত্যাচার চালাত, শোষণ করত তার জীবন্ত দলিল এই 'বিছন' গল্পটি।

'দ্রৌপদী', 'এজাহার', গল্পগুলোতে উঠে এসেছে নকশাল আন্দোলনের সময়কার কথা। এখানে প্রশাসনের দুষ্ট প্রভাবের ছাপও রয়েছে। সাঁওতালদের নেতৃত্বে যে নকশাল আন্দোলন গড়ে উঠেছিল ঝাড়খণ্ডের জঙ্গলে; সেই আন্দোলনকারীদের ওপর প্রশাসনের অমানবিক অত্যাচার আর অত্যাচারের প্রতিরোধ বর্ণিত হয়েছে এই 'দ্রৌপদী' গল্পে।

প্রশাসনের পাশবিক দিকের আরও একটি জ্বলন্ত ও নগ্ন চিত্র রূপায়িত হয়েছে 'এজাহার' গল্পে। একটি মুসলমান মেয়ে মুসাম্মিনকে গুণ্ডাবাহিনী এবং প্রশাসনিক বিভাগের কর্তারা মিলে যেভাবে অত্যাচার করে তার বিরুদ্ধে মুসাম্মিনের প্রতিবাদে গর্জে ওঠার কাহিনি হচ্ছে 'এজাহার'। মহাশ্বেতা দেবী সমাজের বুকে যেখানে অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ, অবিচার চলছে তার বিরুদ্ধে সর্বদাই গর্জে উঠেছেন। তাঁর রচনায় বিষয়ের সত্যতা, ভাষার বৈচিত্র্য, আঙ্গিক, প্রকরণ এবং সর্বোপরি মানুষের কথা এত নিপুণভাবে বলা হয়েছে যা গভীরভাবে মনে দাগ কাটে। মহাশ্বেতা দেবী

আজও এসব অসহায় মানুষের বুকে সাহসের সঞ্চার ঘটিয়ে চলেছেন।

মহাশ্বেতা দেবী এবং আশাপূর্ণা দেবী দুজনেই লেখিকা হলেও দুজনেরই চিন্তা জগতের মূল ভিত্তি ভূমিটা একেবারেই পৃথক জগতের। মহাশ্বেতা দেবী ছিলেন প্রথাগত শিক্ষায় সুশিক্ষিতা এবং বহির্জগতে প্রতিষ্ঠাতা। তাই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁর যাতায়াত এবং তাঁর চরিত্রদের শরিক হওয়াতেই তিনি আনন্দ পেতেন, গৃহগত কোন সমস্যা তাকে ভাবিত করত না। অন্তঃপুরের নারীরা তাঁকে আন্দোলিত করে নি, বৃহত্তর জগতের আহ্বানে তিনি সাড়া দিয়েছিলেন। আশাপূর্ণা দেবী ছিলেন তাঁর সম্পূর্ণ বিপরীত। বহির্জগত তাঁকে বিন্দুমাত্রও আলোড়িত করত না। ঘরে আবদ্ধ অন্তঃপুরিকাদের যে দুঃখ, ব্যথা ও তাদের মনোলোকের গতিবিধি তাই তাঁর কাছে ছিল প্রিয় এবং সেগুলিই তাঁর রচনায় প্রিয় বিষয় হিসেবে রয়ে গেছে।

এই সময়ের অপর একজন সাহিত্যিক হচ্ছেন **নবেন্দু ঘোষ** (১৯১৭ সাল)। তিনি প্রগ্রেসিভ রাইটার্স এ্যাসোসিয়েশন এবং ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সমাজের প্রতি সচেতন হয়ে এবং দায়বদ্ধতাকে মেনে নিয়ে সমাজকে নতুন চেতনায়, স্বপ্নে ও নতুন জীবনের উজ্জীবন মন্ত্রে দীক্ষিত করতে লেখনী ধরেছিলেন। মানুষের জীবনের মধ্যে যে ব্যর্থতা, স্বার্থপরতা, কুটিলতা ও নিরাপত্তাহীনতা কাজ করে — এই দুর্বহ পরিস্থিতিকেই বদলে নতুন বাতাবরণ সৃষ্টি করতে উৎসাহী হয়ে ওঠেন লেখক নবেন্দু ঘোষ। দরিদ্র, শোষিত মানুষের অজ্ঞতা ও সরলতার সুযোগে ধনী মালিক শ্রেণির অত্যাচারের রকমফের তিনি তাঁর ছোটগল্পে তুলে ধরেছেন। ধর্মের মধ্যে সাধারণ অসহায় মানুষ মুক্তির সন্ধান করলেও ধর্মের অভ্যন্তরেও পাপীদের জাল কিভাবে বিস্তৃত তাও তিনি দেখিয়েছেন। জন্তু-জানোয়ারের সমগোত্রীয় যে শোষিত মানুষ, তাদের প্রতি সমবেদনা ও ভালোবাসা থাকলেই যে সমাজে সাম্য বজায় থাকবে সেটাও নবেন্দু ঘোষ বলেছেন। আবার শুধু তিমিরাবৃত সমাজের কথাই তিনি বলেন নি, জীবন যে বৃহত্তর সৌন্দর্যবোধের দিকেও যেতে পারে, একথাও বলেছেন বারংবার। এই বোধগুলোই তাঁর রচনার মূল উপজীব্য হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। অত্যন্ত আন্তরিকভাবে এবং দৃঢ়তার সঙ্গে সমাজের বৈষম্যকে তিনি ঘোচাতে চেয়েছিলেন। তিনি যে গল্পগ্রন্থগুলো রচনা করেছেন সেগুলো হল — 'এই সীমান্তে' (১৯৪৫), 'পোস্টমর্টেম' (১৯৪৬), 'ইস্পাত' (১৯৪৮), 'কান্না' (১৯৫০), 'সিঁড়ি' (১৯৫৭), 'পঞ্চম রাগ' (১৯৬০) প্রভৃতি। শ্যামরায়ের মৃত্যু, বাঁকা তলোয়ার, বস্ত্রংদেহী, ছিন্নমস্তা, কান্না, এই সীমান্তে, কল্কি প্রভৃতি অনেক গল্প।

যেমন 'শ্যামরায়ের মৃত্যু' গল্পে রয়েছে লক্ষ্মীপুরের পাটকলের অশিক্ষিত ধর্মভীরু মজুরদের শোষিত হবার চিত্র।

মালিক শ্রমিক দ্বন্দ্ব নিয়ে দেখা দেয় 'কান্না' গল্পটিও। মালিকের অন্যায়ভাবে অত্যাচারের বিরুদ্ধে শ্রমিক ভাইদের সঙ্গে ধর্মঘটে সামিল হয়েছে বিপিন। যার সংসার অত্যন্ত অনটনের মধ্যে

চলে, তথাপি ভবিষ্যতে নিজের দুর্দিনের কথা চিন্তা না কর প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেছে, কারখানায় ধর্মঘট করে শ্রমিকদের অসুবিধার প্রতি দৃষ্টিপাত করতে চেয়েছে।

'বাঁকা তলোয়ার' গল্পে দেখানো হয়েছে মধ্যবিত্ত জীবনের ক্ষয়িষ্ণুতা কিভাবে দাম্পত্য জীবনেও চরম ট্র্যাজেডি বহন করে আনে। গল্পের মূল নারী চরিত্র পার্বতী। দারিদ্রের কঠিন ছোবলের মধ্যেও সংসারের কৌলিন্য এবং নিজের সতীত্বকে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে আসছিলেন। কিন্তু সংসারকে বাঁচাবার শেষ আন্তরিক চেষ্টা হিসেবে যখন নিজের সতীত্বকে বিসর্জন দিলেন, তখনই নিজের স্বামী সন্তানকেও হারালেন। ভয়ানক কষ্টে, মনের তীব্র দহনে নিজেরই মুষ্টিবদ্ধ হাতটা যেন বাঁকা তলোয়ারের মতো চকচকে হয়ে ওঠে।

জীবনের সৌন্দর্যবোধ ও মুক্তি কামনাকে প্রেম-ভালোবাসার স্বপ্নে বিভোর করে তুলে নতুন জীবনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় নবেন্দু ঘোষের কিছু গল্প। মুক্তির আনন্দকে উপভোগ করার জন্য এখান থেকে সেখানে ছুটে বেড়ায়। তাঁর সমাজ সম্পর্কে সচেতনতা, অবহেলিত নির্যাতিত মানুষের জন্য সমবেদনা — সমস্ত কিছুর সম্মেলনে তিনি এক শক্তিশালী লেখক হয়ে উঠেছিলেন বাংলা সাহিত্যের প্রাঙ্গণে।

সাহিত্য রচনা যারা করেন, প্রত্যেকেরই নিজস্ব একটা বিশেষ অনুভূতি আছে যা তাদের মনন-চিন্তনকে আলোড়িত করে তোলে অনবরত। তাতেই প্রকাশ পায় লেখক বা লেখিকা কোন্ দিকটি নিয়ে নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করতে চাইছেন। উপরিউক্ত লেখকদের সমকালীন লেখিকা আশাপূর্ণা দেবীর আলোচনার বিষয় ছিল সমাজের অন্তর্গত এক একটি পরিবার যারা সংসারে বিরাজিত, সেই সংসারের অভ্যন্তরের কথা। এই সাংসারিক মানুষগুলোর বিশেষ করে মধ্যবিত্ত পরিবার, যারা বেঁচে থাকার জন্য অনবরত সংগ্রাম করে যাচ্ছে তাদের সংঘাতপূর্ণ, দ্বন্দ্বময় জীবনালেখ্য রচনা করাই ছিল লেখিকার মূল লক্ষ্য। তাঁর অন্তরের চিন্তা-চেতনাকে আন্দোলিত করেছিল এ সমস্ত পরিবারের মেয়েদের নানা সমস্যাগুলো। সমাজ, সমাজ অভ্যন্তরস্থ সাধারণ মানুষের জীবনসংগ্রাম, যুদ্ধকালীন বা যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতি অর্থাৎ এককথায় নানাবিধ সামাজিক সমস্যাগুলো আশাপূর্ণা দেবীকে ভাবিত করত না।

তিনি ব্যক্তিজীবনে যে রীতিনীতিগুলো দেখেছেন, সেগুলোকে বৈষম্যমূলক রীতি বলে মনে হয়েছে বলেই তাঁর চিন্তাজগৎ সর্বদাই এই তরঙ্গের অভিঘাতে আলোড়িত হতে থাকত। এর ফলেই তিনি অনুভব করতে লাগলেন সমাজের একেবারে অভ্যন্তরে যে অবহেলা, অসহিষ্ণুতা, বিদ্রোহ পুঞ্জিভূত হয়ে আছে, নারীদের স্বাভাবিক জীবনযাপনের ক্ষেত্রে অত্যধিক অনুশাসনের ফলেই এর জন্ম হয়েছে। সংসারে নারী-পুরুষের সে সামাজিক বন্ধনগুলো রয়েছে তার যতটা সংস্কারজনিত অভ্যাস, ততটা হয়ত প্রেমের নয়। নারীরা যে ব্যক্তিসত্তার অধিকারিণী হতে পারে এই বোধটাই

তাদের মধ্যে জাগ্রত হতে দেয়নি সংসারের নিয়মকানুনের নিষ্ঠুর রীতিগুলো। এই যন্ত্রণাদায়ক কঠিন জীবনযাপন করতে গিয়ে নারীরা কিভাবে প্রতিবাদ করে উঠেছে, ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে শুভবুদ্ধির উদয় হয়ে ব্যক্তিতে পরিণত হয়ে উঠেছেন এবং প্রয়োজনে পরিবারের কর্তৃত্বের প্রতি বিদ্রোহিনীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন — এই দিকগুলোই আশাপূর্ণা দেবীর রচনার মূল উপজীব্য হয়ে উঠেছে। তাই বাস্তব ঘটনা সঞ্জাত তাঁর গল্পের বিষয়বস্তু এবং চরিত্রগুলো, যা জীবনের বেদনাঘন অনুভূতির রসে সিক্ত হয়ে পাঠকের অন্তর্লোকে কম্পন তুলেছে।

সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার প্রাপ্তা আর এক লেখিকা হচ্ছেন নবনীতা দেবসেন। তিনি আশাপূর্ণা দেবীর সৃষ্ট নারী চরিত্রদের সম্পর্কে বলেছেন — "চারদেওয়ালের গণ্ডীর মধ্যে থাকলে কি হবে, জীবনের জটিল, রঙীন, রক্তাক্ত সংগ্রামে আশাপূর্ণার নারীরা পুরুষের চেয়ে অনেক এগিয়ে আছেন। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে সামাজিক প্রতিপত্তি, অর্থবল, লোকবল নিয়ে বহিরঙ্গে পূর্ণ ক্ষমতাশীল পুরুষের অন্তরঙ্গের বলে বলীয়ান না হলেও হয়ত চলে যায়। কিন্তু স্ত্রীলোকের মূল শক্তি যে অন্তর্নিহিত। আশাপূর্ণার নারীদের বোধবুদ্ধিই তাদের প্রকৃত স্ত্রীধন। তাঁর গল্পে প্রায়ই সাধারণ মেয়েদের মধ্যে অনন্য সাধারণ মনুষ্যত্ব ঝিলিক মারে।" ('আশাপূর্ণা দেবীর ছোটগল্প সঙ্কলন' এর ভূমিকা অংশে নবনীতা দেবসেনের লেখা থেকে গৃহীত)। অর্থাৎ আশাপূর্ণা দেবীর গল্পে নারীরাই উজ্জ্বলতার সঙ্গে প্রতিভাত।

উপরিউক্ত লেখকদের মধ্যে প্রায় প্রত্যেকেরই রচনার বৈশিষ্ট্যগুলো স্বাতন্ত্র্যের দাবী রাখে। যেমন — সুবোধ ঘোষের রচনায় সমাজের নানা ক্ষত তাঁর সাংবাদিক সত্তায় ও লেখকের দরদী মনে সুপরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের রচনায় দেশ-কালের অস্থিরতা নয়, সমাজের উচ্চ-মধ্য-নিম্নবিত্তদের অন্তসংর্ঘাতকে তুলে ধরেছেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সৃষ্টিতে প্রকৃতি, দেশ, সমাজ, মানুষ সকলেই সমান আবেগে স্থান লাভ করেছে। পল্লী প্রকৃতি ও উত্তরবঙ্গের তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চল, সেখানকার আদিমতা, বীভৎস রস তাঁর গল্পে বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। সন্তোষকুমার ঘোষ দেশ এবং সমাজের সমস্যা যে ব্যক্তিমনেও অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছে এবং তার প্রভাব মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত সমাজেও যে পড়েছে তাকে রূপায়িত করেছেন। সঙ্গে যুক্ত হয়েছে লেখকের নিজের মৃত্যুচেতনা, যা বিষণ্ণতার ছায়া ফেলেছে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ছিলেন শান্ত, নির্জনতাপ্রিয়, প্রকৃতি-প্রেমিক ও অন্তর্মগ্ন। অবক্ষয়িত সমাজের কথাও তাঁর রচনায় রয়েছে, কিন্তু সজীব দৃষ্টি দিয়ে তন্ময়ভাবে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়ে যে অন্তঃদর্শন তাঁর ঘটত তাই তাঁর লেখনীকে সচল রাখত। সমরেশ বসু তাঁর রচনায় সমাজ, রাজনীতি, সংগ্রাম, প্রতিবাদ এ সমস্তকে তো রেখেছেনই পাশাপাশি তাঁর রচনায় যৌবনাবেগও স্থান পেয়েছে। বিমল করের রচনায় প্রায় সর্বত্রই রয়েছে নিয়তির অমোঘ বিধানের কথা ও ব্যক্তি জীবনে মৃত্যুকে কাছে থেকে উপলব্ধি করার ফলে বিষণ্ণতার চেতনায় আবদ্ধ মৃত্যুচিন্তা। নবেন্দু ঘোষও সমাজের অত্যাচার অত্যাচারিতদের কথা এবং শোষণ, বঞ্চনা ও ধর্মান্ধতার

কথা তুলে ধরেছেন। আর মহাশ্বেতা দেবী তো আদিবাসী সমাজের অত্যন্ত সাধারণ মানের সহজ, সরল, অশিক্ষিত, চিরকালে নিপীড়িত মানুষের প্রাণের একেবারে কাছে চলে গিয়েছেন। শুধু তাই নয় তাদের ন্যায্য প্রাপ্য আদায় করার জন্য লড়াই করছেন ও সর্বসমক্ষে সাহিত্যের মাধ্যমে তা তুলে ধরছেন। কিন্তু এঁদের সকলের চাইতে আশাপূর্ণা দেবীর স্বাতন্ত্র্য এখানেই যে, তিনি যাদের কথা লিখে গেছেন তাদের কথা যে লেখা যায় তা কেউ কখনো ভাবনার জগতেই আনেন নি। অন্দরমহলের অত্যন্ত সাধারণ, শিক্ষা-দীক্ষা বর্জিত, আটপৌরে নারীদের মনের নানা অলিগলির যে অজস্র দিক, সেগুলো সুন্দরভাবে উঠে এসেছে আশাপূর্ণা দেবীর লেখনীতে। বাস্তব সংসার থেকে, মাটির ঘর থেকে যেসব আশা-হতাশা, বঞ্চনা, অবহেলা, প্রতিবাদ, বিদ্রোহ উঠে আসে তাকেই তিনি তুলে ধরেছেন ছোটগল্পগুলোতে। শুধু সমকালীন সাহিত্যিকেরা নন, বাংলা সাহিত্যে তাঁর মতো করে বোধহয় কোন সাহিত্যিকই এতটা ঘরোয়া, আটপৌরে উপাদান নিয়ে অসংখ্য রচনা করেননি। আমাদের চোখের সামনে অনবরত ঘুরে বেড়ানো মানুষগুলোর বাহ্যিক চেহারাটাই যে সব নয়, না দেখার মধ্যেও যে অনেক কথা রয়ে গিয়েছে সেটা আশাপূর্ণা দেবী উপলব্ধি করতে পেরেছেন। তিনি নিজে চারদেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ জীবন কাটিয়েছেন বলে সে সব নারীদের মনের কথা তিনি আন্তরিকভাবে অনুভব করতে পারতেন। কিন্তু মনের যে দিকগুলো দেখা যায় না, শুধু একটু নজর রাখতে হয়, সেটা তিনি করতেন। অর্থাৎ এককথায় যে অজস্র রচনা রাশি তিনি বাংলা সাহিত্য জগতকে উপহার দিয়েছেন তার জন্য ঘরের বাইরে তাঁকে চোখ রাখতে হয় নি। সমাজের দেশের বৃহত্তর সমস্যায় চোখ রাখতে হয়নি। তিনি নিজেও অত্যন্ত সহজ-সরল, আটপৌরে একজন বাঙালী নারী ছিলেন, আর বাঙালী ঘরের সাধারণ চিত্রগুলোও সহজভাবে তাঁর রচনায় উঠে এসে তাঁকে করেছে একেবারে অসাধারণ, স্বাতন্ত্র্যময়ী এক অনন্য লেখিকা, যা বাংলা সাহিত্যে বিরল।

বিশ শতকের প্রথম পাদে তখনও অতি নগণ্য সংখ্যায় নারী শিক্ষা জগতে এসেছেন এবং কেউ কেউ কর্মজগতে ঢুকে পড়েছেন, এরকম এক প্রেক্ষাপটে বাঙালি পরিবারের অন্দরমহল যে পরিবর্তনের ছোঁয়ায় সেভাবে আসেনি সেই অন্দরমহলে আবদ্ধ নারীর নানান দুঃখ-কষ্ট, বদ্ধতার যন্ত্রণা, রক্ষণশীল মনোভাবের শিকার হওয়া সেসব কথাই আন্তরিকতার সঙ্গে অনুভূতিপ্রবণ হয়ে লেখিকা দেখাতে চেয়েছেন এবং তাদের স্বাতন্ত্র্যকেও চিহ্নিত করে প্রকাশ করেছেন।

উপসংহার

সাহিত্যে যে পরিবর্তন আসে তার প্রায় সিংহভাগটাই নির্ভর করে সমাজের বিবর্তনের ওপরে। নানা ধরনের সামাজিক অনুশাসনের ভিত্তিতে সমাজ পরিচালিত হয়। সমাজের যত রীতি-নীতি, নিয়ম-কানুন তার প্রায় সমস্তটাই দেখা যায় নারীদের কেন্দ্র করে। নারীরা শুধু সামাজিক অনুশাসনের দ্বারা বলি-প্রদত্ত নন, গৃহের অভ্যন্তরে অন্দরমহলেও রয়েছে তাদের জন্য নানাবিধ শাসনবিধি এবং অনেক রকমের কথার ফাঁদ। আশাপূর্ণা দেবী ছিলেন এই সমাজেরই একজন নারী এবং তাঁর লেখায় নারীদের কথাই সর্বাধিক প্রাধান্য পেয়েছে। সমাজে শোষিত মানুষের একটা বড় অংশই ছিল নারীরা। অর্থ উপার্জনের সমস্ত দিকগুলো পুরুষেরা দখল করেছিল এবং ভবিষ্যতেও যাতে কোনরকমে নারীরা সে পথ অবলম্বন করতে না পারে সে দ্বারও পুরুষকেন্দ্রিক সমাজ রুদ্ধ করে রেখেছিল। অর্থাৎ শিক্ষা দীক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে পুরুষদেরই ছিল একচ্ছত্র আধিপত্য। নারীদের প্রবেশাধিকার সেখানে ছিল না। এই ব্যবস্থাটাকে বাড়ির বর্ষীয়সী মহিলারাও সমর্থন করতেন। আশাপূর্ণা দেবী নিজে ছিলেন এই পরিস্থিতির শিকার। তিনি নিজেও প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন না, অর্থাৎ সামাজিক প্রচলিত রীতির জন্য বিদ্যালয়ে গিয়ে শিক্ষালাভ তাঁদের বাড়ির মেয়েদের হয়ে ওঠে নি। বাড়ির অভিভাবিকা হিসেবে তাঁর ঠাকুরমার মনোভাব হল মেয়েদের লেখাপড়া শেখা নিষ্প্রয়োজন, এর ওপরে কথা বলা তাঁর বাবা-কাকা কারো ক্ষমতা ছিল না। যথারীতি কেউ এ নিয়ে চিন্তান্বিতও ছিলেন না। কিন্তু যেহেতু আশাপূর্ণা দেবীর মায়ের ছিল অসীম সাহিত্যপ্রীতি, আর তাঁর বাবা, মায়ের এই দিকটাকে সুনজরে দেখতেন, তাই বাবার উৎসাহেই বাড়িতে আসত বিভিন্ন লাইব্রেরীর প্রচুর বই ও পত্র-পত্রিকা। আশা পূর্ণা দেবীও ছেলেবেলায় দাদাদের বই পড়ে পড়ে অনেক কবিতা মুখস্থ করে ফেলেছিলেন। বই পেলেই দুরন্ত মেয়ে শান্তশিষ্ট সুবোধ বালিকায় রূপান্তরিত হয়ে যেত বলে বহু সন্তানের জননী সরলাসুন্দরী দেবী এই লোভটা ছাড়েন নি। সময় সুযোগ পেলেই মেয়ের হাতে গল্পের বই ধরিয়ে দিতেন। ফলে বিদ্যালয়ের প্রথাগত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হলেও সাহিত্যের অঙ্গনে বিচরণ থেকে তিনি বঞ্চিত হন নি। বরং সুবিধার দিকটাই বেশি ছিল, বড়দের এবং ছোটদের সকলের বইই পড়ার তিনি সুযোগ পেতেন।

তথাপি আশাপূর্ণা দেবীকে যে দিকটা মানসিকভাবে পীড়িত করত তা হচ্ছে পুত্র-কন্যার মধ্যে বৈসাদৃশ্য। পুত্র-সন্তানের প্রতি প্রতিটি বাড়ির সদস্যদের প্রয়োজনানুযায়ী বিশেষ যত্ন-আত্তি অথচ কন্যা-সন্তানদের প্রতি প্রত্যেকের অসীম অবহেলা — যা নাকি প্রতিনিয়তই ঘটে যাচ্ছে। "ছেলেরা

যেন পরম মাণিক, মেয়েরা কিছুই নয়" — এই বোধটা বিশেষভাবে তাঁর মনে গেঁথে গিয়েছিল বলেই হয়তো নারীদের দিকটাই তাঁকে ভীষণভাবে ভাবাত। আর সেই ভাবনার প্রতিফলনেই আমরা বেশ কিছু জীবন্ত প্রতিবাদী নারী চরিত্রকে তাঁর লেখনীতে বিকশিত হয়ে উঠতে দেখি। যে সময়ে নারীদের নিজেদের মান-অপমান এবং আত্মসম্মানবোধ বলে কোন কিছু ছিল না এবং সমস্ত রকমের অগ্রগতির পথ নারীদের সম্মুখে অবরুদ্ধ হয়ে থাকলেও তাতে নিজেদের বঞ্চিত ও অপমানিত বলে মনে করতো না — সে সময়েই 'সত্যবতী'র (প্রথম প্রতিশ্রুতি'র নায়িকা) মতো নারীর জন্ম হল আশাপূর্ণা দেবীর লেখনীতে।

আশাপূর্ণা দেবী আজীবন অত্যন্ত সাধারণ একটি নারীর মতো জীবন যাপন করে এসেছেন। পনের বছর বয়সেই তাঁর বিবাহ হয়ে যায় এবং স্বামী-শ্বশুর-শাশুড়ী-দেবর সকলের প্রতি যথাযথ কর্তব্য পালন করে গিয়েছেন। নিজে যখন গৃহিণী হলেন তখনও সন্তানদের প্রতিপালন, সংসার যাত্রা নির্বাহ, বৃদ্ধা শাশুড়ীর সেবা — স্বহস্তে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পালন করে এসেছেন। বিবাহের পূর্বেই কবিতা লেখা শুরু করলেও বিবাহের পরে পরম নিষ্ঠার সঙ্গে সংসারধর্ম পালনের মধ্য দিয়ে শুরু করলেন উপন্যাস ও ছোটগল্প রচনা।

১৩৪৩ বঙ্গাব্দে 'পত্নী ও প্রেয়সী' আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয় আশাপূর্ণা দেবীর রচিত প্রথম ছোটগল্প হিসেবে। এভাবেই তাঁর সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভাব। সংসার জীবনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তার ক্রমাগত পরিণতি দেখা দিয়েছে। তিনি নিজেই বলেছেন —

> "বিচিত্র চরিত্র এই মানুষ জাতটাকে কে কবে চিনেছে? এ কত উল্টো পাল্টা উপাদান দিয়েই তৈরী। এর মধ্যে কত রং, কত লীলা, কত বিস্ময়! সে নিজেই জানে না কি জন্যে কী করে বসে। জানে না তার চেতনে অবচেতনে কোথায় কি আছে, তার 'মন' নামক বস্তুটা কী জটিলতার জালে আবদ্ধ।"
>
> *(পৃ. ৮ আর এক আশাপূর্ণা)*

রক্ষণশীলতা ও নানা সামাজিক অনুশাসনের জালে আবদ্ধ থাকা নারীদের মধ্যে কিভাবে ধীরে ধীরে পরিবর্তন ঘটছে, নারীরা শিক্ষিতা, আধুনিকা হয়ে উঠছেন — অর্থাৎ নারীদের বিবর্তনও তাঁর চোখে পড়েছে। এই পরিবর্তনকে তিনি তাঁর মর্মে অনুভব করতে পেরেছেন, এর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন এবং লেখনীতেও তাদের রূপ দিয়েছেন। কিন্তু এই পরিবর্তনকে দেখার জন্য তিনি কখনো বাইরে যান নি। তিনি নিজমুখেই বলেছেন —

> "আমি চিরদিনই চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দী। আমার পৃথিবী জানলা দিয়ে দেখা।"
>
> *(পৃ. ১৫, ঐ)*

তাঁর অনুভূতিপ্রবণ মনে নানা ধরনের বোধ ক্রমশঃ নানারূপে সত্য ও স্পষ্ট হয়ে প্রতিকায়িত হচ্ছে এবং সেগুলোই তাঁর রচনাকে ধীরে ধীরে পরিপক্ক করে তুলেছে। এ প্রসঙ্গে আশাপূর্ণা দেবীর মনোভাব সম্পর্কে স্মরণযোগ্য হচ্ছে তাঁর নিম্নোক্ত সাক্ষাৎকারটি —

"I always think of the unhappy, the helpless women, but I do try to aviod writing about unhappiness in the physical sense, about hunger, poverty, unemployment, violence etc. I am more concerned with human relationships with the mental and emotional tensions created by society, with the hypocrisis and double - standards in society, with the contradictions between external appearances and the inner world. (A Brief Encounter with Ashapurna Devi : Shivani Banerjee Chakraborty, News Letter, School of women's studies, J. U. March, 2000)."

আশাপূর্ণা দেবীর আরো আগে থেকেই অনেক স্ত্রী সাহিত্যিকরা সাহিত্যাঙ্গণে পদার্পণ করেছেন, তাঁদের লেখনীতেও বাস্তব সত্য ও সমাজ চিত্র নানাভাবে বিকশিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু আশাপূর্ণা দেবীর মতো অন্তঃপুরের অন্তঃপুরিকাদের অন্তঃস্থলে তেমনভাবে কেউ প্রবেশ করতে পারেন নি। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন —

"জীবন পর্যালোচনার বিশিষ্টতায় আশাপূর্ণা দেবীই অগ্রবর্তিনী। ... লেখিকার জীবন নিরীক্ষার সত্যসার এই গৃহজীবনের মধ্যেই নিহিত আছে।"

(পৃ. ৩৩৯ — বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা)

সাহিত্য একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্তা লেখিকা নবনীতা দেবসেন তাঁর এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, জাতীয় স্তরে এবং কখনও ভারতের বাইরেও রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের পরেই পরিচিতির দিক থেকে আশাপূর্ণা দেবীর স্থান রয়েছে। দক্ষিণ ভারতে আশাপূর্ণা দেবীর এতটাই প্রভাব রয়েছে যে, কেরালায় অনেক দম্পতিরা তাদের কন্যাসন্তানের নাম পর্যন্ত 'আশাপূর্ণা' রেখেছেন।

আশাপূর্ণা দেবীর জীবনে অনেকবার বাড়ি বদলের ঘটনা ঘটেছে। তিনি জীবনে অনেক শোক, কষ্ট, আঘাতের সম্মুখীন হয়েছেন আবার অনেক সম্মান ও পুরস্কার লাভ তাঁকে উচ্চাসনে আসীন করেছে। কিন্তু জীবনের ঘটনার গতিপথ পরিবর্তনে বা উত্থান-পতনে তিনি চিরকাল থেকেছেন অবিচল। হর্ষ ও বিষাদকে মর্মে অনুভব করে উৎফুল্ল ও ব্যথিত হতেন, কিন্তু উচ্ছ্বসিত-উদ্বেলিত হয়ে উঠতেন না। এই মনোভাবটা তখনই তৈরি হয় যখন মানুষ সমস্ত লোভ, লালসা, মোহ পরিত্যাগ করে শুধুমাত্র নির্মল ও উদার মনের মানুষ হয়ে কর্মজগতে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারে। আশাপূর্ণা দেবীও ছিলেন তদ্রূপ। তিনি তাঁর কর্ম সম্পর্কে এতটাই আন্তরিক ছিলেন যে, প্রতিটি ঘটনা এবং চরিত্র তাঁর রচনায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে, যা নাকি পাঠক সমাজকে অন্তরে দোলা লাগিয়ে যায়। যে সমস্ত সাধারণ অন্তঃপুরিকারা সাহিত্যের পাতায় স্থান পেয়েছে, তাঁরা যে কখনও সাহিত্যক্ষেত্রে চরিত্র হয়ে উঠবে, তাদের মন-সমস্যা-দ্বন্দ্বও যে গল্পের উপাদান হয়ে উঠতে পারে, তা বাঙালী পাঠককুল এতদিন ভাবতেই পারেনি। আশাপূর্ণা দেবী প্রথম সকলের সম্মুখে এদের উপস্থিত করে বুঝিয়ে দিলেন পর্দার আড়ালে যারা রয়েছে তাদেরও ব্যথা-অভিমান-আবেগ-যন্ত্রণা রয়েছে। তাদেরও নিজস্ব স্বরূপ ব্যক্তিত্ব রয়েছে যা নাকি সে সমস্ত চরিত্রদের পরিপূর্ণ মানবী করে তুলতে পারে। এইসব

নারীদের আত্মসচেতনতাবোধ এক একটি পরিবারের মধ্যে আলোড়ন তুলে দিতে পারে। আমরা 'তাসের ঘর' এ মমতাকে দেখি কেমনভাবে তার দীর্ঘদিনের সংসারকে এক লহমায় ভুলে গিয়ে অজানা জগতে একাকিনী বেরিয়ে পড়েছে। মমতার সামান্যতম অপরাধকে কেউ বুঝতে চাইল না, এমনকি তার স্বামীও নয়; জোয়ারের মত একটা মিথ্যা গল্পকে নিমেষে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে সত্যি বলে দাঁড় করিয়ে দিল এবং সংসারের প্রতি মমতার সমস্ত অবদানের কথা ভুলে গিয়ে তাকে কুৎসিত চেহারায় মানুষের কাছে, সমাজের কাছে উপস্থাপিত করল। এই ব্যাপারটিও অন্দরমহলেরই একজন নারী তথা মমতার বিধবা ননদের দ্বারা ঘটেছিল। পরিণামে মমতার মধ্যে জন্ম নিয়েছে এক প্রতিবাদী বিদ্রোহিণী নারী সত্তা, যা আশাপূর্ণা দেবীর লেখনীকে এবং মানসিক পরিণামকে আরো এক ধাপ এগিয়ে দিল।

আশাপূর্ণা দেবী তাঁর রচনাতে বিধবা নারী চরিত্রগুলোকে উপস্থাপিত করেছেন। কারণ পরিবারে বিধবারা একটা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করত, যদিও সেটা শ্রেণিভেদে হত। যেমন - এক শ্রেণির বিধবা-নারী ছিল বাড়ির মেয়েরা, আর একদল ছিল আত্মীয়ারা। উভয়পক্ষই বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহের শিকার হলেও বাড়ির মেয়েরা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেই থাকতেন। কিন্তু আত্মীয়ারা সর্বদাই দয়ার পাত্রী হয়ে জীবন অতিবাহিত করতেন। এরা সমাজের বুকে ছিলেন অপাংক্তেয়, সমস্ত আনন্দ উৎসব সুখভোগ বিলাস ব্যসন থেকে তাদের দূরে থাকতে হত। কিন্তু এদের মনেও থেকে যেত সংসারের সাধ, একান্নবর্তী পরিবারগুলোতে প্রভাব বিস্তার করে ভাই-ভাজ-ভাইপোদের মধ্যেই নিজেদের পূর্ণতাকে পেতে চাইতেন। আর এদের ভালো-মন্দ উভয়প্রকার প্রভাবই বাকী চরিত্র এবং ঘটনাগুলোকে প্রভাবিত করত। বিধবাদের আহার-বিহার পর্যন্ত সংসারের অন্যান্য নারীদের দয়ার উপকরণ ছিল। যেমন **'ছিন্নমস্তা'** গল্পে আমরা দেখতে পাই বিধবা শাশুড়ীর ডাঁটা চচ্চড়ি খাওয়া নিয়ে নববিবাহিতা পুত্রবধূর ব্যঙ্গোক্তি, যা নাকি অত্যন্ত কষ্টদায়ক ও অপমানজনক ছিল। 'স্বজাতি' গল্পেও দেখি সেই নারীকে — যেখানে শিবানী বিধবা না হলেও নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর পত্নী হিসেবে প্রায় বিধবার সমগোত্রীয় করে রাখা হয়েছে তাকে। মায়েদের চোখে একমাত্র সন্তানের শোকই বড় নয়; রোজগেরে সুউপায়ী পুত্রের দামই অনেক বেশি। এই দিকগুলো আশাপূর্ণা দেবী বাস্তবের কঠিন বাতাবরণ থেকে এত সুন্দরভাবে আহরণ করে আনেন যে, পাঠককুলের অপরিচিত চিত্র বলে মনে হবার কোন অবকাশই থাকে না। মাতৃহৃদয় শুধু যে চিরকল্যাণকামী, সহৃদয়, কোমলা হয় তাই নয়, আপাত স্নেহের অন্তরালে মায়ের নিজের আত্মতৃপ্তি চরিতার্থতার কথাই রয়েছে আশাপূর্ণা দেবীর এই গল্পগুলোতে।

নারীর বহুরূপ চিত্রণের মধ্যে আর একটি দিক আশাপূর্ণা দেবী আলোকিত করেছেন তা হল নারীর ব্যক্তিসত্তার দিকটি। নারীরা অর্থের দিক থেকে স্বাবলম্বী নয় বলে যে তারা পুরুষতান্ত্রিক

সমাজের দেওয়া গালমন্দ, অপমান সব হজম করে সংসারে পড়ে থাকবে তা নয়। নিজের পছন্দ, ভালোলাগা, মন্দলাগা যে পরিবারের সম্ভ্রমের ওপরেই সর্বদা নির্ভর করবে তাও নয় — এ ধরনের প্রতিকূলতাকে জয় করেও কিছু নারীরা বেরিয়ে আসতে পেরেছে। 'ছায়াসূর্য' গল্পে আশাপূর্ণা দেবী ঘেঁটুর মধ্য দিয়ে ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণতাকে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন — তার ভালোলাগাই যেন ধনগর্বীদের বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ। তার প্রেমিক পুরুষটির অসুস্থতা ও মৃত্যু ঘেঁটুকে আরো পরিপূর্ণ মানবী করে তুলতে সহায়তা করে। 'বৈরাগ্যের রং' গল্পে আত্মত্যাগী ভালোবাসায় উৎসাহী কোমল নারীর ভেতরে যে দৃঢ়চেতা একটি মানুষের জন্ম হল অথচ সেটা সমাজ সংসারে থেকেও সকলের চোখের আড়ালে রয়েছে তাকে উদ্‌ঘাটন করাতেই আশাপূর্ণা দেবীর স্বকীয়তা। এই দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁকে সাহিত্যের আঙিনায় পূর্ণ বিকাশে সহায়তা করেছে।

ব্যক্তিত্বের জাগরণই শেষ কথা নয়, ব্যক্তিত্ববোধকে স্বহস্তে স্তিমিত করে দিয়ে পুরানো চাল চলনে ফিরে যাওয়াও দেখা যায় আশাপূর্ণা দেবীর রচনায়। নারীদের স্বাধীনতা দেবার কথা, সমানাধিকারের সুযোগ দেবার কথা তিনি বারংবার বলেছেন যেমনভাবে আবার তেমনভাবে চিন্তিতও হয়েছেন প্রচণ্ড আধুনিকতার ঝোঁকে নারীদের মধ্যে অন্তঃসারশূন্যতা দেখা দেওয়ায়।

নারীর পরকীয়া প্রেমের উদাহরণও আশাপূর্ণা দেবীর রচনায় রয়েছে। সংসারজীবনে আবদ্ধ হলেও মানুষের মন যে একই স্থানে আবদ্ধ থাকবে সে রকম কোন কথা থাকতে পারে না বলেই পুরুষদের মনের নানা স্থানে অবস্থান দৃষ্টিগোচর হয়েছে অনেক উপন্যাস ও ছোটগল্পে। সেদিক থেকে নারীদের ক্ষেত্রেও এই ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশাপূর্ণা দেবী বিশ্বাস করেন। কিন্তু বাস্তবতার নিরিখে তার পরিণাম কি হয় তার অনেক নিদর্শন উপন্যাস ও ছোটগল্পে রয়ে গিয়েছে। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় নারীরা হল অন্দরমহলের বাসিন্দা, তারা বর্তমানে বহির্জগতে এলেও স্বাবলম্বীর সংখ্যা সেখানে পরিমিত। কিন্তু প্রতিটি সংসারের পুরুষকে জীবন ও জীবিকার সন্ধানে বহির্জগতে আসতেই হয়। এছাড়াও পুরুষদের সমস্তরকম ন্যায়-অন্যায় করার যেন একটা অলিখিত অধিকার রয়েছে; কিন্তু অনুশাসনের রকমারি গণ্ডী শুধুই তো নারীদের। তাই হয়ত নারীদের অন্যায়টা বেশি করে চোখে পড়ে। আবার আশাপূর্ণা দেবীই নারীর পরম স্নেহময়ী জননী রূপ, কল্যাণী বধূরূপের প্রতি চরম আস্থা জ্ঞাপন করেছেন, কারণ নারীরা স্নেহ কোমলতার আঁচল পেতে সমস্ত সুখ-দুঃখের ভার সহ্য করতে পারেন বলেই তো সংসার লাবণ্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। তারও পরে যদি কোন নারীর আলাদা কোন ভালোলাগা জন্মায় তাকে বাধা দেওয়া তো মনের গতিপথ রুদ্ধ করে দেওয়া। আশাপূর্ণা দেবী কোন রচনাতেই কি ঘটা উচিত বা অনুচিত তা বলেন নি, কিন্তু ঘটনাটি তুলে ধরেছেন। যেমন প্রলাপ, মৃত্যুবাণ, একটি ভাঙাচোরা গল্প, গুণ্ঠনবতী প্রভৃতি গল্পে নারীরা অপর পুরুষের প্রতি আসক্ত হয়েছে।

মধ্যবিত্তের সংসারে অভাব, দারিদ্র্য হল নিত্যসঙ্গী। দারিদ্র্যের কশাঘাত কিভাবে মানুষের মনের কোমল বৃত্তিগুলোকে শুকিয়ে ফেলে রুক্ষতায় পূর্ণ করে তুলছে তারও নিদর্শন মেলে আশাপূর্ণা দেবীর রচনায়। অর্থাৎ মধ্যবিত্তের জীবনচর্যার দিকগুলো যে ভয়াবহ পরিণতির দিকে যাচ্ছে, তার ফলে সমাজে ঘটছে অবক্ষয়, যা না কি অন্তঃপুরেও আলোড়ন সৃষ্টি করছে। দারিদ্র্যের ছোবলে জয়ন্তী আত্মহত্যা ('আত্মহত্যা') করে, রণক্লান্ত জয়ন্তীর সমস্ত মাধুর্য্য, সুষমা বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। যাদের সুখী রমণী হয়ে সংসারে লক্ষ্মীশ্রী বজায় রেখে চলার কথা তারা উল্টে সংসারকে শ্রীহীন করে চিরতরে বিদায় নিতে বাধ্য হয়। যেমন হয়েছে 'তোমার মুখে আয়নায় ছায়া' গল্পে তপনের বোন ঝুন্টিরও। আত্মহত্যা না করলেও অসুস্থ মা-বাবার সংসারে সমস্ত কাজকর্ম সামলে রুগীর সেবা করে অবশ্যই দারিদ্র্যকে অঙ্গের ভূষণ করে। সেক্ষেত্রে তার পক্ষে কোমলতা, সেবাপরায়ণতা যে বজায় রাখা সম্ভব নয়, সেটা আশাপূর্ণা দেবী অত্যন্ত সহৃদয়তার সঙ্গে অনুভব করেছেন। প্রাণশক্তি ছাড়া যেমন জীবন অচল, তেমনি বেঁচে থাকার ন্যূনতম উপাদানের অভাবেও জীবনে ছন্দপতন ঘটে থাকে। অভাবের তাড়নাগুলো নারীদের ওপর আরো বেশি প্রভাব বিস্তার করে। তাদের মনে, চেহারায় সেই ছাপটা প্রতিফলিত হয়ে ওঠে। অনেক পরিবারের অধঃপতন এবং ধ্বংসের জন্যও পরিবারের নারীদেরই দোষারোপ করা হয়। পারিবারিক জীবনে বিড়ম্বনার প্রতীক হিসেবে 'অঙ্গার' গল্পের 'নতুন বৌ' একটি জীবন্ত উদাহরণ। 'অপরাধ' গল্পে কল্যাণীও ধনী দেওরের নিকট স্বামীর সম্মান রক্ষার্থে দেওরেরই জামার সোনার বোতাম চুরি করে অতিথি সৎকার করে। এতে কল্যাণীর যে অব্যক্ত হৃদয় যন্ত্রণা তাকে দগ্ধে দগ্ধে মারছে সেটাই আশাপূর্ণা দেবীর মূল প্রতিপাদ্য। কল্যাণী এবং নতুন বৌ এর মতো নারীদের সম্পর্কে প্রচলিত রূপের মূর্ত প্রতিবাদই শুধু নয় বরং এরা একে অপরের পরিপূরক। নারীদের এই সংবেদনশীলতা আশাপূর্ণা দেবীর মতো অন্য এক লেখিকা নবনীতা দেবসেনকেও ভাবায়।

ডঃ সরোজ মোহন মিত্র আশাপূর্ণা দেবীর রচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন —

> "সাংসারিক জীবনে কত তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে কত সামান্য ঠোকাঠুকি, কত বিচিত্র তার সমস্যা কিন্তু যত তুচ্ছ সেই ঘটনাই হউক না কেন তাকে কেন্দ্র করে যে কত দীর্ঘশ্বাস, কত চোখের জল পড়ে আশাপূর্ণা দেবী সেই দিকেই বেশি লক্ষ্য রেখেছেন।"
>
> *(পৃ. ২৭৫, বাংলায় গল্প ও ছোটগল্প)*

পাঠক সমাজের চোখের সামনে যা ঘটে সেগুলো সাধারণ মানুষ শুধুই ঘটনা বলে মনে করে, কিন্তু অনুভূতিপ্রবণ আশাপূর্ণা দেবী তাকেই গল্পের উপজীব্য করে সাহিত্যের পাতায় তুলে আনেন বলে চেনা জিনিসকে নতুনরূপে সকলেই খুঁজে পান। পাঠকদের প্রত্যাশা যেন তাকে ঘিরে তাই বৃদ্ধি পেয়েছে, কারণ তাঁর মধ্যে পাওয়া যেত জীবন সম্পর্কে দৃঢ় ও শাশ্বত উপলব্ধি। তিনি যখন প্রথম জীবনে লিখতে শুরু করেন অর্থাৎ যে বোধ তাঁকে ভীষণভাবে নাড়া দিত — তা আশাপূর্ণা দেবীর

লেখার প্রেরণা হলেও তিনি সেখানে থেমে থাকেন নি। নিয়ত পরিবর্তনশীল সমাজ যেখানে নতুন নতুন সমস্যা, আন্দোলন ও আবিষ্কারের তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হচ্ছে তার ঢেউ এসে অবরুদ্ধ অন্দরমহলের দ্বারেও আঘাত করছে। তাই আশাপূর্ণা দেবী যে অধিকার হীনতার অন্ধকার কক্ষে আবদ্ধ অসহায়, নিরুপায়, নিষ্পেষিত মেয়েদের কথা বলতেন তাদের সেই দুঃসহ অবস্থা অনেকটাই ঘুচেছে। সেই নারীরাই শিক্ষাদীক্ষা প্রাপ্ত হয়ে কর্মজগতে প্রবেশ করে নিজের সম্মানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করছে। মানুষ হিসেবে সমাজের দুঃখ-সুখের একজন শরিক হতে পারছে। সংসারে শুধু হাঁড়ি সামলানো নয়, হাঁড়ি চড়ানোর মতো গুরু দায়িত্বও পালন করছে। কারণ, ততদিনে মেয়েরা বুঝতে পারছে পরিবারের সুশৃঙ্খলভাবে পথচলার মধ্যে তাদের অনেক কায়িক পরিশ্রম থাকে, কিন্তু যেহেতু সেখানে অর্থের কোন সংযোগ নেই, তাই সে পরিশ্রম অর্থহীনই থেকে যায়। এর ফলেই নারীদের মধ্যে স্বাবলম্বী হবার চেতনার সঞ্চার ঘটেছে। আশাপূর্ণা দেবী তার ত্রয়ী উপন্যাসে নারী জাগরণের কারণ থেকে শুরু করে এর পরিণাম পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। লেখিকার উপরোক্ত মানসিকতা থেকে দেখতে পাই অনেক গল্পেই নারীরা গৃহগত পরিবেশ থেকে বহির্জগতে এসে কর্মের মাধ্যমে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে। যেমন — 'না', 'ব্রহ্মাস্ত্র', 'দৃষ্টি', 'একটি ফুটো পয়সার জের', 'সিঁড়ি', 'দাসত্ব' প্রভৃতি। আশাপূর্ণা দেবী নিজেও চেয়েছিলেন নারীরা এভাবে কর্মজগতে প্রবেশ করুক।

আশাপূর্ণা দেবী নারীদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার যে কথা বলেছেন তার পাশাপাশি এও বলেছেন যে, কল্যাণী ও শ্রীময়ী মূর্তিতে ঘরের শান্তি-শৃঙ্খলাকেও বজায় রাখতে হবে। কারণ গৃহে শান্তি বিরাজ করলেই কর্মজগতে এবং দেশেও শান্তির বাতাবরণ তৈরি হবে। আশাপূর্ণা দেবীর এই মনোভাবের প্রতি আলোকপাত করে নিতাই বসু বলেছেন —

> "আশাপূর্ণার দৃষ্টিতে যেহেতু নারীই পৃথিবীর শ্রী ও উজ্জ্বলতার প্রতীক তাই স্নেহে সেবায় ক্ষমায় আত্মত্যাগে স্বার্থত্যাগে তাকে পুরুষের চেয়ে অনেক বেশি দায়িত্ব পালন করতে হবে। নারী হল মানুষ গড়ার কারিগর।"
>
> *(পৃ. (ix) ভূমিকা, আশাপূর্ণা দেবীর রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড)*

পৃথিবীকে সৌন্দর্য চেতনায় বিকশিত করে তুলে আধ্যাত্মিকতার পরিমণ্ডল গড়ে সুন্দর একটি ধ্যান গম্ভীর শান্ত পরিবেশ রচনা করে নিতে হবে নারীকেই, আর সেজন্যে প্রথমে নারীকে হতে হবে ঈশ্বর বিশ্বাসী। আশাপূর্ণা দেবীর পুত্রবধূ, নূপুর গুপ্ত বলেছেন —

> "মানুষের শুভবুদ্ধির প্রতি তাঁর অটল বিশ্বাসের উৎস কিন্তু তাঁর অবিচল ভগবৎ বিশ্বাস — যা তাঁকে আজীবন সমস্ত শোক-তাপ-সমস্যার দুর্যোগে আশ্রয় দিয়ে মনোবল বাড়িয়েছে।"
>
> *(পৃ. (xii) আশাপূর্ণা দেবীর রচনাবলী প্রথম খণ্ড)*

তিনি একজন মহৎপ্রাণ মানুষ চেয়েছেন ঠিকই কিন্তু, যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের রুচি ও প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটছে। আশাপূর্ণা দেবী নিজেও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে তাঁর চিন্তা চেতনাকে

আধুনিক জীবনকেন্দ্রিক করে তুলেছেন। এর ফলে তাঁর চোখে যে দ্বন্দ্ব সংঘাত ধরা পড়েছে তা পরিবার, মানুষের মন বা ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে একেবারে আদর্শের দ্বারে উপনীত হয়েছে। তাই আশাপূর্ণা দেবী নিজেই বলেছেন —

> "আজকের সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে আজকের মেয়েরা অনেক পাচ্ছে, তবু আগের যুগের মেয়েদের মতোই কানাকড়িটুকুও সামলাতে চাইছে।"
>
> *(পৃ. (x) — ভূমিকা — রচনাবলী চতুর্থ খণ্ড)*

ধীরে ধীরে নারীদের মধ্যে পরকে আপন করে নেওয়া এবং ভালোবাসার গভীরতাটা যেন ক্রমশঃ স্বল্পাকার ধারণ করছে। যেমন — 'স্বাধীনতার সুখ', 'পাকা ঘর', 'সত্যাসত্য', 'শাড়ী মাহাত্ম্য', প্রভৃতি গল্পে নারীদের যে দিকগুলো ধরা পড়েছে তাই আশাপূর্ণা দেবীকে চিন্তান্বিত করে তুলেছে; তাঁর স্বপ্ন, আদর্শ ভ্রষ্ট হতে চলেছে বলে। মেয়েদের সম্পর্কে আশাপূর্ণা দেবীর আর একটি বাস্তব ধারণা ছিল যে, মেয়েরা মেয়েদের প্রতি সহানুভূতিশীল নয়। কারণ, বধূ নির্যাতনের মতো ভয়ংকর ঘটনাগুলো শুধুমাত্র স্বামীদের জন্য ঘটে না, মূল ভূমিকায় কোন না কোন নারীই বর্তমান। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি উক্তি এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য —

> "কখনও কখনও বাহিরের আগন্তুক আসিয়া পরিবারের আভ্যন্তরীণ সংঘাতকে আরও তীব্র ও জটিল করিয়া তোলে। এই বিক্ষুব্ধ পরিবেশে জীবনের যে রূপ দেখা দেয় তাহা অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও বিকৃত। এমনকি উদার, আদর্শবাদী মনও এই গ্লানিময় পরিবেশে বৃথা সংগ্রামে আত্মক্ষয় করে ও সহজ, প্রসন্ন সার্থকতা হইতে বিচ্যুত হইয়া এক চিত্তদাহকারী দাবানলে সমস্ত সুন্দর ও সুকুমার বৃত্তিকে ঝলসাইয়া ফেলে।"
>
> *(পৃ. ৩৪০ — বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা)*

যে সময়ে নারীরা সংসারে অনেক সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে সে সময়ে তাদের মধ্যে পাবার নেশাটা আরো প্রকট হয়ে দেখা দিচ্ছে ফলে তখন নিজেকে একেবারে নিজের মতো করে না পাওয়া পর্যন্ত যেন সাধ মিটছে না। পরিবারের অন্যান্যদের ভালোবাসা, আন্তরিকতা তখন তিক্ত ও কটু বলে মনে হয়। এভাবেই অখণ্ড সংসারটা ভেঙ্গে একটা খণ্ডচিত্রে রূপান্তরিত হল। যার মধ্যে ফুটে উঠল সংসারের কর্তৃত্বের প্রতি অবমাননা, নিজের চাহিদা সম্পর্কে সচেতনতা এবং সেই চাহিদাকে পূর্ণ করে তোলার দুঃসাহস। এ প্রসঙ্গেও শ্রদ্ধেয় ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন —

> "আজ বাঙালী পরিবারের ইহাই একটি সাধারণ, মর্মান্তিকরূপে সত্য চিত্র। বিশেষতঃ আধুনিক যুগে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের উগ্র আতিশয্য ও কর্তৃপক্ষের নির্দেশের প্রতি অসহিষ্ণুতার ফলে এই মতানৈক্য তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া সাংসারিক শান্তিকে বিধ্বস্ত করিতেছে।"
>
> *(পৃ. ৩৪১ — বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা)*

আধুনিক নারী স্বাধীনতা নারী কোমল বৃত্তিগুলির বিনাশ ঘটিয়ে তাকে আত্মসুখপ্রবণ করে তুলেছে।

আশাপূর্ণা দেবী নারীদের অন্যান্য দিকের মতো অভিনয় ক্ষমতার দিকটির কথাও উল্লেখ করেছেন। যে নারী যতবেশি অভিনয় পটু তার সুনাম, খ্যাতিও যে ততবেশি তা তিনি মানেন। জায়া

ও জননীরূপে নারীরা বিরাজিত হয়ে পূর্ণ ও তৃপ্ত হলেও কিন্তু সেই পূর্ণতার প্রতিষ্ঠা নির্ভর করে অভিনয় দক্ষতার ওপরেই। অভিনয়কে মূলধন করে নারী যতদিন চলতে পেরেছে ততদিন সংসারের একূল-ওকূল উভয়দিকই বজায় থেকেছে। নিজের সুখ আলাদা করে পেতে চায়নি। কারণ নিজের দিকে তাকালেই চরিত্রটির অভিনয় ক্ষমতা লোপ পেয়ে যাবে। আর নারী যদি পক্ষপুট বিস্তারিত করে সংসারকে অভিনয়ের ছলনায় আবৃত করে না রাখে তবে তো সেই সংসার হাড় মাস আলাদা হয়ে অস্থিচর্মসার হয়ে পড়বে। তাই এই গুণটিকেও আশাপূর্ণা দেবী অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে অনেক গল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'অভিনেত্রী' গল্পে অনুপমার পিতা, শ্বশুর, স্বামী এবং পরবর্তীকালে পুত্রের সঙ্গেও সমানভাবে অভিনয় করে গিয়েছেন। অনুপমার কথায় প্রত্যেকে যথেষ্ট খুশী হয়েছে এবং সকলেরই তাকে মনে হয়েছে বড্ড আপনার জন। নিজের সম্পর্কে যখন নিরাসক্তি জন্মায় একটা মানুষ তখনই সকলের মনের সন্ধান রেখে চলতে পারে। অনুপমারও তাই মনে হত, তার ফলে অভিনয়টাই যেন তার কাছে একটা নেশার মত হয়ে গিয়েছিল। আজন্মকাল তিনি সকলের বিশ্বাসের আশ্রয়স্থল হিসেবে ছিলেন এবং পুরুষ জাতির নানা রূপকে অভিনয়ের ছলাকলায় ভুলিয়ে শান্ত রেখেছেন। শুধু অনুপমাই নয় 'অনাচার' গল্পে সুভাষ কাকীমা বিধবা হয়েও বৃদ্ধ, অসুস্থ শ্বশুরের মনে নতুন করে আর পুত্রশোকের ব্যথা দিতে চাননি বলে নিজে সধবার সাজ বজায় রেখে সেইমতো অভিনয় করে যান। তার সেই অভিনয় সমাজে নিন্দিত হয়েছিল। কিন্তু আশাপূর্ণা দেবী মনে করতেন নারী মাত্রেই অভিনেত্রী। অনুপমা সমস্ত নারীর প্রতীক হয়ে গল্পের একটি চরিত্ররূপে দেখা দিয়েছে। সমস্ত কিছুই যেমন একটা স্থানে গিয়ে স্তিমিত হয় অভিনয়ের ক্ষেত্রেও তাই। নারীরা সকলের মনে শান্তি স্বস্তির যোগান দিতে গিয়ে নিজেকে ভুললেও বর্তমান জগতে নারীরা আর নিজেকে ভুলে থাকতে চায় না। নদীর মতো আপন গতিতে পথ চলতে গিয়ে প্রথমেই ছেড়ে গেল অভিনয়কে। কারণ এই সমাজের নানা রীতি-নীতি-সংস্কার-ধর্মের নামে অনুশাসন তাদের নিকট অসহনীয় হয়ে উঠল। নিজেদের অন্তরে বন্ধনদশার যে করুণ অবস্থা উপলব্ধি করতে পারল তখনই তারা এই যন্ত্রণাকর যুগকে আর মেনে নিতে পারল না, এর অবসান চাইল। গড়ে উঠল নারীর মধ্যে আত্মমর্যাদা আর আত্মপ্রতিষ্ঠার ইচ্ছা।

আশাপূর্ণা দেবী শিল্পী হিসেবে নির্মমভাবে সত্যকে উন্মোচিত করেছেন। আশাপূর্ণা দেবী ছোটগল্পের আঙিনাতে দীর্ঘদিন বিচরণ করেছেন। তিনি প্রথম যখন ছোটগল্প লেখা শুরু করেন তখনও তাতে যথেষ্ট গ্রন্থন নৈপুণ্য ধরা পড়ে না। এ প্রসঙ্গে ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন —

> 'আশাপূর্ণার গল্পের প্লট গঠন যে সর্বত্র নিখুঁত ও আঁটসাট তা বলা যাবে না। কারণ তিনি গল্প লেখেন না, গল্প বলেন। তাঁর রচনার মধ্যে যেন কোন কথকঠাকুর লুকিয়ে আছেন, অথবা ঠানদিদি।"
>
> *(পৃ. (xvii) ভূমিকা — রচনাবলী প্রথম খণ্ড)*

গল্প লিখতে গেলে গল্প রচনার বৈশিষ্ট্যগুলোর যথাযথ বিকাশের দিকে যতটা নজর দেওয়া প্রয়োজন

মনে করতেন তার চেয়ে কি বলতে চাইছেন তিনি — সেটাই তাঁর নিকট বেশি গুরুত্ব পেত। তাই এককথায় তাঁর রচনাকে বলা যায় বক্তব্য প্রধান। মানুষের জীবনের সমস্যাগুলো তাঁকে ভাবিত করত, কিন্তু সমস্যা সমাধানের পথ আবিষ্কার তাঁর চিন্তার বিষয় নয়, তাই তাঁর রচিত গল্পগুলো সমস্যা প্রধানও বটে। সমস্যা বিজড়িত এই বিষয়গুলো প্রত্যেকটি সহানুভূতিসম্পন্ন মানুষের হৃদয়কে আলোড়িত করে তুলত আবেগে, ব্যথায় ও ভাবনায়। কারণ, গল্পগুলো পাঠ করার পর দেখা যেত যেন পাঠকের একেবারে পাশের মানুষটির কথা বলা হচ্ছে। যাকে চোখের সামনেই এই অবস্থায় দেখা যাচ্ছিল, কিন্তু এভাবে যেন তার সম্পর্কে ভাবা হচ্ছিল না। গল্পের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে যে চরিত্র থাকে এবং তার যে সমস্যা গল্পে বিকশিত হয়ে ওঠে তার ভেতরেও যে মানবিক কোন আবেদন থাকতে পারে লেখিকা তা দেখিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত যেন অন্যান্যদের দৃষ্টিগোচর হয় না। যেমন 'অনাচার' গল্পে সুভাষ কাকীমা যে তার অসুস্থ বৃদ্ধ শ্বশুরের কথা ভেবে নিজের সমস্ত কষ্ট, দুঃখ শোককে বুকে চেপে রেখেছিলেন সেটা সমাজের সকলের চোখ এড়িয়ে গেছে, প্রাধান্য পেয়েছে সুভাষ কাকীমার সধবার সাজ পোষাক, খাওয়া-দাওয়ার সুখ বজায় রাখার চেষ্টাটাই। কিন্তু স্বামী বিয়োগ ব্যথার মত কষ্টকেও যে একটা মহৎ উদ্দেশ্যে চেপে রেখেছেন — সেটা চাপা পড়েই থাকত পাঠক সমাজের কাছেও, যদি না আশাপূর্ণা দেবী এই দিকটাতে আলোকপাত করতেন। অর্থাৎ এককথায় বলা যায় তাঁর রচনাগুলো বাস্তব ঘটনা প্রধান।

আশাপূর্ণা দেবীর রচনা ভাবাবেগবর্জিত, বুদ্ধিদীপ্ত, অসীম মমতায় পরিপূর্ণ দৃঢ়তার, ঋজুতার সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি নিয়ে স্বমহিমায় প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। আশাপূর্ণা দেবীকে প্লট খুঁজতে কোথাও যেতে হয় না বা কোন চিন্তা ভাবনার জগতেও ডুব দিতে হয় না। গৃহকর্মে সুনিপুণ দক্ষতায় সকলের সাথে বিরাজ করলেও মনোজগতে যে একাকী বিচরণ করতেন তাই তাঁকে সকলের চেয়ে আলাদা করে রাখত। এই আত্মমগ্নতা তাঁকে চতুপার্শ্বের ঘটনাগুলোকে অনুভব করতে এমনভাবে সহায়তা করত, যার ফলে মনে হত তিনি যেন ধূর্জটির তৃতীয় নয়নের মতো ঘরে বসেও অপ্রত্যক্ষকে প্রত্যক্ষ করতে পারছেন। এই অনুভূতি থেকেই তৈরি হয় চরিত্রগুলো। বাস্তবের সমস্যাগুলো আর চরিত্রগুলোকে তিনি এতটাই পাশাপাশি রেখে লিখতে শুরু করেন যে চরিত্রগুলো প্রত্যেকে যেন রক্তমাংসের মানুষ হয়ে পাঠকের চোখের সম্মুখে চলাফেরা করে। ঘটনার বাস্তব সত্যতা এবং বক্তব্যের গভীরতা নির্ভর করে চরিত্রের বিকাশের ওপর। চরিত্রকে সঠিকভাবে অত্যন্ত দরদ দিয়ে আশাপূর্ণা দেবী প্রথমে ভাবতেন এবং সেই চরিত্রকে ঘিরে প্লট গড়ে উঠত ও চরিত্রকে জীবন্ত করে তুলতেই তিনি সংলাপ ও ভাষার সুপ্রযুক্ত ব্যবহারও করেছেন। স্বভাবতই তিনি যেহেতু নারীকেন্দ্রিক বিষয়কেই রচনায় স্থান দিতেন তাই তাঁর রচনাতে নারী চরিত্রগুলোই সজীব, স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠেছে। সেই হিসেবে তাঁর রচনায় পুরুষ চরিত্ররা বেশ দুর্বল, ভীরু; আবার কখনো বা একগুঁয়ে জেদী ও স্থূল। কোন বিশেষ

ছকে আশাপূর্ণা দেবীর সৃষ্ট চরিত্রগুলোকে ধরা যায় না। কারণ কোন গতানুগতিকতা লেখিকাকে ভাবাবার সুযোগ দেয় না। তিনি মনে করতেন যে, তিনি মূলতঃ চরিত্রকেই ভাবেন, আর তাই তাঁর রচনা হচ্ছে চরিত্র প্রধান। কারণ, মানুষের মনের অভ্যন্তরে যে সংস্কারের শিকড় এবং অহংবোধ প্রোথিত রয়েছে — তাই মানুষকে চালিত করে। আশাপূর্ণা দেবী এই বিষয়টা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন বলেই মানুষের দু'একটা সংলাপেই তাদের প্রকৃতিকে বুঝতে পারতেন। আর তাই তাঁর সৃষ্ট চরিত্ররা প্রত্যেকেই অভিনবত্বের এবং সতেজতার দাবী রাখে। এই চরিত্রগুলোকে সার্থক করে তুলতে গিয়ে যে প্লট তৈরি হত, তাও হত অভিনব। আবার এ সমস্ত চরিত্রের কেউ বা সামাজিক অনুশাসনে গড়া — যেমন, 'পরাজিত হৃদয়', আবার কেউবা প্রকৃতির শাসনে শাসিত — 'ভয়'। চরিত্রের কথা বলতে গিয়েও কতকগুলো গল্পে ব্যক্তিচরিত্র বিকশিত হয়ে যুগচরিত্রে উন্নীত হয়েছে। অর্থাৎ এমন এক একটি চরিত্র রয়েছে যারা একটা যুগের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করছে। আশাপূর্ণা দেবী চরিত্রদের মনের কথা বলতে গিয়ে কখনো মনস্তাত্ত্বিক জটিলতায় ডুব দেননি। ফলে চরিত্রগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব, দোলাচলতা, নিজের অন্তরের গহনে ডুবে গিয়ে মুক্তোর সন্ধানের প্রয়োজন হয়নি বলে তাদের আত্মমগ্ন হয়ে নিজের কথা আত্মকথন রীতিতে বলে যাবার প্রয়োজনও হয়নি। অর্থাৎ আশাপূর্ণা দেবীর সৃষ্ট চরিত্ররা, বিশেষত নারীরা সমাজের যে স্থানে এবং যে যুগেই অবস্থান করুক না কেন, তারা নিজেদের ন্যূনতম মর্যাদা, আত্মসম্মান প্রতিষ্ঠার কথা বলতে গিয়েই এক একজন বিদ্রোহিনী, ব্যক্তিত্বময়ী, আত্মসচেতন নারীতে পরিণত হয়েছেন।

আশাপূর্ণা দেবী ছিলেন নগর সভ্যতাকেন্দ্রিক জীবনের মানুষ। তাই তাঁর রচিত ছোটগল্পগুলোর মধ্যেও একান্তভাবেই নাগরিকতার ছাপ সুস্পষ্ট। তাঁর রচনায় পল্লীপ্রকৃতি উঠে এলেও পার্শ্বপটভূমিকা ও মূল গল্পের পরিপূরক হিসেবে এসেছে। যদিও কোন গল্পের পটভূমিকা রচিত হয়েছে পল্লীগ্রামে, সেখানে কিন্তু চরিত্র বিকাশই মুখ্য হয়ে উঠেছে, পল্লীগ্রাম হয়ে রয়েছে নিতান্তই গৌণ (পত্রাবরণ)। কিন্তু মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তদের ক্ষয়িষ্ণু সমাজের কথাই তিনি বারংবার বলে গিয়েছেন। একান্নবর্তী ঘুণধরা অবক্ষয়িত সংসারগুলোর কথা বলতে গিয়ে তিনি প্রায় প্রতিটি গল্পেই ভগ্নদশাগ্রস্ত অট্টালিকাকে প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করেছেন। পরিবারের সকলে একটি স্নেহমায়ার বন্ধনে আবদ্ধ থেকে সাজিয়ে গুছিয়ে বসবাস করার স্মৃতি চর্বণ করে বর্তমানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস করা, মূল কর্তৃত্বকে উপেক্ষা করে কেন্দ্রবিন্দু থেকে বেরিয়ে যাওয়ার প্রবণতার যে চিত্র তাকেই আশাপূর্ণা দেবী 'থীম' হিসেবে তাঁর ছোটগল্পের ক্যানভাসে আঁকতে চেয়েছেন। এ অবস্থায় আর পারিবারিক ঐতিহ্য, অট্টালিকার ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে তারা মনোযোগী নন। ক্রমশঃ পরিবর্তিত হতে থাকা বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবারের ক্ষয়িষ্ণু চিত্রটিকে আশাপূর্ণা দেবী 'থীম' হিসেবে ব্যবহার করেন। এতেই ধরা পড়ে অত্যাচারিতের পরিবর্তনের চিত্র। পূর্বে যেখানে ছিল অশিক্ষিতা, স্থূল অত্যাচারী শাশুড়ীদের অত্যাচারের যুগ (ছিন্নমস্তা), পরে সে

স্থানে আসে শিক্ষিতা, সূক্ষ্ম ভাবে অত্যাচারী শাঁসালো পুত্রবধূদের যুগ (ঘূর্ণমান পৃথিবী)। অর্থাৎ নাগরিক চেতনাসম্পন্ন আশাপূর্ণা দেবী নিজের মতো তাঁর গল্পের চরিত্রগুলোকেও যে মনেপ্রাণে, অন্তরে-বাহিরে আধুনিক সুস্পষ্টতার প্রতিভূ করে গড়ে তোলেন তাই বোঝা যাচ্ছে। তাই তিনি কখনো কারো পক্ষ নিয়ে কথা বলেন না। নিরপেক্ষ, নিরাসক্ত জীবনদৃষ্টিই তাঁকে সত্য চিত্র উদ্‌ঘাটনে সহায়তা করে। এতে কারো জন্য কোন পক্ষ অবলম্বন করার প্রয়োজন হয় না। সত্যের স্বরূপেই উঠে আসে অত্যাচারী আর অত্যাচারিতের প্রকৃত চিত্র, তা কখনো পুত্রবধূ, কখনো শাশুড়ী, কখনো কোন পুরুষ — যেই হোক না কেন। অর্থাৎ কোন সংস্কার, কোন ধর্মীয় ছুৎমার্গ, কোন অতিপ্রাকৃতের ব্যবহার — কোন কিছুই তাঁর রচনার ও চরিত্রের পরিপূরক হিসেবে ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়নি।

এইসব চরিত্রগুলোকে জীবন্ত করে তুলতে আশাপূর্ণা দেবীর ব্যবহৃত ভাষাগুলো বিশেষ সহায়ক হয়ে উঠেছে। নারীদের মুখে পরিবেশ, পরিস্থিতি অনুযায়ী ভাষা, সংলাপ, প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার তাদের জীবন্ত করে তুলেছে।

ছোটগল্পের উদ্ভব হবার পর অগ্রসর হতে হতে তা যখন যৌবনে উপনীত হল, তখন যৌবনের নন্দনকাননে অনেককেই বিচরণ করতে দেখা গেল। তাদের মধ্যে যেসব ছোটগল্পকার আশাপূর্ণা দেবীর সমকালীন তাঁরা প্রায় সকলেই সমাজ, দেশ, প্রকৃতি, মৃত্যু চেতনা, রাজনীতি, অসহায় আদিম প্রজাতিদের ব্যথা-বেদনা ও জীবনযন্ত্রণাকে উপলব্ধি করেছেন। প্রত্যেকেই তাদের নিজস্ব অনুভূতি, মনন, বাস্তব অভিজ্ঞতা, বোধ থেকে প্রকৃত সত্যের রহস্যকে উন্মোচিত করেছেন। উপরোক্ত দিকগুলো নিয়ে উদ্ভুত যে সমস্যা সেগুলো প্রতিটি মানুষকে, রাজনৈতিক মহলকে ভাবায় এবং সাহিত্যের মাধ্যমে পাঠকসমাজও এসব বিষয় অবগত হতে পারে। সুবোধ ঘোষ, সন্তোষ কুমার ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, বিমল কর, প্রমুখরা প্রায় সকলেই সমাজের যে স্থানটি স্পর্শ করে গেছেন তা হচ্ছে মধ্যবিত্ত সমাজ। মধ্যবিত্ত সমাজের টানা-পোড়েন, উত্থান-পতন, তাদের জীবন সংগ্রাম, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার অপমৃত্যু এবং সর্বোপরি তাদের নিয়ে শাসক গোষ্ঠীর যে অত্যাচার এবং রাজনীতির খেলা চলে — এই বিষয়গুলোই হচ্ছে এই ছোটগল্পকারদের রচনার মূল উপজীব্য। সমাজের গভীর ক্ষতস্থানগুলো যেগুলো সমাজকে আরো বিষাক্ত করে দিয়ে কিছু সংখ্যক মানুষের যেন তাকে আরো দুর্গন্ধময় করে তোলার দিকেই প্রবণতা বেশি রয়েছে। ফলে আদর্শভ্রষ্ট সমাজ জীবনের প্রগতির সঙ্গে সমান পদক্ষেপে সবসময় চলতে ফিরতে পারছে না বলে তা কৃত্রিমতায় পর্যবসিত হচ্ছে। আর তাই উন্নয়নের চিন্তাধারায় শক্তিশালী প্রধান একটি স্রোত নির্মিত হচ্ছে না। অর্থাৎ এই সময়ের বহু বিচিত্র সমস্যা, চিন্তা ও মতামত এক বন্ধুর ও জটিল পথে এগিয়ে চলেছে। শোষিতরা শাসকদের দ্বারা নিষ্পেষিত হতে হতে এককোণে গিয়ে আশ্রয় পেয়েছে। যেমন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'টোপ' গল্পে রাজাবাহাদুর তার কীপারের মাতৃহীন একটি ছোট্ট শিশুকে

নিয়ে বাঘ শিকারের 'টোপ' হিসেবে ব্যবহার করেন। অমানবিক এই দিকগুলোও সাহিত্যের প্রাঙ্গনে উঠে এসেছে ছোটগল্পকারদের তীক্ষ্ম ধীশক্তির সাহায্যে। যার ফলে পাঠক সমাজ দরিদ্র নিপীড়িতদের দুরবস্থা সম্পর্কে অবহিত হতে পারছে। কিন্তু প্রত্যেকের মধ্যে সমাজ, দেশ, কালের সমস্যা ভাবনার উদ্রেক করলেও আশাপূর্ণা দেবীর ছোটগল্পগুলো প্রায় সবই সংলাপধর্মী এবং তির্যক বাক্‌ভঙ্গিমাযুক্ত। চোখে দেখা সত্যটাকে চিত্রিত করার জন্য যেটুকু প্রয়োজন, সেটুকুকেই বর্ণনা করেছেন; তাই তা হয়েছে বাহুল্যবর্জিত এবং কথনেও রয়েছে আবশ্যিকতা-অতিকথন সুন্দরভাবে বর্জিত।

গল্পের বিষয়বস্তু, ভাষারীতি পাঠককুলের অতিপরিচিত বলে গল্পের অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনা ও ইঙ্গিতময়তা সহজেই সকলকে বিমুগ্ধ ও আকৃষ্ট করে। গল্পের মধ্যে সমস্যাটা ফুটে ওঠার পর গল্পের সমাপ্তিতে যে রেশ রয়ে যায়, তার সূত্র ধরেই পাঠক সমাজ যেন এর সমাধান খুঁজতে চেষ্টা করে তাদের ভাষায় — এখানেই লেখিকার সার্থকতা। তাই যে সময়ে আধুনিকতার প্রভাবে সব ছোটগল্পকাররা গল্পের আঙ্গিক নিয়ে চিন্তিত তখন অবলীলাক্রমে আশাপূর্ণা দেবী গল্প বলে গেছেন সহজ উপাদান নিয়ে সহজ রীতিতে। তাই স্বচ্ছ ভাবনার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ হিসেবে গল্পের আঙ্গিকও স্বভাবতই বিষয়ানুগ হয়ে ওঠে এবং তা যথেষ্ট সাফল্যও সূচিত করে। আশাপূর্ণা দেবী যুগোপযোগী শব্দও চয়ন করেছেন তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলোর জন্য। শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে নারী এবং পুরুষদের আলাদা ধরন থাকে, অন্তঃপুরের নারীদের উপযুক্ত শব্দ ব্যবহারে তাঁর জুড়ি মেলা ভার, বিশেষত ছোটগল্পগুলোর ক্ষেত্রে। তাঁর রচনারাজিতে কাব্যিকচেতনা, সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা, সৌন্দর্যবোধ ও উপমা, রূপকল্পের ব্যবহারও যথেষ্ট রয়েছে। অর্থাৎ সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কেও তাঁর যথেষ্ট সচেতনতা চোখে পড়ে। দেশ-কাল ও সমাজের সামগ্রিক পরিস্থিতি আশাপূর্ণা দেবীকে কখনো ভাবাত না, কারণ সমগ্রকে নিয়ে যে সমস্যা — সেই অখণ্ড চিত্রের প্রতি তাঁর কোনকালেই আগ্রহের আতিশয্য ছিল না। তিনি জীবনের একান্ত নিভৃত অঞ্চলের কথা বলতে গিয়ে যেটুকু দেশাত্মবোধের প্রয়োজন পড়ত — সেটুকুই বলেছেন। কারণ, তাঁর সৃষ্ট চরিত্ররা নিজেদের জগতকে শুধুমাত্র চারদেওয়ালের মধ্যেই আবদ্ধ রেখেছিলেন, বহির্জগতের ঘটনার টানাপোড়েন, সংগ্রাম, যুদ্ধ, অর্থনীতি, রাজনীতি — কোনকিছুর তাপ-উত্তাপই এইসব চরিত্রদের তাপিত করত না। খিড়কির দরজা থেকে প্রধান ফটক আর ভেতরের আঙিনা — এটুকুই ছিল তাদের জীবনের জানার গণ্ডী। তাই যুদ্ধের প্রভাব এসব স্ত্রী চরিত্রদের ভাবনায় তথা আশাপূর্ণা দেবীর রচনার উদ্দেশ্যতে কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি। বরং তিনি কোথাও কোথাও দেখিয়েছেন যুদ্ধ লাগার ফলে কোন কোন বাড়িতে উৎসবের আমেজ চলে এসেছে। কারণ, সঠিক কোথায় বোমা পড়বে তা জানতে না পারায় মেয়েরা সব তাদের সন্তান সন্ততিদের নিয়ে চতুর্দিক থেকে এসে শহরে হাজির হয়েছে সমাজে যে ভাঙন বা অবক্ষয় শুরু হয়েছে তার মূলে দেখা দিচ্ছে নারীদের আত্মসুখের প্রবণতা।

একান্নবর্তী পরিবারগুলোতে সুখ এবং শান্তি প্রায় পাশাপাশি চললেও বাইরের সমাজে তখন লেগে গিয়েছে পরিবর্তনের হাওয়া। সেই তরঙ্গ এসে আঘাত করছে মধ্যবিত্ত জোট সংসারে। আর তখনই বহু অভিভাবক বেষ্টিত সংসার থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে স্বাধীন, ছোট্ট, সুখী সংসারের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে নারীরা। এই আত্মসুখই অতীতের আভিজাত্যবোধকে ভেঙ্গে দিচ্ছে, জন্ম নিচ্ছে স্বজনহীন ছোট্ট ছোট্ট পরিবার। এই স্থানগুলোকেই আশাপূর্ণা দেবী 'প্লট' হিসেবে নিয়েছেন। এই দিকগুলি একদম চিন্তান্বিত করে নি। তাই সকলের থেকে তাঁর স্বাতন্ত্র্য এখানেই যে, একমাত্র আশাপূর্ণা দেবীই অন্দরমহলের নারীদের অন্তরের কথা সাহিত্যের প্রাঙ্গনে তুলে এনেছেন।

সন্তোষ কুমার ঘোষ এবং বিমল করের মধ্যে যে মৃত্যুচেতনা কাজ করত, তার প্রভাব তাঁদের রচনায় পড়লেও আশাপূর্ণা দেবী কিন্তু মৃত্যুভয়ে ভীত অধিক সন্তানহারা এক বৃদ্ধার কথা লিখেছেন 'ভয়' গল্পে যে নাকি অশীতিপর হয়েও মরতে ভয় পায়। বেঁচে থাকবার আকুলতা রয়েছে তাঁর রচনায়, জীবনকে কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নিয়ে গিয়েও বাঁচিয়ে রাখতে দেখা গেছে 'অঙ্গার' গল্পে নতুন বৌ চরিত্রের মধ্য দিয়ে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর মধ্যে দেখা যায় প্রকৃতির সান্নিধ্যে এসে প্রেমে কেমন আত্মমগ্ন হয়ে গেছেন, কিন্তু আশাপূর্ণা দেবীর রচনায় যারা এসেছে তারা জীবন সংগ্রামে এক একজন ক্লান্ত বিধ্বস্ত সৈনিক, তাদের প্রকৃতির সৌন্দর্য্যচেতনায় আপ্লুত হবার তাদের সময় বা মানসিকতা কোনটাই নেই। কারণ, তাঁর সৃষ্ট চরিত্ররা প্রত্যেকেই সংসারের জটিল আবর্তে এমনভাবে নিমজ্জিত যে প্রকৃতির প্রতি প্রেম জন্মানো তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় যেভাবে তরাই ও ডুয়ার্সের বিভিন্ন অঞ্চল এবং ঘন বনের গভীরতাকে গল্পের মূলকেন্দ্রে আনতে পেরেছেন তার কারণ তিনি এসব অঞ্চলগুলো পরিভ্রমণ করেছেন এবং এদের প্রতি মনের একটা অনবদ্য আকর্ষণ অনুভব করতেন। কিন্তু আশাপূর্ণা দেবী তো একেবারেই আলাদা জগতের অধিবাসী, চারদেওয়ালের মধ্যেকার জীবনযন্ত্রণাকে তিনি উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। বহির্জগতের কোন আকর্ষণ তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকে নি। যা নাকি মহাশ্বেতা দেবীর সমস্ত বোধকে নাড়া দিয়েছিল। নিজের সমস্ত অসুবিধাকেও উপেক্ষা করে মহাশ্বেতা দেবী ছুটে ছুটে চলে যেতেন প্রত্যন্ত অঞ্চলে, যেখানে বঞ্চিত নিপীড়িত আদিবাসীরা দিনের পর দিন শোষণ আর বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন। এইসব মানুষদের নিয়ে গড়ে তুলেছেন নানা সংগঠন, তাদের প্রাণে যুগিয়েছেন বল, আর মুখে যুগিয়েছেন ভাষা। এই অসহায়দের জন্য আজও তাঁর প্রচেষ্টা এবং লেখনী সচল রয়েছে। মহাশ্বেতা দেবীকে কিন্তু আমাদের গৃহাভ্যন্তরের শাশুড়ী-বৌমা-ননদ-ভাজের সংসারের পাঁচ ফোড়নে পাওয়া যায়নি। একজন নারী হলেও নারী পুরুষ নির্বিশেষে সামগ্রিক ভাবনা তাকে ভাবিত করেছিল। কিন্তু আশাপূর্ণা দেবী যে রক্ষণশীলতার মধ্যে জন্মেছিলেন এবং জীবনযাপন করেছিলেন সেই জালে আবদ্ধ নারীদের বন্ধনদশা থেকে মুক্তির চিন্তাই তাঁর জীবনের সমস্ত বোধকে নাড়া দিয়েছিল। তাই ঘরের ভেতরে বন্দী,

দুর্দশাগ্রস্ত নারীদের কথা, আর চোখের সামনে ঘটে যাওয়া চলমান জীবনের ছবিই চিরকাল আশাপূর্ণা দেবী চিত্রিত করে গিয়েছেন।

তিনি সমসাময়িক লেখক লেখিকাদের মতো নানা ধরনের ফর্ম নিয়ে গবেষণা না করে চারদিকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ, দুঃখ, হাসি, অশ্রুকেই সাধারণ মানুষের মনে নানা রঙে চিত্রিত করেছেন। আশাপূর্ণা দেবীর এই ঘর গৃহস্থালী, বৈঠকখানার আড্ডাতেই নিজের দৃষ্টিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। পুরাতন জীর্ণ সংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি এবং তাঁর সৃষ্ট নারীদের বিদ্রোহিনী মূর্তি সাহিত্যজগতে অম্লানবদনে বিরাজিত। পাণ্ডিত্যের কোনরকম প্রকাশ না ঘটিয়ে সহজ কথাকে অত্যন্ত সহজে বলে গিয়েই আশাপূর্ণা দেবী আজ সকল পাঠক সমাজ, সাহিত্যপ্রেমীদের কাছে একান্ত আপনার জন, প্রাণের মানুষ হয়ে উঠেছেন।

গ্রন্থপঞ্জী

আকর গ্রন্থ

	গ্রন্থ	লেখক	প্রকাশক ও প্রকাশ কাল
১।	গল্প সমগ্র, আশাপূর্ণা দেবী — প্রথম খণ্ড		মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা - ৭৩ প্রথম প্রকাশ - ১লা বৈশাখ ১৩৯৮ পঞ্চম মুদ্রণ, পৌষ ১৪০৮
২।	গল্প সমগ্র, আশাপূর্ণা দেবী — দ্বিতীয় খণ্ড		মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা - ৭৩ প্রথম প্রকাশ - শ্রাবণ ১৩৯৯ তৃতীয় মুদ্রণ, আশ্বিন ১৪০৫
৩।	গল্প সমগ্র, আশাপূর্ণা দেবী — তৃতীয় খণ্ড		মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা - ৭৩ প্রথম প্রকাশ শুভ নববর্ষ ১৪০২ দ্বিতীয় মুদ্রণ, কার্তিক ১৪০৫
৪।	গল্প সমগ্র, আশাপূর্ণা দেবী — চতুর্থ খণ্ড		মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা - ৭৩ প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৪০৪ দ্বিতীয় মুদ্রণ, পৌষ ১৪০৮
৫।	গল্প সমগ্র, আশাপূর্ণা দেবী — পঞ্চম খণ্ড		মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা - ৭৩ প্রথম প্রকাশ -বৈশাখ ১৪০৬
৬।	আশাপূর্ণা দেবীর ছোটগল্প সংকলন		ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, এ - ৫ গ্রীণ পার্ক নয়াদিল্লী - ১১০০১৬ প্রথম প্রকাশ - ১৯৯৩
৭।	স্বনির্বাচিত শ্রেষ্ঠগল্প — আশাপূর্ণা দেবী		মডেল পাবলিশিং হাউস ২ এ শ্যামাচরণ দেব স্ট্রীট, কোলকাতা ৭৩ প্রথম সংস্করণ - ১লা বৈশাখ ১৩৯৫

গ্রন্থ	লেখক	প্রকাশক ও প্রকাশ কাল
৮। নির্বাচিত গল্পগুচ্ছ,	আশাপূর্ণা দেবী	আনন্দম ১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলকাতা - ৭০০০৭৩ প্রথম প্রকাশ - স্বাধীনতা দিবস ১৫ই আগস্ট ১৯৯৩ পরিমার্জিত সংস্করণ ঃ কলকাতা পুস্তক মেলা - ২০০৪
৯। নক্ষত্রের আকাশ,	আশাপূর্ণা দেবী	সাহিত্যম্ ১৮ বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলকাতা - ৭০০০৭৩ সাহিত্যম্ সংস্করণ, তৃতীয় মুদ্রণ - মহালয়া ১৪০৩
১০। বাছাই গল্প —	আশাপূর্ণা দেবী	মণ্ডল বুক হাউস, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা - ৯
১১। আশাপূর্ণা দেবী রচনাবলী (প্রথম খণ্ড)	আশাপূর্ণা দেবী	মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স কলিকাতা - ৭৩ প্রথম প্রকাশ ৮ই জানুয়ারি ২০০০ / পৌষ ১৪০৬ তৃতীয় মুদ্রণ - ২০০১ ফেব্রুয়ারি / মাঘ ১৪০৭
১২। রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড		মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স
১৩। রচনাবলী তৃতীয় খণ্ড		”
১৪। রচনাবলী চতুর্থ খণ্ড		”
১৫। রচনাবলী পঞ্চম খণ্ড		”
১৬। রচনাবলী ষষ্ঠ খণ্ড		”
১৭। রচনাবলী সপ্তম খণ্ড		”
১৮। রচনাবলী অষ্টম খণ্ড		”

সহায়ক গ্রন্থ

	গ্রন্থ	লেখক	প্রকাশক ও প্রকাশ কাল
১।	আর এক আশাপূর্ণা	আশাপূর্ণা দেবী	মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ কলিকাতা - ৭৩ প্রথম প্রকাশ - মাঘ ১৪০১ কলিকাতা পুস্তকালয়
২।	ছোটগল্পের কথা	রথীন্দ্রনাথ রায়	পুস্তক বিপণি ২৭ বেনিয়া টোলা লেন, কলিকাতা - ৯
৩।	বাংলা ছোটগল্প	শিশির কুমার দাস	দে'জ পাবলিশিং ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা - ৭৩ প্রথম প্রকাশ - ১৯৬৩ অক্টোবর তৃতীয় সংস্করণ - ১৯৯৫ নভেম্বর
৪।	বাংলা ছোটগল্প ঃ প্রসঙ্গ ও প্রকরণ	বীরেন্দ্র দত্ত	পুস্তক বিপণি ২৭ বেনিয়া টোলা লেন, কলিকাতা - ৯
৫।	বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প ও গল্পকার	শ্রী ভূদেব চৌধুরী	মর্ডাণ বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ ১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা - ৭৩ ১ম প্রকাশ - ১৯৬২ ৩য় প্রকাশ - ১৯৮২
৬।	বাংলা ছোটগল্পে প্রতিবাদী চেতনা	ডঃ বিজিত ঘোষ	পুনশ্চ ৯, এ নবীন কুণ্ডু লেন, কলিকাতা - ৯ প্রথম প্রকাশ - বইমেলা, ২০০০
৭।	বাংলা প্রবাদে স্থান কাল পাত্র	বরুণ কুমার চক্রবর্তী	পুস্তক বিপণি ২৭ বেনিয়া টোলা লেন, কলিকাতা - ৯ প্রথম প্রকাশ - ৫ই মার্চ, ১৯৭৯ দ্বিতীয় সংস্করণ - ১৯৮৪ অক্টোবর
৮।	রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্পের সমাজতত্ত্ব	ক্ষেত্র গুপ্ত	পুস্তক বিপণি ২৭ বেনিয়া টোলা লেন, কলিকাতা - ৯ প্রথম প্রকাশ - ১৯৮৬, ২৬ শে মার্চ
৯।	শিল্প সাহিত্য দেশকাল	সত্যেন্দ্র নাথ রায়	দে'জ পাবলিশিং ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা - ৭৩ প্রথম প্রকাশ - আশ্বিন ১৩৮৮ / ১৯৮১ অক্টোবর

	গ্রন্থ	লেখক	প্রকাশক ও প্রকাশ কাল
১০।	বাংলায় গল্প ও ছোটগল্প	ডঃ সরোজ মোহন মিত্র	তুলসী প্রকাশনী ৯/৭ বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট কলিকাতা - ৭৩ প্রথম প্রকাশ - ১৯৭৯ জুলাই দ্বিতীয় সংস্করণ - ১৪০৪
১১।	বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা	শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	মর্ডাণ বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ কলিকাতা - ৭৩
১২।	বাস্তবতা ও বাংলা উপন্যাস	কার্তিক লাহিড়ী	সারস্বত লাইব্রেরী ২০৬, বিধান সরণী, কলি - ৭০০০০৬ প্রথম প্রকাশ - ১৯৭৪
১৩।	কালের প্রতিমা	অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়	দে'জ পাবলিশিং কলিকাতা - ৭৩ প্রথম প্রকাশ - ১৯৭৪ এপ্রিল ১৩৮১ বৈশাখ দ্বিতীয় সংস্করণ - ১৯৯১ এপ্রিল ১৩৯৮ বৈশাখ
১৪।	কালের পুত্তলিকা	অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়	দে'জ পাবলিশিং কলিকাতা - ৭৩ চতুর্থ সংস্করণ - ১৪০৬ কার্তিক
১৫।	বাংলা উপন্যাসের কালান্তর	সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়	দে'জ পাবলিশিং কলিকাতা - ৭৩ প্রথম সংস্করণ - ১৯৬২
১৬।	ছোটগল্প ঃ বিকাশ, পরিণতি ও উপলব্ধি	সম্পাদনা - উজ্জ্বল কুমার মজুমদার জ্যোতিপ্রসাদ রায়	বামা পুস্তকালয় ১১ এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট কলিকাতা - ৭৩ প্রথম প্রকাশ - ২৮শে জানুয়ারি ২০০৪
১৭।	বাংলা আকর গ্রন্থ সংগ্রহ ও তথ্য	অসিতাভ দাস প্রদোষ কুমার বাগচী যুথিকা দাস (দাম)	উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির সি - ৩, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলি - ৭০০০০৭ প্রথম প্রকাশ - বইমেলা, ১৯৯৭
১৮।	বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা	শ্রী ভূদেব চৌধুরী	দে'জ পাবলিশিং প্রথম সংস্করণ - ১৯৫৪

	গ্রন্থ	লেখক	প্রকাশক ও প্রকাশ কাল
১৯।	রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ	শিবনাথ শাস্ত্রী	নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট কলি - ৭৩ প্রথম সংস্করণ - ১৩৬২ ভাদ্র চতুর্থ মুদ্রণ - ১৩৯০ ভাদ্র ১৯৮৩ আগস্ট
২০।	কালের পুতুল	বুদ্ধদেব বসু	নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলি - ৭২ প্রথম প্রকাশ - ১৯৪৬ সাল নিউ এজ সংস্করণ - মাঘ ১৩৬৫ বাং জানুয়ারি ১৯৫৯
২১।	মনীষা ও মন ঃ সমীক্ষণ	অমল শঙ্কর রায়	পুস্তক বিপণি ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলি - ৯ প্রথম প্রকাশ - ফেব্রুয়ারি - ১৯৮৪
২২।	মধ্যাহ্ন থেকে সায়াহ্নে বিংশ শতাব্দীর বাংলা উপন্যাস	অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়	দে'জ পাবলিশিং প্রথম প্রকাশ - জুলাই ১৯৯৪
২৩।	সাহিত্য কোষ, কথা সাহিত্য	অলোক রায়	সাহিত্যলোক দ্বিতীয় সংস্করণ - ১৯৯৩
২৪।	সংসদ সমার্থ শব্দকোষ	অশোক মুখোপাধ্যায়	সাহিত্য সংসদ দ্বিতীয় সংস্করণ - প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৮৪
২৫।	আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস	অশ্রুকুমার সিকদার	অরুণা প্রকাশনী প্রথম প্রকাশ জুলাই ১৯৮৮
২৬।	কল্লোল যুগ	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	প্রথম প্রকাশ -১৯৭১
২৭।	আধুনিক বাংলা উপন্যাসে বাস্তবতার স্বরূপ	অবিমুন রহমান	বাংলা অ্যাকাডেমী, ঢাকা প্রথম প্রকাশ - আষাঢ় ১৪, ১৪০০
২৮।	সাহিত্যের রূপরীতি	উজ্জ্বল কুমার মজুমদার	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ কলিকাতা - ১৯৮০
২৯।	দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথা সাহিত্য	গোপিকানাথ রায় চৌধুরী	পুস্তক বিপণি কলিকাতা - ৯

	গ্রন্থ	লেখক	প্রকাশক ও প্রকাশ কাল
৩০।	বাংলা কথা সাহিত্য প্রকরণ ও প্রবণতা	গোপিকানাথ রায় চৌধুরী	মহিন্দর পুস্তক বিপণি প্রথম প্রকাশ - নভেম্বর ১৯৯১
৩১।	রবীন্দ্রনাথ ঃ ছোটগল্পের প্রকরণ শিল্প	গোপিকানাথ রায় চৌধুরী	সাহিত্যলোক প্রথম সংস্করণ - ডিসেম্বর ১৯৯৭
৩২।	সতীনাথ ভাদুড়ী ঃ সাহিত্য ও সাধনা	গোপাল হালদার	অয়ন প্রথম প্রকাশ - জানুয়ারি ১৯৭৮
৩৩।	নির্বাচিত গল্প	জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী	দে'জ পাবলিশিং প্রথম সংস্করণ - ১৯৮৯
৩৪।	বাংলা গল্প বিচিত্রা	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	বেঙ্গল পাবলিশিং প্রাঃ লিঃ প্রথম প্রকাশ - মাঘ ১৩৪৬
৩৫।	গল্পমালা (৩য় খণ্ড)	নরেন্দ্রনাথ মিত্র	আনন্দ পাবলিশার্স প্রথম সংস্করণ - ১৯৮৬
৩৬।	নরেন্দ্র নাথ মিত্র রচনাবলী (৫ম)	নরেন্দ্রনাথ মিত্র	গ্রন্থালয় প্রথম সংস্করণ - ১৯৮৮
৩৭।	বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি	নাজমা জেসমিন চৌধুরী	চিরায়ত প্রকাশ প্রাঃ লিঃ প্রথম প্রকাশ - জুন ১৯৮০ ঢাকা, বাংলাদেশ প্রথম ভারতীয় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩
৩৮।	ভাষার ইতিবৃত্ত	সুকুমার সেন	আনন্দ পাবলিশার্স প্রথম প্রকাশ - ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ
৩৯।	বাঙালী জীবনে রমণী	নীরদ চন্দ্র চৌধুরী	মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ প্রথম প্রকাশ - ১৩৭৪ চৈত্র চতুর্দশ মুদ্রণ - শ্রাবণ ১৪০৮
৪০।	বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক উপন্যাস	বিজিত কুমার দত্ত	মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ চতুর্থ সংস্করণ - মাঘ ১৪০২
৪১।	ছোটগল্পে নরেন্দ্র মিত্র	ডঃ মঞ্জুরী চৌধুরী	দে'জ পাবলিশিং প্রথম প্রকাশ - ৭ই জানুয়ারি বইমেলা, আগরতলা

	গ্রন্থ	লেখক	প্রকাশক ও প্রকাশ কাল
৪২।	ছোটগল্পের কথা	রবীন্দ্রনাথ রায়	পুস্তক বিপণি প্রথম প্রকাশ - সেপ্টেম্বর ১৯৫৯
৪৩।	ছোটগল্পের রূপশিল্পী প্রেমেন্দ্র মিত্র	রামরতন রায়	তপন পুস্তকালয় প্রকাশ কাল - আগস্ট ১৯৮৫
৪৪।	সুবোধ ঘোষের ছোটগল্পে মানবিক মূল্যবোধ	ডঃ শিবশঙ্কর পাল	সুবর্ণা প্রকাশনী ৬ এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি - ১৩ প্রথম প্রকাশ - ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৯
৪৫।	বাংলা সাহিত্যের নবযুগ	শশীভূষণ দাশগুপ্ত	ভারতী প্রকাশনী ১ম সংস্করণ ১৯৯৭
৪৬।	বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা	সত্যেন্দ্র নাথ রায়	দে'জ পাবলিশিং প্রথম প্রকাশ - জানুয়ারি ২০০০
৪৭।	বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (৪র্থ খণ্ড)	সুকুমার সেন	ইস্টার্ন পাবলিশার্স প্রথম প্রকাশ - ১৯৫৮ সংস্করণ - ১৯৬৩
৪৮।	স্বর্ণকুমারী দেবী	সুদক্ষিণা ঘোষ	সাহিত্য একাদেমী, রবীন্দ্র ভবন ৩৫, ফিরোজসাহ রোড, নতুন দিল্লী - ১১০০০১ প্রথম প্রকাশ - ২০০১
৪৯।	হিন্দুনারী	সুষমা সেন	দেব সাহিত্য কুটির প্রাঃ লিঃ প্রথম প্রকাশ - ১৯৭৩
৫০।	বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (৪র্থ খণ্ড) (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)	সুকুমার সেন	আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড প্রথম আনন্দ সংস্করণ - ১৯৯৬ পঞ্চম সংস্করণ - ১৩৮৮
৫১।	বাংলা সাহিত্যে গদ্য	সুকুমার সেন	ইস্টার্ন পাবলিশার্স কলিকাতা ১৯৮৩
৫২।	গল্পসমগ্র (২য় খণ্ড)	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ তৃতীয় সংস্করণ - ১৯৯৮
৫৩।	সুবোধ ঘোষের রচনাবলী (৩য় খণ্ড)	সুবোধ ঘোষ	আনন্দ পাবলিশার্স প্রথম সংস্করণ - ১৯৯৪

	গ্রন্থ	লেখক	প্রকাশক ও প্রকাশ কাল
৫৪।	সাহিত্য সেবক অন্বেষা (২য় খণ্ড)	সৌরীন্দ্র কুমার ঘোষ	সাহিত্যলোক প্রথম সংস্করণ ১৩৮৬
৫৫।	বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড উনবিংশ শতাব্দী	সুকুমার সেন	ইস্টার্ন পাবলিশার্স সপ্তম সংস্করণ, ১৩৮৬
৫৬।	বাঙালীর সংস্কৃতি	সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়	পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমী ৪র্থ সংস্করণ, ৩১ শে জানুয়ারি ১৯৯৬
৫৭।	শরৎচন্দ্র সমালোচনা সাহিত্য	সুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত	এ মুখার্জী এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ ষোড়শ সংস্করণ, আশ্বিন ১৪০৪
৫৮।	সাহিত্যের নানা কথা	হরপ্রসাদ মিত্র	নাথ সাহিত্য প্রথম প্রকাশ, মহালয়া ১৩৬৩
৫৯।	প্রথম প্রতিশ্রুতি	আশাপূর্ণা দেবী	মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রথম প্রকাশ - ১৩৭১ ফাল্গুন দ্বিচত্বারিংশ মুদ্রণ অগ্র ১৪০৮
৬০।	সুবর্ণলতা	আশাপূর্ণা দেবী	মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ
৬১।	বকুল কথা	আশাপূর্ণা দেবী	মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স
৬২।	স্তন্যদায়িনী ও অন্যান্য গল্প	মহাশ্বেতা দেবী	নাথ ব্রাদার্স কলিকাতা প্রথম প্রকাশ - ১৯৭১
৬৩।	সমরেশ বসুর রচনাবলী	সমরেশ বসু	
৬৪।	সমরেশ বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প	সমরেশ বসু	ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং
৬৫।	সন্তোষ কুমার ঘোষের শ্রেষ্ঠ গল্প	সন্তোষ কুমার ঘোষ	ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং
৬৬।	মহাশ্বেতা দেবীর রচনাসমগ্র	মহাশ্বেতা দেবী	দে'জ পাবলিশিং প্রথম প্রকাশ - ১৪০৭ বঙ্গাব্দ

	গ্রন্থ	লেখক	প্রকাশক ও প্রকাশ কাল
৬৭।	হাজার চুরাশির মা	মহাশ্বেতা দেবী	করুণা প্রকাশনী প্রথম প্রকাশ - ১৯৭৪
৬৮।	বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস (১ম খণ্ড)	ক্ষেত্র গুপ্ত	গ্রন্থ নিলয় নতুন ২য় সংস্করণ, আগস্ট ১৯৯৫
৬৯।	বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস (২য় খণ্ড)	ক্ষেত্র গুপ্ত	গ্রন্থ নিলয় প্রথম সংস্করণ ২রা ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪
৭০।	নির্বাচিত গল্প	বিমল কর	অনন্য প্রকাশন ৬৬, কলেজ স্ট্রীট কলকাতা - ১২ প্রথম প্রকাশ - ১৯৭৩ ১৬ই মে
৭১।	সাহিত্যে ছোটগল্প	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	কলিকাতা ডি. এম. লাইব্রেরী প্রথম প্রকাশ - ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ
৭২।	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠগল্প	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং প্রথম প্রকাশ - ১৩৬১
৭৩।	বিছন	মহাশ্বেতা দেবী	কলকাতা পিপলস্ বুক সোসাইটি প্রথম প্রকাশ - ২০০৫
৭৪।	প্রেমের গল্প	মহাশ্বেতা দেবী	বাণী শিল্প, প্রথম প্রকাশ - ২০০৪
৭৫।	অরণ্যের অধিকার ঃ বাস্তবতার সন্ধান	মহাশ্বেতা দেবী	অক্ষর প্রকাশনী প্রথম প্রকাশ - ২০০৫
৭৬।	জীবন বিচিত্রা	সুবোধ ঘোষ	অশোক প্রকাশন প্রথম প্রকাশ - ২০০৫
৭৭।	বাংলা ছোটগল্পে বাত্যজীবন	সোহারাব হোসেন	করুণা প্রকাশনী প্রথম প্রকাশ - ২০০৪
৭৮।	বিপন্ন জাহাজের এক নাবিকের গল্প	গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ	ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রথম প্রকাশ - ২০০৫

	গ্রন্থ	লেখক	প্রকাশক ও প্রকাশ কাল
৭৯।	সময়ের প্রত্নতত্ত্ব ও অন্যান্য	তপোধীর ভট্টাচার্য	জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী প্রথম প্রকাশ - ২০০৫
৮০।	শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ	বীরেন্দ্র দত্ত	পুস্তক বিপণি প্রথম প্রকাশ - ২০০৪
৮১।	বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (৫ম খণ্ড)	সুকুমার সেন	আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ দ্বিতীয় মুদ্রণ - ২০০২ মে
৮২।	প্রসঙ্গ ঃ অনুষঙ্গ	সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়	দে'জ পাবলিশিং প্রথম প্রকাশ - শ্রাবণ ১৩৯৭ আগস্ট ১৯৯০
৮৩।	মৃচ্ছকটিক	শূদ্রক (অনুবাদ - সুকুমারী ভট্টাচার্য)	সাহিত্য একাদেমী রবীন্দ্র ভবন ৩৫ ফিরোজশাহ রোড নতুন দিল্লী - ১১০০০১ প্রথম প্রকাশ - ১৯৮০ পঞ্চম মুদ্রণ - ২০০৩
৮৪।	বাংলা শিশু সাহিত্য (তথ্য তত্ত্ব রূপ ও বিশ্লেষণ)	নবেন্দু সেন	পুঁথিপত্র, ক্যালকাটা প্রাঃ লিঃ এ্যান্টনি বাগান লেন, কলি - ৯ প্রথম প্রকাশ - ১৯৯১ আগস্ট পুনর্মুদ্রণ - ২০০০
৮৫।	রবীন্দ্রনাথ আরু অসমীয়া কবিতা	ডঃ পল্লবী ডেকা বুজরবরুয়া	কৌস্তভ প্রকাশন ডিব্রুগড় - ৩ মিলননগর, ডিব্রুগড় - ৭৮৬০০৩ অসম প্রথম প্রকাশ - ফেব্রুয়ারি ২০০৩

সহায়ক পত্র-পত্রিকা

কথা সাহিত্য ঃ শ্রাবণ ১৪০২, প্রকাশক মিত্র ও ঘোষ।

আনন্দবাজার পত্রিকা ঃ ২৯শে আষাঢ় ১৪০২ (১৫ই জুলাই, ১৯৯৫)
৯ই চৈত্র ১৪১৪ রবিবার (২৩শে মার্চ, ২০০৮)
১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৪১৫ রবিবার (২৫শে মে, ২০০৮)

সংবাদ প্রতিদিন ঃ ১৯শে এপ্রিল ২০০৮, শনিবার শারদীয়া সংখ্যা।
১৪০৬, শারদীয়া সংখ্যা ১৪০৮

দেশ ঃ শারদীয়া ১৪০২, শারদীয়া সংখ্যা ১৪০৬, ১৪০৮।

কোরক ঃ মহাশ্বেতা সংখ্যা ১৯৯৩, ছোটগল্প সংখ্যা ১৪০২, বইমেলা ১৪০১

বর্তমান ঃ শারদ সংখ্যা ১৪১১, ১৪১৪

চতুষ্কোণ ঃ শারদীয়া ১৪০৯ ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্র, ৫৪ বর্ষ নবপর্যায় ৪২ বর্ষ, সম্পাদক সমরেন্দ্র মৈত্র

আজকাল ঃ ১০ই অক্টোবর ১৯৯৯

LIBRARY NBU DARJEELING